"দাস গোস্বামী"

['ঠাকুর হরিদাসের কৃপাপাত্র' 'স্বরূপের পুত্র ও ভৃত্য',
'গম্ভীরা-বিহারী গৌরহরির নীলাচল লীলার ধারক'
'আরোপে আরতি হেরে হুঁহুঁকারী'
শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর
সু-নির্ম্মল জীবন চরিত।]

"প্রচার সংস্করণ"

প্রকাশনে—
"শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রেরণা"

সঙ্কলনে—
রামকিঙ্কর দ

প্রথম প্রকাশ :
"শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী"
১৭ই মাঘ : ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ ;

এই তিথিটি :

(১) 'গৌরহরির অভিন্ন-তনু' নিতাইচাঁদের আবির্ভাব তিথি

এবং

(২) পরম গুরুদেব শ্রীল রাধারমণ চরণদাস দেবের নবদ্বীপস্থ প্রখ্যাত 'সমাজবাটিতে' প্রথম প্রবেশ তিথি

"রাজপথের গাছ তলায় দাঁড়িয়ে কেউ আমার গাছ ব'লে দাবী করলে কলহ হয়, রাজা কি সে কথা শোনে? তিনি বলেন—

'পথের গাছ সবারই. ওর 'ছায়া' ওর 'ফুল' ওর 'ফলে' সবারই সমান অধিকার। নষ্ট ক'রলেই দোষী।'

ভক্তি পথে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা তাঁরই তৈয়ারী গাছ, তিনি যতদিন রাখবেন ততদিন সকলেরই। তবে তুমি যদি তোমার বাগানে লাগাতে চাও ওর বীজ নিয়ে যাও।"

(নামমন্ত্রজীবন শ্রীল রামদাস বাবাজী)

মুদ্রণ :
মজুমদার প্রেস, ৫৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৫

শ্রীরামহরিদাস বাবাজী
বৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপ

শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজী
কুসুমসরোবর, শ্রীকুণ্ড

শ্রীকুঞ্জদাস বাবাজী
কেশিঘাট, শ্রীবৃন্দাবন

শ্রীরাধারমনচরণ দাস দেব
সমাজবাটী, নবদ্বীপ

জয় নিতাই গৌর রাধেশ্যাম ।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

জয়গুরু শ্রীগুরু   জয় ঠাকুর হরিদাস

বাবাজী ম'শায়ের নিত্য 'দর্শন' স্মরণ ও বন্দনার মহাপুরুষবৃন্দ ঃ—

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু প্রভু, শ্রীহরিবোলানন্দ ঠাকুর, প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অবধূত জ্ঞানানন্দস্বামী, শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ ভারতী, শ্রীমৎ স্বামীসচ্চিদানন্দ-বালকৃষ্ণ ব্রজবালা, শ্রীগৌরহরিদাস বাবাজী, শ্রীরামহরিদাস বাবাজী, শ্রীহরিচরণদাস বাবাজী, শ্রীমাধবদাস বাবাজী, শ্রীকুঞ্জদাস বাবাজী এবং পরম গুরুদেব শ্রীল রাধারমণ চরণদাস বাবাজী ।

—এঁদের 'চিত্র' পরপৃষ্ঠায় সংযোজিত হইল ।

"শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা"

"জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম-কলপতরু"

বল ভাই—জয় জয় শ্রীগুরু

একবার,—জয় দাও ভাই

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেবের জয় দাও ভাই

অযাচিত কৃপাকারী প্রভুর জয় দাও ভাই

অদোষে-দরশী প্রভুর জয় দাও ভাই

অগতির গতি দাতা প্রভুর জয় দাও ভাই

"জয় জয় শ্রীগুরু—প্রেম-কলপতরু"

কল্প-তরুর সনে—তুলনা হয় না

—সে ত',—না চাহিলে দেয় না রে

কল্পতরু বলে যারে সে ত',—না চাহিলে দেয় না রে

তার, কাছে গিয়ে দাও বলে

—সে ত', না চাহিলে দেয় না রে

তার, কাছে না গেলে ত' দেয় না রে

বাঞ্ছিত ফল তার, কাছে না গেলে ত' দেয় না রে

এ যে, অপরূপ প্রেম কল্পতরু

সেধে যেচে বিলায় রে

চির অনর্পিত প্রেমফল,— সেধে যেচে বিলায় রে

'চির অনর্পিত প্রেমফল'

যা, কিশোরীর ভাণ্ডারের নিধি চির অনর্পিত প্রেমফল
যা, ব্রহ্মাদিরও সুদুর্লভ চির অনর্পিত প্রেমফল
যা, গোলকে গোপনে ছিল সেই—চির অনর্পিত প্রেমফল
যা, কোটি কল্প কঠোর সাধনেও মিলে না।
—চির অনর্পিত প্রেমফল

সেধে যেচে বিলায় রে
গিয়ে, আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে সেধে যেচে বিলায় রে
তাই বলি, তুলনা হয় না
প্রাকৃত, কল্পতরুর সনে—তুলনা হয় না

"অদ্ভুত যাঁহার প্রকাশ"

অতি, অদ্ভুত প্রকাশ ভাই
অদ্বয়-ব্রহ্ম, শ্রীনন্দনন্দনের অতি, অদ্ভুত প্রকাশ ভাই
মো হেন অধমের লাগি অতি, অদ্ভুত প্রকাশ ভাই
ও,—"জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরু-রূপ ধরি ॥"

গুরু-রূপে অদ্ভুত প্রকাশ
তাই বলি,—অতি অদ্ভুত প্রকাশ ভাই
"হিয়া-অগেয়ান, তিমির বর-জ্ঞান,
সুচন্দ্র-কিরণে করু নাশ।"
হিয়ার, অজ্ঞান-আঁধার দূর কৈলেন
বর-জ্ঞান-সুচন্দ্র-কিরণ প্রকাশে
—হিয়ার, অজ্ঞান আঁধার দূর কৈলেন

কিসে বা গণি রে

চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশ কিসে বা গণি রে

তারা, বাহিরের তাপ-তমঃ নাশে

উদয় হ'য়ে আকাশে হৃদয়ের পাপ-তমঃ নাশে

উদয় হ'য়ে হৃদ্ আকাশে হৃদয়ের পাপ-তমঃ নাশে

"সুচন্দ্র-কিরণে করু নাশ।
ইহঁ লোচন-আনন্দধাম॥"

লোচন-আনন্দধাম

শ্রীগুরু-মূরতিখানি—লোচন-আনন্দ-ধাম

ইহ লোচন-আনন্দধাম।

"অযাচিত মো হেন পতিত হেরি যো পহুঁ
যাচি দেয়ল হরিনাম॥"

আমায়, সেধে যেচে নাম দিলেন

আমি, কখনও ত' জানতাম্ না ভাই

আমি, কখনও ত' চাই নাই ভাই

হরিনাম দাও ব'লে আমি, কখনও ত' চাই নাই ভাই

আমায়, সেধে যেচে নাম দিলেন

বাহু পসারি হিয়ায় ধ'রে আমায়, সেধে যেচে নাম দিলেন

ধর, ধর নামের মালা পর

কেন মিছে,—ত্রিতাপ জ্বালায় জ্ব'লে মর

ধর, ধর নামের মালা পর

এ যে ত্রিতাপ হর— ধর, ধর নামের মালা পর

হরি,—নামের মালা কণ্ঠে পর

বল, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
বল, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

ধর,—পর হরিনামের মালা

ওরে ও কলিহত জীব—পর হরিনামের মালা

দূরে যাবে ত্রিতাপ-জ্বালা পর হরিনামের মালা
যাবে জ্বালা, পাবে নন্দলালা পর হরিনামের মালা
হয়ে, ব্রজবালা, পাবে নন্দলালা পর হরিনামের মালা

আমায়,—সেধে যেচে নাম দিলেন
যাচি দেয়ল হরিনাম ॥

আমি, দূর-মতি অগতি, সতত-অসত মতি,
আমার,—"নাহি সুকৃতি-লব লেশ।

আমি, দূরমতি অগতি
আমার, নাহি কোনও সুকৃতি আমি, দূরমতি অগতি
আমার, অসৎ সঙ্গে সদা বসতি আমি, দূরমতি অগতি

সুকৃতির ত' লেশ ছিল না
আমার, কোনও জন্ম জন্মান্তরের—সুকৃতির ত' লেশ ছিল না
আমি, শ্রীগুরু কৃপা পেতে পারি—এমন কোন
—সুকৃতির ত' লেশ ছিল না

আমার, "নাহি সুকৃতি লব লেশ।
শ্রীবৃন্দাবন, যুগল ভজন ধন
মোহে করল উপদেশ ॥"

নিজগুণে জানাইলেন

ব্রজে, রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় নিজগুণে জানাইলেন

আমায়,—কৃপা ক'রে জানাইলেন

যুগল-ভজন-কথা আমায়,—কৃপা ক'রে জানাইলেন

আ'মরি কি করুণা রে

করুণার বালাই ল'য়ে ম'রে যাই আ'মরি কি করুণা রে

"মোহে করল উপদেশ ॥

নিরমল-গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে"

আ'মরি—নিরমল নিরমল

গৌর আমার উন্নত উজ্জ্বল নিরমল নিরমল

'মহা,' রাস-বিলাসের পরিণতি—

রাই কানু একাকৃতি মহা, রাস-বিলাসের পরিণতি

আ'মরি,—নিরমল নিরমল

ও,—"নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে,
পূরল সব-মন-আশ ॥"

আমার, সকল আশা পূরণ কৈলেন

আশার অতীত-ধন দিয়ে

—আমার, সকল আশা পূরণ কৈলেন

'আশার অতীত-ধন দিয়ে'—

আমি যা স্বপনেও কভু ভাবি নাই—আশার অতীত-ধন দিয়ে

আমার, সকল আশা পূরণ কৈলেন

"পূরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে, রতি নাহি হোয়ল,"
দয়াল,—"(গুরু-চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল")

আমার রতি মতি হ'ল না ভাই
শ্রীগুরু চরণাম্বুজে—আমার মতি গতি হ'ল না ভাই

কি হবে আমার গতি
শ্রীগুরু-চরণে না হ'ল রতি কি হবে আমার গতি
ভাই, সেই তো উত্তমা গতি
শ্রীগুরু-চরণে রতি—ভাই, সেই তো উত্তমা গতি

আমার গতি কি বা হবে
আমি, একদিনও ত ভজলাম্ না ভাই
নিষ্কপটে শ্রীগুরু-চরণ— একদিনও ত ভজলাম্ না ভাই

আমি ভুলেও একবার বললাম্ না ভাই
ভজার কথা দূরে থাক্
—আমি ভুলেও একবার বললাম্ না ভাই
'হা, গুরুদেব তোমার হ'লাম ব'লে'

মায়ার দাসত্ব ছেড়ে—হা, গুরুদেব তোমার হ'লাম বলে
মুখেও একবার বললাম্ না ভাই
তাই বলি, আমার গতি কি বা হবে

"ধিক্ ধিক্ জীবনে কি আশ ।।"
"রোয়ত বৈষ্ণব দাস ।।"

এই কৃপা কর সকলে
ওগো,—বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ, নারী এই কৃপা কর সকলে

যেন, অবিচারে বিকাতে পারি

পরম-করুণ-শ্রীগুরুপদে　　যেন, অবিচারে বিকাতে পারি

যেন, আজ্ঞাপালন ক'রতে পারি

কায়-মন-বাক্য দ্বারা　　যেন, আজ্ঞাপালন ক'রতে পারি

যেন, কখনও না হই স্বতন্তরী

শ্রীগুরু-চরণ বিস্মরি　　যেন, কখনও না হই স্বতন্তরী

তাঁর কৃপাদত্ত নামাবলী　　যেন, প্রাণ ভ'রে গাইতে পারি

আর যারে দেখি তারেই বলি—

'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥'

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

প্রথম ঃ

সর্ব্ব প্রথমে শ্রীগুরু করুণার জয় দিয়া এই "দাস গোস্বামী" শ্রীগ্রন্থের প্রকাশের ইতিবৃত্তটুকু নিবেদন করি। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের নিয়ম সেবার সময় (আশ্বিন শুক্লা একাদশী হইতে কাত্তিক শুক্লা একাদশী সময়কে নিয়ম সেবার মাস বলা হয়)—শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ, স্বর্গদ্বার, পুরীতে 'দাস গোস্বামী' সঙ্কলনের প্রেরণা মনে জাগে। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত উদঘাটিকাটির খসড়াটি সেখানে আত্মপ্রকাশ করেন। কাত্তিক পূর্ণিমার দিন এই গ্রন্থ সঙ্কলন আরম্ভ হয় 'টিটিলাগড়ে' এবং সম্পূর্ণ হইলেন—সঙ্কলয়িতার শ্রীকুণ্ডতটে অবস্থানের আবাসে। —সেদিন সোমবার, অমাবস্যা, ২৭শে মে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ।

তাহারই আঠার দিন পরে বা ১৫ই জুন তারিখের অপরাহ্ণে 'শ্রীগুরু করুণাই' মানুষের মূত্তি ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকুণ্ডে আগমন করেন এবং 'রামকিঙ্করদাসকে' খুঁজিতে খুঁজিতে বহুক্ষণ পরে একরূপ পরিচয় হীন সঙ্কলয়িতার কুটিরে (তারাস মন্দির, পোষ্ট ঃ রাধাকুণ্ড, জেলা ঃ মথুরা) পদার্পণ করেন।

এই ঘটনার দেড়মাস পরে (৪ঠা আগষ্ট) শ্রীগুরু করুণার সেই সচল মূত্তি কাঙ্গাল সঙ্কলয়িতাকে নিজের মোটরে ষ্টেশনে পঁহুছাইয়া 'তুফান মেলে' কলিকাতার একখানি 'টু-টায়ার বার্থ-এর' টিকিট সহ ট্রেনে চড়াইয়া দেন। ঐ শ্রীগুরু করুণার সচল মূত্তির মধুর স্বভাবা দ্বিতীয়া পুত্রবধূটিও এই ভিখারী সঙ্কলয়িতাকে অপত্যস্নেহে—ট্রেনে ব্যব্যহারের জন্য এক কুঁজা যমুনার জল ও পর্য্যাপ্ত ফল সঙ্গে দেন।

৫ই আগষ্ট '৬৮ সন্ধ্যাকালে সঙ্কলয়িতা গৌরপরিকর শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ী বরাহনগর, কলিকাতা-৩৫-এ অবস্থিত নিজ 'শ্রীগুরু-পাঠ'-এ উপনীত হয়।

ধন-জন-সহায়-সম্পদ-হীন অধম ভিখারী সঙ্কলয়িতা ৯ই আগষ্ট তারিখে (ঐ) শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে বসিয়াই টেলিফোনে সংবাদ পায়—

গ্রন্থ ছাপাই জন্য 'প্রিন্টিং ও আর্ট পেপার' এবং প্রেসের ব্যবস্থা প্রস্তুত। ছাপাই শুরু হয়। ১৯-৮-৪৮ তারিখে "দাস গোস্বামী"র প্রথম ফর্ম্মাটির 'ফাইল কপি' আমরা পাই।

লিখা বাহুল্য যে এই সব ব্যবস্থা, উপরে উল্লিখিত সচল শ্রীগুরু-করুণারই কীর্ত্তি।

আবার ছাপাই কার্য্য আরম্ভ হওয়ার কিছু দিন পরে যখন তিনি (শ্রীগুরু করুণার সচল মূর্ত্তি) জানিতে পারিলেন যে (সাহায্যকারী) প্রুফ্ রীডাররে পারিশ্রমিক এবং সঙ্কলয়িতার বরাহনগর হইতে বেনিয়াটোলায় অবস্থিতি 'প্রেসে' ও অন্যান্য স্থানে প্রত্যহ যাতায়াত জন্য রিক্সা ট্রাম ও বাসের ব্যয়ের সংস্থানও দরকার, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে সব প্রয়োজনেরও সংস্থান করিয়াছেন।

শ্রীগুরু-করুণার উক্ত সচলমূর্ত্তি—**'জাত-সেবক'**। এই কারণেই তাঁহার সুখের জন্য এখানে (তাঁহার) নামোল্লেখ হইল না।

'লীলা ত্রিকাল সত্য'
'কেউ কোথাও যায় না'

—এই সূত্র অনুসারে, আমাদের এই সচল শ্রীগুরু-করুণার মূর্ত্তির আচরণ ও কার্য্য কোন্ শক্তির খেলা ?

বিচিত্র !—

[মায়ার দাসত্ব ছেড়ে—

হা ! গুরুদেব ! তোমার হ'লাম বলে, মুখেও একবার বল্‌ছি না. অথচ নির্হেতুক কৃপাকারী শ্রীগুরুদেবের করুণা নিজ স্বভাবেই নৃত্য ক'রে চ'লেছেন।

হা গুরুদেব ! যদি রাখ্‌তে সাধ তবে এই জগতে এই কৃপা কর, যেন তোমার প্রদর্শিত পথে চলতে পারি। তোমার কৃপাদত্ত নাম যেন ভুলি না এবং আমা হ'তে তোমার 'অকলঙ্ক নামে' (যেন) কলঙ্ক রটে না।]

দ্বিতীয় :

একজন ধনী ব্যক্তির অবোধ শিশু সন্তানকে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য গৃহশিক্ষককে যে 'শ্রম' ও 'দক্ষতা' প্রয়োগ করিতে হয়, অনুরূপ শ্রম ও দক্ষতার সহিত শ্রীগুরুকৃপাস্নাত, অগাধ পণ্ডিত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর দেবশর্ম্মা**-শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ (শ্রীগুরু সম্পর্কে এ অধমের 'দাদা') সঙ্কলয়িতার "ভাব" ও "প্রকাশ ভঙ্গীকে" অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই শ্রীগ্রন্থকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

এই শ্রীগ্রন্থের সপ্তদশ তরঙ্গে 'প্রীতিউপহার' (২) (পৃষ্ঠা ৫২১-৫৬১ পর্য্যন্ত) সম্পূর্ণ অংশ, এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'র সংগ্রহ হইতে লওয়া হইয়াছে।

দৈনন্দিন, আলাপে, বাবাজী ম'শায়ের শ্রীমুখ হইতে যে সব অমূল্য নিধি ছড়াইয়া পড়িত, সে সব সংরক্ষণে যাঁহারা প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইনি শুধু প্রধানই নন্, সে সব সংরক্ষণের সার্থক রূপ (প্রায় অর্দ্ধেক মুদ্রিত হইয়াছে, বাকী তাঁহার নিকট পাণ্ডুলিপিতে সুরক্ষিত আছে)— দিয়াছেন।

এ ছাড়া, শ্রীল রামদাসবাবাজী মহাশয়ের অমল জীবন চরিত (নাম চরিত মাধুরী) গ্রন্থের সঙ্কলকও এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'।

শ্রীগুরু চরণে সকাতর প্রার্থনা যেন তিনি নিত্য নূতন ভাবে দাদাকে অনুরূপ সেবা-সৌভাগ্য-গৌরবে গৌরবান্বিত করিতে থাকেন।

তৃতীয় :

এই শ্রীগ্রন্থে অষ্টাদশ তরঙ্গে পাথেয় (২) ব্রজের মুকুটমণি শ্রীকুণ্ডে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের ইতিহাস সংযোজিত হইয়াছে।---এই ঐতিহাসিক সংযোজনে—১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিবরণ ও তথ্যাবলী শ্রীকুণ্ডের বৈষ্ণব-কুল-গৌরব **শ্রীল নবদ্বীপ দাস** বিরচিত 'শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস' গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৬৮ পর্য্যন্ত সময়ের তথ্যাবলী বর্ত্তমান **মহান্ত শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণদাস বাবাজী** মহাশয়ের কৃপায় পওয়া গিয়াছে। এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত তথ্যই পূজনীয় মহান্তজীর নিকট সংরক্ষিত রেকর্ডের (records) সহিত মিলাইয়া লওয়া হইয়াছে।

আর ৫৮০ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত (পরিক্রমার রাস্তা ও গোস্বামীদের স্থানগুলির চিহ্ন সহ শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের) মানচিত্রটি (এই) মহান্তজীর নিকট আদালতের যথার্থ অনুলিপির মানচিত্র হইতে অবিকল নকল করিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে।

মহান্ত মহাশয়ের স্নেহ, কৃপা, সাহায্য ও উৎসাহ দান, এ সঙ্কলয়িতার নিত্য সাধ্যায়ের ধন। তিনি কৃপা পূর্ব্বক অপদার্থ সঙ্কলয়িতার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করেন ইহাই সকাতর প্রার্থনা।

(মনে হয়)—ইহার মুখ্য ভজন—

শ্রীকুণ্ডবাসী বৈষ্ণববৃন্দ যাহাতে নিরুপদ্রবে 'ভজন' করিতে পারেন, তাহার 'চেষ্টা' ও 'সু-ব্যবস্থা'। অদ্ভুত!

পাথেয় (১)ঃ মহামন্ত্রের পরিচর্য্যা সঙ্কলনে—

বিদ্যারত্ন, শ্রীগোপালদাস কাব্য-তীর্থ-ব্যকরণ সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীমহামন্ত্র মীমাংসা" গ্রন্থ আমাদের মূল উৎস।

চতুর্থঃ

বর্ত্তমান ব্রজমণ্ডলের (শ্রীবৃন্দাবনবাসী) আদর্শ গৃহী, প্রখ্যাত অধ্যাপক **শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**, ভাগবতভুষণ, অধম সঙ্কলয়িতাকে (নিজগুণে) আপন ছোট ভাই-এর মত সদা স্নেহ করেন। তিনি তাঁহার বহুমূল্য সময় ও শ্রম ব্যয় করিয়া এই শ্রীগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার স্নেহঋণ যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ইহাই শ্রীগুরু বৈষ্ণব চরণে সকাতর প্রার্থনা।

এখানে প্রসঙ্গত নিবেদন যে, এই পাণ্ডুলিপি পঠন ও শ্রবণ করিয়া তিনি আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলিয়াছেন—

"ঠাকুর হরিদাসের কৃপাস্নাত" "স্বরূপের পুত্র ও ভৃত্য" "গম্ভীরা-বিহারী গৌরহরির নীলাচল লীলার ধারক" এবং "আরোপে আরতি হেরে হুঁহুঁকারী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সু-রসাল জীবন কথা সঙ্কলিত হয়েছেন, এ যেন, বাবাজী ম'শায়ের "করুণা" অক্ষর রূপে মূর্ত্তি ধরেছে!

(বহুবার দেখেছি ত') তাঁর সংকীর্ত্তন, সময়ে (আঁখরে প্রকাশিত) স্বতঃস্ফূর্ত "তত্ত্ব" ও "তথ্যাবলী" সবই শাস্ত্রের কথা।

পণ্ডিতবাবা (বৃন্দাবনস্থ রমণরেতিতে নিত্য লীলায় অবস্থিত) -ও —এ অভিমত পোষণ করিতেন। তিনি বলিতেন—

'শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় শাস্ত্রের যে পৃষ্ঠা হইতে কীর্ত্তন করেন, আমরা এখানো সে পৃষ্ঠায় পৌঁছুছাই নাই।'

পঞ্চম ঃ

মায়া কবলিত নরপশু সঙ্কলয়িতাকে পারমার্থিক পথে আকর্ষণের প্রথমা ও প্রধানা শ্রীকুণ্ড-তট-বাসী **শ্রীমতি রাণুবালা দাসী** (স্নেহ-ময়ী দিদি) শ্রীকুণ্ডে, "দাস গোস্বামী" সঙ্কলন সময়ে পাঁচ মাস কাল ব্যাপী যে অপূর্ব্ব 'সেবা' ও 'উৎসাহ' দান করিয়াছেন, তাহা অভূতপূর্ব্ব। তাঁহার স্নেহ ঋণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক।

(ক) শ্রীকুণ্ডে বিরক্ত বৈষ্ণবদের একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার আছে। ঐ গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ **শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়।**

"দাস গোস্বামী" এবং 'পরিণতির পরিণতি-লীলার অন্যতম নায়ক **ঠাকুর মহাশয় শ্রীল নরোত্তম**" (গ্রন্থদ্বয়) সঙ্কলিত হইতেছে জানিয়া, ইনি তাঁহাদের গ্রন্থাগার হইতে, এককালে অন্ততঃ পনের কুড়ি খানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, সঙ্কলয়িতাকে, নিজ কুটিরে লইয়া গিয়া, নিজ অবসর ও প্রয়োজন মত দেখার সুযোগ দান করিয়া অত্যন্ত কৃপা করিয়াছেন।

(খ) শ্রীকুণ্ড-তট-বাসী পূজ্যপাদ **শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারীদাস বাবাজী** মহাশয়, নিজ বহুমূল্য 'সময়' ও 'ভজনের' বিঘ্ন স্বীকার করিয়া, এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত ৫৮০ পৃষ্ঠায় সংযোজিত চিত্রে, সমস্ত নামগুলি লিখিয়া দিয়াছেন।

এঁরই কৃপায় ৪৮৯ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত দুর্লভ ঐতিহাসিক ছবিটির সন্ধান মিলে।

(গ) শ্রীকুণ্ডবাসী **শ্রীশচীনন্দন দাসজী, শ্রীভাগবত দাসজী শ্রীশ্যামসুন্দর দাসজী, শ্রীদীনবন্ধু দাসজী** এবং আর আর

—আ

সকলেই অযোগ্য সঙ্কলয়িতাকে যে স্নেহ ও কৃপা প্রদর্শন করেন তাহা বর্ণনার ভাষা হয় না।

ভুবন-পাবন শ্রীকুণ্ডবাসী সকলের শ্রীচরণের ধূলিকণার কৃপাপ্রার্থী এ অযোগ্য সঙ্কলয়িতা।

সপ্তম ঃ

গৌর পরিকর শ্রীল (রঘুনাথ উপাধ্যায়) ভাগবতাচার্য্যের 'শ্রীপাঠবাড়ীর' (বরাহনগর) সেবা ভার ১৯২৮।২৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়ের শ্রীহস্তে আসে। ঐ সময় হইতেই সঙ্কলয়িতার জ্যেষ্ঠ গুরু ভ্রাতা নিত্যধামগত **'হরি ঘোষালদাদা'** শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের অন্যতম সেবক। (১৯১৮ খৃষ্টাব্দে চৈত্র কৃষ্ণা দ্বাদশীর দিন এই শ্রীপাঠবাড়ীতেই তাঁহার দীক্ষা হয়)। এই আশ্রমেই তিনি দেহ রক্ষা করেন,—সে দিনটি ১লা ফাল্গুন ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

এই 'হরি ঘোষালদা' বাবাজী ম'শায়ের দিব্য জীবনের—"স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত "আঁখর সমন্বিত" কীর্ত্তনাবলী সংরক্ষণের 'মূল্য' ও 'গুরুত্ব' অনুভব করেন। তাঁহারই অনলস সেবা চেষ্টায় আজ আমরা (জন-সাধারণ)—সেই আঁখরগুলির মধ্যে—

গৌরলীলার ইতিহাস (History) গৌরলীলার ঐতিহ্য (Tradition) গৌরলীলার বিজ্ঞান (Science) গৌরলীলার দর্শন (Phylosophy) এবং গৌরলীলার সু-গম্ভীর মর্ম্মার্থ—'দর্শন' 'পাঠ' ও 'কীর্ত্তনের' সু-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

হরি ঘোষালদা'র অপ্রকটের পর অন্যতম গুরুভ্রাতা বৈরাগ্যের প্রতীক শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বাবাজী ম'শায়ের দেওয়া সার্থক নাম 'রতন') নীরবে,—যে 'ধৈর্য্য' 'অধ্যবসায়' ও 'সহিষ্ণুতার'

সহিত হরিঘোষালদা'র আরব্ধ কার্য্য (বাবাজী ম'শায়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আঁখর সমন্বিত কীর্ত্তনবলী সংগ্রহ) এবং (কৃতজ্ঞতা স্বীকারে পূর্ব্বে, দ্বিতীয়ে উল্লিখিত) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'র আরব্ধ কার্য্য বাবাজী ম'শায়ের দৈনন্দিন আলাপে যে সব অমূল্য নিধি ছড়াইয়া পড়িত তাহার সংগ্রহ ও প্রকাশ ইনি যে ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাহা কেবল অনুভবের ধন।

উক্ত রতনদা' বাঁকুড়ায় অবস্থিত গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতেছেন।

"বাহির দেখ না ঠকে যাবে, কাজ দেখে মিলিয়ে নাও"

—বাবাজী ম'শায়ের এই বাণী বা সূত্র অনুসারে উপরে উল্লিখিত হরিঘোষালদা', শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' এবং 'রতনদা' এঁরা তিন জনেই শ্রীগুরুদেবের "**বিশেষ চিহ্নিত দাস**"।

এই শ্রীগ্রন্থে যে সকল 'কীর্ত্তন' ও 'উপদেশামৃত' সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে সবের মূল উৎস এঁরা।

অষ্টম ঃ

"দাস গোস্বামী"র মুদ্রণ কার্য্য চলিতেছে। মূল গ্রন্থের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয় হয় এমন সময় ডক্টর **শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী** নিজ গবেষণা উপলক্ষে শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে (কলিকাতা-৩৫) আসেন। সঙ্কলয়িতার সহিত মিলন ও বারদিন একত্র বাস ঘটে। ঐ সময় এই গ্রন্থে সন্নি-বেশিত 'পাথেয়' 'নিবেদন' আদি কয়েকটির মুদ্রণ বাকী ছিল। ঐ সব পাণ্ডুলিপিগুলি তিনি নিজের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া দেখিয়া দেন। 'স্মরণীয় বাণী কণা' এই সু-মিষ্ট শীর্ষ নামটি তাঁরই দেওয়া।

বিদ্যার Climax হচ্ছে ভগবৎ চরণে অব্যভিচারিণী 'মতি' ও 'রতি'। যিনি ঐ ধনে ধনী হইতে পারেন তাঁহার 'যাজন' বা 'স্বাভাবিক জীবন যাত্রাই, জগতে প্রকৃত কল্যাণ দান করে।

স্নেহভাজন ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বিদ্যার এই পূর্ণ অধিকার লাভ করুন, ইহাই (শ্রীগুরু আনুগত্যে) নিতাইচাঁদের নিকট আমাদের প্রার্থনা।

নবম ঃ

প্রীতিভাজন **শ্রীমান শতদল কর গুপ্ত,** তাঁহার বহুমূল্য সময় ব্যয় করিয়া নিজ মোটরে পানিহাটি গমন পূর্ব্বক বটবৃক্ষ ৩৮ পৃষ্ঠা ও মাধবীকুঞ্জ ১৮৯ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত চিত্র দুইটির ফটো তুলিয়া তাহার 'নেগেটিভ' এবং এই গ্রন্থে ৬০৮ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর (শ্রীকুণ্ডতটে) অবস্থিত সমাধির ফটোটি দিয়া (তিনি) "দাস গোস্বামী" গ্রন্থের সেবা করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রার্থনা তিনি যেন এইরূপ মহৎ সেবা সৌভাগ্য তাঁকে সদাই দান করেন

দশম ঃ

এই গ্রন্থে যেখানে যেখানে যাহা যাহা আঁখর সমন্বিত কীর্ত্তন সন্নিবেশিত হইয়াছে সে সবই নামময়জীবন শ্রীল রামদাস বাবাজী ম'শায়ের। কোনও কোনও স্থানে তাঁহার নামোল্লেখ বাদ পড়িয়াছে মাত্র।

একাদশ ঃ

গৌরহরির প্রকট বিহারের পরিকরবৃন্দ এবং অপ্রকটে চিহ্নিত মহাজনবৃন্দ গৌরলীলার গ্রন্থ (চরিত্র, নাটক, পদ-পদাবলী কীর্ত্তন ইত্যাদি) রচনা করিয়া "শব্দ" সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মনের ভাব প্রকাশ করার সামর্থ্য ঐ সব শব্দে

সু-পরিস্ফুট। পরবর্ত্তী মহাজনবৃন্দ ঐ সব 'শব্দে' অধিক শক্তি যোজনা করিয়াছেন। ঐ সব মূল্যবান 'শব্দ সম্পদ' আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি।

শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির যথোচিত মর্য্যাদা দেওয়া হইল কি না তাহা, এই শ্রীগ্রন্থ 'পাঠক' 'পাঠিকা' যাঁহারা পড়িবেন বা যাঁহারা শুনিবেন এবং শুনিয়া অনুভব করিবেন তাঁহারা নিজেদের বহুমূল্য সময় ও শ্রম ব্যয় করিয়া আমাদের জানাইলে কৃতার্থ হইব।

দ্বাদশ ঃ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাস (Artist & Block maker 'ডস্ আর্ট এম্পোরিয়াম, ১৫৩. আপার চিৎপুর রোড, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫) অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সহিত এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত চিত্রাবলী ঃ—

১। প্রচ্ছদ পটের ব্লক ২। সেবাঞ্জলি ৩। জগন্নাথের শ্রীমন্দিরের পার্শ্বে রাজপথে (রাজপুত্র) "রঘুনাথ"—এই তিনটির 'ডিজাইন' ও ব্লক এবং সঙ্কলয়িতার শ্রীগুরুদেব এবং সেবাঞ্জলিতে উল্লিখিত মহাজনবৃন্দের চিত্রগুলিতে 'টাচিং' 'ফিনিসিং' পরে ব্লক করিয়াছেন। শ্রীগুরু আনুগত্যে নিতাইচাঁদের শ্রীচরণে এই শচীনবাবুর সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

ত্রয়োদশ ঃ

বৃহত্তর কলিকাতার মধ্যে অবস্থিত পত্র পত্রিকা এবং প্রখ্যাত মনীষীবৃন্দের নিকট গমন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহাদের শ্রীকর-কমলে "দাস গোস্বামী" প্রদান করা আমাদের আন্তরিক কামনা।

উদার স্বভাব (গুরু ভ্রাতা) কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসন্ন সেন, কবিকেশরী, নিজ বহুমূল্য সময় ও শ্রম ব্যয় করিয়া এই মহৎ সেবা (আংশিক) সানন্দে গ্রহণ করিবার স্বীকৃতি দিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেবের নিকট সকাতর প্রার্থনা যেন তিনি জ্যোতিঃ প্রসন্নদা'কে অছিদ্রভাবে অনুরূপ সেবা সৌভাগ্য দান করেন।

চতুর্দ্দশ ঃ

পাঠক পাঠিকাবৃন্দের শ্রীচরণে ভুলণ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণামান্তে নিবেদন—এই গ্রন্থের বক্তব্যের ভাষায় এবং প্রুফ্ দেখার ত্রুটির পরও বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি যে সব দোষ ও কর্কশতা সৃষ্ট হইয়াছে সেগুলির প্রতি তাঁহাদের কৃপাসুন্দর দৃষ্টি ও শোধন মার্জনের প্রসন্ন প্রয়াস এই মূর্খ সঙ্কলয়িতার ভিক্ষা প্রার্থনা।

মঙ্গলাচরণম্

(১) ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, চরতঃ পরিভূত কালজালভিয়ঃ
ভক্তমকরান্‌শীলিত—মুক্তিনদীকান্নমস্যামি ॥

(২) বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥

(৩) বিভ্রৎ কান্তি বিকচ-কনকাম্ভোজগর্ভাভিরাম—
মেকীভূতং বপুরবতু বো রাধয়া মাধবস্য ॥

(৪) হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া-সমদয়া মাধুর্য্য মর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য! দয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

(৫) কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপাদুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
ন্যস্য স্বরূপেবিদধেঽন্তরঙ্গং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥

পয়ার, অনুবাদ ও টীকা ঃ—

(১) 'যাঁরা ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বিহরে।
মহাকাল জালভয় পরাভব করে॥
পঞ্চবিধা মুক্তি নদী করে অনাদর।
অন্য অভিলাষশূন্য যাদের অন্তর॥
সেই গৌর-ভক্তগণ মকর প্রধান।
তা সভার চরণে মোর কোটি পরণাম॥'

(শ্রীশ্রীভাবনাসার সংগ্রহ)

(২) বন্দ ইতি। শ্রীনিত্যানন্দমহং বন্দে। কীদৃশং? ঈশ্বরং স্বাধীনবৈভবং অনন্তং অগণ্যং অদ্ভুতং মহাচমৎকরণীয়ং ঐশ্বর্য্যং ঈশ্বরত্বাদিকং যস্য তম্। যস্য শ্রীনিত্যানন্দস্য ইচ্ছয়া কৃপয়া অজ্ঞেন শাস্ত্রাস্বব্যুৎপন্নেনাপিময়া তস্য স্বরূপং তত্বং নিরূপ্যতে বর্ণ্যতে।

(৩) 'সিংহ জিনি কণ্ঠশোভা, গণ্ড কিবা মনোলোভা, মধুর মধুর হাসি তায়।
অতিগূঢ় রসময়, আশ্চর্য্য বিকারচয়, কত শোভা পায় গোরা রায়॥
বিকচ হেমাব্জসম, কান্তি কিবা মনোরম, গোরারূপে জগত বিকল।
রাধা-মাধবের যেই, একীভূত-তনু সেই, তোমাদের করুণ মঙ্গল॥'

(শ্রীশ্রীভাবনাসার সংগ্রহ)

(৪) হে চৈতন্য দয়ানিধি! তোমার দয়ায় অতি সহজেই জীবের সর্ব্ব সন্তাপ দূরে যায়, চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং হৃদয়ে প্রেমানন্দের উদয় হয়। তোমার দয়ায় শাস্ত্রাদির বিবাদ প্রশমিত হয়। তোমার দয়া চিত্তে গাঢ়রস সঞ্চার করিয়া প্রগাঢ় মত্ততার সৃষ্টি করে। তোমার দয়া হইতেই ভক্তি-জাত সর্ব্বপ্রকার আনন্দ ও সর্ব্বত্র সমদর্শন লাভ হয়, ইহা সকল মাধুর্য্যের সার। হে কৃপাসিন্ধু! এ অধমে দয়া কর।

(৫) সুগৃহান্ধকূপাৎ শোভনাৎ—গৃহান্ধকূপাৎ। ভঙ্গ্যা যে কৃপা-রূপগুণা স্তৈঃ। ভঙ্গ্যা ইতি—রাত্রি শেষে শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যস্য অন্তঃ প্রেরণায়ৈ—তদ্‌গৃহং যাপয়িত্বাচার্য্যেণ সহ তদ্‌গৃহগমনায় কিঞ্চিৎ প্রদেশং শ্রীরঘুনাথ দাসং নীত্বা তস্মাৎ তস্য পলায়নং ইত্যেবংরূপয়া ভঙ্গ্যা।

(চক্রবর্ত্তী)

নিবেদন—

(শ্রীগুরু প্রেরণায়)

'ব্রজলীলা' ও নদীয়ালীলা,'—এই উভয় লীলাতে 'গৌরপরিকর-বৃন্দের' সমান প্রবেশ। এ সম্বন্ধে, বৈষ্ণবগ্রন্থাবলী দিক-দর্শক হিসাবে শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের চরিত্রে তাহা প্রস্ফুটিত করিয়াছেন।

ঘটনাটি—

'মূরতিমন্ত-গৌর-প্রেম' শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু তুইটি বিবাহের পর (তিনি) বিষ্ণুপুরে আছেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়াদেবীও সেখানে আছেন। এমন সময় একদা তিনি লীলা ধ্যানে অস্বাভাবিক সময় পর্য্যন্ত বাহ্যজ্ঞান রহিত। তাঁহার সে অবস্থা দেখিয়া—

"শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া আদি আকুল হইয়া কাঁদি
চিন্তান্বিত মন সবাকার।"

কি চিন্তা?--

'সবাই মনে মনে ভয় গণে
আচার্য্য কৈলা বুঝি লীলা সঙ্গোপনে
—সবাই মনে মনে ভয় গণে

এ হেন সময়ে, লীলাশক্তির আকর্ষণে—

"রামচন্দ্র হেনকালে আসি উপনীত হইল"

তারপর তিনি—

'শুনি তার সব বিবরণ'

—গৌরাঙ্গপ্রিয়াদেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আচার্য্যপ্রভুর আনুগত্যে তাঁহার বাহ্য-জ্ঞানহীন শ্রীঅঙ্গের নিকট (তাঁহারই শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া) নিজেও লীলাধ্যানে বসিলেন

এবং—

"ধরি নিজ সিদ্ধ দেহ গুরুরূপা সখী সহ
মিলিলেন শ্রীযমুনা তীরে।"

সেখানে, দেখিলেন যে,—

রাসলীলা অন্তে, শ্রীযমুনায় জলকেলি সময়ে শ্রীমতীর নাসার বেসর খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে। জলকেলি অন্তে সখিরা নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন। সকালে তাঁহারা শ্রীমতীর সহিত মিলনকালে দেখেন যে, তাঁহার নাসায় বেসর নাই। সুতরাং সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন।—এ হেন সময়ে আচার্য্যপ্রভু নিজ সিদ্ধ-স্বরূপে শ্রীমতীর সান্নিধ্য (লাভের) লীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

ওদিকে নিজ সিদ্ধ স্বরূপে, এই লীলায় প্রবেশ করিয়া রামচন্দ্রও দেখেন যে, সখীদের আদেশ মতে তাঁহার শ্রীগুরুদেব 'বেসর' অনুসন্ধানে ব্যাকুল। বেসর সন্ধানের আবেশেই তিনি বিভোর হইয়া আছেন। ফলে তাঁহার যথাবিহিত দেহের বাহ্য-জ্ঞান নাই এবং এই দশাতে তিন দিন (সময়) অতিবাহিত হইয়াছে।

এখন—

তবে দুই সখী মিলি হ'য়ে অতি কুতূহলী
খুঁজি তথা পদ্ম পত্র তলে।—

তারপর—

পাইয়া বেসরখানি আনন্দেতে পুনি পুনি
বক্ষে শিরে ধরে পরস্পরে॥"

'শ্রীগুরু-আনুগত্য-বলে' 'রামচন্দ্র' পদ্ম পত্র তলে বেসরটি পাইলেন। ইহাতে তাঁহার ও আচার্য্যপ্রভুর আনন্দের সীমা নাই। শ্রীমতির বেসরটি পাইয়া তাঁহারা আনন্দে প্রমত্ত হইলেন।

এখন উপাসনার রীতিতে (ব্রজলীলার মঞ্জরী স্বরূপে) তাঁহারা সেই বেসরটি আচার্য্য প্রভুর শ্রীগুরুদেব গোপাল ভট্টের সিদ্ধ স্বরূপ শ্রীগুণ মঞ্জরীর শ্রীকরে দিলেন। তিনি আবার, শ্রীরূপ গোস্বামীর সিদ্ধ স্বরূপ রূপ মঞ্জরীকে তাহা দিলেন। তিনি-

"তিঁহ শীঘ্র শ্রীমতীরে, পরাইল সে বেসরে,
সবে অতি আনন্দ লভিলা।"

এ রহস্য অপরূপ।—

পর পর আনন্দের বিকাশ। বেসর পাইয়া শ্রীমতীর যত সুখ, তাহা দেখিয়া শ্রীরূপের সে আনন্দ কোটি গুণ ভোগ। পরস্পরের মুখাবলোকনে এই আনন্দের ক্রম বিকাশ চলিতেছে।—শ্রীরূপের ভোগ কোটি গুণিত হইয়া শ্রীগুণমঞ্জরীতে পর্যবসিত। আবার তাহা কোটি গুণিত হইয়া আচার্য্যপ্রভুতে পর্য্যবসিত।—'আচার্য্যপ্রভুর' ভোগ কোটি গুণিত হইয়া 'রামচন্দ্রে' পর্য্যবসিত।

—"আনুগত্যে অধিক সুখ"

তারপর—

"শ্রীরাধিকা হৃষ্টা মনে, চর্ব্বিত তাম্বুল দানে,
তুষিলেন নব সখী-দ্বয়ে।

ফলে,—

তাহার অধরামৃত, পাই দোঁহে প্রফুল্লিত,
'রাধে জয়' ধ্বনি উচ্চারয়।"

আনন্দে গদভাসে তাঁহারা শ্রীমতীর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন—

"হে প্রেমময়ী রাধে! না চাইতেই তুমি আশা পূরণ করলে। করুণাময়ী! নিজ কিঙ্করী করে (সদা) শ্রীচরণে রেখো।"

অতঃপর—

বাহ্য হৈল হেনমতে দেখিল তাম্বুল হাতে
সৌরভেতে ভরিল আলয়।*

এবং এইরূপ উভয় লীলায় সমান প্রবেশের অবধি (climax) হচ্ছেন **শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী**।

মূর্খ অবোধ বালক নিজ পাঠ্য পুস্তক অশুদ্ধভাবে, উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে থাকিলে,—দয়ালু-বিজ্ঞ-শ্রোতা যে পাঠ শুদ্ধ করিয়া দেন, ফলে, বালকের ভ্রম সংশোধন হয়।

কাঙ্গাল, মূর্খ, সঙ্কলয়িতার 'দাস গোস্বামী' সঙ্কলন প্রচেষ্টাও মূর্খ বালকের উচ্চৈঃস্বরে পাঠের মত। এই 'আশয়েই' এই সংস্করণের নাম '**প্রচার সংস্করণ**'।

(শ্রীগুরু করুণায়) মাত্র এগার শত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে পাঁচ শত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, গবেষক, বিচারক, চিকিৎসক, জ্ঞানী, গুণী,

---

* এ আলয়, বিষ্ণুপুরে আচার্য্যপ্রভুর বাসস্থান—যেখানে, দেবীগৌরাঙ্গ-প্রিয়া, সগোষ্ঠী রাজা বীরহাম্বির এবং বিষ্ণুপুরের অগণিত অধিবাসী—এ তিন দিন যাবৎ আকুল প্রাণে উদ্‌গ্রীব হইয়া অপলক দৃষ্টিতে আচার্য্যপ্রভু ও রামচন্দ্রের শ্রীদেহ দুইটিকে ঘিরিয়া সজল নয়নে অপেক্ষা করিতেছিলেন। মনে তাঁদের নিরন্তর ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, আর কতক্ষণে চেতনা হবে?

বিচিত্র!—এখন ঘন ঘন হরিধ্বনিতে স্থানটি অপ্রাকৃত মাধুর্য্যে পূর্ণ হইল। পরে আচার্য্যপ্রভু মধুর হাসিতে হাসিতে সমবেত জনতার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেন।

পণ্ডিত এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুশীলনকারী মহাত্মাদের শ্রীকর-কমলে সমর্পণ জন্য চিহ্নিত হইয়াছে।

—-এবং দুই শত গ্রন্থ নদীয়া, নীলাচল ও ব্রজে অবস্থিত ভুবন-পাবন বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীকর-কমলে সমর্পণ জন্য চিহ্নিত হইয়াছে।

অবশিষ্ট চারিশত গ্রন্থ (বোর্ড বাঁধাই) প্রতিটি গ্রন্থ দশ টাকার বিনিময়ে সর্ব্বসাধারণের জন্য চিহ্নিত হইয়াছে। এইরূপে যে অর্থাগম হইবে তাহার ব্যয় বিবৃতি :—

(১) শ্রীবৃন্দাবনবাসী প্রখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপক শ্রীযুত রবীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগবতভূষণ মহাশয় বৈষ্ণব ও ভক্তগোষ্ঠীতে 'প্রতিদিন' ভক্তি-গ্রন্থ পাঠ করেন। তাঁহার প্রধান পাঠের আসর স্বনামধন্য অশ্বিনীবাবুর মন্দির, বৃন্দাবন।

এক শত গ্রন্থ কিম্বা গ্রন্থের বিনিময় মূল্য তাঁহার শ্রীকর-কমলে অর্পিত হইবে। তিনি প্রতি বর্ষে (যতদিন পর্য্যন্ত অর্থ সঙ্কুলান হয়) বৎসরের কোন এক সময়ে, তাঁহার (ঐ) নিত্য পাঠের আসরে এই শ্রীগ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ করিবেন, ইহাই একান্ত নিবেদন।

(২) শ্রীকুণ্ড-তট-বাসী বিরক্ত বৈষ্ণব শ্রীযুত দীনবন্ধু দাস মহাশয়ের শ্রীকর-কমলে একশত গ্রন্থ কিম্বা শত গ্রন্থের বিনিময় মূল্য সমর্পিত হইবে। তিনি ঐ অর্থ হইতে ব্যয় করিয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'দণ্ডমহোৎসবের' সময় প্রতি বর্ষে, শ্রীকুণ্ডে, এই গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠের ব্যবস্থা করিবেন। ইহাই আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

(৩) বাঁকুড়ায় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস মহাশয়ের শ্রীকর-কমলে একশত গ্রন্থ কিম্বা শত গ্রন্থের বিনিময় মূল্য সমর্পিত হইবে। তিনি ঐ অর্থ হইতে ব্যয় করিয়া (প্রতি বর্ষে) শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিরহ মহোৎসব মাসে তাঁহাদের নিত্য সন্ধ্যায় পাঠের আসরে, এই শ্রীগ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমাদের সুখী করিবেন।

অবশিষ্ট একশত গ্রন্থ কিম্বা তাহার বিনিময় অর্থ শ্রীগুরুদেবের কয়েকটি আশ্রমের সেবানুকূল্যে ঃ

যথা—	গ্রন্থ
(ক) শ্রীব্রজগোপাল দাস, শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, কলিকাতা-৩৫	৫০টি
(খ) ” কানাইদাস বাবাজী, সমাজবাটী, নবদ্বীপ	২৫টি
(গ) ” ননীগোপাল দাস, ঝাঁজপিটা মঠ, পুরী	১৫টি
(ঘ) ” নিতাইদাস, শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ, পুরী	১০টি
	১০০টি

উদ্বোধিকা

গৌরহরির আবির্ভাবের পূর্ব্বে জনশ্রুতি ও বিদ্বদনুভূতি এবং ভাগবত পুরাণ আদি গ্রন্থাবলীতে ছিল যে শ্রীভগবান মানুষের দেশে মানুষের বেশে (মানুষীং তনুমাশ্রিত্য) আসিয়া মানুষের সাথে মিশিয়া মানুষের মূর্ত্তিতেই কত শত কর্ম্ম (করোতি বিবিধা ক্রিয়াঃ) করেন।

কিন্তু, আমাদের সু-সৌভাগ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং গৌরাঙ্গ পরিকর-বৃন্দের চরিত্রগুলি মাত্র পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের গৌড়ের উজ্জ্বলতম ইতিহাসের গ্রন্থপৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সু-প্রসিদ্ধ জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত ও সাধু মহাত্মারা শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ ও তাঁহাদের লীলাপরিকরবৃন্দের কার্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহাদের 'চরিত্রকথা' ও 'লীলাবলী' সংস্কৃত এবং নিজ নিজ মাতৃ-ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যা এবং গৌড়দেশীয় (গৌর) পরিকর-বৃন্দের (প্রকট বিহারের) অনেকেই গ্রন্থ প্রণয়ন ও পদ পদাবলী-রচনা করিয়া 'জীবন্ত ইতিহাসের' সাক্ষ্য প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। আবার 'বৃক্ষ', 'কুণ্ড', 'সরোবর', 'হস্তাক্ষর' ও 'তাঁহাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তু' এবং 'বংশ-ধারাক্রমেও' অদ্যাপি তাঁহারা বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

গৌর ও গৌরপরিকরবৃন্দের চরিত্রানুশীলনে বিশেষ কথা—

চিন্তাশীল মানবের মধ্যে অনন্ত জিজ্ঞাসা থাকিলেও অন্যতম দুইটি প্রধান জিজ্ঞাসা—

(১) শ্রীভগবান যে আছেন তাহার প্রমাণ কি ?

(২) যদি তিনি (ভগবান) থাকেন তবে বিশ্বের 'দৃষ্ট' ও 'শ্রুত' বস্তুর মধ্যে কি না ?

এই জিজ্ঞাসার সমাধানের পরতত্ত্বসীমা স্বয়ং ভগবান, শচীদুলাল গৌরহরিই এই বস্তু জগতের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সপার্ষদ (পিতা, মাতা, স্ত্রী, বান্ধব ও অগণিত ভক্ত সহ) সর্ব্ব সাধারণের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ পাতিয়া পাতাইয়া—

(ক) ভগবানের মাধুর্য্যের সংবাদ—

(খ) অপূর্ব্ব কারুণিকত্বের সংবাদ—

(গ) উদারতা—

(ঘ) ভগবানের সহিত নিকটতম সম্বন্ধের সংবাদ এবং—

(ঙ) ভাবীকালের জীবের জন্য ভজনাঙ্গের উপাদেয়তা দান করিয়াছেন।

(ক) 'মাধুর্য্যের সংবাদ'—

গৌরহরির আবির্ভাবের পূর্ব্বে সর্ব্ব-সাধারণ জীবের ধারণা ছিল, 'পাপের শাস্তিদাতা ভগবান'।

গৌরহরির দান—

স্বয়ং ভগবান অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি সত্য, তথাপি তাহা অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের সহিত অনুস্যূত। ভগবানের ঐশ্বর্য্যে 'ত্রাস' 'জ্বালা' বা 'সঙ্কোচ' নাই। ভগবান পাপীর শাস্তিদাতা তো ননই বরং যে যত পাপ করিয়াছে তাহার উপর ভগবৎ করুণা তত বেশী পতিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। উচ্চারণের আভাস ভগবানের নামাভা সেই পাপ, তাপ, সব দূরে পলায়ন করে। এই করুণাময় ভগবানের মাধুর্য্যের অস্তিত্ব, তাহার তো কোন তুলনাই হয় না। সে মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে বাণীর ভাণ্ডারে কোন ভাষা নাই। শ্রীকৃষ্ণ

মাধুর্য্য এমনই এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু যে তিনি স্বয়ং 'আপ্তকাম' আত্মারাম ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, তাঁহারই মাধুর্য্য তাঁহাকেই 'মুগ্ধ' 'লুব্ধ' করে। কাম কাঞ্চনের-নফর মায়া কবলিত জীব অহেতুক ভগবৎ কৃপায় কিম্বা "তাঁহার দাসের কৃপায়" সেই পরম লোভনীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারে।

(খ) অপূর্ব্ব কারুণিকত্বের সংবাদ—

শ্রীভগবানের করুণার কথা সকল দেশের ধর্মাচার্য্যগণই প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু, সে সব বাণী শ্রবণেও জীবের মনের 'ত্রাস' ও সাধ্বস কাটে না। সেই জন্য গৌরহরি বলিলেন—

'শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণ। মায়া কবলিত জীবকে উদ্ধার করা তাঁহার 'স্বভাব' ও 'স্বরূপগত ধর্ম্ম।'

(গ) উদারতা—

১। ভারতের হিন্দু সমাজেই শাক্ত, শৈব গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব এই পাঁচটি সম্প্রদায় 'ধর্ম্ম' প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান আদি নানা ধর্ম্মও আছে। কিন্তু, সমস্ত বিশ্বের ধর্ম্মমত, পথ ও সম্প্রদায় বহু।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপাস্যকে বৈষ্ণব আচার্য্যবৃন্দ 'সত্য জ্ঞানে' যথোচিত মর্য্যাদা দান করেন। বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 'সিদ্ধ' অবস্থাই **"ভাগবত বৈষ্ণবতা"**। কারণ তখন তাঁহাদের অবস্থা—

"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা ইষ্ট স্ফূর্ত্তি।"

অবশ্য ভগবানকে 'প্রাণপতি' সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা, ভজনের রীতি গৌরহরিরই প্রবর্ত্তিত। ইহা, অন্যত্র কোথাও আছে কি না জানি না।

—ই

আর এক বৈশিষ্ট্য, বৈষ্ণবদের ভজন "সব কিছুকে লইয়াই"—এঁদের কেহ 'ত্যজ্য' নয়। আবার, শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শোনা যাচ্ছে—

"এ রাজ্যে' 'সে রাজ্যে' কোন তফাৎ নেই—কেবল অনুভূতির হের ফের।"

২। 'সাধন' সম্বন্ধীয় উদারতাও অতুলনীয়—

'নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥'

—চরিতামৃত মধ্য ৮ম

৩। বৈষ্ণব ধর্ম্মে যে সকলেরই 'ভজনের' অধিকার আছে শুধু তাহাই নয়, যোগ্য হইতে "আচার্য্য" হইতেও বাধা নাই। যথা—

কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব বেত্তা সেই 'গুরু' হয়॥

—চরিতামৃত

(ঘ) ভগবানের সহিত নিকটতম সম্বন্ধের সংবাদ—

গৌরহরির প্রবর্ত্তিত মধুর রসে সম্পৃক্ত ভজন পন্থায় কেবল মাধুর্য্যেরই পরম আকর্ষণত্ব। "মধুর রসের প্রভু" "মধুর রসের সখা" "মধুর রসের পুত্র" ও "(মধুর রসময় গতি) প্রাণপতি" এই চা'র প্রকারের নিবিড় সম্বন্ধে ভগবান বাঁধা। তাঁহার মত 'পরম আত্মীয়' ও 'আপন জন' জীবের কেহ তাই হইতেও পারে না।

'(ঙ) ভজনাঙ্গের উপাদেয়তা'—

জ্ঞান-যোগাদি সাধনে সকলের দেহ মন যোগ্য হয় না। তা ছাড়া জ্ঞান ও যোগের সাধনা ও সাধ্যফল যে ফল দান করে তাহাও ভক্তির

সম্পর্ক ঘটিলেই পূর্ণতা লাভ করে। গৌরহরি এমন সরল মধুর ও সহজ সাধন ও ভজনের উপদেশ করিলেন যাহা দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে (তাহা) অবলম্বনীয়। অর্থাৎ যে কোন লোক (বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ বা নারী) যে কোন অবস্থায় (খাইতে শুইতে) যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে (যথা তথা) সাধন ভক্তির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বা 'অপ্রাকৃত উপচার' 'হরি সংকীর্ত্তন' করিতে পারে।

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাই সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ

—যে হেতু গৌরসুন্দর 'পরতত্ত্বের অবধি' সুতরাং তাঁহার নিত্য পার্ষদবৃন্দও 'সেবক তত্ত্বের অবধি'।

"পরিকর বৈশিষ্ট্যেম্ ভগবৎ আবির্ভাব বৈশিষ্ট্যন"

রসিক ভক্তেরা জানেন যে—

১। গৌর লীলার অপর নাম—'আশ **মিটান লীলা**'

২। **গৌর যুগল, পরিকর যুগল—'যুগলে যুগলে খেলা'**

শ্রীরাধা যে অনির্ব্বচনীয় প্রেমদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, তাহার মহিমা কি প্রকার এবং শ্রীরাধার সেই আস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যই বা কি প্রকার এবং সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধার যে কি সুখ হয়, তাহাই বা কিরূপ ? এই তিনটি বাঞ্ছার

পূর্ত্তির জন্য শ্রীনন্দনন্দনই শ্রীরাধার ভাব হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার কান্তিও অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গ রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। এতেই মিলন সম্পূর্ণ হইল কি? প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলন যে বাকী রহিল। তাই 'রাই-কানুর মিলিত বিগ্রহ' ও 'অতি গূঢ়তম গৌরলীলায়' কিছু অসম্পূর্ণ থাকার কথা নয়। রাধা গোবিন্দের অচিন্ত্য শক্তির লীলা সান্নিধ্যেই যুগলিত লীলা বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব। সেই লীলাশক্তির অপর এক রহস্য মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়-দেহ শ্রীবলরামের সঙ্গে শ্রীরাধার দ্বিতীয়-দেহ অনঙ্গমঞ্জরীর মিলিত লীলা বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব। আবার, শ্রীরাধার যে যে অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য বৈভব, সেই বৈভবের সু-প্রকাশ তাঁর পরিকরবৃন্দ। তাই এক এক গৌরপরিকর পূর্ব্বলীলারই দ্বিতীয় প্রকাশ। যেমন সুবল আর ললিতার ভাব মিলে 'স্বরূপ দামোদর'। বিশাখা আর ব্রজের অর্জ্জুন সখার ভাব মিলে 'রামরায়'। এমনি ধারায় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের ভাবগুলির এক এক সখা আর শ্রীরাধার অঙ্গের এক একটি ভাব মিলিত হইয়া এক এক গৌর-পরিকরের আবির্ভাব—এই তাঁদের লীলা-পার্ষদ পরিচয়।

তাই ব্রজের পরিকরবৃন্দের যেমন শ্রীকৃষ্ণ উপাস্য, তেমনি নদীয়ালীলায় গৌর পরিকরদের 'উপাস্য' বা 'সেবা' পরতত্ত্ব সীমা 'গৌর-স্বরূপ'। তাঁহাদের যত কিছু আচার, প্রচার, গ্রন্থ প্রণয়ন, পদ-পদাবলী, বিগ্রহ, সেবা-স্থাপন, সবই একমাত্র "গৌর সেবার" উপায়ন ভিন্ন অন্য কিছুই নয় এবং হইতেও পারে। এই তত্ত্বে সু-দৃঢ় স্থৈর্য্য রক্ষা করিয়া 'গৌরপরিকরবৃন্দের' চরিত্র অনুশীলন করিলে তবেই পূর্ণাঙ্গ হইবে।

(সেই অচিন্ত্য শক্তি লীলাবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার অবদানের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন করা হয়।)

উপরে নিবেদন করা হইয়াছে যে, এই গৌরলীলার অপর একটি নাম 'আশ মিটান লীলা'। ব্রজলীলায় সখীবৃন্দের লীলা মুখরতা

অসীম। তথাপি মঞ্জরীদের মত মূক আস্বাদনে তাঁহাদের লোভ ছিল (অবগুণ্ঠিত চিত্তবৃত্তি)। তাঁহাদের সে বাসনার পূর্ত্তি হইয়াছে।

ব্রজলীলায় মঞ্জরীবৃন্দ (যেন) 'মূক' ছিলেন। অথচ সখীদের মত, শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা গানে তাঁহাদের 'বাচাল' হইবার লোভ ছিল সে লোভেরও পূর্ত্তি হইয়াছে। এবার তাঁহাদিকেও 'বাক্ চঞ্চল' করিয়া সে 'আশার' পরিপূর্ত্তি হইয়াছে।

এই মূকের গণেরই (বোবাদেরই) একজন সু-মধুর চরিত্র লইয়া গৌরলীলায়—**"রঘুনাথ দাস"** বা **"দাস গোস্বামী"** নামে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

[২]

(ক) মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় সুহৃদ অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর স্বরূপকে বলিয়াছিলেন "এই রঘুনাথকে আজ আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি ইহাকে (শ্রীরঘুনাথকে) পুত্রের ন্যায় স্নেহে করিও ও ভৃত্যের ন্যায় কৃপা করিও বা তাহার সেবা গ্রহণ করিও। রঘু তোমাকে পারমার্থিক পিতা জ্ঞান করিবে এবং শরণাগত ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা তোমার সুখ-তাৎপর্য্যময় আচরণ করিবে। আমার রঘু অতি প্রিয় ধন, এ বস্তুটি আজ হইতে তোমারই হইল। অতঃপর লোকে ইঁহার পরিচয় "স্বরূপের রঘুনাথ"। মহাপ্রভু রঘুনাথের দুইটি হাত ধরিয়া স্বরূপের কর-কমলে সমর্পণ করিয়াছিলেন। লোক ব্যবহারের ভাষায় যাহাকে বলে 'হাতে হাতে সঁপিয়া দেওয়া'।

স্বরূপ দামোদর বা স্বরূপ তাঁহার নাম। পূর্ব্বাশ্রমে ইঁহার পরিচয়—শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য। ইনি অতি অল্পকালের মধ্যেই নবদ্বীপে নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। ইঁহার নম্রতা, দীনতা ও পাণ্ডিত্য অতুলনীয়। ইঁহার কণ্ঠস্বর বড় মধুর। তাঁহার

সু-কণ্ঠে গান শুনিয়া সকলের চিত্ত বিমোহিত হইত। ইনি নিমাই পণ্ডিতের সৌন্দর্য্যে, অসাধারণ পাণ্ডিত্যে এবং কোন এক অচিন্ত্যনীয় আকর্ষণে তাঁহার নিকট সতত সলজ্জ হইয়া অবস্থান করিতেন। একটি মূহূর্ত্ত 'গৌরহরিকে' না দেখিলে অধীর হইতেন।

ইনি—

'প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলা বারাণসী গিয়া' ॥

—পরে যখন সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার সর্ব্বস্ব নিধি গৌরহরি নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন—ইনিও তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া গৌর চরণে পতিত হইয়া দয়া প্রার্থনা সূচক স্বরচিত শ্লোকে * অপূর্ব্ব স্তুতি পাঠ করিলেন।

গৌরসুন্দর স্বরূপের সহিত পুনরায় অন্তরঙ্গ মিলন লাভ করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহাকে বক্ষে জড়াইয়া গাঢ় প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। প্রেমাশ্রুতে উভয়ের অঙ্গ পরিষিক্ত, ওষ্ঠাধর কম্পিত এবং আবেগে উচ্ছ্বসিত প্রেমে ডুবিয়া উভয়ে অবশ ও অচেতন প্রায় হন।

কিছুক্ষণ পরে একটু স্থির হইয়া শচীদুলাল গৌরহরি বলিয়াছিলেন—

'তুমি যে আসিবা আমি স্বপ্নেই দেখিল।
ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল' ॥

(খ) 'শ্রীরূপ গোস্বামীর' কবিত্ব ও রসতত্ত্ব বিচার বিশ্বের বিস্ময়কর।—এ হেন শ্রীরূপকেও রসতত্ত্ব শিক্ষা দিবার প্রসঙ্গে গৌরহরি স্বরূপকে আদেশ করেন—

---

* মঙ্গলাচরণের চতুর্থ শ্লোকটি দেখুন—

'যোগ্য পাত্র হয় গূঢ় রস বিবেচনে।
তুমিও কহিও তারে গূঢ় রসাখ্যানে॥'

—চৈঃ চঃ মধ্য ১ম

"তুমিও কহিও উঁহায় রসের বিশেষ"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১ম

(গ) শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌমের উক্তি—

·········এই স্বরূপ দামোদর।
মহাপ্রভুর ইহোঁ হয় দ্বিতীয় কলেবর॥

(ঘ) শ্রীল বৃন্দাবন দাসের উক্তি—

কি শয়নে কি ভোজনে কি বা পর্য্যটনে।
'দামোদর' প্রভু না ছাড়েন কোন ক্ষণে॥

একেশ্বর 'দামোদর-স্বরূপ' গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥

অশ্রু ঘর্ম্ম হাস্য মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
যত কিছু আছে প্রেম-ভক্তির বিকার॥
'দামোদর-স্বরূপের' উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে।
শুনিলে না থাকে বাহ্য পড়ে সেই ক্ষণে॥

দামোদর-স্বরূপ সঙ্গীত রসময়।
যার ধ্বনি শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয়॥

কীর্ত্তন করিতে যেন তুম্বুরু নারদ।
এক প্রভু নাচায়েন কি আর সম্পদ॥

অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
বিহরেন দামোদর-স্বরূপের সঙ্গে॥

পথ চলিতেও প্রভু 'দামোদর' গানে।
নাচেন বিহ্বল হৈয়া পথ নাহি জানে॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি ঃ—

(১)

'সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
'দামোদর' সম আর নাহি মহামতি॥'

(২)

'অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥

অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
'দামোদর-স্বরূপ' হইতে যাহার প্রচার॥

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ॥'

(৩)

'স্বরূপ গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে 'আবিষ্ট' যার 'কায়' 'বাক্য' 'মন'॥

স্বরূপের ইন্দ্রিয় প্রভুর নিজ ইন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান আস্বাদন॥'

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ॥'

(৩)

এককালে (যশোহরের) ভৈরব নদ হইতে প্রায় রূপনারায়ণ নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডকে "সপ্তগ্রাম মুলুক" বলা হইত। আর সপ্তগ্রাম বলিতেই—সপ্তগ্রাম, বংশবাটী, শিবপুর, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর এবং শঙ্খনগর এই সাতটী গ্রামকে বুঝাইত। এই কয়টী গ্রামের মুকুটমণি ভূখণ্ডের নাম **সপ্তগ্রাম-নগর**। 'সপ্তগ্রাম মুলুকের' রাজধানী সপ্তগ্রাম। এখানে ছোট একটি Mint বা টাক্‌শাল ছিল। আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমলের সেরেস্তায় "সপ্তগ্রাম সরকার" নামে 'সপ্তগ্রাম মুলুক' অভিহিত হইত।

রাজকার্য্যে বিচক্ষণ, ক্ষমতাশালী ও বিপুল বৈভবশালী কায়স্থকুল-প্রদীপ হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস নামে দুই সহোদর ভ্রাতা 'মোক্‌রর' সূত্রে এই সপ্তগ্রাম মুলুকের রাজস্ব আদায়ের অছি বা 'মোক্তার' ছিলেন। 'মোক্তার' অর্থ এই যে, প্রতি সন রাজ-সরকারে নির্দ্দিষ্ট একটি রাজস্ব আদায় দিবার বন্দোবস্ত যিনি করেন এবং আয়টির 'গ্যারাণ্টি' যিনি দেন।

এই হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাস সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

'হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাস দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥'

দেশ ও সমাজের গৌরব এই দুই ভায়ের একমাত্র বংশধর—
শ্রীল রঘুনাথ দাস (গোস্বামী)

প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদনকারী, লোকে রাগমার্গ-ভক্তি প্রচারকারী, 'রসিকশেখর' ও 'পরমকরুণ' 'সচল জগন্নাথ' গৌরহরির অপার করুণায় অনুপম চরিত্র শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সঞ্চারময়ী কৃপায় অখিল বাঞ্ছার পুর্ত্তি 'কল্পতরু' 'করুণাবাহন' শ্রীগুরুদেবের অবিরলবর্ষিণী করুণা ধারার সিঞ্চন লাভ করিয়া "দাস গোস্বামী" প্রকাশিত হইলেন। সোনার-গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর 'সযত্ন-লালিত', 'কৃপা-সিঞ্চিত 'কৃপাপুষ্ট' 'গৌর-গর্ব্ব-অলঙ্কারে অলঙ্কৃত' 'ঠাকুর হরিদাসের কৃপাস্নাত' শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সু-ললিত জীবন-সুষমা প্রকাশ করা অসম্ভব হইলেও অভিন্ন-চৈতন্য-তনু শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাসিঞ্চিত শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাঁহাদের প্রেমময়ী লেখনীতে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ভক্ত মহানুভবগণ এই দুই শ্রীগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাসের অমল চরিত কথা বহুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি উক্ত মহান্ চরিত্রটিকে প্রামাণ্যসূত্রে গ্রন্থিত করিয়া 'দাস গোস্বামী' নামে প্রকাশ করিবার লোভ পাইয়া বসিল। উহা—

"আত্ম-শোধিবার তরে দুঃসাহস হেন"

এই 'দাস গোস্বামীর' জীবন কথার এমনি আকর্ষণ যে তাহা নিজের করিয়া আস্বাদন করিতে প্রবল বাসনা হয়। অথচ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'সু-রসাল' 'সু-গম্ভীর' জীবন কথা প্রকাশ করা আমাদের মত অযোগ্যের দ্বারা একান্ত অসম্ভব। তাই যাঁহারা তাঁহার সু-মধুর জীবন গাঁথা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নিকট মাধুকরী করিয়া এই সম্পুট ভরিয়া তুলিয়াছি।

এই পরম মঙ্গল চরিত্রের মূল উৎস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং স্বতঃ অনুভূতিময়চিত্ত নামময়-জীবন মদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আঁখরে সমন্বিত কীর্ত্তনাবলী ও তাঁহারই বিবিধ প্রসঙ্গ।

এই শ্রীগ্রন্থ সঙ্কলনে এ অধমের অযোগ্যতা দোষে ত্রুটি বিচ্যুতি যাহা যাহা লক্ষণীয় হইবে সেগুলিকে উপেক্ষা না করিয়া কৃপাময় পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ আমাদের জানাইয়া পরবর্ত্তী সংস্করণে সেগুলির সংশোধনের সহায়তা করিবেন ইহাই এ দীনের সকাতর প্রার্থনা।

'সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা সভার চরণ কৃপা শুভের কারণ॥'

'রঘুনাথ দাস কথা' যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধূঞা করোঁ মুই পানে॥

'শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ॥'

ভিখারী—
রামকিঙ্কর দাস

"স্মরণীয় বাণী-কণা"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে বর্ণিত 'গৌর এবং গৌর-পরিকর-বৃন্দের', 'অমল' চরিত্র অনুশীলনে যে 'কৃপা' ও সাবধানতার প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে—

(১) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্বমুখোক্ত বাণী—

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ়,—কহিতে না জুয়ায় ;
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়।
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ় ;
বুঝিবে রসিক ভক্ত,—না বুঝিবে মূঢ়।

—চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষ-বিশেষে কৈল রস আস্বাদন॥

—সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে, এই সব মর্ম্ম॥

—চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ

চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটি সমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে, কেহ না বুঝিতে॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়

মধুর চৈতন্যলীলা—সমুদ্র গম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর॥
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য়

বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্য চরিত।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত॥
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য়

(২) বঙ্গদেশীয় কবির নাটক প্রসঙ্গে শ্রীস্বরূপ দামোদরের বাণী—
'কৃষ্ণলীলা' বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষ দুর্গম এই 'চৈতন্য বিহার'॥
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম

(৩) ঠাকুর হরিদাসের উক্তি—
যে কহে,—চৈতন্য মহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক, মোর পুন এই ত নিশ্চয়—
তোমার মহিমানন্তামৃতাপার সিন্ধু।
মোর বাঙ্মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু॥
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়

(৪) শ্রীমদ্দাস গোস্বামী বিরচিত মুক্তাচরিতের মঙ্গলাচরণে—
নিজামুজ্জ্বলিতাং ভক্তি সুধামর্পয়িতুং ক্ষিতৌ
উদিতং তং শচীগর্ভব্যোম্নি পূর্ণং বিধুং ভজে।
'নিজাম্ উজ্জ্বলিতাং ভক্তিসুধাং'—
"আস্বাদিতে নিজ-মাধুর্য্য-সীমা
—প্রচারিতে নিজ নাম-মহিমা"
(বাবাজী ম'শায়)

———

"প্রচ্ছদ পটের পরিচয়"

প্রথম চিত্র ঃ

চাঁদপুরে—

"রঘুনাথ দাস" বালক করেন অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরে যাই করেন দর্শন॥"

দ্বিতীয় চিত্র ঃ

(শ্রীধাম-পুরীতে) শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মঠের অভ্যন্তরে প্রখ্যাত 'গম্ভীরা'

[(ফটো তুলিয়া) ঠাকুর হরিদাস শ্রীগ্রন্থে ১১০ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।—সেই চিত্রটিরই 'লাইন ব্লক']

॥ সূচীপত্র ॥

তরঙ্গ ঃ	বিষয় ঃ		পৃষ্ঠা
প্রথম তরঙ্গ	বাল্যে ঠাকুর হরিদাসের কৃপা	:	১
দ্বিতীয় তরঙ্গ	গৌর-নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণে	:	৫
	প্রথম গৌর দরশনে	:	৭
	দ্বিতীয় বার গৌর দরশনে	:	১১
	প্রিয়ের প্রিয়ে অধিক প্রীতি	:	১৬
	পুরশ্চরণ	:	১৭
তৃতীয় তরঙ্গ	বিপদে	:	১৯
চতুর্থ তরঙ্গ	নিতাই প্রসঙ্গে	:	২৩
	নিতাই মিলনে	:	২৭
	এ যুগের সাধন কি ?	:	৩২
	দণ্ড মহোৎসব ও গৌর আবির্ভাব	:	৩২
	দণ্ড মহোৎসবের রাত্রিতে	:	৩৭
	'রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথ উপরে'	:	৩৮
	নিতাইচাঁদের আশীর্ব্বাদ	:	৩৯
	নিতাই মদিরা পানে	:	৪২
পঞ্চম তরঙ্গ	সংসার শৃঙ্খল মোচন	:	৪৫
	রঘুনাথের অদর্শনে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের ভবনে	:	৪৯
	নীলাচলের পথে	:	৫২
	নীলাচলে গৌর-রঘুনাথ মধুর মিলন	:	৫৩
	রঘুনাথের নীলাচল বিহার	:	৫৮
ষষ্ঠ তরঙ্গ	স্বরূপের পুত্র ও ভৃত্যরূপে	:	৫৯
	অযাচক বৃত্তিতে	:	৬০
	শ্রীনাম সাধনার সূত্রে সঙ্কেত	:	৬৩

তরঙ্গ :	বিষয় :		পৃষ্ঠা
	শ্রীনামের চিন্ময় অবয়ব	:	৬৩
	শ্রীনামের প্রভাব	:	৬৩
	ধরণীতে নাম মূর্ত্তির প্রকাশ	:	৬৫
	বিকশিত নামের বসতি স্থলী	:	৬৯
	শ্রীনামই গুরু মূর্ত্তিতে	:	৬৯
	গুরু মূর্ত্তিতে ভূরি দান	:	৭০
	নাম গ্রহণে শ্রীগুরু উপদেশ	:	৭১
	প্রতিশ্রুতি দান	:	৭১
	শাস্ত্র প্রসঙ্গে শ্রীগুরু উপদেশ	:	৭২
	শ্রীনামের বীর্য্যশক্তি	:	৭৪
	শ্রীনামের দ্বিতীয় লীলা মূর্ত্তি	:	৭৫
	নামের লীলা মূর্ত্তি প্রাপ্তি-লোভ জাগিলে	:	৭৫
	রহো লীলার নব যুগল	:	৭৬
	নব যুগল মূর্ত্তির প্রমাণ প্রসঙ্গ	:	৭৭
	শ্রীনাম লীলার নব যুগল মূর্ত্তির প্রসঙ্গ	:	৭৭
	শ্রীনামের রহোলীলার মর্ম্মকথা	:	৭৮
	শ্রীনামের গৌরাঙ্গলীলা	:	৭৯
	শ্রীনামের নদীয়ালীলায় নব যুগল বিগ্রহের নব-লীলা	:	৮২
	শ্রীনাম মূর্ত্তির নীলাচল লীলা	:	৮৪
	শ্রীনামের লীলা পুর্ত্তি	:	৮৮
	(১) নাম সর্ব্বশক্তিমান	:	৮৯
	(২) আমিত্ব থাকৃতে পুরুষকার থাকৃতে···	:	৯০
	সংশয় নিরসনে	:	৯০
	পিতার কল্যাণে	:	৯৭
	বৈরাগ্যের ক্রম প্রকাশ	:	১০০
সপ্তম তরঙ্গ	ভূমিকা	:	১০৫
	শ্রীরূপ প্রসঙ্গে	:	১০৬
	শ্রীচৈতন্যাষ্টক (১)	:	১০৯
	” (২)	:	১১৪
	” (৩)	:	১১৮
	ইতিহাস	:	১২৩
	শ্রীসনাতন প্রসঙ্গে	:	১২৩

তরঙ্গ :	বিষয় :		পৃষ্ঠা
	'লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিবে'	:	১২৮
	রায় রামানন্দ প্রসঙ্গে	:	১৩৩
	গদাধর পণ্ডিত প্রসঙ্গে	:	১৩৮
	অপর এক ঘটনা	:	১৪৩
	বল্লভ ভট্টের প্রসঙ্গে	:	১৪৪
	অনর্গলরসবেত্তা	:	১৪৫
	'প্রেমসুখানন্দ'	:	১৪৬
	ঠাকুর হরিদাস প্রসঙ্গে	:	১৪৮
	জগদানন্দ প্রসঙ্গে	:	১৫২
	রঘুনাথ ভট্ট প্রসঙ্গে	:	১৭০
	বাণীনাথ প্রসঙ্গে	:	১৭৩
অষ্টম তরঙ্গ	নদী-সাগর-সঙ্গমে ভাসি গেলা নীলাচল	:	১৮০
	রাঘবের ঝালি	:	১৮৫
	ঝালির অন্যান্য দ্রব্য	:	১৯০
	(মঠ হইতে গমন)	:	১৯৩
	(সিংহদ্বারে উপস্থিত)	:	১৯৪
	(কাশী মিশ্রের দ্বারে উপস্থিত হইয়া)	:	১৯৫
	(গম্ভীরার দ্বারে)	:	১৯৬
	ঝালি সমর্পণের প্রসঙ্গে বাবাজী মহাশয়ের অনুস্মৃতিতে অধিক বিকাশ	:	২০৯
	গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা	:	২১২
	ইন্দ্রদ্যুম্নে—	:	২৩০
	আইটোটায়—	:	২৩৩
	নেত্রোৎসব দর্শনে—	:	২৩৭
	"পহুণ্ডি বিজয়"	:	২৪১
অষ্টম তরঙ্গ	রথাগ্রে—	:	২৪৩
	রথের সম্মুখে—	:	২৪৭
	অপরূপ রথের আগে—	:	২৬৬
	'গোরা নাচে রাধাভাবে। এই জগন্নাথের রথের আগে॥'	:	২৭৩
	গুণ্ডিচা বাড়ীর দরজায়	:	২৭৭

তরঙ্গ :	বিষয় :		পৃষ্ঠা
	মনোমন্দিরে শ্রীগুরু আনুগত্যে লীলা চিন্তনে শ্রীরামদাস	:	২৮৩
নবম তরঙ্গ	নিতাই প্রসঙ্গে	:	২৯১
	নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত	:	২৯৫
	'উদ্ধারিতে পতিত সবার। নিতাই তোমার অবতার ॥'	:	২৯৬
	গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রসঙ্গে (১)	:	৩০০
	গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ প্রসঙ্গে (২)	:	৩০৩
	কে বুঝিবে তাঁহা দোঁহার গোপভাব গূঢ়	:	৩০৬
	বিজয়া দশমী	:	৩০৮
দশম তরঙ্গ	শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর	:	৩১০
	উদ্ঘাটন	:	৩১১
	প্রথম চিত্র	:	৩২০
	দ্বিতীয় চিত্র	:	৩৩০
	তৃতীয় চিত্র	:	৩৪১
	চতুর্থ চিত্র	:	৩৫৩
	পঞ্চম চিত্র	:	৩৬০
	ষষ্ঠ চিত্র	:	৩৬২
	সপ্তম চিত্র	:	৩৬৮
	কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ?	:	৩৭১
	অষ্টম চিত্র	:	৩৮০
	নবম চিত্র	:	৩৮৫
	দশম চিত্র	:	৩৯২
একাদশ তরঙ্গ	রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবন—	:	৩৯৮
	গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা প্রসঙ্গে	:	৪০২
দ্বাদশ তরঙ্গ	রূপ-সনাতন প্রসঙ্গে	:	৪০৪
	রূপ-সনাতনের অদর্শনে	:	৪০৭
ত্রয়োদশ তরঙ্গ	শ্রীকুণ্ড সংস্কারে	:	৪১০

তরঙ্গ :	বিষয় :		পৃষ্ঠা
চতুর্দ্দশ তরঙ্গ	শ্রীকুণ্ড তটে	:	৪১৭
	শ্রীনিবাস প্রসঙ্গে	:	৪১৮
	মা-জাহ্নবা-প্রসঙ্গে	:	৪২৩
	'কবিরাজ যাঁর শিষ্য রহিলেন কাছে'	:	৪২৫
পঞ্চদশ তরঙ্গ	গৌর-বিরহ প্রমশনের ঔষধি	:	৪২৯
	শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পতরু	:	৪২৯
	শ্রীশচীনন্দনাষ্টক-স্তোত্রম্	:	৪৪০
	শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর স্বরচিত বাংলা		
	ঐ পদ-কীর্ত্তন	:	৪৫০
	ঐ আরত্রিক বর্ণনা	:	৪৫১
	ঐ জয়দেবের মহিমা কীর্ত্তন	:	৪৫২
	"বিরহে" গৌর সেবার উপকরণ	:	৪৫৩
ষোড়শ তরঙ্গ	ভূমিকা	:	৪৫৬
	শ্রীসূচক কীর্ত্তনের গৌরচন্দ্র	:	৪৫৭
	শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শোচক কীর্ত্তন	:	৪৬৯
	শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শোচকে "আক্ষেপ কীর্ত্তন"	:	৫০৭
সপ্তদশ তরঙ্গ	প্রীতি-উপহার	:	৫১৮
	(বিবরণ—৫১৮, সূচীপত্র—৫১৯)		
অষ্টাদশ তরঙ্গ	পাথেয়	:	৫৬১
	(পাথেয় সঙ্কেত ৫৬২ পৃষ্ঠায় দেখুন)		
	শ্রীগুরু কৃপায় কি না হয় ?	:	৬১৩
	(অভিমত সঙ্কেত—৬১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)		

চিত্র সঙ্কেত ঃ

বিবরণ—		পৃষ্ঠা
১। প্রভু জগদ্বন্ধু, প্রভুপাদ শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি দ্বাদশ মহাপুরুষ (সেবাঞ্জলির পর পৃষ্ঠায় তিন ভাঁজে)	:	
২। (পানিহাটি গ্রামে) গঙ্গা তটে প্রখ্যাত 'বটবৃক্ষ'	:	৩৮
৩। শ্রীধাম পুরীতে (শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে) রাজপথে, নিক্ষিপ্ত '**মহাপ্রসাদ**' সংগ্রহকারী (রাজপুত্র) রঘুনাথ	:	১০৩
৪। (শ্রীকুণ্ড-তটে) শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীল রঘুনাথ দাস ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঃ —এ তিনের 'পুষ্প' সমাধি	:	১৭০
৫। রাঘব ভবনে 'মাধবকুঞ্জ'	:	১৮৯
৬। (শ্রীকুণ্ড-তটে) শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজন কুটির	:	৪১৬
৭। (শ্রীকুণ্ড-তটে) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটির	:	৪২৮
৮। পঙ্কোদ্ধারের পরে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ঃ (ফটো—তারিখ ২০শে জুলাই ১৯৪০ খৃঃ	:	৪৮৯
৯। গ্রন্থ সঙ্কলয়িতার শ্রীগুরুদেব—নামময়-জীবন শ্রীল রামদাস বাবাজী	:	৫২০
১০। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের ম্যাপ্	:	৫৮০
১১। **'গম্ভীরা-বিহারী গৌরহরির নীলাচল লীলার ধারক' শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধি (শ্রীকুণ্ড)**	:	৬০৮

প্রথম তরঙ্গ

বাল্যে ঠাকুর হরিদাসের কৃপা ঃ

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাস দুই সহোদর। হিরণ্য জ্যেষ্ঠ, গোবর্দ্ধন কনিষ্ঠ। হিন্দু-কুল-গৌরব এই দুই ভাই সুপ্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম মুলুকের অধিপতি। বিপুল বৈভব ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব না থাকিলে মুসলমান আমলে কোন হিন্দুর এইরূপ অধিকার সম্ভব নয়।

শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বদান্যতায় ও সদাচারে এই দুই সহোদর জন-সমাজে সবিশেষ সমাদৃত ও সম্মানিত ছিলেন। হিরণ্য নিঃসন্তান। গোবর্দ্ধনের একটি মাত্র সন্তান, নাম 'রঘুনাথ'। সুতরাং দুই সহোদরের একমাত্র বংশধর ও উত্তরাধিকারী এই রঘুনাথ। ইনিই কালে জগৎ-পূজ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস বা 'দাস গোস্বামী'।

বৃটিশের আগমন পূর্ব্বে এ দেশে 'আত্মধর্ম্ম'* সম্বন্ধি বস্তুর আদর ছিল এবং 'অনাত্মধর্ম্ম'† সম্বন্ধি বস্তু সমূহের তথ্য সংরক্ষণে অনাদর ও উপেক্ষা ছিল। তখনকার সমাজ ও গ্রন্থপ্রণেতৃগণ একটি মহাজীবনের সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহারই সংবাদ সংসারকে জানাইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু কোন্ দেশ

---

* "আত্মধর্ম্ম" :—যে ধর্ম্মের সহিত জীবের 'স্বরূপ' অনুবন্ধী কর্ত্তব্যের সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ যে ধর্ম্ম সমূহ জীবাত্মা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান এবং তাহাদের স্বরূপগত সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাদিগকে 'আত্মধর্ম্ম' বলে। এই আত্মধর্ম্ম নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়।

† অনাত্মধর্ম্ম :—দেহাদি অনাত্ম বস্তুর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারাদি, লোকাচার ও দেশাচারদিগকে 'অনাত্মধর্ম্ম' বলা হয়। ইহারা অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল।

হইতে কি প্রকারে সেই জীবনধারাটি প্রবাহিত হইয়া এইরূপ উদার অথবা মহান্ উচ্ছ্বসিত প্রবাহে পরিণত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে তাঁহারা যত্নবান হন নাই। এই কারণেই "রঘুনাথের" চরিত্র ঐতিহাসিক হইলেও তাঁহার জন্মস্থান, সন, তারিখ আদির প্রামাণ্য তথ্য তেমন সু-নির্দ্দিষ্ট নাই।

দাস গোস্বামীর প্রকট জীবনের পরবর্ত্তী কালের পরম শ্রদ্ধেয় মহাজনবৃন্দ তাঁহার (শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর) আবির্ভাবের যে সব তথ্যপ্রকাশ করিয়াছেন সেগুলিকে সাজাইয়া দেখিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১) শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ তাঁহার "শ্রীমৎ দাসগোস্বামী" শ্রীগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন—

'শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী কোন্ শকে সহর সপ্তগ্রামের কোন্ পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন তাহার নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ নাই। তবে সম্ভবতঃ ১৪১৫ শক হইতে ১৪১৮ শকের মধ্যে কোনও সময়ে চাঁদপুর বা তন্নিকটস্থ কোন পল্লীতে এই বৈরাগ্য অবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল।

(২) শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীগৌরগণ-সংক্ষিপ্ত চরিত রত্নাবলী' (প্রথম খণ্ড) পৃষ্ঠা ৯৬ দ্বিতীয় লাইন—

'রঘুনাথ দাস গোস্বামী ১৪২০ শকাব্দায় কৃষ্ণপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।'

(৩) শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (৩) পৃষ্ঠা ১৩২৫—

'আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য মজুমদারের অনুজ গোবর্দ্ধনের গৃহে ইনি আবির্ভূত হন।'

জন্ম বিবরণের কথা দূরে থাকুক—'রঘুনাথের' বাল্য-ইতিহাসের সামান্য ইঙ্গিতও কোন প্রামাণিক গ্রন্থে সহজে পাওয়া যায় না। একমাত্র শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদই তাঁহার পরিচয় উল্লেখ করিয়াছেন।—

"সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

এই স্বল্পাক্ষর বর্ণনা হইতে যতটুকু জানা যায় সেই বিপুল বৈভবশালী গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠতাত, আত্মীয়বর্গ ও দাসদাসীর অত্যন্ত আদরের দুলাল হইয়াও রঘুনাথ আহার বিহার ক্রীড়া কৌতুকাদিতে আবাল্য উদাসীন ছিলেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের একমাত্র স্নেহের দুলাল হইয়াও ভগবৎভক্তির আদর্শে তিনি গুরুগৃহে পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাল্যে রঘুনাথের শিক্ষা-গুরুর নাম শ্রীবলরাম আচার্য্য। এই শ্রীবলরাম আচার্য্যই একদিন ভুবনপাবন নামময়জীবন ঠাকুর হরিদাসের কৃপাপাত্র হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ইনি পরম ভক্তিমান, পবিত্রহৃদয় এবং বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। সাধু সজ্জন পাইলেই ভক্তিপূর্ব্বক ও পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে তিনি নিজ আলয়ে লইয়া যাইতেন। তাঁহার গৃহে বিদ্যা অধ্যয়নকালীন রঘুনাথ সম্ভবতঃ ৮।১০ বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র। তখন তাঁহার সৌভাগ্যে শ্রীল বলরাম আচার্য্যের গৃহে ঠাকুর হরিদাস কিছুকাল অবস্থান করেন। রঘুনাথও সেই সুযোগে প্রত্যহ ঠাকুর হরিদাসকে দর্শন করিতে যাইতেন। যথা—

"হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চাঁদপুরে ।
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে ॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই মুলুকের মজুমদার ।
তাঁর পুরোহিত বলরাম আচার্য্য নাম তার ॥
হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তি মানে ।
যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেই গ্রামে ॥
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন ।
বলরাম আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহন ॥

রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন ।
হরিদাস ঠাকুরে নিত্য যাই করেন দরশন ॥
হরিদাস কৃপা করেন তাহার উপরে ।
সেই কৃপা কারণ চৈতন্য পাইবারে ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

স্বভাবেই ভগবৎপ্রিয় ও বিষয়ে উদাসী সেই বালক 'রঘুনাথ' শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে প্রত্যহ দর্শন করিয়া ও তাঁহার সু-মধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া, তাঁহার পরম রূপলাবণ্যময় বৈরাগ্যবেশ ও সরল-জীবন দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি মুগ্ধ ও লুব্ধ হইলেন। অপরদিকে ঠাকুর হরিদাসের কৃপা-কটাক্ষে তাঁহার জীবন সেই আদর্শে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন প্রসঙ্গেও পাওয়া যায়—

(রঘুনাথের) স্বাভাবিক অনুরাগ
বয়ঃ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে— স্বাভাবিক গৌর অনুরাগ
(পরস্পর) লোক মুখে শুনে— স্বাভাবিক গৌর অনুরাগ

শুধু কেবল তাই নয়

আরও গূঢ় কথা আছে
গৌর অনুরাগ প্রকাশ পাবার রঘুনাথের আরও গূঢ় কথা আছে ভাই
বাল্যকালে পেয়েছেন দর্শন
ঠাকুর হরিদাসের— বাল্যকালে পেয়েছেন দর্শন
সেই স্বাভাবিক অনুরাগে
সদাই ব্যাকুলিত চিত
কবে 'গৌরপদে' ঠাঁই পাব— সদাই ব্যাকুলিত চিত

——————

দ্বিতীয় তরঙ্গ

গৌর-নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণেঃ

হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস সপ্তগ্রামের আশ্রয় ও অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, দীন দুঃখীকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান, জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, সাধু, সজ্জন, উদাসী. বিদ্যার্থী সকলের জন্যই অন্নসত্র এবং মাসিক ও বাৰ্ষিক বৃত্তি, পূজা পার্ব্বণে দান ও অন্যান্য জনহিতকর বিবিধ প্রকারের সেবা দুই ভাইয়ের স্বাভাবিক কৃত্য ছিল।

উপরোক্ত পরিবেশের ফলে নদীয়া, গৌড় ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিশেষ বিশেষ সংবাদ লোকমুখে প্রচারিত হইয়া সদা সর্ব্বদা

হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সভাতেও প্রকাশ পাইত। শচীদুলাল গৌরহরির মাতৃগর্ভে অবস্থান হইতে প্রতিটি ঘটনাই অতি আশ্চর্য্য ও পরমমাধুর্য্য মণ্ডিত। সুতরাং এ সংবাদও যে গোবর্দ্ধনের সভায় প্রকাশ পাইবে তাহা বলা বাহুল্য।

বালক রঘুনাথ আত্মীয় ও দাসদাসীর মুখে এবং প্রতিদিন হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সভায় যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের মুখেও নদীয়া-বিহারী গৌরহরির অলৌকিক আশ্চর্য্য রূপমাধুরী, অমানুষী প্রতিভা এবং জন্ম বাল্য কৈশোর ও যৌবনের সময়গুলিতে তাঁহার অনুপম মধুময় লীলামাধুরীর নিত্য নূতন সুরসাল বর্ণনা ও ঐ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে ছড়া, গান, পদাবলী শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

পরমমঙ্গল 'গৌরনাম' ও তাঁহার মন-প্রাণ-মাতান লীলাবলীর স্বাভাবিক আকর্ষণ শক্তিতে বালক রঘুনাথ ইহ জনমের মতই গৌরচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ফলে গৌরদর্শন ও গৌরসঙ্গ-লাভের জন্য তাঁহার নির্ম্মল চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল। ইতি-পূর্ব্বে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের দর্শন ও তাঁহার কৃপা কটাক্ষে রঘুনাথের মন তীব্র বৈরাগ্যের ক্ষেত্র হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার ফলে মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের প্রীতি ও স্নেহ, মনোমুগ্ধকর নিত্য নূতন আমোদ প্রমোদ, অশেষ বিশেষ বিলাস উপকরণ ও অতুল ঐশ্বর্য্যে রঘুনাথের মন বিতৃষ্ণ হইয়া গেল। অন্তরের আবেশে রঘুনাথ পুনঃ পুনঃ গৃহত্যাগের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কয়েক বার তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা মনে মনে প্রমাদ গণিলেন এবং অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। স্বাভাবিক মমতার বশে অন্ধ হইয়া কঠোর শাসনের পরিবর্ত্তে রঘুনাথকে সতত সজাগ দৃষ্টিতে প্রহরার মধ্যে রাখিতে লাগিলেন।

প্রথম গৌর দরশনে ঃ

ইত্যবসরে নদীয়া-জীবন গৌরহরি কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অনুরাগী জনের মধ্যে এই মর্ম্মান্তিত সংবাদটি তড়িত গতিতে সমগ্র গৌড় মণ্ডলে প্রচারিত হইয়া গেল। বালক রঘুনাথও এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। আহার নিদ্রাও ত্যাগ করিলেন। শচীদুলাল হয়ত বঙ্গদেশ ছাড়িয়া বহু দূর দেশের কোথাও যাইবেন।—এই চিন্তা রঘুনাথকে বিহ্বল করিল।

তিন দিন পরেই রঘুনাথ সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার প্রাণ-মন উন্মাদকারী 'গৌরহরি' সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাঢ় দেশে ভ্রমণান্তে শান্তিপুরে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তাই প্রাণের দেবতা গৌরহরিকে একটিবার দর্শনের জন্য রঘুনাথের চিত্ত অস্বাভাবিক ব্যাকুল হইল। রঘুনাথের এই ব্যাকুল চঞ্চল অবস্থা দেখিয়া বিচক্ষণ ভ্রাতৃদ্বয় (হিরণ্য গোবর্দ্ধন) প্রচ্ছন্ন প্রহরীর ব্যবস্থায় পাইক, পর্য্যাপ্ত সেবক ও ব্রাহ্মণ সহ রঘুনাথকে শান্তিপুরে পাঠাইলেন।

শান্তিপুরে আসিয়া রঘুনাথ দেখিলেন শ্রীহরি-নাম কীর্ত্তনের তরঙ্গে শান্তিপুর ডুবুডুবু। নিরবিচ্ছিন্ন জনস্রোতে শত শত বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী একাকার হইয়া গৌর দর্শনে চলিয়াছেন। সকলের মুখেই উচ্চৈঃস্বরে মন প্রাণ মাতান মধুর 'হরিধ্বনি'। রঘুনাথের স্বাভাবিক গৌর অনুরাগ এই অনুকূল পরিবেশে সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইল। প্রেমাবিষ্ট রঘুনাথ 'আচার্য্যের' গৃহে যাইয়া গৌর-চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

"সন্ন্যাস করিয়া প্রভু শান্তিপুরে আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

গৌরসুন্দর পরম স্নেহে রঘুনাথের মস্তকে নিজ রাতুল চরণের স্পর্শ

দিয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করিলেন। প্রণতঃ রঘুনাথকে উঠাইয়া নিজ বক্ষে ধারণ করিলেন। উভয়ের নয়ন ধারায় উভয়ের শ্রীঅঙ্গ সিঞ্চিত হইল।

রঘুনাথ সপ্তগ্রামের অধিপতির একমাত্র উত্তরাধিকারী। সকলেই তাঁহাকে চেনেন। আবার শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত হিরণ্য গোবর্দ্ধনের বিশিষ্ট পরিচয়। তিনি পরম স্নেহে ও অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক রঘুনাথের সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করিলেন। রঘুনাথ পাঁচ সাত দিন শান্তিপুরে থাকিয়া মনের সুখে গৌর দর্শন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত প্রভু প্রতিদিন গৌরের অবশেষ রঘুনাথকে ভোজন করাইলেন।

"তার পিতা করে সদা আচার্য্য সেবন।
অতএব আচার্য্য তারে হইল প্রসন্ন ॥
আচার্য্য প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

রঙ্গিয়া গৌরহরি পাঁচ সাত দিন অখণ্ড সঙ্গ-সুখ ও নিজ অধরামৃত দান করিয়া স্বচরণে পরিপূর্ণ ভাবে লুব্ধ করিয়া রঘুনাথকে বিদায় দিলেন। রঘুনাথ গৌরাঙ্গের সুমধুর সঙ্গ-সুখ হারাইয়া 'বিরহে' নয়ন জলে মুখ বুক ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিলেন। এই চোখের ধারাই রঘুনাথের জীবন সাথী হইল। রঘুনাথের এখনকার গৌর-বিরহ অবর্ণনীয়।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের বিলাপ বর্ণনই সম্ভবতঃ রঘুনাথের দশার সহিত তুলনীয়।—

"মরম কহিব সজনি কায়
মরম কহিব কায়।

উঠিতে বসিতে দিক্ নেহারিতে
হেরি যে গৌরাঙ্গ রায় ॥
হৃদি সরোবরে গৌরাঙ্গ পশিল
সকলি গৌরাঙ্গময় ।
এ দুটি নয়নে কত বা হেরিব
লাখ আঁখি যদি হয় ॥
জাগিতে গৌরাঙ্গ ঘুমাতে গৌরাঙ্গ
সকলি গৌরাঙ্গ দেখি ।
ভোজনে গৌরাঙ্গ গমনে গৌরাঙ্গ
কি হল মোর এ সখি ॥
গগনে চাইতে সেখানে গৌরাঙ্গ
গৌর হেরি যে সদা ।
নরহরি কহে গৌরাঙ্গ চরণ
হিয়ায় রহিল বাঁধা ॥”

গৌরাঙ্গ প্রেমের বাতুল রঘুনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা মাতার শ্রীচরণে পরম ভক্তির সহিত নিবেদন করিলেন যে, তোমারা আমরা প্রিয়জন, আমার সুখে সুখী হইয়া যদি আমার প্রাণ বাঁচাইতে চাহ তাহা হইলে তোমরা আমায় কৃপাপূর্ব্বক ছাড়িয়া দাও। গৌর-বিরহে আমি প্রাণে বাঁচিব না। আমি তাঁহার কাছে যাই।

‘রঘুনাথের’ বাতুল চেষ্টা ও এই বজ্রসম কঠোর প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অতি বিষণ্ণ ও শঙ্কিত হইলেন। কোন্ পিতা মাতা তাঁহাদের একমাত্র দুলালকে গৃহ ছাড়িয়া উদাসী হইবার অনুমতি দিতে পারে? সুতরাং রঘুনাথের আবেদন নিষ্ফল হইল। কিন্তু গৌর-প্রেমের আকর্ষণে রঘুনাথের গৃহবাস অসম্ভব হইল। তিনি গৃহ হইতে পলায়নের নিত্য নূতন চেষ্টা উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সুচতুর পিতা ও

জ্যেষ্ঠতাতের সতর্ক দৃষ্টিতে তাঁহার পলায়নের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইতে লাগিল।

রঘুনাথের মনের গতি পরিবর্ত্তনের আশায় বিষয়-বিচক্ষণ ভ্রাতৃদ্বয় জাগতিক যত কিছু ভোগ, বিলাস, ক্রীড়া, কৌতুক ভূলোকে সম্ভব, একে একে সমস্তই রঘুনাথের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দেখিলেন যে রঘুনাথের মন সেই বাতুলের মতই রহিয়াছে। 'গৌর-বিরহে' রঘুনাথের উন্মাদ দশা, চোখে ধারা, মুখে হা হুতাস্।

জগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আকর্ষণ 'নারী'। শেষ চেষ্টা হিসাবেই তাঁহারা রঘুনাথের বিবাহের আয়োজন চিন্তা করিলেন। অপূর্ব্ব সুন্দরী এক কন্যার সন্ধান করিয়া বিশেষ আড়ম্বর ও ঘটা করিয়া রঘুনাথের বিবাহ দিলেন। কিন্তু তাহাতেও রঘুনাথের মন আকৃষ্ট হইল না। স্ত্রীকে বিসধর সর্পের মতই মনে করিয়া তাঁহাকে পরিহার করিয়াই চলিতে লাগিলেন। রঘুনাথের এই আচরণে জ্যেষ্ঠতাত ও মাতা-পিতা সর্ব্ব প্রকারে বলহীন হইয়া পড়িলেন। এত দিনে তাঁহারা সুনিশ্চিত ভাবে বুঝিলেন যে, গৌর-প্রেমের পাগলকে পার্থিব বিলাস বৈভব ও অপ্সরাসম স্ত্রী দ্বারা মুগ্ধ করা যায় না।

হিরণ্য, গোবর্দ্ধন অতুল বৈভব ও বিবিধ সুখ সম্পদের অধিকারী হইয়াও রঘুনাথের মানসিক দশা দেখিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা দুঃখে ও ব্যাকুল চিত্তে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রাণে এক মুহূর্ত্তও শান্তি নাই। এদিকে রঘুনাথ এখন গৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টায় পাগল। তিনি সুযোগ পাইবামাত্রই পুনঃ পুনঃ পলায়ন করেন। তাঁহার পিতা বহুবার বহু কষ্টে পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া অধিকতর স্নেহ ও সতর্কতার সহিত তাঁহাকে রক্ষণা বেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"বার বার পলায় তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তারে বাঁধি রাখেন আনি পথ হৈতে॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

আহা ! গৌরহরির "অনর্পিত-অর্পণ" লীলায় প্রেম ধারণের আদর্শ পাত্রটিকে কি ভাবেই যে দৃঢ়-ভিত্তিক করা হইতেছে তাহা কিশোর শ্রীরঘুনাথের বৈরাগ্যবাতুল চেষ্টা দেখিয়া কিছুটা অনুমান করা যায়।

(উপরোক্ত ঘটনাটি ১৪৩১ শকাব্দের মাঘ মাসে)

দ্বিতীয় বার গৌর দরশনেঃ

(১৪৩৬ শকাব্দ কার্ত্তিক মাস)

'নদীয়া-জীবন গোরা শান্তিপুরে আসিয়াছেন' এই সংবাদ শুনিবা-মাত্র রঘুনাথের হৃদয়ে 'গৌর-বিরহ-যাতনা' শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইল। সন্ন্যাস আবরিত (রাই-কানু একাকৃতি) শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শান্তিপুরে প্রথম মিলনের সেই সুখময় স্মৃতি তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছিল। পুনশ্চ তিনি গৌরহরির সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সকাতরে পিতার চরণে জানাইলেন। যথা—

"আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীর জীবন ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

হিরণ্যদাস ও গোবৰ্দ্ধনদাস শচীদুলাল গৌরহরির আবির্ভাব হইতে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের মধুর হইতে সু-মধুর লীলাবলীর রসাল বর্ণনা অশেষ বিশেষ ভাবেই শুনিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর এই চারি পাঁচ বৎসরের বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও লীলাবলীও তাহাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। যথা—

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষ, সু-প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও সন্ন্যাসীদের অধ্যাপক শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নব-জীবন ; 'অনর্গল রসবেত্তা,' 'মহাভাগবত প্রধান' রায় রামানন্দ ও উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রবল গৌর অনুরাগ ও তাঁহাকে আত্মসাৎ করিবার অলৌকিক লীলা ; দক্ষিণ দেশে ভ্রমণের সময়ে ঐশ্বরীয় শক্তির প্রকাশ (যথা—গমন পথে গৌরহরি এক এক জনকে এমন শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন যে সেই সেই ব্যক্তি যাহাদের স্পর্শ করিতেছেন এবং তাঁহারাও যাহাদের স্পর্শ করিতেছেন সকলে মহাশক্তিধর হইয়া দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্র প্রেমধন বিতরণ করিয়াছেন) ; 'জীবে দয়া' ও 'ভগবানে প্রেম' প্রকট করিয়া কঠিন হৃদয় জীবদিগকে মোহিত করিয়াছেন। তাঁহার তর্কেও এমন মাধুর্য্য যে প্রতিপক্ষ পরাজিত হইয়া অপমানিত বোধ করিতেন না, নিজেকে কৃত-কৃতার্থ বোধ করিতেন। কাহাকেও আপনার দৈন্যে, কাহাকেও আপনার ঔদার্য্যে, কাহাকেও আপনার মধুর চরিত্রে বশীভূত করিয়াছেন। 'তুকারামের' ন্যায় এক এক মহা ভক্তরূপ বিভিন্ন ফলবান বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন। 'বারমুখী'র ন্যায় বেশ্যাকে পরম বৈষ্ণবী করিয়াছেন, 'নরোজীর' ন্যায় দস্যুর নিজ হস্তে অন্তিমকৃত্য করিয়া অপার করুণা দেখাইয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া হিরণ্য গোবর্দ্ধনের মনে সু-দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে শচীদুলাল গৌরহরি স্বয়ং ভগবান। পরম সুকৃতিবান তাঁহাদের পুত্র 'রঘুনাথ' সেই 'সচল ভগবানের' দর্শনে যাইবার অনুমতি চাইতেছে। তাঁহারা কি আর বাধা দিতে পারেন? এই সঙ্গে আবার তাঁহাদের মনে একটি ক্ষীণ আশার রেখার উদয় হইল যে গৌরসুন্দর অন্তর্য্যামী, তিনি জানেন 'রঘু' আমাদের নয়নের মণি, প্রাণের প্রাণ। রঘুর বিহনে আমরা প্রাণে মরিব। তিনি পরম

করুণ। তিনি কৃপা করিলে আমাদের অঞ্চলের নিধি (রঘু) সুস্থ চিত্তে আদর্শ গৃহীর জীবন-যাপন করিতে পারে।

যাহা হউক পুত্রের প্রতি মমতা এবং গৌর দর্শনের জন্য রঘুনাথের উন্মাদ দশা দেখিয়া তাঁহারা রঘুনাথকে পুনরায় শান্তিপুরে যাইতে অনুমতি দিলেন।

পরম বিচক্ষণ পিতা পূর্ব্বের মত প্রচ্ছন্নরূপে সুদৃঢ় প্রহরার ব্যবস্থা করিলেন যেন 'রঘু' পলায়ন করিতে না পারে। তাহার পর শ্রীল অদ্বৈত ও গৌরপরিকরবৃন্দের জন্য ঘৃত, দধি মিষ্টান্ন, ভোজ্য ও বস্ত্র ইত্যাদি অতি উপাদেয় বিবিধ উপঢৌকন এবং পর্য্যাপ্ত রক্ষী, সেবক, ব্রাহ্মণ ও ধন-রত্নাদিসহ তাঁহাদের নয়নমণি রঘুনাথকে গৌরহরি দর্শনের জন্য শান্তিপুরে পাঠাইলেন। বিদায় কালে মাতা ও পিতা সপ্রেম ভাষণে বলিলেন—"বাপধন! তুমি আমাদের নয়নের তারা, তুমি আমাদের পরাণের পরাণ, তোমার পথ পানে চাতকের মত তাকিয়ে রইলাম। খুব শীঘ্রই ফিরে আস্‌বে।"

ওদিকে রঘুনাথের মনে চার পাঁচ বৎসর যাবৎ গৌর-বিরহে ঝুরিতে ঝুরিতে যে গৌর-অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই অনুরাগের চক্ষু দিয়া রঘুনাথের এবারের গৌর দরশন অতি অপরূপ।

প্রথম বারে শান্তিপুর পৌঁছানোর পর তিনি দেখিয়াছিলেন, কীর্ত্তন তরঙ্গে শান্তিপুর তখন ডুবু ডুবু। এবার, রাস্তাতেই যাহা দেখিতেছেন তাহাতেই রঘুনাথের মনে হইতেছে যেন সমস্ত গৌড়দেশ প্রেম তরঙ্গে ভাসিতেছে। নদীর প্লাবনের ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে জন প্রবাহ প্রেম-বারিধি গৌরহরির মধুর মধুর লীলাবলী শ্রবণ করিয়া উন্মাদের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে 'জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ' ধ্বনি দিতে দিতে শান্তিপুর মুখে ছুটিয়াছে।

রঘুনাথ নিজ 'পরাণ নাথের' এই লোকাকর্ষী মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মনে মনে আরও গভীর আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনিও

পরমানন্দে গৌর-মহিমার জয় দিতে দিতে দৌড়াইতে লাগিলেন। সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়াই একাকী ছুটিয়া শান্তিপুর আসিয়া গৌর-চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। 'এত দিনে কৃপা হ'ল বলে'—দর্শন মাত্র কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রঙ্গিয়া গৌরহরি পরম বাৎসল্যের সহিত রঘুনাথকে উঠাইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন।

গৌর-বিরহী রঘুনাথের অনুপম রূপ-লাবণ্য ও মাধুর্য্য দেখিয়া গৌর-আনা-প্রভু সীতানাথ পরম তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইলেন। তিনিও পরম বাৎসল্যের সহিত রঘুনাথকে গাঢ় আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। রঘুনাথের সহিত প্রেরিত হিরণ্য গোবর্দ্ধনের প্রীতি উপহার সমুহ যথস্থোনে রাখিবার জন্য নিজ ভৃত্যবর্গকে নির্দ্দেশ দিলেন। রঘুনাথের জন্য বাসা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রঘুনাথ যাহাতে নিরবিচ্ছন্ন গৌর-সঙ্গ ভোগ করিতে পারে তাহার যথোচিত সু-ব্যবস্থা করিলেন। এবারেও প্রত্যেক দিন গৌরহরির আহারের অবশেষ রঘুনাথের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন।

'রঘু' মাতা পিতাকে বাক্যদান করিয়া আসিয়াছে 'শীঘ্র ফিরিব'। সেই কারণে, এই পরমানন্দ পরিবেশের মধ্যেও—'বাড়ী ফিরিতে হইবে,' বাড়ীতে পিতা-মাতার দেওয়া প্রহবার পীড়া এবং 'গৌর-বিরহ জ্বালা' ভোগ করিতে হইবে এই সব চিন্তা রঘুনাথের মনকে বিষাদে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। লোকাভিরাম গৌরহরির করুণায় তিনি এখন মনে প্রাণে জানিয়াছেন যে গৌরহরির 'ইচ্ছা' এবং 'কৃপা' ছাড়া তাহার দুঃখ দূর হইতে পারে না। অথচ, গৌরহরিকে তাহা মুখ ফুটিয়া বলা যায় না। তাই, তিনি মনে মনে গৌরসুন্দরের শ্রীচরণে পুনঃ পুনং জানাইতেছেন—

(১) বাড়ীর প্রহরীর হাত হইতে উদ্ধারের উপায় কর—

(২) তোমার এই সুখময় সঙ্গ ছাড়া ক'রে আমাকে আর রেখো না। শীঘ্র নীলাচলে তোমার শ্রীচরণে স্থান দাও।

যাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা হইতে নিখিল সর্ব্বজ্ঞদের সর্ব্বজ্ঞতা সেই সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি সোনার গৌরাঙ্গ রঘুনাথের হৃদয়ের আবেশ কোন্‌দিকে তাহা বুঝিয়া একদা রঘুনাথকে একটি প্রবাদ সুলভ উপদেশে বলিলেন—

"স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব সিন্ধু-কূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথা যোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তর্নিষ্ঠা কর বাহ্যে—লোক ব্যবহার।
'অচিরাতে' কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

এই পয়ারে বিধৃত বাক্যাবলীর যথা শ্রুত অর্থ—

ভবসিন্ধু হইতে সহসা পরিত্রাণের উপায় হয় না। এ জন্য সাধনার প্রয়োজন। স্থির হও। উন্মাদের আচরণ করিও না। বাড়ী ফিরিয়া যাও। লোক দেখান মর্কট-বৈরাগ্য* পরিহার কর। বিষয়ে অনাসক্ত হও। লোক দেখান বাহ্য-বৈরাগ্য করিও না। শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে উদ্ধার করিবেন।

---

* মর্কট অস্বাভাবিক কামার্ত্ত। আবার এতদূর ক্রোধান্ধ যে রাজ্যাদি কিছু না থাকিলেও ভয়ানক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরের প্রাণ বিনষ্ট করে এবং নিজেও প্রাণ হারায়, আবার এতদূর লুব্ধ যে কিসে পরের খাদ্যদ্রব্য অপহরণ করিবে এই অভিসন্ধিতে সর্ব্বদা ফিরে। মর্কট বা বানর বাস করে বনে বৃক্ষের শাখায় এবং গৃহও প্রস্তুত করে না। উলঙ্গ থাকে, নিরামিষ খায়। এইরূপ যাহারা কাম ক্রোধাদির নিরন্তর বশবর্ত্তী হইয়া বাস্তবতঃ বিরক্তের ন্যায় বেশাদি ধারণপূর্ব্বক বিচরণ করে তাহাদিগের সেই বৈরাগ্যকে 'মর্কট-বৈরাগ্য' বলে।

Jaikris

প্রিয়ের প্রিয়ে অধিক প্রীতি ঃ

"প্রভুর শিক্ষাতে তিঁহ নিজ ঘরে যায়।"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

শান্তিপুরে সাতদিন সাতরাত্রি অখণ্ড ভাবে 'গৌর' ও ভুবন পাবন 'গৌরগণের' সঙ্গ সুধা লাভ করিয়া রঘুনাথ রঙ্গিয়া গৌরহরির প্রীতিময় গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জক উপদেশ শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গ-সঙ্গহারা হইয়া নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এবার রঘুনাথের বিপরীত আচরণ। তিনি প্রথম দর্শনেই মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ-তাতের সহিত হাসি মুখে মধুর সম্ভাষণ ও প্রিয় নর্ম্ম আলাপ করিতে লাগিলেন। বাড়ীর দাস দাসী অতিথি অভ্যাগত সকলকে যথাযোগ্য প্রিয় সম্ভাষণে তৃপ্ত করিতে লাগিলেন। সু-মধুর পরিহাসের সহিত পত্নীর উল্লাস বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। স্বকার্য্য সাধনের জন্য অন্তর বাহিরের ভাব সযত্নে যথাযোগ্য ক্ষেত্রে প্রকাশ ও অপ্রকাশ করিয়া রঘুনাথ তাহার আচরণ ব্যবহারটিকে সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিলেন। ইহার আচরণে পিতা মাতা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। হিরণ্য গোবর্দ্ধনের শোকদুঃখময় ম্রিয়মাণ সংসার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সুখের বন্যায় প্লাবিত হইল।

নবদ্বীপ বিহার কালে 'নদীয়া বিনোদিয়া' গৌরহরির জনগণমন-লোভনীয় গার্হস্থ লীলার সু-রসাল সংবাদ (আমাদের) রঘুনাথ অনু-শীলন করিয়া প্রাণ-শচীদুলালিয়া গৌরহরির সেই লীলা চরিত্রের বিভিন্ন দিক অনুসন্ধানের দ্বারা নিজের সংসার গ্রন্থি মোচনের পথ দেখিতে পাইতেছেন। এখন সেই আদর্শে নিজ পরিবারবর্গ ও সপ্তগ্রামবাসীদের সহিত কৃত্রিম আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য তাহাদিগকে আনন্দসাগরে ডুবাইয়া সকলের সহিত অনুকূল আচরণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে, রঘুনাথের জন্য পূর্ব্বে যে প্রহরার ব্যবস্থা ছিল তাহা ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল।

'রঘুনাথের' এই গার্হস্থ্য জীবনের নীতি কি ছিল তাহা কবিরাজ গোস্বামী দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া লিখিয়াছেন—

"ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম।
দেখি তার পিতা মাতা আনন্দিত মন ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

সেই সময় কুলপ্রথা অনুসারে এই গার্হস্থ আশ্রমেই রঘুনাথ কুল-গুরু শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। কবি-কর্ণপুর শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে বলিয়াছেন—

"আচার্য্য যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ।
তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যাদিগুণ প্রাণাধিকো মাদৃশাং ॥"

অনুবাদঃ (গৌরপার্ষদ) শ্রীবাসুদেব দত্তের প্রিয়তম প্রেমবান্ যদুনন্দন আচার্য্যের শিষ্য নিখিল গুণের আধার রঘুনাথদাস আমাদের প্রাণাধিক।

পুরশ্চরণঃ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী* শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপে 'কৃষ্ণ' মন্ত্রে পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। অন্যতম আচার্য্যবর্য্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীও ইন্দ্রসম রাজ্য ও অপ্সরাসম স্ত্রী হইতে মুক্তিলাভ এবং সচল নীলাচলনাথ গৌরহরির শ্রীচরণ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ অনুরূপ পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। গৌর-আনা-গোস্বামী অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য এই

* কৃষ্ণ মন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ; অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য চরণ।
—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ

পুরশ্চরণ কার্য্যে নিজ শিষ্য রঘুনাথকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া তিনি একদিন সংবাদ পাইলেন—

'ঝারিখণ্ড পথে গৌর যায় সিংহ ব্যাঘ্র কেন্দে লুটায়।'

আবার কিছুদিন পরে খবর পাইলেন—

'কৃষ্ণ প্রেমের উন্মাদ মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রজবনে পরিক্রমা করিতেছেন।'

আবার কিছুদিন পরে সংবাদ পাইলেন—

'বৃন্দাবন হইতে পুরী প্রত্যাগমন পথে প্রয়াগে শ্রীরূপকে অঙ্গীকার আত্মসাৎ করিয়া ব্রজে পাঠাইয়াছেন।'

আবার কিছুদিন পরে সংবাদ পাইলেন—

'সনাতন গোস্বামিপাদকে কৃপা আত্মসাৎ ও অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকেও ব্রজে পাঠাইয়াছেন।'

এবং

'কাশীবাসী দশ হাজার সন্ন্যাসী ও তাঁহাদের প্রধান আচার্য্য শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে স্বচরণে আনুগত্য দান করিয়া 'মূরতি মন্ত্র-প্রেম-বৈচিত্ত্য' গৌরহরি নীলাচল প্রত্যাগমন পথে গমন করিয়াছেন।'

আবার কিছুদিন পরে সংবাদ পাইলেন—

'ব্রজবনে (কৃষ্ণ)-বিরহিনী-উন্মাদিনী প্রাণ-গোরারায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।'

তৃতীয় তরঙ্গ

বিপদে ঃ

হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাস সপ্তগ্রাম মুলুকের *মোক্‌ররা বলে কর আদায় ও তহশীল আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে জনৈক মুসলমান ঐ মুলুকের চৌধুরী † সূত্রে শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায় করিয়া দিল্লী সরকারকে কিছুই দিতেন না। সমস্তই আত্মসাৎ করিতেন। সরকার তাহাতে বিব্রত বোধ করেন। শান্তি বিঘ্নিত না করিয়া কিরূপে ঐ মুলুক হইতে নিশ্চিত, নিয়মিত বাৎসরিক 'কর' আদায় হয় তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস দিল্লী সরকারকে জানাইলেন যে সপ্তগ্রাম মুলুকের রাজস্ব আদায় হউক বা না হউক প্রতিবর্ষে তাঁহারা রাজ সরকারকে বার লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। প্রবল প্রতাপী প্রভূত ধনশালী, মহা বিচক্ষণ, সপ্তগ্রামের বাসিন্দা ও ঐ মুলুক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিচিত হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাসের এই প্রস্তাব দিল্লী সরকার সানন্দে গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, সেই মুলুকের প্রাক্তন মুসলমান শাসনকর্ত্তা যখন দেখিলেন যে তিনি নিজের অধিকার হারাইলেন, এবং দিল্লী সরকারও প্রতিবর্ষে নিয়মিত ভাবে রাজস্ব পাইতেছেন এবং হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাস অত্যন্ত সম্মান ও যোগ্যতার সহিত মুলুকের শাসন কার্য্যেরও পরিচালনা করিতেছেন তখন ক্রোধ ও ঈর্ষ্যায় তিনি

* স্থায়ী বন্দোবস্ত।

† চৌধুরী যাহারা রাজস্ব আদায়ের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া বাদশাহের কার্য্য করিতেন।

নানা প্রকার কুচক্র ও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি বাদসাহের মনে সু-দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইলেন যে সপ্তগ্রাম মুলুকের ভূমি রাজস্ব বিশ লক্ষ টাকা আদায় হয়। এ ছাড়া, ব্যবসা ও অন্যান্য বিবিধ প্রকারের কর (Taxes) আরও বেশ কয়েক লক্ষ টাকা আদায় হয়। সুতরাং হিরণ্য গোবর্দ্ধনকে মাত্র বার লক্ষ টাকায় ঐ মুলুক 'মোকররা' দেওযায় সরকারের বহু ক্ষতি হইতেছে।

তখন বাদশাহ ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া উক্ত বিচ্যুত মুসলমান শাসনকর্ত্তার পরামর্শ মতে পর্য্যাপ্ত সৈন্য সহ একজন উজীরকে পাঠাইলেন। সহসা তাহারা সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইল।

ধীর, স্থির, পরম গম্ভীরাশয় হিরণ্যদাস ও গোবদ্ধনদাস জানিলেন সৈন্য সহ উজীরের সপ্তগ্রামে পদার্পণ। এ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই প্রত্যক্ষ অপমান ও 'ভাগ্য বিপর্য্যয়' এড়াইবার জন্য তাঁহারা সুকৌশলে প্রচ্ছন্ন রহিলেন।

যবন সেনা সহ উজীর হিরণ্যদাসের আলয়ে প্রবেশ করিল। বহু অনুসন্ধানেও হিরণ্যদাস কিম্বা গোবর্দ্ধনদাস কাহাকেও পাইল না। কূটনীতি বিশারদ্ উজীর নাবালক রঘুনাথকেই বাঁধিয়া লইয়া গেল। উজীর আশা করিল যে হিরণ্য গোবৰ্দ্ধনের নয়নের মণি এই রঘুনাথ, ইহার উদ্ধারের জন্য তাহারা অবশ্যই আত্ম প্রকাশ করিবে। আরও বিচার করিল যে রঘুনাথ সত্যবাদী, সরল বালক, পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত কোথায় লুকাইয়া আছে তাহা যদি ইহার জানা থাকে, তবে ইহাকে তাড়না ও তর্জ্জন গর্জ্জন দ্বারা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা আছে।

নামময়জীবন ভুবনপাবন ঠাকুর হরিদাসের কৃপাস্নাত কিশোর রঘুনাথ অচঞ্চল চিত্তে সর্ব্ব প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন সহ্য করিলেন। শুধু তাহাই নয়, ভক্তির প্রতিমূর্ত্তি রঘুনাথ একদিন সেই কুচক্রী

তুড়ুক্‌কে (তুরস্ক দেশীয় মুসলমান শাসনকর্ত্তা) মধুর কণ্ঠে অতি বিনয় সহকারে বলিলেন—

"তাত ! আপনি এবং আমার জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা যেন তিনটি আপন ভাই। আমি জানি ঝগড়া ও মিলন আপনাদের মধ্যে হামেসাই লেগে আছে। আজ আপনাদের ঝগড়া কালই আবার দেখ্‌তে পাব তিন জনের মধ্যে পরম প্রীতি ও মিলন। আমি যেমন পিতার পাল্য তেমনি পিতৃতুল্য আপনারও পাল্য নই কি? পালক কখনও পাল্যকে তাড়না করে না। ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ব্যবহারিকতায় আপনি প্রবীণ ও সর্ব্বোত্তম। আমার প্রতি আপনার এ সব আচরণ শোভা পায় না।"

অঘটন-ঘটন পটীয়সী ভক্তিদেবীর কৃপা কটাক্ষে রঘুনাথের মুখে অপূর্ব্ব শক্তির বাকস্ফূর্ত্তি হইল, তাহা শুনিয়া কুচক্রী তুড়ুকের হৃদয় মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে নির্ম্মল হইল। তাহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, সেই ধারায় দাড়ি ভিজিয়া গেল।

"এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।
দাড়ি বহি অশ্রু পড়ে, কহিতে লাগিল॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

ঐ 'তুড়ুক'ই অতঃপর রঘুনাথের মুক্তির চেষ্টা ও ব্যবস্থা করিলেন। এবং অকপট হৃদয়ে রঘুনাথের নিকট নিজের মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

"দেখ, বাপ্ রঘু! তোমার জেঠার বুদ্ধিনাশ হইয়াছে। এই মুলুকের কেবল ভূমি রাজস্বের লভ্যাংশই আটলক্ষ টাকা। আমি এখানের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা। আমি নির্ব্বিরোধে তোমার জেঠার অনুকূলে নিজ অধিকার ছাড়িয়াছি। আবার, আমাদের যেরূপ প্রীতির সম্বন্ধ তাহাতে ঐ লভ্যাংশের আমিও ভাগীদার! সম্প্রতি যে

ঘটনা ঘটিয়া গেল মন হইতে তাহা মুছিয়া দাও। আজ হইতে সত্য সত্যই তুমি আমার 'পুত্র'। এখন তুমি স্বচ্ছন্দে বাড়ী যাও। আমি যাহাতে সম্মান ও উচিত মর্য্যাদায় জীবন যাপন করিতে পারি সে ব্যবস্থার ভার তোমার জেঠার উপরই ছাড়িয়া দিলাম। তোমার জেঠাকে আমার এই সব কথা বলিবে। সত্বর তাঁহার সহিত আমার মিলন করাও। যথাকালে যথাযোগ্য সম্মান ও বিষয় সম্পর্কে একটা সন্ধি করা যাইবে।"

রঘুনাথ সগৌরবে বাড়ী ফিরিলেন। রঘুনাথের দর্শনে ও অস্বাভাবিক প্রভাব শ্রবণে যাহারা লুকাইয়া ছিলেন ক্রমে তাহারা যথাসময়ে সকলে মিলিত হইল। মা বাবা ও জ্যেষ্ঠতাত সকলে আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। প্রথম সুখ-মিলন পরে, সুযোগ মত রঘুনাথ তাহার জ্যেষ্ঠতাতকে বলিলেন—

"তাত! আপনি পরম বিচক্ষণ, স্বভাব দয়ালু ও দানবীর। ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা যাহাতে সম্মান ও মর্য্যাদার সহিত বাকি জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা আপনার সুবিবেচনার উপরে তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার সহিত সত্বর আপনি মিলিত হউন ইহাও তাঁহার নিবেদন।"

রঘুনাথের নির্ভীকতা, সহিষ্ণুতা, বিচক্ষণতা, ব্যবহারিক পারদর্শিতা ও সর্ব্বোপরি সুমধুর চরিত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও পিতাকে 'অপমান' ও 'ভাগ্য-বিপর্য্যয়' হইতে রক্ষা করিল। অতঃপর রঘুনাথের প্রতি হিরণ্য গোবর্দ্ধনের স্নেহ ও মমতা সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইল।

বিশ্বের সৃজনকারিণী মায়াদেবীর গুরু নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের কৃপাস্নাত রঘুনাথের এ কোন্ বিস্ময়!

চতুর্থ তরঙ্গ

নিতাই প্রসঙ্গে ঃ

হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সভায় বিভিন্ন প্রয়োজনে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন প্রান্তের ভিখারী হইতে পরম জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত প্রভৃতি সর্ব্ব স্তরের লোকের সর্ব্বদা গতায়াত ছিল। সুতরাং গৌরহরির বিভিন্ন লীলাবলীর সংবাদ অতি স্বাভাবিকভাবেই রঘুনাথ জানিতে পারিতেন। ইহার উপর আবার রঘুনাথের উৎসাহদানে ও তাঁহার দ্বারা পুরস্কৃত হইবার আশায় বহু লোক কেবল গৌরহরির সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রঘুনাথকে দিবার জন্য ব্যস্ত হইল। এই সময় রঘুনাথের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় 'রাম', 'কৃষ্ণ' ও 'গৌর' লীলার অভিনয়, কবিপাঠ, 'কীর্ত্তন' আদি নানান্ উৎসবে সমস্ত সপ্তগ্রাম মুখরিত হইল।

সপ্তগ্রামের বালক-বৃদ্ধ-পুরুষ-নারী সকলের নিকট রঘুনাথের চিত্তাকর্যক পরম মধুর গার্হস্থ্য জীবন প্রায় দুই বৎসর অতীত হইলে পর একদা রঘুনাথ শুনিলেন যে—

'অভিন্ন-চৈতন্য-তনু', প্রেমদাতা, অবধূত নিতাইচাঁদ গম্ভীরা-বিহারী 'সচল জগন্নাথ' গৌরহরির আজ্ঞায় 'নাম' 'প্রেম' বিতরণ করিতে করিতে পানিহাটি গ্রামে আসিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্রই গৌরহরির সেই কৃপাবাণী স্মরণে আসিল—

> "বৃন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে।
> তবে তুমি আমা পাশে আসিও কোন্ ছলে।।"
>
> —চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

সেই স্মৃতিতেই রঘুনাথের চিত্তকে নূতন ভাবে আলোড়িত করিতে লাগিল। কে যেন তাঁহার প্রাণে বলিয়া দিল—"রঘুনাথ! তোমার সুদিন আগত। ত্বরায় যাও। নিতাই সোনার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।"

রঘুনাথ 'নিতাই' ও তাঁহার প্রেমদান লীলার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য অতি যোগ্য ও সু-চতুর কয়েক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন : অল্প কয়েকদিন মধ্যেই তিনি বিস্তারিত বিবরণ পাইলেন। যথা—

প্রথম সংবাদ :

গম্ভীরাবিহারী গৌরহরি সহজ করুণ নিতাইচাঁদকে তাঁহার গণ সহ গৌড়মণ্ডলে পাঠাইয়াছেন। উদ্দেশ্য :—কলি জীবের দ্বারে দ্বারে গমনপূর্ব্বক কে কোথায় পতিত আছে খুঁজিয়া খুঁজিয়া সকলকে 'নাম' 'প্রেম' দান করিতে হইবে। যথা—

"কৃত পাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডী আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।"

দ্বিতীয় সংবাদ :

নিতাইচাঁদের সঙ্গে আসিয়াছেন--'রামদাস', 'গদাধর দাস', 'রঘুনাথ', 'কৃষ্ণদাস পণ্ডিত', 'পরমেশ্বর দাস', 'পুরন্দর পণ্ডিত' এবং 'বাসু ঘোষ'। ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে পাগল ও শ্রীনিতাইচাঁদের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পার্ষদ। পথে আসিবার কালেই নিতাইচাঁদ এই পার্ষদগণের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন তাহা অতি অদ্ভুত। যথা—

"পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব্ব পারিষদ করিলেন প্রেমময়॥

প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য 'রামদাস'।
তান্ দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ ॥
মধ্য পথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর তিন বাহ্য পাসরিয়া ॥

হইল রাধিকা ভাব গদাধর দাসে।
'দধি কে কিনিব' বলি মহা অট্টহাসে ॥

'রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়' মহামতি।
হইলেন মূর্ত্তিমতি যে হেন রেবতী ॥

'কৃষ্ণদাস' 'পরমেশ্বর দাস' দুই জন।
গোপাল ভাবে হৈ হৈ করে সর্ব্বক্ষণ ॥

'পুরন্দর পণ্ডিত' গাছেতে গিয়া চড়ে।
মুঞিরে অঙ্গদ বলি লাফ দিয়া পড়ে ॥

এই মত নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত ধাম।
সভারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাম ॥" —চৈঃ ভাঃ

তৃতীয় সংবাদ ঃ

পানিহাটি গ্রামে ভাগ্যবান রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতে অবধূত নিতাইচাঁদ সগণে আসিয়া প্রেমদান লীলা আরম্ভ করিয়াছেন। সেখানে নিতাইচাঁদের অভিষেক লীলা। জম্বীরের গাছে কদম্ব ফুল। 'নিতাই' নর্ত্তনে প্রত্যহ 'গৌর আবির্ভাব' ইত্যাদি মন-প্রাণ উন্মাদনকারী লীলাবলীর বর্ণনা অন্তে সংবাদদাতা পুলক অশ্রু কলেবরে গদগদভাষে নিবেদন করিল যে—

ভাগবত বর্ণিত 'গোপী-প্রেম' নৃ-লোকে হয় না। কিন্তু সেই গোপী-প্রেম নিতাইচাঁদ আচণ্ডালে দান করিতেছেন। যথা—

"যে দিকে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
সে দিকে **মহা-প্রেমভক্তি বৃষ্টি** হয়॥

যাহারে চাহেন সেই **প্রেম মূর্চ্ছা পায়**।
বস্ত্র না সম্বরে ভূমে পড়ি গড়ি যায়॥

দরশন মাত্র সর্ব্ব জীব মুক্ত হয়।
নাম তনু দুই নিত্যানন্দ রসময়॥"

—চৈঃ ভাঃ

উপসংহারে সংবাদদাতা নিবেদন করিল, বিধি পুরশ্চরণের অপেক্ষা নাই, স্থান, কাল, পাত্র বিচার নাই, নিতাইচাঁদ যারে তারে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম ধনে ধনী করিতেছেন। আর—

"কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেকো না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্ত্তন বিনে॥

যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় শত শত জন॥

গৃহস্থের শিশু সব কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা মহা বৃক্ষ ধরি টানে॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
'মুঞিরে গোপাল' বলি বেড়ায় ধাইয়া॥
হেন সে সামর্থ্য একো শিশুর শরীরে।
শত শত জন মিলিয়াও ধরিতে না পারে॥"

—চৈঃ ভাঃ

'রঘুনাথ' এই সব সংবাদদাতাদিগকে অপ্রত্যাশিত পারিতোষিক দানে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন।

নিতাই মিলনেঃ

(১৪৪০ শকাব্দে বা ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী)

'সচল-জগন্নাথ' গৌরহরির আদেশে অবধূত নিতাইচাঁদ পানিহাটি আসিয়া পরম সুকৃতিবান রাঘব পণ্ডিতের ভবনে অবস্থান করিতেছেন। আর ভক্ত অভক্ত সকলের বিস্ময় উৎপাদনকারী লীলা-মত্ততায় পরমানন্দ দান করিতেছেন। এ সংবাদ হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস উভয়েই প্রায় প্রত্যহই পাইতেছেন। আবার 'রঘুনাথের' আহার বিহার ক্রীড়া কৌতুক রঙ্গ-রহস্য ইত্যাদির ব্যাপারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহাদের মনও প্রফুল্ল। তাঁহাদের একমাত্র উত্তরাধিকারী রঘুনাথ যে বিপুল বৈভবের সুব্যবহার করিতে পারিবে এবং 'সপ্তগ্রাম মুলুক' পরিচালনায় ধৈর্য্য, বিচার বুদ্ধি ও অসাধারণ দক্ষতা যে রঘুনাথের আছে তাহার প্রমাণ তাঁহারা পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন।

সময় ও সুযোগ বুঝিয়া রঘুনাথ একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার সমীপে বিনীত নম্র কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—"জেঠা মহাশয়! আমাদের মুলুকের অন্তর্গত পানিহাটি গ্রাম। সেখানে পরম দয়ালু স্বভাব নিতাইচাঁদ আগমন করিয়া রাঘব পণ্ডিতের ভবনে অবস্থান করিতেছেন। আমার বাসনা, একবার তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসি। আপনারা সানন্দে অনুমতি দিলে কৃতার্থ হই।"

রঘুনাথের আবেদন তাঁহারা সানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং পানিহাটি যাইবার অনুমতি দান করিলেন।

রঘুনাথ পরম হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার অন্তরের বলবতী আশা পূর্ণ হইল। রাঘব পণ্ডিতকে উপঢৌকন দিবার জন্য ঘৃত, দধি, বিবিধ প্রকারের মিষ্টান্ন, বিবিধ উপাদেয় ফল, ভোজ্য, বস্ত্র ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সম্ভার সুসজ্জিত করিয়া প্রহরী, সেবক ও কয়েকজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া রাজ-মর্য্যাদায় তিনি নিত্যানন্দের দর্শনে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। হাসি মুখে ও সুমিষ্ট সম্ভাষণে পিতা, জ্যেষ্ঠতাত, মাতৃদেবী ও পরিজনবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। নিজ প্রিয়াকে সরস সম্ভাষণে আনন্দদান করিয়া তাহার নিকটও সানন্দ বিদায় অনুমতি গ্রহণ করিলেন। শুভ মুহূর্ত্তে প্রাণ-মন উন্মাদনকারী 'গৌরহরির' জয় দিতে দিতে তিনি নিজ ভবন হইতে বাহির হইলেন।

(২)

'পানিহাটি' গ্রামটিও হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাসের শাসিত মুলুকের অন্তর্ভুক্ত স্থান। রঘুনাথ দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষমূলে পিণ্ডা বাঁধান আছে এবং তাহার উপরে চাঁদনিতাই বসিয়া আছেন। তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে যুগপৎ সেই স্থান অলঙ্কৃত আছে। পিণ্ডার উপরে ও তলে বহু ভক্ত। নিতাইচাঁদ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের শ্রীঅঙ্গের অপরূপ জ্যোতি দর্শনে রঘুনাথ বিস্মিত হইলেন। স্বাভাবিক দৈন্যে আপনাকে অযোগ্য মনে করিয়া দূর হইতেই রঘুনাথ ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। যথা—

"গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে ;
বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় ক'রে

তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত ;
দেখিয়া প্রভুর **প্রভাব রঘুনাথ** বিস্মিত।

দণ্ডবৎ হৈঞা সেই পড়িলা কথো দূরে।"

রঘুনাথ সকলেরই পরিচিত। রঘুনাথের প্রতি গৌরহরির কৃপা ইতিপূর্ব্বে সকলেই দেখিয়াছেন। অতুল বৈভবের অধিপতিদের একমাত্র দুলালকে অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারে ভূষিত ও ভূলুণ্ঠিত দেখিয়া সকলের হৃদয়ে প্রেমানন্দ যেন শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইল। কিছুক্ষণ পরে জনৈক সেবক নিতাইচাঁদকে প্রেমস্বরে বলিলেন—

"দেখ, দেখ প্রভু নিতাই, ঐ অদূরে রঘুনাথ তোমায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেছে।"

এই কথা শ্রবণ মাত্রেই পরম কৌতুকী নিতাইচাঁদ অতি উৎফুল্লিত মনে ছুটিয়া গিয়া প্রথমে রঘুনাথের মস্তকে নিজ রাতুল চরণের স্পর্শ দান করিলেন এবং তাঁহাকে পরম প্রেমে উঠাইয়া স্বীয় বক্ষে ধারণ-পূর্ব্বক প্রেম মধুর স্বরে বলিলেন—

"চোরা! এতদিন পরে দেখা দিলি! দাঁড়াও আজ তোমায় হাতের কাছে পেয়েছি। চুরির উচিত দণ্ড বিধান করি।"

রঘুনাথ মনে-প্রাণে জানেন যে তিনি ঘোর বিষয়ী, ঘৃণ্য এবং সংসারের কীট। সুতরাং নিজেকে পরম প্রভাবশালী নিতাইচাঁদের দর্শনেরও অযোগ্য মনে করেন। তিনি সর্ব্ব সমক্ষে নিতাই সোনার এই প্রীতি ও সোহাগ মাখা আচরণে নিজেকে অতি বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন।

নিতাইচাঁদ রঘুনাথকে 'চোরা' সম্বোধন করিয়া ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে বিশেষ তাৎপর্য্য সৃষ্টি করিলেন। তাঁহাদের মনে প্রশ্ন জাগিল— "কেন রঘুনাথকে চোরা বললেন? তাঁর কি চুরি করেছে? দেখা ত হয় নাই। কেমন করে চুরি করল?"

ব্যবহারিক রাজ্যের হিসাবে জানা যায় যে গুরু, শিক্ষক বা সহায়কের সাহায্যেই শিক্ষা লাভ হয়। পারমার্থিক রাজ্যেও কি এক নিয়ম? উত্তর: হ্যাঁ। 'বিষয়'কে পাইবার জন্য মূল আশ্রয় তত্ত্বের আনুগত্যে যাইতে হয়। আর এই লোক চমৎকার লীলায় গৌর 'বিষয়' এবং নিতাই 'আশ্রয়'। পূর্ব্বে রঘুনাথ দুইবার নিতাই-চাঁদের বিনা আনুগত্যে গৌরহরির সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু লীলার মর্য্যাদায় গৌরসুন্দর প্রতিবারেই মিষ্ট ব্যবহারে রঘুনাথকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যাহার ধন তাহাকে না বলিয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহাকে চুরি বলা হয়। রঘুনাথের সে দোষ অবশ্যই ঘটিয়াছে।

নিতাইচাঁদের মনের ভাব 'চোরা' আমার ধন আমায় না ব'লে ভোগ করতে চাও? আজ তোমায় দণ্ড দোব।

(৩)

(এ চুরির কি দণ্ড হইতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ আচরণ)

রাই-কানুর ভাব মিলিত বিগ্রহ গৌরহরির অভিন্ন তনু চাঁদ নিতাই বলিলেন—

'দধি, চিড়া ভাল মতে খাওয়াও মোর গণে।'

অপূর্ব্ব এ 'দণ্ড'!

'দধি চিড়ার মহোৎসব।'

মহতের 'দণ্ড' যে প্রতিকূলে কৃপা তাহা অনেকেরই শোনা আছে। ঐ প্রসঙ্গে নলকুবেরের প্রতি নারদের এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির

প্রতি নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ বলরামের দণ্ডদান স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিকূলে কৃপা প্রকাশ পাইয়াছে। নলকুবেরের প্রতি দণ্ডদান 'পুরাণের' সংবাদ। সে দৃষ্টান্তের উল্লেখ শুধু স্মরণীয় করুণার কথা। আর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রতি দণ্ড বিধান ১৪৪০ হইতে ১৪৪২ শকাব্দের কোন এক অগ্রহায়ণ শুক্লা ষষ্ঠী (ওড়ন ষষ্ঠী) তিথিতে ঘটিয়াছে। স্বরূপ দামোদর, দাস গোস্বামী আদি পরিকরবৃন্দ স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন।

কিন্তু রঘুনাথের প্রতি এই দণ্ড বিধান—

তাৎকালীন গৌড়ের অগণিত ভক্ত সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। শত শত বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী যাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভক্তি সম্পর্কশূন্য, যাহারা বিভিন্ন ও দূর দূর গ্রামে থাকিয়া নিজ নিজ গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন, ইঁহাদের সকলকে এই 'দণ্ড' ছলে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিতাইচাঁদ সমীপে উপনীত করা হইয়াছিল। তাহার পরই 'নিতাই দর্শন' এবং 'নিতাই গৌরের করুণামৃত' তাঁহারা হেলায় প্রাপ্ত হইলেন। ফলে তাহাদের জন্ম জন্মান্তরের তাপ কালিমা দূর হইয়া গেল।

শ্রীল রঘুনাথদাসকে নিতাই সোনার আনুগত্য ও অগণিত বৈষ্ণব সেবার সুযোগ দান করা হইল। এই ঘটনা ১৪৪০ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে আর আষাঢ় মাসে রথযাত্রার পূর্ব্বে গৃহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রঘুনাথ নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ লাভ করেন।

আবার এই দণ্ডকে উপলক্ষ করিয়াই ভাবী কালের জীবের জন্য শ্রীনিত্যানন্দ আনুগত্যই যে সাধনার পথ, তাহা উন্মুক্ত করা হইল এবং আচরণ দ্বারাও তাহা প্রচারিত হইল।

এ যুগের সাধন কি ?

কলি জীব মাত্রেই গৌরহরির করুণা রাজ্যের বাসিন্দা। তিনি নিজ প্রয়োজনেই বুঝি কলিজীবকে অপ্রাকৃত প্রীতিরসে মজ্জিত করিয়াছেন। সেই অপ্রাকৃত প্রেমধন বিচার বুদ্ধির অলক্ষেই তাহাদিগকে দান করা হইয়াছে। এই প্রাপ্ত বস্তুর 'বোধ' ও 'সংরক্ষণই' এ যুগের সাধন।

(৪)

দণ্ড মহোৎসব ও গৌর আবির্ভাব ঃ

"দধি চিড়া ভাল মতে খাওয়াও মোর গণে"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

এই সু-রসাল দণ্ড শ্রবণে রঘুনাথ আনন্দে আত্মহারা হইলেন। মহোৎসব পূর্ণ করিবার জন্য বিপুলভাবে আয়োজনের আদেশ দিলেন। উচ্চ আনন্দ কোলাহলে শত শত লোক চিড়া, দধি, দুগ্ধ, কলা, গুড়, সন্দেশ ও মালসা প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য ছুটিলেন।

"শাসনকর্ত্তার অপূর্ব্ব দণ্ড"

"দণ্ডাদেশ পালনে শ্রীরঘুনাথের সোল্লাস অনুমোদন" বিদ্যু গতিতে এই অদ্ভুত ও অশ্রুতপূর্ব্ব দুইটি বার্ত্তা প্রায় সমস্ত সপ্তগ্রাম মুলুকে ছড়াইয়া পড়িল।"

অল্প সময়ের মধ্যেই চতুর্দ্দিক হইতে গ্রামের পর গ্রামের লোক

'ভিড়' করিয়া ভারে ভারে চিড়া দধি দুগ্ধ গুড় কলা ও মালসা * এবং রঙ্গ দেখিবার জন্য বালক-বৃদ্ধ-পুরুষ-নারীর জনপ্রবাহ পাণিহাটি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল।

"মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গমন॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

শত শত কলসে দুগ্ধ, শত শত ভারে দধি, স্তূপে স্তূপে চিড়া, ভারে ভারে গুড়, কান্দি কান্দি কলা এবং শত সহস্র মালসা সেই গঙ্গাতীরের বটবৃক্ষমূলে (অদ্যাপিও সেই বটবৃক্ষ বর্ত্তমান) আনিয়া উপস্থিত করিল। দ্রব্য সম্ভারের মধ্যে চিড়া দুই ভাগ করা হইল। সেই চিড়া একভাগ ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধে ভিজান হইল অপর ভাগ দধিতে। পরিমাণ মত কলা ও গুড় মিশ্রিত করিয়া শত শত মালসায় ভরিয়া রাখা হইল।

ইতিমধ্যে অগণিত জন সমাবেশ ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল বর্ণের বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী নিতাইচাঁদ ও তাঁহার পরিকরবৃন্দকে সর্ব্বদিক হইতে বেষ্টন করিয়া জলে ও স্থলে আশ্চর্য্য উন্মাদনায় চঞ্চল ও উল্লাসময় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। কৌতুকী দৃষ্টিতে নিতাইচাঁদ স্মিতহাস্যে সকলের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিলেন।

আদেশ হইল প্রত্যেককে এক মালসা দধি চিড়া ও এক মালসা দুধ চিড়া দাও।

মূল পরিবেশক কুড়ি জন এবং তাহাদিগকে সাহায্যের জন্য শত শত স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত হইল। পিণ্ডার উপরে আটটি মালসা

* মালসা :—মাটির পাত্রে চিড়া, দধি, দুগ্ধ আদি দ্বারা যে ভোগ নিবেদন করা হয় তাহাকে মালসা বলে।

স্বতন্ত্র করিয়া সর্ব্ব প্রথমে রাখা হইয়াছে। ঐ স্থান ছাড়িয়া পিণ্ডার অপর অংশ, চবুতরা সম্মুখে বিরাট বটচ্ছায়ায় বিশাল মুক্ত প্রাঙ্গণে, ভাগ্যবতী সুরধনীর নীরে ও তীরে—উপরে বর্ণিত বিচিত্র ও বিপুল জন সমাগম প্রত্যেককে একটি দুধ চিড়ার মালসা ও অপরটি দই চিড়ার মালসা দেওয়া হইল। সকলে নিজ নিজ সম্মুখে মালসা রাখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় প্রখ্যাত রাঘব পণ্ডিত সেই স্থানে শুভ বিজয় করিলেন। দণ্ড মহোৎসবের ঘটা ও সু-গভীর তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া তিনি বিস্মিত ও আনন্দে আত্মহারা হইলেন। ঐ দিন নিতাইচাঁদের 'রাঘব ভবনে' মধ্যাহ্ন ভিক্ষার দিন স্থির ছিল। সেই উপলক্ষে তিনি নিতাইচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "অবধূত! কি ব্যাপার? তুমি না আজ আমার বাড়ীতে মধ্যাহ্ন কর্‌বে? সেখানে প্রসাদ প্রস্তুত। ভুলে গেছ না কি?" নিতাইচাঁদ রাঘব দর্শনে অধিক উল্লসিত হইলেন। মধুর হাসিয়া বলিলেন, "দেখ রাঘব! আমি ও আমার সঙ্গীগণ সকলে 'গোপ'। পুলিন ভোজনেই আমাদের পরমানন্দ। তুমিও এসেছো, খুব ভাল হয়েছে। তুমি আমাদের সাথে পুলিন ভোজনে যোগ দাও। তোমার বাড়ীর প্রসাদ রাত্রে গ্রহণ কর্‌ব।" এই বলিয়া তাঁহার জন্যও দুইটি মালসা আনাইলেন।

কোন কিছু ভাল হইলেই স্বভাবতই নিজ প্রিয়জনকে তাহার অংশ দিতে সকলেরই প্রাণে বাসনা জাগে। নিতাইচাঁদেরও জাগিল—আজিকার এই পুলিন ভোজনে এই জনগণের অনাস্বাদিত আনন্দ-তরঙ্গ এ ভাবে কখনও হয় নি। ভবিষ্যতে কি হইবে সে বিবেচনার প্রয়োজন নাই। এ ব্যাপারে আমার প্রাণ-রমণ সচল-জগন্নাথ গৌরহরিকে অবশ্যই আনিব। তিনি ধ্যানস্তিমিত নেত্রে স্থির বদ্ধাসনে বসিয়া নীলাচল বিহারী গৌরহরিকে প্রাণে প্রাণে আকর্ষণ করিলেন।

'একবার এস হে
এস আমার প্রাণ গৌর একবার এস হে
তোমার রঘুনাথের দণ্ড মহোৎসবে একবার এস হে
একবার এস হে'

"ধ্যানে তবে প্রভু, মহাপ্রভুরে আনিল।
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিল।"

—চৈঃ চঃ

'আর কি প্রভু রইতে পারে
নিতাই ডেকেছে তারে আর কি প্রভু রইতে পারে'

তারে লৈয়া সবার চিড়া দেখিতে লাগিল।।
"সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া এক এক গ্রাস্।
মহাপ্রভুর মুখে দেয় করি পরিহাস॥"

তখন "হাসি প্রভু আর এক গ্রাস লৈয়া।
'একলা খেতে ভাল লাগে না
বলে খাও নিতাই সোনা একলা খেতে ভাল লাগে না'
তার মুখে দিয়া খাওয়ান হাসিয়া হাসিয়া"

'এই মত নিতাই বেড়ায় সকল মণ্ডলে'
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥*

'কেউ জানতে পারে না
কি করিয়া বেড়ায় নিতাই কেউ জান্‌তে পারে না'

---

* জলে স্থলে বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী যে যেখানে ছিল প্রত্যেকের নিকট—

"কি করিয়া বেড়ায় ইঁহো কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে ॥"

যাঁরে দেখা দেন কৃপা করে
সেই তাঁরে দেখতে পারে যারে দেখা দেন কৃপা ক'রে
মহাপ্রভুর দর্শন পান কোন ভাগ্যবানে।

(প্রেমনেত্রের বিকাশ না হইলে এ সব প্রত্যক্ষ হয় না। রাঘব পণ্ডিত আদি যাঁহারা চিহ্নিত পরিকর তাঁহারা সকলেই গৌর আগমন প্রত্যক্ষ করিলেন।)

অলৌকিক শক্তির প্রভাবে চতুর্দ্দিকের সমবেত জনতা মুহুর্মুহু জয়, জয় ধ্বনি দিতে লাগিল।

এই লীলা অন্তে নিতাইচাঁদ গৌরাঙ্গ সুন্দরকে সঙ্গে লইয়া চবুতরা উপরে উঠিলেন। সেখানে পূর্ব্বেই আটটি মালসা স্থাপন করা হইয়াছে। গৌরসুন্দরকে নিজ দক্ষিণে বসাইয়া চারটি মালসা তাঁহাকে দিলেন ও বাকী চারটি নিজের সামনে রাখিলেন। তাহার পর চতুর্দ্দিকে অবস্থিত জনসমুদ্রের প্রতি আর একবার শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া সকলকে প্রসাদ গ্রহণের আদেশ দিলেন। গৌরহরির নিজ জন যাঁহারা তাঁহারা সকলেই প্রচ্ছন্ন লীলাটি মানস নেত্রে প্রত্যক্ষ করিলেন। এবং সমবেত অগণিত জনসমুদ্র তাঁহাদের প্রাণের স্বাভাবিক প্রেরণাতেই মুহুর্মুহু 'নিতাই' 'গৌরের' জয় দিতে দিতে পুলিন ভোজন করিতে লাগিলেন।

ভাগ্যবান রঘুনাথদাস অবনত দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া অঝোর নয়নে ঝরিতেছেন। তিনি পুলিন ভোজনে বসেন নি। আচমনান্তে নিতাইচাঁদ—

'চারি কুণ্ডার অবশেষ রঘুনাথে দিল'

পরম দৈন্যে তিনি (রঘুনাথ) তাহা গ্রহণ করিলেন।

ব্রজভূমির পুলিন ভোজন কৃষ্ণ বলরামের নিত্য সিদ্ধ পরিকর-বৃন্দের মধ্যেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। আর এই পুলিন ভোজন?

ইহা হইল অগণিত জন সাধারণের সঙ্গে। যাহারা কামিনী ও কাঞ্চনের নফর, সু-মন্দ, মন্দমতি ও ভক্তিহীন কলিজীব তাহারা সকলে আজ পুলিন ভোজনের সহচর। এ কারুণ্য ব্রজলীলার প্রকাশ পায় নাই।

"প্রেমধন দান করি বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী
খণ্ডাইব সবাকার দুঃখ।"

গৌরহরির এই সার্থক করুণাবাণী প্রভু নিতাই মাধ্যমেই আচরিত ও প্রকাশিত হইল।

দণ্ড মহোৎসবের রাত্রিতে

'নিতাই নর্ত্তনে', 'রাঘব ভবনে', 'শচীমার রন্ধনে' ও 'শ্রীবাসের অঙ্গনে' এই চারিটি স্থানে নিগম-নিগূঢ় অবতার গৌরগুণমণির নিত্য অবস্থান।

সন্ধ্যা সমাগমে রাঘব ভবনে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। অতি গূঢ় চাঁদনিতাই প্রথমে তাঁহার পার্ষদ ও ভক্তবৃন্দকে নৃত্য করাইলেন, তারপর নিজে নৃত্য করিলেন। যথা—

'রাঘব মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল।
ভক্তগণে নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায়॥"

(তাঁহার) সেই অনির্ব্বচনীয় ঘটনা দর্শনে রঘুনাথ কৃত-কৃতার্থ হইলেন।

সু-মধুর নৃত্য অন্তে নিতাইচাঁদ কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি গৌরহরির জন্য নিজ দক্ষিণে একটি আসন এবং পার্ষদ ও ভক্তবৃন্দকে যথাযোগ্য আসনে বসাইয়া ভোজন লীলারঙ্গে রত হইলেন। মহাপ্রভু শুভাগমন করিয়া আসনে

[illegible] ইহা দর্শন করিয়া রাঘব পণ্ডিত [illegible] আনন্দিত [illegible]। শাল্যন্ন, বিবিধ ব্যঞ্জন, নানা প্রকার পিঠা, পায়েস, আম ও [illegible] দুগ্ধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি বহু প্রকারের উপাদেয় [illegible] পরম পরিপাটির সহিত রাঘব স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া দুই ভাইকে পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। ভক্তবৃন্দকেও আকণ্ঠ ভোজন করাইলেন। রাঘব পণ্ডিত দুই ভাইকে (নিতাই গৌর) মালা পরাইয়া শ্রীঅঙ্গ চন্দন চর্চ্চিত করিলেন। বিড়া (পান) খাওয়াইলেন ও চরণ বন্দনা করিলেন। ভক্তবৃন্দেরও অনুরূপ পরিচর্য্যা করিলেন।

'রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথ উপরে'

নিতাই গৌরের সু-দুর্লভ অবশেষ পাত্রটি রঘুনাথকে দিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ! গৌরসুন্দর স্বযং এখানে আবির্ভূত হইযা প্রসাদ গ্রহণ করিযাছেন। আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি তাঁহাব সেবার এই অবশেষ তোমাকে দিলাম। তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার (গৌর-হরির শ্রীচরণ প্রাপ্তির বাধক) সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইল।

(বাস্তবিক তাহাই হইযাছিল। এই ঘটনা ১৪৪০ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীতে। রঘুনাথ এবার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কবিযা পাঁচ দশ দিনের মধ্যেই গৃহত্যাগ পূর্ব্বক নীলাচলে পলাযনেব সুযোগ পাইয়াছিলেন।)

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে 'পাণিহাটি' গ্রাম, সেই 'জাহ্নবী' এবং সেই 'বটবৃক্ষ' অদ্যাপি বর্ত্তমান।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥"

ত্রিকাল সত্য 'দণ্ড মহোৎসব' লীলাটি অনুভূতি স্মৃতির গোচরে আনিবার জন্য আজও সেই পাণিহাটি গ্রামে জাহ্নবীতটে বটবৃক্ষমূলে

পানিহাটি গ্রামে গঙ্গা-তটে প্রখ্যাত বটবৃক্ষ

অনুষ্ঠিত হয়। জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আজও বৈষ্ণব সাধু, ভক্ত, সুধীবৃন্দ সমাগত হইয়া দাস গোস্বামীর 'দণ্ড মহোৎসবে' যোগদান করিয়া ত্রৈকালিক সত্যের মহদনুভূতি লাভ করেন।

(নামময় জীবন শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দ হইতে প্রতি বৎসরই পাণিহাটিতে এই উৎসবে বহু গোস্বামী সন্তান এবং অগণিত ভক্তবৃন্দের সহিত কীর্ত্তন করিয়াছেন। আজও অগণিত ভাগ্যবান যাঁহারা সেই স্মরণ মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেরই অনুভব আছে যে ঐ দিন সু-মধুর লীলাটি যেন প্রকট হইত।)

নিতাইচাঁদের আশীর্ব্বাদ

দণ্ড মহোৎসবের পরের দিন। প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিয়া নিতাইচাঁদ স্বপরিকরে বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া আছেন। এবং রাঘব পণ্ডিতও সেখানে উপস্থিত আছেন। রঘুনাথ সেখানে আসিয়া দৈন্য প্রণতি জ্ঞাপন করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। রাঘব পণ্ডিত পূর্ব্ব দিনের পুলিন ভোজনের স্মৃতিকথারই আলাপনের দ্বারা রঘুনাথকে পরম আত্মীয়ের ব্যবহার ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। ভক্তির স্বভাবে রঘুনাথের সর্ব্বদাই অভাব বোধ। তিনি নিজেকে দীন হীন ও সকলের দয়ার পাত্র ও সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য বোধ করেন। তিনি সবিনয়ে রাঘব পণ্ডিতের সমীপে নিবেদন করিলেন, আপনার কৃপানুমতি পাইলে 'এ দাস' প্রভু নিতাইয়ের শ্রীচরণে নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করে। মধুর হাসিয়া অবধূত নিতাই অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ সজল নয়নে গদ্গদ্ ভাষে বলিলেন—

"তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা করিলে তাঁরে, অধমেও পায়॥"

"মোর মাথে পদ ধরি, কর আশীর্ব্বাদ।
'নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাও' কর আশীর্ব্বাদ॥"

পরম গম্ভীর নিতাই গুণমণি সজল নেত্রে অপলক দৃষ্টিতে রঘুনাথের শ্রীবদন দেখিতে লাগিলেন। রঘুনাথের নিবেদন এখনো শেষ হয় নাই। তিনি পুনরায় বলিতেছেন—

"অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয় পাঙ চৈতন্য চরণ॥
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভু সিদ্ধ নয়॥

যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই জন রাখেন বান্ধিয়া॥"

মুখের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই মনের আবেগে রঘুনাথ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

পরম করুণ নিতাইচাঁদ সহাস্য মুখে নিজ পার্ষদবৃন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—

'প্রেমধনে ধনী হইলে মায়ার সৃষ্ট নিখিল পদার্থে স্বাভাবিক অরুচি জন্মে'—তারই প্রতিমূর্ত্তি ঐ রঘুনাথ। এই রঘুনাথের মাতা পিতা আদর্শ গৃহী। এঁদের জাগতিক বৈভব অতুলনীয়। এই সব বস্তুকে মলমূত্রবৎ ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ লাভের জন্য ইহার প্রাণ ব্যাকুল। রঘুনাথের গৃহ হইতে পলাইবার চেষ্টার কথা তোমরা শুনিয়াছ। গৌরাঙ্গ প্রেমের 'সচল' মূরতি এই

রঘুনাথ—প্রাণভরে দেখে নাও। রঘুনাথ নাম ধরে ঐ সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

নিতাইচাঁদের এই সব আনন্দ উচ্ছ্বাসের কথায় রঘুনাথ মর্ম্মে মর্ম্মে লজ্জিত হইলেন। নিতাইচাঁদ এইবার রঘুনাথকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—

'তুমি করাইলে এই পুলিন ভোজন

ইহা পরম মঙ্গল মহৎ সেবা নির্হেতুক কৃপাকারী গৌরহরি সেই উৎসবে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্নে পুলিনে চিড়া দুধ ও দই চিড়া এবং রাত্রে (ঐ) রাঘবের ভবনে প্রসাদ অঙ্গিকার করিয়া তোমাকে তাহার অবশেষ দিয়াছেন। এর পরও তোমার আবার উদ্ধারের প্রার্থনা? নিশ্চিন্তে এখন বাড়ী যাও।

"'অচিরে' 'নির্ব্বিঘ্নে' পাবে চৈতন্য চরণ॥"

গৌরহরি তোমাকে 'স্বরূপের' আনুগত্যে নিজ অন্তরঙ্গ সেবা সৌভাগ্য দান করিবেন।

নিতাইচাঁদের হৃদকর্ণ রসায়ন আশীর্ব্বাদ বাণী শ্রবণ করিয়া রঘুনাথ পুলকিত ও গম্ভীর হইলেন। সকলের চরণ বন্দনা করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। পুনরায় তাঁহাদের শ্রীচরণে নীরব প্রার্থনা জানাইয়া ধীরে গৃহের পথে পা বাড়াইলেন।

কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর গৌরহরি বৃন্দাবন যাইবার জন্য যে উন্মাদ চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছিলেন; আজ নিতাইচাঁদের কৃপা আশীর্ব্বাদে রঘুনাথের সেইরূপ নীলাচলে গৌরসুন্দরের শ্রীচরণ প্রাপ্তির জন্য উন্মাদ চেষ্টা প্রকাশ পাইল। ফলে, অঝোর নয়নে, স্খলিত চরণে, মুখে নিরন্তর—হা নিতাই! হা গৌর! কৃপা কর বলিতে বলিতে বাড়ীর পথে চলিলেন।

নিতাই মদির পানে—

দ্বিতীয় বার শান্তিপুরে গৌরহরিকে দর্শন করিয়া যে রঘুনাথ বাড়ী ফিরিয়াছিলেন, আর এবার 'নিত্যানন্দ' দর্শন করিয়া সেই রঘুনাথই বাড়ী ফিরিয়াছেন কিন্তু একই রঘুনাথের ভিন্নাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

রঘুনাথের মাতা. পিতা, স্ত্রী. দাস দাসী সকলেই তাঁহার পাণিহাটি গমন জনিত এই কয়দিন কেবল রঘুনাথের গুণ ও ধীর গম্ভীর মধুর স্বভাবের কথাই আলাপ করিতেছিলেন। এবং তাঁহারা আশা পোষণ করিতেছিলেন যে তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় রঘু সত্বর পরমানন্দে ফিরিতেছেন।

রঘুনাথ সত্বর ফিরিয়াছেন। তাঁহাদের প্রাণ রঘুনাথ বাড়ী ফিরিয়াছেন কিন্তু এ কি? তাহার বেশভূষা ছিন্নভিন্ন, ধূলি ধূসরিত, মস্তকের চুল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, চোখে জলের শুষ্ক রেখা।

হিরণ্য গোবর্দ্ধন ও তাঁহাদের পরিজনবর্গ সকলেই ব্যাকুল হইলেন। কাহারও মুখে কথা আসিতেছে না। সকলেই ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া রঘুনাথের নিকট আসিয়া বার বার দেখিতে লাগিলেন। ইহাদের এই ব্যাকুলতায় রঘুনাথ কোন রূপে নিজেকে সংযত রাখিয়া ব্যাকুলস্বরে বলিলেন, আমাকে বাহিরে থাকিতে দিন্। রঘুনাথ দুর্গা মণ্ডপেই আশ্রয় লইলেন।

"সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করে গমন।
বাহিরে দুর্গা মণ্ডপে করেন শয়ন॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

ভুবন পাবন শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপা কটাক্ষ পাইবার পর হইতেই রঘুনাথের বৈরাগ্য ও বাড়ী হইতে বার বার পলায়নের চেষ্টা তাঁহার মাতা পিতার সু-পরিচিত। কিন্তু এইবারের চেষ্টা দেখিয়া

আর তাহার নির্জ্জন বাসের আচরণ দেখিয়া মাতা পিতা ও পত্নীর মনে অন্যরূপ ধারণা হইল। রঘুনাথ গৌরবিরহে বিলাপ ও প্রলাপ করিতেছেন। পলায়নের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে বাতুল চেষ্টা করিতেছেন। এইবার বোধহয় সুনিশ্চিত বিপদ আসিতেছে অনুমান করিয়া রঘুনাথের মাতা পিতা ও পত্নী অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় ও দুঃখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার অঞ্চলের ধন, নয়নমণি যে কোন মুহূর্ত্তে হয়তো চিরদিনের জন্য পলায়ন করিবে। স্নেহময়ী জননী এই চিন্তায় অর্দ্ধ পাগলিনী হইলেন। তিনি একদিন স্বামীকে বলিলেন—

"রঘু বাতুল হইয়াছে। নচেৎ কি এত সুখ ভোগ ছাড়িয়া অনাহারে অনিদ্রায় দুর্গামণ্ডপে পড়িয়া থাকে? এবং পলাইতে চায়? তাহাকে কিছুদিন পট্টডুরি দিয়া হাতে পায়ে বান্ধিয়া রাখ। সে পলাইলে আমি প্রাণে বাঁচিব না।"

স্ত্রীর ঐ করুণ বিলাপ শুনিয়া গোবর্দ্ধনের দুঃখ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে রঘুনাথ এখন তাঁহাদের আয়ত্তের বাহিরে। তিনি সখেদে জবাব দিলেন—

"অপ্সরাসম নারী, ইন্দ্র সম বৈভব যাহাকে বাঁধিতে পারিতেছে না, সামান্য দড়ি তাহাকে কিরূপে বাঁধিবে? রঘুনাথ যে সে পাগল নয়। পাণিহাটিতে অবধূত নিতাই ইহাকে অতি উগ্র গৌরাঙ্গ প্রেম মদিরা পান করাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে আটক রাখে।

'চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্য প্রভুর বাউল কে রাখিতে পারে?'

গৃহীর পুত্র সুখের মত বিষয় সুখ আমাদের ভাগ্যে আর নাই। আমরণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন যাইবে। তবে যতক্ষণ রঘুনাথ আমাদের

কাছে আছে ততক্ষণ রঘুনাথকে গৃহে আবদ্ধ রাখিবার সব চেষ্টাই আমরা করিব।

সেই দিন হইতে প্রহরীর সংখ্যা বাড়াইলেন। প্রহরীর দল দিবারাত্র পালা করিয়া প্রহরা দিতে লাগিল। ওদিকে রঘুনাথ নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া গৃহ হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টায় রত থাকিলেন।

পঞ্চম তরঙ্গ

সংসার শৃঙ্খল মোচন ঃ

রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ করিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ 'সচল জগন্নাথ' দর্শনের লালসায় প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন—

'প্রতি বর্ষে আইসে, সঙ্গে রহে চারিমাস।
তাঁহা সভা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস॥'

—চৈঃ চঃ মধ্য ১ম

ব্রজরামাগণের কৃষ্ণভাবনাময় চিত্ত, আর গৌরপরিকরদের গৌরভাবনাময় চিত্ত। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নিরন্তর গৌরনাম, গৌরের রূপ গুণ লীলা প্রসঙ্গ বা শ্রীহরি সংকীর্ত্তনের জনক শ্রীগৌরহরির নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পরমানন্দে গৌড়দেশ হইতে পদযাত্রা করিয়া সুদূর নীলাচলে যাইতেন।

রঘুনাথ মনে মনে স্থির করিলেন—'আর না এইবার রথযাত্রায় অবশ্যই নীলাচলে যাইব। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সঙ্গে যাইতে পারিলে পরমানন্দ হয়। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যে সে আশা নাই।' তাই তিনি মনে মনে গম্ভীরার গুপ্তনিধি গৌরহরির শ্রীচরণে নিবেদন জানাইলেন—হে প্রাণনাথ! হে কৃপানিধি! হে পরম করুণ। তোমার নিতাই সোনার আশীর্ব্বাদ বাক্য সফল কর। তিনি তো বলিয়াছেন—

"'অচিরে' 'নির্ব্বিঘ্নে' পাবে চৈতন্য চরণ"

পানিহাটি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রঘুনাথের নিদ্রা নাই।

দিবারাত্র গৌর-বিরহে, অনাহারে, অনিদ্রায় কখনও কখনও উচ্চৈস্বরে কখনও বা ধীরে ধীরে 'হা গৌর! প্রাণ গৌর! আর কতদিনে কৃপা হবে' বলিয়া হায় হায় করিয়া নিরন্তর ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছেন। রঘুনাথের দশা দেখিয়া তাঁহার পিতা মাতা ও স্ত্রীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এমন কি রক্ষীগণও তাঁহার সহিত কাঁদিয়া আকুল হইতেছে।

একদা তিন প্রহর রাত্রি অতীত হইল। তখনও রঘুনাথ কাঁদিয়া জাগিয়া রাত্রি কাটাইতেছেন। রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া আসিল। রক্ষীরা রঘুনাথকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু, রঘুনাথের তীব্র ব্যাকুলতায় তাহারাও কাঁদিতে লাগিল। প্রভাত হইতে প্রায় চারদণ্ড কাল বাকী, এমন সময় হঠাৎ দুর্গা মণ্ডপের আঙ্গিনায় এক ব্যক্তি স্নেহ মধুর কণ্ঠে ডাকিলেন—

'বাপ্ রঘুনাথ।'

সুপরিচিত স্বর শ্রবণে রঘুনাথ চমকিত হইলেন। নিজের মনের ভাব প্রশমিত করিয়া দুর্গা মণ্ডপের বাহিরে অঙ্গনে আসিলেন। দেখিলেন তাঁহার দীক্ষা-গুরু।

সম্মুখে শ্রীগুরু মূর্ত্তির দর্শনলাভ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণতি করিলেন। আদেশের অপেক্ষায় করযোড়ে নতমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রঘুনাথের দীক্ষাগুরু শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য মহাশয়, নিশান্তে অকস্মাৎ কেন দর্শন দিতে আসিলেন? রঘুনাথের ব্যাকুল হৃদয়ে কত প্রশ্ন জাগিল। ঘটনাটি—

'আজ কয়দিন হইল আচার্য্য মহাশয়ের ঠাকুর সেবার ব্রাহ্মণ সেবাকার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি এই কয়দিন অন্যান্য পূজারী দ্বারা তাঁহার নিত্য ঠাকুর সেবার কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। সে সেবা তাঁহার মনঃপুত হইতেছে না। সুতরাং প্রাক্তন ব্রাহ্মণ সেবককেই তিনি পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার মনের আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস যে রঘুনাথ অনুরোধ করিলে উক্ত সেবক (ব্রাহ্মণ) তাহার বাক্য অবশ্যই

রক্ষা করিবে। ঐ ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে অন্যত্র কাজে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাহার সহিত রঘুনাথের সাক্ষাৎ বাঞ্ছনীয়। এই কারণেই তিনি একটু রাত্রি থাকিতেই রঘুনাথের নিকট আসিয়াছেন।

রঘুনাথ ধীর ও স্থির হইয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে উপরোক্ত বিবরণ শুনিলেন। রঘুনাথের রক্ষীগণও অদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া সব শুনিলেন। ইত্যবসরে রঘুনাথ শ্রীগুরুদেবের সহিত যেন আলাপ করিতে করিতে প্রাঙ্গণ হইতে রাস্তায় নামিলেন। গুরু শিষ্য উভয়েই উক্ত ব্রাহ্মণ সেবকের বাড়ী অভিমুখে স্বচ্ছন্দ গতিতে রওনা হইলেন।

রক্ষীগণ রাত্রি জাগরণে ক্লান্তও হইয়াছিল, সেইজন্য তাহারা জানে আর অল্পক্ষণ পরেই দিবাভাগের রক্ষীরা কার্য্যে যোগ দিতে আসিবে। রাত্রির প্রহরীরা সারা রাত্রি রঘুনাথের হৃদয়-বিদারক বিলাপ শুনিয়াছে। রাত্রির অবসান হইতে দেরী নাই। শ্রীগুরুদেবের আগমনে ও সঙ্গ প্রভাবে এবং বিষয়ান্তরের অভিনিবেশে রঘুনাথকে এখন স্বাভাবিক ও প্রফুল্ল দেখা যাইতেছে। আচার্য্য মহাশয় রঘুনাথের সঙ্গে আছেন। তিনি নিজ কার্য্যে রঘুনাথকে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তিনি অবশ্যই রঘুনাথকে এই দুর্গা মণ্ডপে রাখিয়া যাইবেন। ইহাদের সঙ্গে আমাদের যাওয়া অশোভন। এইরূপ বিবেচনা করিয়া রক্ষীদের কেহই রঘুনাথের সঙ্গে গেল না। স্বাভাবিক ক্লান্তিতে সেইখানেই তাহারা অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী। আবার আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী ছাড়িয়া আরও কিছুটা পূর্ব্বে গেলে উক্ত ব্রাহ্মণ সেবকের বাড়ী। গুরু শিষ্য আলাপ করিতে করিতে শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্যের বাড়ীর নিকট আসিলে পর অতি বিনয় দৈন্যে রঘুনাথ বলিলেন—"শ্রীগুরুদেব! এ আর এমন কি কাজ? আমাকে আজ্ঞা দিন এবং আপনি স্বচ্ছন্দে বাড়ী গিয়া নিত্য কর্ম্ম সমাপন

করুন।” আচার্য্য রঘুনাথের বাক্য সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করিয়া রঘুনাথকে আজ্ঞা দিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রঘুনাথের মন ও প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ‘জয় গৌর’ ‘জয় নিতাই’ ধ্বনি দিতে দিতে ভাবিলেন—এই ত দেখিতেছি প্রাণ গৌরের সেই কৃপাবাণী—

‘সে ছল সে কালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে’

—আজ সফল হইল। আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর আসিয়াছি। আবার প্রহরী মুক্তও। এই সুযোগ। ইহার সুব্যবহার করিতে হইবে। তখনও প্রভাত হয় নাই। আঁধার রহিয়াছে। দুই একটি পাখী জাগিয়া উষা আগমনের সূচনা করিতেছে মাত্র। নগরে তখনও কেহ জাগে নাই। পথ জনশূন্য। রঘুনাথ দ্রুতগতিতে পূর্ব্ব মুখেই চলিলেন।* তাঁহার মুখে ভগ্নস্বরে ‘হা নিতাই! হা গৌর! রক্ষা কর।’ কেবল এই মধুর শব্দ সকল উচ্চারিত হইতেছে আর চক্ষে অবিরল ধারা। শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ পাইবার উন্মাদ ব্যাকুলতায় তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন। মাঝে মাঝে এক বার বলিতেছেন—

‘হা গদাধর কূল দাও’
‘সীতানাথ বল দাও’

নিজ প্রহরী হস্তে ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া সমান বেগেই ছুটিয়া চলিয়াছেন। পথ বিপথ দৃষ্টি নাই। অনুসন্ধান নাই। জল জঙ্গল তৃণ কণ্টক প্রভৃতির উপর দিয়া গৌর-প্রেমে-উন্মত্ত-উৎকণ্ঠিত রাজপুত্র রঘুনাথ মুক্ত চরণে ছুটিয়া চলিয়াছেন।

* এই গমন পথে, শ্রীগুরুদেবের ব্রাহ্মণ সেবককে কার্য্যে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কি না তাহা গ্রন্থে উল্লেখ নাই। আদর্শ চরিত শ্রীরঘুনাথ সম্ভবতঃ তাহা করিয়াছিলেন।

"অতি উৎকণ্ঠিত মন উন্মত্তের প্রায়।
দিগ্বিদিক ফিরি বুলে গ্রাম না তাকায়॥
জল জঙ্গল তৃণ কণ্টক কঙ্করা—
নাহি মানে, ধায় মাত্র, বাতুলের পারা।"

—ভক্তমাল

'অনর্পিত-অর্পণ লীলায়' 'গৌর-প্রেম' রক্ষার আদর্শ 'আধার' রঘুনাথের এই গমন যেন রাস রজনীতে কৃষ্ণকান্তাদের বাতুল গমন ভঙ্গীর সঙ্গে সাদৃশ আছে।

এই ভাবে গৌর-বিরহ-পাগল রঘুনাথ পনের ক্রোশ পথ চলিয়া সন্ধ্যাকালে পথে এক গোয়ালার গো-বাথানে উপস্থিত হইলেন।

"পঞ্চদশ ক্রোশ চলি গেলা এক দিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিল এক গোপের বাথানে॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

পরম সুকৃতিবান সেই গোপ জনগণ-মনলোভা রঘুনাথকে শ্রান্ত ক্লান্ত ও উপবাসী দেখিয়া অপত্যস্নেহেই অশেষ বিশেষ অনুরোধ পূর্ব্বক তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইলেন। ঐ গোপের একান্ত অনুরোধে তাহাকে কৃতার্থ করিয়া সে রাত্রি ঐ গোয়াল ঘরেই যাপন করিলেন। 'যে কোন মুহূর্ত্তে হয় তো বা নিজ রক্ষীদের হাতে ধরা পড়িব'—এই ভয়, রঘুনাথের মনকে চঞ্চল করিতে লাগিল। তিনি সমস্ত রাত্রি নিতাই গৌরের গুণ ও কৃপা স্মরণ পূর্ব্বক কাঁদিয়া জাগিয়া অতিবাহিত করিলেন।

রঘুনাথের অদর্শনে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের ভবনেঃ

এ দিকে অরুণোদয়ের পর দিবাভাগের প্রহরীরা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে রাত্রির প্রহরীরা অবসন্ন দেহে নিদ্রামগ্ন।

দুর্গামণ্ডপ গৃহে রঘুনাথ নাই। তাহারা রাত্রির প্রহরীদের জাগাইল। তাহাদের মুখে রঘুনাথ ও তাঁহার শ্রীগুরুদেবের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া কয়েকজন প্রহরী সর্ব্বপ্রথমে ছুটিয়া আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী গেল। রঘুনাথের অনুসন্ধান রত প্রহরীদের দেখিয়া আচার্য্য যদুনন্দন নিজেকে বিব্রত বোধ করিলেন। তিনি বিস্মিত হইয়া রক্ষীদের বলিলেন—'সে কি? রঘুনাথ এখনো বাড়ী যায় নাই?' রক্ষীরা সেখানে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দুর্গামণ্ডপে ফিরিয়া আসিয়া "রঘুনাথ পলাইয়াছে" এই নিদারুণ সংবাদ অন্যান্য রক্ষীদের জানাইল।

এ ধারে শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যও রঘুনাথের জন্য চিন্তিত হইয়া গোবর্দ্ধনদাসের বাড়ীতে আসিলেন। রঘুনাথের জন্য তিনি নিজেকে দোষী মনে করিলেন। অমল চরিত বাসুদেব দত্তর সঙ্গ প্রভাবে তিনিও একজন 'গৌর-অনুরাগী ভক্ত'; নিজ শিষ্য রঘুনাথের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। গৌর-ভক্ত স্বভাবে তিনি ব্যাকুল প্রাণে সজল নয়নে মনে মনে শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে নিবেদন করিলেন—

'হে দীন দয়াল! হে স্বভাব করুণ! এবার নির্ব্বিঘ্নে (তোমার) রঘুনাথকে শ্রীচরণে স্থান দিয়া আমাকে বিনামূল্যে কিনিয়া নাও।'

দিবা ও রাত্রির উভয় রক্ষী দল শঙ্কিত হৃদয়ে হিরণ্য গোবর্দ্ধন-দাসকে "রঘুনাথ পলাইয়াছে" এই ভয়ঙ্কর সংবাদটি জানাইল। তাহাদের সকলের মুখ ভয়ে শুষ্ক, চক্ষে জল।

গম্ভীর আশয়, বিচক্ষণ ও ধীর স্বভাব ভ্রাতৃদ্বয় গম্ভীর হইলেন। অন্য সমস্ত ভৃত্য রক্ষীদের ডাকাইয়া একত্রিত করিলেন। কয়েক-জনকে সপ্তগ্রাম নগরের মধ্যে অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। এবং নগরের দক্ষিণ দিকের পথে, যত যত গ্রাম, প্রান্তর ও জঙ্গল পড়ে সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবার উপযোগী রক্ষী, পাইক, পেয়াদা ও অশ্বারোহী পাঠাইলেন। এ দিকে অন্দর মহলে রঘুনাথের মাতা

ও স্ত্রী এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয় বিদারক করুণ ক্রন্দন করিতেছেন। তাঁহাদের দশা অবর্ণনীয়।

'রঘুনাথ দক্ষিণে যান্ নাই'। সুতরাং হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাসের বিচক্ষণ পাইক পেয়াদা সকলে অনুসন্ধান করিয়া বিফল হইল। ভগ্নমনোরথে একে একে সকলে ফিরিয়া আসিযা নতমুখে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

ওদিকে নীলাচলের পথে গৌবপ্রেমেব পাগল গৌডেব ভক্ত-বৃন্দের দল যে রথযাত্রাব উপলক্ষ করিয়া গৌবাঙ্গ দর্শনে যাত্রা করিয়াছেন সে সংবাদ হিরণ্য গোবর্দ্ধন জানেন। তাঁহাদের প্রধান পরিচালক প্রখ্যাত সেন শিবানন্দেব নিকট একখানি অতি বিনয় পূর্ণ চিঠি সহ দশজন অশ্বারোহী রক্ষী তৎক্ষণাৎ পাঠাইলেন। চিঠিতে বিশেষ প্রার্থনা—

"আমাদের প্রাণ, নয়নের মণি 'রঘু' যদি আপনাদের সঙ্গ লইয়া থাকে তাহা হইলে নিজ ভৃত্য জ্ঞানে কৃপাপূর্ব্বক রঘুকে (এই) রক্ষীদের সহিত ফেরত পাঠাইযা আমাদের প্রাণ রক্ষা কবিতে কৃপা আজ্ঞা হয।"

অশ্বারোহী রক্ষীদল মেদিনীপুবের অন্তর্গত ঝাকডাতে (দক্ষিণ দেশগামী পথপার্শ্বে অবস্থিত) গৌব-ভক্ত গোষ্ঠীসহ সেন শিবানন্দের সাক্ষাৎ পাইল। তিনি হিরণ্য গোবর্দ্ধনের প্রেরিত পত্র পডিয়া এবং রক্ষীদের মুখে রঘুনাথের পলায়নের বিস্তারিত সংবাদ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। 'রঘুনাথ সেন শিবানন্দের সঙ্গ লন নাই' এই সংবাদ বহন করিয়া অশ্বারোহী রক্ষীদল হিরণ্য গোবর্দ্ধনের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

হিরণ্য গোবর্দ্ধন এখন রঘুর প্রাণের আশঙ্কায় অস্থির ও অধীর হইলেন। সম্ভব অসম্ভব সর্ব্বপ্রকারের সন্দেহের বশে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। রঘুর মাতা প্রায় পাগলিনী হইয়া গেলেন।

তাঁহার স্ত্রীর ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছে। গোবর্দ্ধনদাস নিজ হৃদয়ের তাপ ও দুঃসহ দুঃখ যত্নে প্রশমিত করিয়া স্ত্রী ও পুত্রবধূর সুস্থতা বিধানের জন্য সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নীলাচলের পথে ঃ

পূর্ব্ববর্ণিত গো-বাথান হইতে প্রভাতে যাত্রা করিয়া বার দিনের দিন রঘুনাথ নীলাচলধামে প্রবেশ করিলেন।

"বার দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

গৃহত্যাগ করিয়া প্রথম দিনে তিনি পূর্ব্ব মুখে তিরিশ মাইল আসিয়াছেন। আজ দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণ মুখে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। 'ছত্রভোগ' পর্য্যন্ত রাজপথ ধরিয়া দ্রুত গমন করিলেন। তাহার পর নীলাচল-ধামের পথ ধরিয়া সর্ব্বদাই সাধারণের অব্যবহৃত রাস্তা ও কুখ্যাত গ্রামের মধ্য দিয়া তিনি গমন করিতেছিলেন।

(প্রথম দিন) পূর্ব্বদিকের পথে গমনের যে গমনভঙ্গী পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে সেই ধারাতেই বারটি দিন ও বারটি রাত্রি নিরন্তর 'হা নিতাই'! 'প্রাণ নিতাই'! 'হা গৌর'! 'প্রাণ গৌর'! 'কাছে নাও' বলিতে বলিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন। পথে জল, জঙ্গল, কণ্টক, পর্ব্বত আদি কোন দিকেই গৌরপ্রেমের উন্মাদ রঘুনাথ ফিরিয়া চান নাই। পথের কোন কষ্টই তাঁহার কষ্টকর বোধ হইতেছে না।

'পথে তিন দিন মাত্র করিল ভক্ষণ'

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

প্রথম দিন, গোপের একান্ত অনুরোধে, গো-বাথানে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। পরে উন্মাদের গতিতে গমনের পথে অযাচক ভাবে একদিন চর্ব্বন যোগ্য কিছু খাবার এবং অপর একদিন সম্ভবতঃ জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বিশেষ কোন ভাগ্যবানের অনুরোধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। খাবার জন্য রঘুনাথের কোন অনুসন্ধান বা চেষ্টাই ছিল না।

নীলাচলে গৌর-রঘুনাথ মধুর মিলন—

"দেখিয়া শ্রীমন্দির-- (রঘুনাথের) নয়নে গলয়ে নীর
হা চৈতন্য ডাকে উচ্চৈস্বরে ॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
দূর হ'তে শ্রীমন্দির দেখে— ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
(বলে) এইত এলাম নীলাচলে
প্রাণ গৌর তুমি কোথায় আছ— এইত এলাম নীলাচলে
কাঁদতে কাঁদতে চলিল রে
উপনীত সিংহ দ্বারে
হা গৌর ব'লে কাঁদতে কাঁদতে— উপনীত সিংহ দ্বারে
যারে দেখে শুধায় তারে
নীলাচল-বাসী নরনারী— যারে দেখে শুধায় তারে
ব'লে দাও নীলাচল-বাসী
তোমাদের হাতে ধরি পায়ে পড়ি— ব'লে দাও নীলাচল-বাসী
কোথা গেলে তার দেখা পাব— ব'লে দাও নীলাচল-বাসী

"যার রসে তনু ঢরঢর গৌর-কিশোরবর
নাম যাঁর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।।"

যাঁর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম
সে যে আমাদের শচীসুত গুণধাম— যাঁর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম এই নীলাচলে
আমরা ডাকি তারে শচীদুলাল ব'লে--
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম এই নীলাচলে
কোথা আছে সে ন্যাসিরতন
কেঁদে কেঁদে রঘুনাথ শুধায়— কোথা আছে সে ন্যাসিরতন
গৌর-বরণ গেরুয়া পিধন— কোথা আছে সে ন্যাসিরতন
কোথা আছে দাও বলি
গৌর বরণ যুবা সন্ন্যাসী— কোথা আছে দাও বলি
আমি তার দরশনে অভিলাষী
গৌর-বরণ নবীন সন্ন্যাসী— আমি তার দরশনে অভিলাষী
ব'লে দাও গো দয়া করি
করজোড়ে মিনতি করি— ব'লে দাও গো দয়া করি

"হা চৈতন্য ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।

কহে মুঞি আকিঞ্চন দুরাচার মন্দহীন
কাঁহা মুই রঘুনাথদাস।
'যাহার দর্শনমাত্র উলসিত সর্ব্ব গাত্র
তাঁর পদরেণু মোর আশ ।।"

একি অসম্ভব কথা—

কোন্ গুণে তার দেখা পাব
মুই দুরাচার মন্দহীন-- কোন্ গুণে তার দেখা পাব

তৈছে মোর অভিলাষ
বামনের চাঁদ ধরিতে আশ্— তৈছে মোর অভিলাষ
এত বলি গড়ি যায়
রঘুনাথদাস গোসাঞি— এত বলি গড়ি যায়
জগন্নাথের সিংহদ্বারে— এত বলি গড়ি যায়
আর কি প্রভু রইতে পারে
প্রাণের রঘু ডাকে তারে— আর কি প্রভু রইতে পারে
রঘুনাথ কাঁদে সিংহদ্বারে— আর কি প্রভু রইতে পারে
টান পড়েছে প্রাণে প্রাণে— আর কি প্রভু রইতে পারে
কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে ছিলেন নির্জনে
স্বরূপ রামানন্দ সনে— কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে ছিলেন নির্জনে
নিভৃত গম্ভীরা-ভবনে— কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে ছিলেন নির্জনে
অকস্মাৎ উঠিলেন চমকি
স্বরূপ রামরায় বলে একি একি— অকস্মাৎ উঠিলেন চমকি
কেন প্রভু চঞ্চল হ'লে
অকস্মাৎ এমন করে— কেন প্রভু চঞ্চল হ'লে
প্রাণ গৌর বলেন মধুর স্বরে
বড়ই ব্যাকুল প্রাণে— প্রাণ গৌর বলেন মধুর স্বরে
কে টান্‌ছে আমায় প্রাণে প্রাণে
জগন্নাথের সিংহদ্বার পানে— কে টান্‌ছে আমায় প্রাণে প্রাণে
আর ত রইতে নারি ঘরে
কে টানে আমায় সিংহদ্বারে— আর ত রইতে নারি ঘরে

অমনি উঠি চলিলেন গৌরহরি
অকস্মাৎ গমন দে'খে

স্বরূপ রামরায় ছুটলেন ত্বরা করে
প্রাণ গৌরহরির পিছে পিছে—স্বরূপ রামরায় ছুটলেন ত্বরা করে

(গৌর) উপনীত সিংহদ্বারে

রঘুনাথের আকর্ষণে — উপনীত সিংহদ্বারে

রঘুনাথ দেখলেন তাঁরে

দূর হ'তে দেখ্‌তে পেয়ে

রঘুনাথ নিজ পরাণ নাথে— দূর হ'তে দেখ্‌তে পেযে

কেঁদে উঠলেন দ্বিগুণ বেগে.

নয়নে দর্‌দর্‌ ধারে— কেঁদে উঠলেন দ্বিগুণ বেগে

অভিমানে আকুল হয়ে— কেঁদে উঠলেন দ্বিগুণ বেগে

এতদিনে দয়া হ'ল কি ব'লে— কেঁদে উঠলেন দ্বিগুণ বেগে

এত দিনে মনে পড়েছে ব'লে-- কেঁদে উঠলেন দ্বিগুণ বেগে

ছুটে গেলেন গৌরহরি

রঘুনাথের কাছে বাহু প্রসারি— ছুটে গেলেন গৌরহরি

প্রেমে ছলছল তুটি আঁখি— ছুটে গেলেন গৌরহরি

গৌর যান আলিঙ্গিতে

রঘুনাথ বলেন কাতরে

ভাসি তু'টি নয়ন ধারে— রঘুনাথ বলেন কাতরে

আমায় তুমি ছুঁযো না প্রভু

আমি অস্পৃশ্য বিষয়ী-সেবী— আমায় তুমি ছুঁযো না প্রভু

আমি তোমা-স্পর্শের যোগ্য নই— আমায় তুমি ছুঁযো না প্রভু

দৈন্য-ভূষণে বিভূষিত

প্রাণ গৌর-গণ যত— দৈন্য-ভূষণে বিভূষিত

এ দৈন্যে কৃষ্ণ বশ— দৈন্য-ভূষণে বিভূষিত

এ দৈন্য আর কোথায় আছে ?

আমরা গোর গৌরবে বল্‌তে পারি—

এ দৈন্য আর কোথায় আছে ?

গৌর-গণ বিনে এ জগতে— এ দৈন্য আর কোথায় আছে ?

মানিলেন না শচীনন্দন

রঘুনাথের কোন বারণ— মানিলেন না শচীনন্দন

বাহু পশারি নিলেন কোলে

এস আমার রঘু ব'লে— বাহু পশারি নিলেন কোলে

দৈন্য সম্বরণ করে ব'লে— বাহু পশারি নিলেন কোলে

কর দৈন্য সম্বরণ

ও আমার প্রাণের রঘু— কর দৈন্য সম্বরণ

তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন— কর দৈন্য সম্বরণ

রঘুনাথে স্থির কৈলেন

কৃপাশক্তি সঞ্চারিয়ে— রঘুনাথে স্থির কৈলেন

রঘুনাথ স্থির হলেন

যাঁর প্রাণ তাঁকে দিয়ে, রঘুনাথ স্থির হ'লেন।

(শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়)

———

রঘুনাথের
নীলাচল বিহার—

* শকাব্দ ১৪৪০ হইতে ১৪৫৫ পর্য্যন্ত

"'ষোড়শ' বৎসর কৈল 'অন্তরঙ্গ সেবন'।
স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥"

—চৈঃ চঃ আদি ১০ম

আর, গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ—

'বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি'

---

* দাক্ষিণাত্যে শালিবাহন নামে একজন পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা ছিলেন। তিনি 'শক' নামক একটি প্রবল জাতিকে যুদ্ধে জয় করেন। ঐ সময় হইতে প্রচলিত বৎসরের নাম শকাব্দ। সৌর বর্ষারম্ভে শকাব্দ বর্ষ আরম্ভ হয়।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

স্বরূপের পুত্র ও ভৃত্যরূপে ঃ

'রঘুনাথ' গম্ভীরার-গুপ্তনিধি-গৌরহরির শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। মহাপ্রভুও তাঁহাকে নিজ জন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। 'রঘু' এখন মহাপ্রভুর নিজ বস্তু। রঘুনাথ স্থির হইলে পর গৌরহরি তাঁহাকে স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—

'এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে ;
'পুত্র' 'ভৃত্য' রূপে ইঁহায় কর অঙ্গীকারে।'

'এত কহি রঘুনাথের হস্তে ধরিল ;
স্বরূপের হস্তে তারে সমর্পণ কৈল।'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

স্বরূপ-দামোদর সন্ন্যাসী। সচল-জগন্নাথ গৌরহরি তাঁহার রঘুনাথকে অর্পণ করিলেন এবং আদেশ করিলেন—
" 'পুত্র' ও 'ভৃত্য' রূপে ইহাকে অঙ্গীকার কর"

আদর ক'রে ডাক্‌তেন প্রভু
সেইদিন হ'তে রঘুনাথে— আদর ক'রে ডাক্‌তেন প্রভু
ও স্বরূপের রঘু বলে— আদর ক'রে ডাক্‌তেন প্রভু
(শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়)

অযাচক বৃত্তিতেঃ

ভক্তবৎসল গৌরহরি গোবিন্দকে বলিলেন—

'পথে ইহোঁ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন ;
কত দিন কর ইঁহার ভাল সন্তর্পণ।'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

'রঘুনাথ' গৌরহরির (উপরোক্ত) স্নেহ বাৎসল্যে পূর্ণ হৃদয়' হইয়া প্রথম পাঁচ দিন গোবিন্দের দেওয়া গৌরহরির 'অধরামৃত' গ্রহণ করিলেন। তাহার পরই তিনি বিচার করিলেন যে নিজের দগ্ধ উদর পূর্ত্তির জন্য পরম-দুর্ল্লভ গৌর-পরিকরদের শ্রম ও সময় আমার জন্য নষ্ট হইতেছে। তাই ষষ্ঠ দিন হইতে তিনি সিংহদ্বারে রাত্রি দশ দণ্ডের পর নিষ্কিঞ্চন অযাচক বৃত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া রহিতেন।

সে সময়ে প্রথা ছিল যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবকগণ রাত্রিতে গৃহে প্রত্যাগমনের সময় সিংহদ্বারে কোন নিষ্কিঞ্চন অযাচক দেখিলেই, তাঁহাকে মহাপ্রসাদের ভিক্ষা দিতেন। রঘুনাথ দিবা রাত্র ছায়ার ন্যায় স্বরূপের অনুগমন করিতেন। কেবল রাত্রি দশ দণ্ড কালে স্বরূপের কৃপাদেশ গ্রহণ করিয়া সিংহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেন। অযাচক থাকিয়া জগন্নাথ সেবকদের প্রদত্ত মহাপ্রসাদ যাহা পাইতেন তাহা কাশী মিশ্রালয়বাসী 'সচল জগন্নাথ গৌরহরি'কে নিবেদনপূর্ব্বক স্বরূপের অনুমতি গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন।

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান ;
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর-ভগবান।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

(ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্য্য। তাহাদের মধ্যে 'বৈরাগ্য'ও একটি ঐশ্বর্য্য। বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্যটি অন্যান্য ঐশ্বর্য্যের মুকুটমণি।)

স্বাভাবিক প্রীতিতে গৌরহরি একদিন গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"রঘুনাথ এখানে প্রসাদ পায় না ?"

গোবিন্দ উত্তর করিলেন—

"রঘুনাথ সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া অযাচক বৃত্তিতে যাহা পান তাহাই গ্রহণ করেন।"

একদিন ঠাকুর হরিদাসের আবাসেও (পুরীধামে সিদ্ধ-বকুল তলে) সনাতন গোস্বামীকে গৌরহরি বলিয়াছেন—

"তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

(সনাতন। তোমার এই দেহ দ্বারা আমি অনেক কাজ করাইব। আমি অনেক সঙ্কল্প করিয়াছি ; সে সকল সঙ্কল্প সিদ্ধির পক্ষে তোমার দেহই আমার সর্ব্বপ্রধান উপায়।)

গৌরহরির এই আন্তরিক অভিপ্রায় রঘুনাথের প্রতিও প্রযোজ্য। রঘুনাথের সিংহদ্বারে অযাচক বৃত্তি দেখিয়া তিনি সর্ব্ব জীবের জন্যই উপদেশ দিলেন—

"বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন ;
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ।

বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা ;
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা।

বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস ,
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ।

"বৈরাগীর কৃত্য সদা 'নাম সঙ্কীর্ত্তন' ;
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

গৌরহরি বলিলেন—

বৈরাগীর 'ধর্ম্ম' 'সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন'
বৈরাগীর 'কৃত্য' 'সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন'

(তাৎপর্য্য : কলিজীবের ও কলিযুগের 'সাধ্য' ও 'সাধনের' মুখ্য কৃত্য ও মুখ্য ধর্ম্ম 'নাম সঙ্কীর্ত্তন'। নিজ নিজ 'ইষ্টের' সুখ-তাৎপর্য্য-ময় স্বভাব লাভের বাধক—পরাপেক্ষা, জিহ্বার লালসা, প্রভৃতি সবকিছুই নাম সঙ্কীর্ত্তন অবলম্বন করিলে সমূলে দূর হইবে।)

স্কন্দ পুরাণে পাওয়া যায়—

"দানব্রততপস্তীর্থ-ক্ষেত্রাদিনাঞ্চ যা স্থিতাঃ,
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভা,
আকৃষ্টা হরিণা সর্ব্বা স্থাপিতাঃ স্বেষু নামষু।'

এবং—

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীও তাঁহাব বিবচিত "বৃহদ্ভাগবতামৃত" গ্রন্থে বলিয়াছেন—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারেঃ—
বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদি যত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

আবার, বিংশ-শতাব্দীর সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের নব উদ্গাতা শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় "নাম সঙ্কীর্ত্তন"কে 'লালন' 'পালন' পূর্ব্বক 'বিশ্ব-জন-মনে নাম সঙ্কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিযাছেন। ভাগ্যবান পাঠক ও ভাগ্যবতী পাঠিকাবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

শ্রীনাম সাধনার সূত্র সঙ্কেত ঃ

জপ,—হবে কৃষ্ণ হরে রাম

ওরে ভাই বে,এই ত' কলিযুগেব মূলমন্ত্র—জপ, হবে কৃষ্ণ হরে রাম

ঘোব-কলিযুগে, এই ত' পবিত্রাণেব মূলমন্ত্র--জপ, হবে কৃষ্ণ হবে রাম

কলি—যুগোচিত এই নাম-ধর্ম্ম

এ যে, বেদেব নিগূঢ় মর্ম্ম— কলি— যুগোচিত এই নাম

শ্রীনামের চিন্ময় অবয়ব ঃ

আ'মবি—নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ—অভেদ নাম নামী

'আ'মবি—নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ—

চৈতন্য বস-বিগ্রহ-নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ

'অভেদ নাম নামী'—

এ নাম, অখিল বসের ধাম— জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম

—এই, নাম বই আর সাধন নাই রে

শ্রীনামের প্রভাব ঃ

মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে—পাপ হরে আর তাপ হরে

পাপ-তাপ সব পলায় দূরে

যদি কেহ, নাম ব'লব মনে করে আগেই তার, পাপতম সব পলায় দূরে

স্মূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, অন্ধকার-রাশির মত আগেই তার, পাপ-তাপ-সব

পলায় দূরে

চিত্ত দর্পণ মার্জ্জন করে

অনাদিকালের, দুর্ব্বাসনা-মালিন্য-পূর্ণ চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জন করে

চিত্ত দর্পণের সম্মার্জ্জনী

মধুর-হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন— চিত্তদর্পণের সম্মার্জ্জনী

চিত্ত দর্পণ মার্জ্জন করে

অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

প্রাকৃত, ভোগ-বাসনা হ'তে তুলে ল'য়ে—

শ্রীকৃষ্ণপদে উন্মুখ করে

শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

কায়মনোবাক্য দ্বারায়— শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

সর্ব্ব-সাধন-শকতি দিয়ে— শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

'সর্ব্ব-সাধন শকতি দিয়ে'—

শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-সর্ব্ব-সাধন শকতি দিয়ে

শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে

প্রেমামৃত-সিঞ্চন ক'রে— সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে

ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

কম্প-অশ্রু পুলকাদি— ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

এই, দেহাভিমান যায় রে দূরে

দারুণ, সংসার-বন্ধনের একমাত্র কারণ—

এই, দেহাভিমান যায় রে দূরে

এই প্রাকৃত,— দেহাভিমান ঘুচায়ে দেয় রে

এই তত্ত্ব জাগায়ে দেয় রে

এক শক্তিমান্ আর সকলি শক্তি—

এই তত্ত্ব জাগায়ে দেয় রে

একা, পুরুষ 'কৃষ্ণ' আর সব প্রকৃতি—

এই তত্ত্ব জাগায়ে দেয় রে

ধরনীতে নাম মূর্ত্তির প্রকাশ ঃ

'প্রচারিতে এই নাম ধর্ম্ম

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে— শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

প্রচারিতে নিজ নাম-মহিমা— শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

'প্রচারিতে **নিজ-নাম-মহিমা'**—

আস্বাদিতে নিজ-মাধুর্য্য-সীমা—প্রচারিতে-নিজ-নাম মহিমা

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

আ'মরি—হইল সেই করুণার বিকাশ

যে করুণা—কোনকালে কেউ পায় নাই—হইল সেই করুণার বিকাশ

যে করুণা—'চিরকালের অনর্পিত'— হইল সেই করুণার বিকাশ

যে করুণা—'গোলকে গোপনে ছিল'— হইল সেই করুণার বিকাশ

যে করুণা—'ব্রহ্মাদির অনুভব ছিল না'— হইল সেই করুণার বিকাশ

কোটি কল্প—'কঠোর সাধনেও কেউ যার সন্ধান পায না—

হইল সেই করুণার বিকাশ

আ'মরি—কলিজীবের সৌভাগ্য বশে— হইল সেই করুণার বিকাশ

করুণার-বারিধি শ্রীগোবিন্দ— মনে মনে বিচার করিলেন

আমি—"চিরকাল নাহি কবি প্রেমভক্তি দান!" রে

আমি ভুক্তি, মুক্তি দিয়েছি বটে

অষ্ট প্রকার সিদ্ধিও দিয়েছি

চতুর্ব্বিধা মুক্তিও দিয়েছি
জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিও দিয়েছি
যথা যোগ্য সাধন ফলে— জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিও দিয়েছি
কিন্তু,—সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই
যে ভক্তি আমায়,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধে—
সে ভক্তি ত' কাকেও দেই নাই
যে ভক্তি আমায়,—পুত্র, সখা, প্রাণপতি করে—
সে ভক্তি ত' কাকেও দেই নাই
যে ভক্তি আমায়,—বশ ক'রে অধীন করে—
সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই
আমায়—বশ ক'রে অধীন করে—
আমার—ঈশ্বর অভিমান ঘুচাইয়ে—
আমায়, বশ ক'রে অধীন করে
সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই

"মাতা যৈছে পুত্র ভাবে করেন পালন।" রে !
অতি হীন জ্ঞানে করেন তাড়ন ভৎর্সন ॥ রে !!
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। রে !

বলে—তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম ॥ রে ! রে !!

আপনাকে বড় মানে আমায় সম হীন। রে !
তার প্রেমে বশ আমি হই ত' অধীন ॥ রে ! রে !!

আমি,—এ ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই
আমি—চিরকাল নাহি করি (এই) প্রেমভক্তি দান। রে !
এই—ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ রে ! রে !!
জীব,—কখনও স্থির হতে নারে
যতই সাধন করুক্ না কেন— জীব, কখনও স্থির হতে নারে

অহৈতুকি ভক্তির আশ্রয় না পেলে—

জীব, কখনও স্থির হ'তে নারে

প্রেম লক্ষণা ভক্তির আশ্রয় না পেলে—

জীব, কখনও স্থির হতে নারে

আমি,—যারে তারে যেচে দিব

অহৈতুকী ভক্তির আশ্রয় না পেলে—

জীব, কখনও স্থির হ'তে নারে

প্রেম-লক্ষণা ভক্তির আশ্রয় না পেলে—

জীব, কখনও স্থির হ'তে নারে

ব্রজ-জাতীয়, সম্বন্ধ ভক্তির আশ্রয় না পেলে—

জীব, কখনও স্থির হ'তে নারে

আমি, যারে তারে যেচে দিব

এই, প্রতিজ্ঞা করিলেন শ্রীগোবিন্দ—

"আমি,—যারে তারে যেচে দিব

আজ,—**তাই হরি ব্রজবিহারী, শ্রীনবদ্বীপে অবতরি,**

নাম ধরি গৌরহরি"

নাম ধরি গৌরহরি

শ্রীরাধাভাব কান্তি ধরি—নাম ধরি গৌরহরি

আপনি যেচে বলে দিয়েছেন

বল,—**"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।**

বল,—**হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"**

ধর,—পর হরিনামের মালা

ওরে, ও কলিহত জীব— ধর,—পর হরিনামের মালা

দূরে যাবে ত্রিতাপ জ্বালা— ধর,—পর হরিনামের মালা

আ' মরি কি করুণা রে

করুণার বালাই ল'য়ে মরে যাই— আ' মরি কি করুণা রে

আজ, আপনি যেচে ব'লে দিয়েছেন

আপনার প্রাপ্তির উপায়— আজ, আপনি যেচে ব'লে দিচ্ছেন
আপনাকে,—বশ ক'রে অধীন করার উপায়—
আজ, আপনি যেচে ব'লে দিচ্ছেন

'নিজ গুণে গাঁথি নাম চিন্তামণি,
জগজনে পরাওল হার ॥ রে !
আরে, কলি-তিমিরাকুল অখিল লোক দেখি
বদন চাঁদ পরকাশ ৷ রে ! রে !

বদন চাঁদের প্রকাশ ক'রলেন
কলিঘোর,—তিমিরে জগৎ আচ্ছন্ন দেখে—
বদন চাঁদের প্রকাশ করলেন
আরে,—'কলি ঘোর তিমিরে গরাসল জগজন
ধরম করম গেল দূর ৷ রে !
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি,
আমার,—গোরা বড় দয়ার ঠাকুর ॥' রে !!

আরে,—"কলি ঘোর পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময় ৷ রে !
পূর্ণ শশধর ভেল চৈতন্য তাহায় ৷" রে ! রে !!

আবার,—"লোচনে প্রেম সুধারস বরিষণে,
জগজন তাপ বিনাশ ৷" রে !

সকল তাপ দূর করিলেন
কলিহত পতিত জীবের— সকল তাপ দূর করিলেন
গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হয়ে— সকল তাপ দূর করিলেন
জগবাসী নর-নারীর— সকল তাপ দূর করিলেন

বিকশিত নামের বসতি স্থলী ঃ

কি ব'লব করুণার কথা

আরে,—"ভকত কলপ-তরু অন্তরে অন্তরু
রোপলি ঠামহি ঠাম।" রে !

স্থানে স্থানে রোপন ক'র্‌লেন
নিজ ভক্ত কল্পতরু— স্থানে স্থানে রোপন ক'র্‌লেন
নিজ, ভক্তগণের জন্ম দিলেন

আরে,—"তছু পদতল অবলম্বনে পন্থিক,
পূরল নিজ নিজ কাম।" রে।

ছায়ায় ব'সে জুড়াইল
ভকত কলপতরুর— ছায়ায় ব'সে জুড়াইল
শ্রীগুরু কলপতরুর— ছায়ায় ব'সে জুড়াইল
শ্রীগুরু কলপতরুর— ছায়ায় ব'সে জুড়াইল

শ্রীনামই গুরু মূর্ত্তিতে ঃ

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়। রে।
তার মন্ত্র উপদেশে মায়া পিশাচী পলায়॥ রে ! রে।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ তরে। রে।
নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে॥" রে ! রে !

তীর সংযোগ মহৎ কৃপা
তীর সংযোগ গুরু-কৃপা

'ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। রে।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা জীব ॥' রে! রে!

দুই রূপে করেন কৃপা
'অন্তর্য্যামী' আর 'ভক্তশ্রেষ্ঠ'— দুই রূপে করেন কৃপা
অন্তর্য্যামী রূপে করেন প্রেরণা
গুরু-রূপে জানান উপাসনা— অন্তর্য্যামী রূপে করেন প্রেরণা

আরে,—**"মহৎ কৃপা বিনে কোন কার্য্য সিদ্ধ নয়। রে!
কৃষ্ণ কৃপা দূরে রহু সংসার না হয় ক্ষয় ॥" রে!**

তাপ জুড়াবার আর উপায় নাই
শ্রীগুরু পদাশ্রয় বিনা ভাই— তাপ জুড়াবার আর উপায় নাই

গুরু মূর্ত্তিতে ভূরি দান ঃ

কেউ,—শুনেছ কি কোন কালেতে
আ' মরি কি আত্মদান
যাই রে দানের বলিহারি
কি ব'লব করুণার কথা
যে,—বিষয়-বিষ পীতে ছিল
তারে,—নাম-অমিয়া পিয়াইল
যে, বিষয়-বিষ পীতে ছিল— তারে,—নাম-অমিয়া পিয়াইল
বিষয় বিষ-ভাণ্ড কেড়ে ল'য়ে— তারে,—নাম-অমিয়া পিয়াইল
বিষয়-বিষ-ভাণ্ড কেড়ে ল'য়ে—

আয় বলে, বাহু পশারিয়ে হিয়ায় ধ'রে—

বিষয়-বিষ-ভাণ্ড কেড়ে লয়ে

নিজ—সেবায় লুব্ধ কৈল

যে রিপু সেবায মত্ত ছিল— তারে—নিজ সেবায় লুব্ধ কৈল

তারে,—দিল নিজ সেবা অধিকার

মাযার,—লাথি খাওযা স্বভাব যাব—

তারে—দিল নিজ সেবা অধিকার

নাম গ্রহণে শ্রীগুরু উপদেশঃ

'খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়। রে।

ইথে,—কাল দেশ নিযম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয।' রে।

আ' মরি—পূরে ভাই মনস্কাম

হেলায শ্রদ্ধায় নিলে নাম— আ' মরি—পুরে ভাই মনস্কাম

স্বভাব জাগায়ে দেয় রে সুখে

পরিপূর্ণ কৃষ্ণভোগের— স্বভাব জাগায়ে দেয রে সুখে

নামে, বুক ভ'রে যায অভাব মিটায—স্বভাব জাগায়ে দেয় রে সুখে

প্রতিশ্রুতি দানঃ

অপরূপ,—নাম সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা

"নান সঙ্কীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন। রে!

চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্‌গম ।। রে !!
কৃষ্ণ প্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত আস্বাদন । রে !
কৃষ্ণপ্রাপ্তি—সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ।। রে !!

চিত্তদর্পণের সম্মার্জ্জনী
মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন— চিত্তদর্পণের সম্মার্জ্জনী

এমন উপায় আর নাই ভাই,
চিত্তশুদ্ধি করবার তরে— এমন উপায় আর নাই ভাই
হরি. নাম সঙ্কীর্ত্তনের মত— এমন উপায় আর নাই ভাই

চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে
অজ্ঞানতা যায় রে দূরে
মধুর—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে— অজ্ঞানতা যায় রে দূরে
ভুক্তি-মুক্তি বাসনা রূপ— অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

শাস্ত্র প্রসঙ্গে শ্রীগুরু উপদেশ ঃ

'কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম রে !
সেই হয় জীবের এক অজ্ঞানতম ধর্ম্ম ॥ রে !!
অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব ।' রে !

কৈতব ব'ল্‌তে কপটতা
'অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব । রে ।
ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥' রে !!

ইহাকেই বলে অজ্ঞানতা
কৃষ্ণ ভ'জে চতুর্ব্বর্গ বাসনা— ইহাকে বলে অজ্ঞানতা

'তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। রে!
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।' রে॥

সে হৃদয়ে কখনও যান না
শুদ্ধা সাধ্বী ভকতি দেবী— সে হৃদয়ে কখনও যান না
শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয় না
ভুক্তি মুক্তি বাসনা থাকতে— শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয় না
ত্রিতাপ জ্বালা যায় রে দূরে
মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে— ত্রিতাপ জ্বালা যায় রে দূরে
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক---
ত্রিতাপ জ্বালা যায় রে দূরে
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে
এই ভুবন মঙ্গল নাম গানে— সর্ব্ব অমঙ্গল হরে
সকল মঙ্গল উদয় করে
শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির অনুকূল— সকল মঙ্গল উদয় করে
পরিপূর্ণ, কৃষ্ণ প্রাপ্তির অনুকূল- সকল মঙ্গল উদয় করে
শ্রীকৃষ্ণপদে উন্মুখ করে
যত বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তি— শ্রীকৃষ্ণপদে উন্মুখ করে
প্রাকৃত, ভোগ বাসনা হ'তে তুলে ল'যে—শ্রীকৃষ্ণপদে উন্মুখ করে
শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করায
কায মনো বাক্য দ্বারায— শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করায
সর্ব্ব সাধন শকতি দিয়ে— শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করায
শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন — সর্ব্ব সাধন শকতি দিয়ে
শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করায
সর্ব্ব বিদ্যার জীবন শক্তি নাম— সর্ব্ব সাধন শকতি দিয়ে
সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে
মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন-- সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে

প্রেমামৃত সিঞ্চন করে— সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে

ভাব ভূষণে ভূষিত করে

সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে— ভাব ভূষণে ভূষিত করে

কম্প অশ্রু পুলকাদি— ভাব ভূষণে ভূষিত করে

গোপী, ভাবামৃতে লুব্ধ করে

শ্রীনামের বীর্য্যশক্তি ঃ

মহামন্ত্র মহাশূর

তাইতে বলি মহাশূর

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে

যে ধনের পায় নাই সন্ধান

কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-সাধন ফলে— যে ধনের পায় নাই সন্ধান

অনায়াসে করেন দান

মহামন্ত্র—মহাশূর তাই— অনায়াসে করেন দান

পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধন— অনায়াসে করেন দান

শ্রীকৃষ্ণ লীলা-রস-ধাম

এই বত্রিশ অক্ষর ষোল নাম— শ্রীকৃষ্ণ লীলা-রস-ধাম

তাই, মহামন্ত্র এত শক্তিমান

এ যে, ব্রজলীলা রস-ধাম— তাই মহামন্ত্র এত শক্তিমান

অপরূপ এ নাম রহস্য

এ নাম, যুগল বিলাস ধাম

কারুণ্য তারুণ্য লাবণ্যামৃত ধাম— এ নাম, যুগল বিলাস ধাম

এই, নামেই করেন অবস্থান

ব্রজলীলা রসের উপাদান— এই, নামেই করেন অবস্থান

শ্রীনামের দ্বিতীয় লীলা মূর্ত্তি ঃ

পরাণ গৌরাঙ্গ দেখায়
'হরে কৃষ্ণ' নাম নিজ স্বরূপ— পরাণ গৌরাঙ্গ দেখায়
দেখায় প্রাণের গৌর-মুরতি
মহা,—রাস বিলাসের পরিণতি— দেখায় প্রাণের গৌর-মুরতি
রাই কানু একাকৃতি— দেখায় প্রাণের গৌর-মুরতি
দেখায় প্রাণের শচীসুত
মূরতি অদভুত— দেখায় প্রাণের শচীসুত
ভানুসুতা মণ্ডিত নন্দসুত--- দেখায় প্রাণের শচীসুত
মুরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত— দেখায় প্রাণের শচীসুত
দেখায় মধুর গৌরদেহ
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ— দেখায় মধুর গৌরদেহ
দেখায় চিতচোরা গোরা
'হরে কৃষ্ণ' নাম নিজ স্বরূপ--- দেখায় চিতচোরা গোরা

নামের লীলা মূর্ত্তির প্রাপ্ত-লোভ জাগলে ঃ

সেই আশা পুরাইতে
যোগমায়া লীলা শক্তি
যুগলের সুখদাত্রী যোগমায়া লীলা শক্তি
অভিন্ন স্বরূপের করিলেন প্রকাশ
অভিন্ন স্বরূপ কে বল ভাই
নিগম নিগূঢ় শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন স্বরূপ কে বল ভাই
ব'লেছেন ব'সে পানিহাটিতে

নিগম নিগূঢ় শ্রীচৈতন্য আমার — ব'লেছেন ব'সে পানিহাটিতে
মহা মহা উল্লাসেতে — ব'লেছেন ব'সে পানিহাটিতে
অভিন্ন স্বরূপের কথা — ব'লেছেন ব'সে পানিহাটিতে

"(শুন) শুন রাঘব তোমায় আমি নিজ গোপ্য কই। হে !
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই ॥" হে !!

এক আত্মা দুই কলেবর
প্রভু নিতাই প্রাণ গৌরসুন্দর — এক আত্মা দুই কলেবর
আবেশে বলেন গৌরহরি
রাঘবের করে ধরি — আবেশে বলেন গৌরহরি
নিজ গূঢ় মরম কথা — আবেশে বলেন গৌরহরি

'এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে।
সেই করি আমি এই বলিল তোমারে ॥'

আমি, নিতাইচাঁদের খেলার পুতুল
যেমন নাচায় তেমনি নাচি — আমি, নিতাইচাঁদের খেলার পুতুল

রহো লীলার নব যুগল :

অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ
রাই কানু মিলিত গোরার — অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ

গোদাবরী তীরে রামরায় দেখে
এই 'রসরাজ' 'মহাভাব' প্রত্যক্ষে, গোদাবরী তীরে রামরায় দেখে

রামরায় মূরছিত
দেখি নিতাই গৌর জড়িত — রামরায় মূরছিত

দেখি, নিতাই গৌর আলিঙ্গিত রামরায় মূরছিত
দেখি, নিতাই গৌর বিলসিত রামরায় মূরছিত

নব যুগল মূর্ত্তি'র প্রমাণ প্রসঙ্গ ঃ

"সর্ব্বোপরি তত্ত্ব নিতাই গৌরাঙ্গ স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥

যা' দেখি রায় রামানন্দ মূরছিত।

রাম রায় পড়ল ধরা
দেখি নিতাই রমণ গোরা রাম রায় পড়ল ধরা
রাম রায় মূরছিত

শ্রীনাম লীলার নব যুগল মূর্ত্তি'র প্রসঙ্গ ঃ

শ্রীগুরু চরণে দিয়ে মাথা ঐ মূরতি হৃদে ধর সদা
নরহরির চিতচোরা ঐ মূরতি হৃদে ধর সদা
প্রাণ ভ'রে গান কর
অনুশীলনে গৌর রহস্য ভাগের তরে প্রাণ ভ'রে গান কর

রহস্যের উৎপত্তি তথায়
ব্রজ, নিকুঞ্জ বিহারে প্রবেশ না হলে
নদীয়া বিহার বুঝা যায় না

যে যুগল বিলাস বুঝবে
'বিলাস-বিবর্ত্তে-বিলাস রঙ্গ— তার, ভোগ ক'রতে সাধ হবে

তার, ভোগ ক'রতে সাধ হবে

ব্রজে যা' পায় নাই তা'— তার, ভোগ করতে সাধ হবে

তার, নদীয়া লীলায় লোভ হবে

সে ভোগে যখন সাধ জাগে

তখন আস্‌তে হয় নদীয়াতে

গৌরগণের আনুগত্যে— তখন আস্‌তে হয় নদীয়াতে

আমার, চিতচোর প্রাণ গৌরাঙ্গ

বিবর্ত্তে-বিরহ-রঙ্গ আমার চিতচোর প্রাণ গৌরাঙ্গ

শ্রীনামের রহোলীলার মর্ম্মকথা ঃ

দয়া ক'রে দিলেন এই নাম

পরম করুণ শ্রীগুরুদেব দয়া ক'রে দিলেন এই নাম

অহৈতুকী কৃপা স্বভাবে দয়া ক'রে দিলেন এই নাম

সাধ্য সাধন নির্ণয় করা দয়া ক'রে দিলেন এই নাম

সাধ্য সাধন নির্ণয় করা

সাধ্য—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

সাধন—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

সাধ্য-সাধন-নির্ণয় করা নাম

আবার—অতিগূঢ় রহস্য আছে এই নামে

আশ্রয় জাতীয় সাধন ক্রমে—

আবার—অতিগূঢ় রহস্য আছে এই নামে

নিতাই আশ্রয়, গৌর বিষয়

তাই, আগে নিতাই পিছে গৌর নিতাই আশ্রয়, গৌর বিষয়

ভূমি প্রস্তুত ক'রে দেয় রে
শ্রীসেবা বিগ্রহ নিতাই আমার ভূমি প্রস্তুত ক'রে দেয় রে
হৃদয়ে গৌর উদয় হয়ে নিশিদিশি গুণেতে কাঁদায়
গৌর স্বরূপের এই ত' স্বভাব নিশিদিশি গুণেতে কাঁদায়
প্রাকৃত ভোগ বাসনা ঘুচায়
গৌর, হৃদয়ে উদয় হ'যে গুণে কাঁদাযে
প্রাকৃত ভোগ বাসনা ঘুচায়
এই, দেহাভিমান যায় রে দূরে

আমার, গৌরগুণে ঝুরে ঝুরে এই, দেহাভিমান যায় রে দূরে
আর কোন উপায় নাই রে

দেহাভিমান যায় না কোন সাধনে
আমার, গৌরগুণে কাঁদা বিনে, দেহাভিমান যায় না কোন সাধনে

ব'লেছেন ঠাকুর নরোত্তম
নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
গৌর গুণে যে বা ঝুরে নিত্যলীলা তারে স্ফুরে

যদি ভোগ ক'রতে চাও
নিশিদিশি জপ কর
'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম , নিশিদিশি জপ কর

শ্রীনামের গৌরাঙ্গ লীলা ঃ

সে যে আমার গৌর মূরতি
দেখে, আবির্ভাব এক সোনার মূরতি সে যে আমার গৌর মূরতি
, মহারাস বিলাসের পরিণতি সে যে আমার গৌর মূরতি

রাই কানু একাকৃতি সে যে আমার গৌর মূরতি
'হরে কৃষ্ণ' নামের স্বরূপ দেখে প্রাণের গৌরহরি
রাই সম্পুটে বংশীধারী দেখে প্রাণের গৌরহরি
রাই কিশোরী ঢাকা বংশীধারী দেখে প্রাণের গৌরহরি

দেখে গৌর গুণনিধি
মহাভাব প্রেম রস বারিধি দেখে গৌর গুণনিধি

দেখে প্রাণের শচীসুত
মূরতি অদভূত দেখে প্রাণের শচীসুত
ভানুসুতা মণ্ডিত নন্দসুত দেখে প্রাণের শচীসুত
মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত দেখে প্রাণের শচীসুত

দেখে প্রাণের নদের নিমাই
পরস্পর বুকে ধ'রে হারাই হারাই দেখে প্রাণের নদের নিমাই

দেখে মধুর গৌর দেহ
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ দেখে মধুর গৌর দেহ

দেখে চিতচোরা 'গোরা'
পরস্পর, বুকে ধ'রে আত্মহারা দেখে চিতচোরা 'গোরা'
শুধু কেবল তাই নয়
দেখে, বিরুদ্ধ স্বভাবে মাতোয়ারা
রাই কানু, কানু রাই দেখে, বিরুদ্ধ স্বভাবে মাতোয়ারা
রমণী রমণ, রমণ রমণী দেখে, বিরুদ্ধে স্বভাবে মাতোয়ারা
কিশোরী কিশোর, কিশোর কিশোরী
দেখে, বিরুদ্ধে স্বভাবে মাতোয়ারা
মহাভাব রসরাজ, রসরাজ মহাভাব
দেখে, বিরুদ্ধে স্বভাবে মাতোয়ারা

দেখে, নিগম নিগূঢ় গৌর রূপ
'বিলাস বিবর্ত্ত রূপ দেখে, নিগম নিগূঢ় গৌর রূপ

গৌর মূরতি দেখেই
ব্রজ দেখে নদীয়া
স্বরূপের সঙ্গেই ধামের প্রকাশ ব্রজ দেখে নদীয়া
শ্রীযমুনা সুরধনী ব্রজ দেখে নদীয়া

শ্রীবাস মণ্ডল শ্রীবাস অঙ্গন
তার, মাঝে নাচে শচীনন্দন
শ্রীবাস মণ্ডল শ্রীবাস অঙ্গন তার, মাঝে নাচে শচীনন্দন
চারিদিকে ঘিরে নাচে
পারিষদ সব গোপীগণ চারিদিকে ঘিরে নাচে

অপরূপ রহস্য ভাই
নিগূঢ় গৌরাঙ্গ লীলার অপরূপ রহস্য ভাই

গৌর পরিকর যত
সখা সখী মিলিত গৌর পরিকর যত

এ যে, আশ মিটান লীলা রে
নিগূঢ় গৌরাঙ্গ লীলা এ যে, আশ মিটান লীলা রে

সকলের সাধ পূর্ণ হ'ল
সখা সখী সঙ্গে যুগল কিশোরের সকলের সাধ পূর্ণ হ'ল

শ্যামের বাসনা পূর্ণ হ'ল
স্বমাধুরী আস্বাদিল
রাধা ভাব কান্তি ধ'রে স্বমাধুরী আস্বাদিল

রাইএরও বাসনা পূর্ণ হ'ল
আমাদের কিশোরীর মনে সাধ ছিল

"নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে।"

যদি পুরুষাকৃতি পেতাম
সদাই তোমা ল'য়ে ফিরতাম যদি পুরুষাকৃতি পেতাম

আজ সেই সাধ মিটিল
রসময়ের গঠন পেয়ে আজ সেই সাধ মিটিল

দেশে দেশে ফিরে গো
পরাণ বঁধু বুকে ধ'রে দেশে দেশে ফিরে গো

সবাই বলে গৌরহরি
শচীদুলালে হেরি সবাই বলে গৌরহরি

শ্রীনামের নদীয়া লীলায় নব যুগল বিগ্রহের নব লীলা

সবাই বলে গৌরহরি
তা-তো নয় তা-তো নয়
ও যে আমাদের প্রাণ কিশোরী
ফিরছে বঁধুকে বুকে ধরি'
বঁধুর বিরহ সইতে নারি ফিরছে বঁধুকে বুকে ধরি'
আর কেউ লখিতে নারছে

বঁধুকে বুকে ধ'রে বেড়াইছে

আর কেউ লখিতে নার্‌ছে
বড় সাধে বেড়াইছে

বুকে রেখে উপরে থেবে

বড সাধে বেডাইছে

যুগলের সাধ পূর্ণ হ'ল
যুগলের সাধ পূর্ণ হ'ল

বলদেবেরও বাসনা পূর্ণ হ'ল
বড়ই বাধা ছিল
বড়ই বাধা ছিল

তার কেবল সম্বন্ধ বাধা

সার সেবাতে মগন আছে বাঁধ

তার কেবল সম্বন্ধ বাধা

সকলই ত' বলাই আমার

বসন ভূষণ ভোজ্য পে

সকলই ত' বলাই আমার

যোগপীঠ বলাই আমার
পুষ্প শয্যা বলাই আমার
এ দিকে কোন বাধা নাই

কেবল সম্বন্ধ বাধা
কেবল সম্বন্ধ বাধা

বলরামের সাধ উঠিল
বলরামের সাধ উঠিল
কি করে সাধ পূর্ণ হবে
মনে মনে ভাবিল
আমারই ত' স্বরূপ বটে

অনঙ্গমঞ্জরী আমারই ত' স্বরূপ বটে

অন্তরঙ্গ সেবা করে

যুগলকিশোরের — অন্তরঙ্গ সেবা করে

আমি ত' প্রবেশ ক'রব
অনঙ্গমঞ্জরীতে — আমি ত' প্রবেশ ক'রব

বলাইএর সাধ পূর্ণ হ'ল
শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপে — বলাইএর সাধ পূর্ণ হ'ল
অনঙ্গের ভাব কান্তি নিল — বলাইএর সাধ পূর্ণ হ'ল

অনঙ্গেরও বাসনা পূর্ণ হ'ল

শ্রীনাম মূর্ত্তির নীলাচল লীলা

বিলাসী গোরা সুখে বিলসে
বিলসে সঙ্কীর্ত্তন মহারাসে
জগ, জীবের স্বরূপ করি' প্রকাশে — বিলসে সঙ্কীর্ত্তন মহারাসে

জগন্নাথ নাম পূর্ণ হ'ল
গৌরাঙ্গ স্বরূপে — জগন্নাথ নাম পূর্ণ হ'ল
সেই কথা সার্থক হ'ল
একলা, পুরুষ কৃষ্ণ আর সব প্রকৃতি — সেই কথা সার্থক হ'ল

পুরুষ শব্দ বাচ্য সে
নিরপেক্ষ শক্তি যে — পুরুষ শব্দ বাচ্য সে

সেই ত' নন্দদুলাল বটে
যদি নিরপেক্ষ শক্তি থাকে — সেই ত' নন্দদুলাল বটে
এক মাত্র পুরুষ জগতে — সেই ত' নন্দদুলাল বটে

কৃষ্ণ বিনা আর কেউ নয়
পুরুষ শব্দ বাচ্য হয় — কৃষ্ণ বিনা আর কেউ নয়
জগভরি সব শক্তি
সকলেই প্রকৃতি সত্ত্বা
এক কৃষ্ণ শক্তিমান— সকলেই প্রকৃতি সত্ত্বা

শ্রীভাগবতে এ তত্ত্বের প্রকাশ
গৌরাঙ্গ স্বরূপে সার্থক হ'ল
এতদিন কেবল কথায় ছিল— গৌরাঙ্গ স্বরূপে সার্থক হ'ল

গৌর বিলসিল সবা সঙ্গে
গোপীভাব জাগায়ে দিয়ে— গৌর বিলসিল সবা সঙ্গে
সঙ্কীর্ত্তন রাস রঙ্গে— গৌর বিলসিল সবা সঙ্গে
দর্শন স্পর্শন আলিঙ্গনে— গৌর বিলসিল সবা সঙ্গে

আনের কথা কি বা বলব
নাগরে করিল আলি
এম্‌নি, মধুর গৌর নাগরালি— নাগরে করিল আলি

তার নিদর্শন মনে কর ভাই
রথাগ্রে গৌরের কীর্ত্তন রঙ্গ- তার নিদর্শন মনে কর ভাই
জগন্নাথ শ্যাম হইল লুব্ধ
রথাগ্রে গৌর নটন দেখে— জগন্নাথ শ্যাম হইল লুব্ধ
গৌর পরিকরত্বে লোভ হ'ল
নিরন্তর গৌর স্বরূপ ভোগের লাগি—গৌর পরিকরত্বে লোভ হ'ল
না হবে বা কেন রে
এ যে, নাগরীর নাগরালি
শ্যাম নাগরে করিল আলি — এ যে, নাগরীর নাগরালি

নাগর যদি নাগরী হ'ল
বেদে যারে পুরুষ বলে— সেই নাগর যদি নাগরী হ'ল
কেমন ক'রে থাকবে বল
জীবের সামান্য পুরুষ অভিমান— কেমন ক'রে থাকবে বল
সবার স্বরূপ হ'ল জাগ্রত
স্থাবর, জঙ্গম গুল্ম লতা যত— সবার স্বরূপ হ'ল জাগ্রত
হেরি, রসময় শচীসুত— সবার স্বরূপ হ'ল জাগ্রত
বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ হ'ল
বিশ্ব মধুরে মাতিল— বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ হ'ল

পরিকর সঙ্গে গৌর স্বরূপের খেলা
অপূর্ণ রাসরস পূর্ণলীলা— পরিকর সঙ্গে গৌর স্বরূপের খেলা

শ্রীগুরু কৃপায় সাধক দেখে
এই. সঙ্কীর্ত্তন মহা মহা রাসলীলা— শ্রীগুরু কৃপায় সাধক দেখে
দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেখে অপরূপ
দেখে, গৌর স্বরূপে আবার নব লালসা
মহারাস রঙ্গে ভোরা সেই— গৌর স্বরূপে আবার নব লালসা

একে ত' বিবর্ত্ত দশা
গৌরাঙ্গ স্বরূপে যুগলের— একে ত' বিবর্ত্ত, দশা
আবার, তায় উঠেছে ভোগ লালসা
বিবর্ত্তে বিলাস চেষ্টা
কেমনে পূরণ হবে বল
ভোগ্য ভোক্তা এক ঠাঁই— কেমনে পূরণ হবে বল
দুই স্বরূপ না হইলে— কেমনে পূরণ হবে বল

ভোগীর ভোগ লালসা দেখে

আর কি রইতে পারে
শ্রীগৌর সেবা বিগ্রহ-- আব কি রইতে পারে
ভোগদাতৃ স্বরূপ আর কি রইতে পারে

আসি দাঁড়াইল সম্মুখে
বিবর্তে ভোগ লালসা মিটাইতে— আসি দাঁড়াইল সম্মুখে
অভিন্ন চৈতন্য তনু— আসি দাঁড়াইল সম্মুখে
আশ্রয় জাতীয ভাবে— আসি দাঁড়াইল সম্মুখে
প্রকট নিত্যানন্দ রূপ
বিবর্তে বিলাসের ভোগরূপ— প্রকট নিত্যানন্দ রূপ

সম্মুখে ভোগ্য স্বরূপ দে'খে
বাহু পসারি' ধ'র্ল বুকে
গৌব স্বরূপ নিতাইযে দেখে'— বাহু পসাবি ধ'র্ল বুকে

হল পরস্পব জড়াজড়ি
দোঁহে মিলিল বাহু পসারি'— হল পরস্পর জড়াজড়ি
ভোগ্য ভোক্তা মুরতি— হল পবস্পব জড়াজড়ি
মহাভাব নিতাই রসবাজ গোরা— হল পবস্পব জড়াজড়ি

রামরায, মুরছিত গোদাবরী তীরে
এই, বিবর্তে বিলাস বঙ্গ হেবে— বামরায মুরছিত গোদাবরী তীরে
বামরায মুরছিত ধরণীতে
দেখি এই নব উৎসবে— রামবায মুরছিত ধরণীতে
স্বভাবে বিলাস দেখেছ বটে
বামরায ব্রজেব বিশাখা সখা— স্বভাবে বিলাস দেখেছ বটে
কিন্তু, তাব ত' অনুভবে নাই

বিবর্ত্তে বিলাস রঙ্গ ঘটে— তার ত' অনুভবে নাই'

রামরায় মূরছিত

দেখি, বিলাস অনুভব অতীত রামরায় মূরছিত

নাম রহস্যের এই পরিণতি ভোগ

শ্রীগুরু কৃপাদত্ত নাম রহস্যের— এই পরিণতি ভোগ

একদিন রহস্য পুছে ছিলাম

তাঁর মুখোদগীর্ণ নামের— একদিন রহস্য পুছে ছিলাম

কৃপা করে ব'লে ছিলেন

'ভজ' আর 'জপ' রইল

শ্রীনামের লীলা পূর্ত্তিঃ

সাধ্য সাধন নির্ণয় করা বইল

একান্তে নাম আশ্রয় কর

নাম সব বলে দেবে— একান্তে নাম আশ্রয় কর

এখন, যা' বলায় তাই ত' বলি

পাগ্‌লা প্রভু মহাবলী— এখন, যা' বলায় তাই ত' বলি

এই নাম যে আশ্রয় করে

অপরূপ রহস্যময়— এই নাম যে আশ্রয় করে

শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-পদাশ্রয়ে— এই নাম যে আশ্রয় করে

সে, '**নিতাই-গৌরাঙ্গ-বিলাস**' ভোগ করে—

এই নাম যে আশ্রয় করে

দেখে, '**নিতাই-রমণ**' গোরা

নরহরির চিতচোরা— দেখে, 'নিতাই-রমণ' গোরা

আয় ভাই, প্রাণ ভ'রে গান করি

'হৃদে ধরি' শ্রীগুরু মূরতি— আয় ভাই, প্রাণ ভ'রে গান করি

'হৃদে ধরি' শ্রীগুরু মূরতি—

আমাদের, জীবনে মরণে গতি — হৃদে ধরি শ্রীগুরু মূরতি

এই, নামদাতা মহাদানী— হৃদে ধরি শ্রীগুরু মূরতি

আয় ভাই, প্রাণ ভ'রে গান করি

নিতাই-গৌরাঙ্গ-বিলাস-ভোগে মাতি—

আয় ভাই, প্রাণ ভ'রে গান করি

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

আ'মরি কি মধুর নাম

"নিতাই গৌর রাধেশ্যাম"— আ'মরি কি মধুর নাম

নামের বর্ণে বর্ণে পূর্ণামৃত — আ'মরি কি মধুর নাম

অমৃত হ'তেও পরামৃত— আ'মরি কি মধুর নাম

(১)

(১) '(কলি জীবকে) বিধি ব্যবস্থা দিয়ে জড়িত করলে তারা পারবে না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা দরকার। '<u>নাম সর্ব্বশক্তিমান</u>', সেই পেয়াদার হাতে ফেলে দিলে নামই ঠিক করে নেবে। নাম রূপ বীজ ফেলা হলো—এখন সে বীজকে নাড়া-চাড়া করতে নেই;

দরকার—'শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ জল ঢালা'। জল পেলেই বীজ হ'তে চারা বের হবে এবং দিনে দিনে বাড়তে থাকবে—তখন স্বতঃই বিধি পালন করবে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, মহাপ্রভুর আজ্ঞায় গৌড়ে নাম-প্রেম প্রচার করতে এসে বিধি নিষেধ না দিয়ে সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা কর্‌লেন। কারণ, গানে সর্পও খল স্বভাব ত্যাগ করে। সামবেদ গানে ভগবান্ আকৃষ্ট হন। গানের শক্তি অসীম।

(২) আর যাঁরা প্রচার কার্য্যে ব্রতী হবেন তাঁদের কিছু কর্ত্তব্য আছে। কথায় আছে খুঁটোর জোরে 'মেড়া' যুঝে। আচারহীন প্রচারে কোন কাজ হয় না। / যাঁরা উপদেশ করবেন, তাঁদের আগে ভগবানে পূর্ণ মাত্রায় নির্ভরশীল হওয়া চাই। **আমিত্ব থাকতে, পুরুষকার থাকতে,** ভগবানের কৃপা আসে না। এটি মনে-প্রাণে বোঝা চাই। গীতায় ভগবান কি দেখালেন—অর্জ্জুনের নিজ গাণ্ডীব তুলিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নাই।

(শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়)

সংশয় নিরসনে ঃ

নীলাচলে প্রথম মিলনের দিনেই "সচল জগন্নাথ" গৌরহরি নিজের অভিলাষ পূর্ণ করিবার নির্ম্মল আধার ঐ রঘুনাথকে স্বরূপের করে সমর্পণ করিয়াছেন। রঘুনাথকেও তিনি কৃপাদেশ করিয়াছেন—

"প্রাণের রঘু! আজ হইতে স্বরূপ (স্বরূপ-দামোদর) তোমার 'পিতা' ও 'প্রভু'।"

(তাৎপর্য্য ঃ---সর্ব্ব বিষয়ে পরম সমর্থ পিতা থাকিলে পুত্রের আর অন্যের নিকট চাহিবার কিছুই থাকে না। তদ্রূপ হে রঘু!

স্বরূপই তোমার সর্ব্বস্ব জানিবে। তুমি আজ হইতে স্বরূপের 'পুত্র' (পাল্য ও উত্তরাধিকারী)। এই প্রাপ্ত বস্তুর মর্য্যাদাবোধ ও ভোগের জন্য আজ হইতে তুমি স্বরূপের 'ভৃত্য'। অতঃপর তোমার 'সাধন' হইল 'স্বরূপের আদেশ পালন ও ছায়ার ন্যায় সঙ্গী হইয়া তাহার সুখ-তাৎপর্য্য-ময় আচরণ'।")

গম্ভীরার গুপ্তনিধি গৌরহরির কৃপা প্রেরণায়, রঘুনাথ একদিন স্বীয় প্রভু 'স্বরূপের' মাধ্যমে তাঁহাকে (গৌরহরিকে) প্রশ্ন করিলেন—

"কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানি উদ্দেশ ;
কি মোর কর্ত্তব্য ? মুঞি না জানি উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে প্রভু কর উপদেশ।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

এই প্রশ্ন শুনিয়া মধুর হাস্যের সহিত গৌরসুন্দর বলিলেন—

"রঘু! তোমার 'সাধ্য', 'সাধন' ও 'তত্ত্ব' সবই ঐ "স্বরূপ-দামোদর"। আবার—'আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে'

(চরিতামৃত)

এই কথা বলার পরই পুনরায় হাসিয়া বলিতেছেন—

"তথাপি আমার বাক্যে শ্রদ্ধা যদি হয় ;
আমার এই বাক্য তুমি করহ নিশ্চয়।"

(চরিতামৃত)

পরম কৌতুকী গৌরহরি রঘুনাথকে বলিতেছেন—

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।"

(চরিতামৃত)

কি ব্যাপার ? রঘুনাথকে এ কথা বলার তাৎপর্য্য ? ব্রজরামাদের প্রতি 'যোগ' উপদেশের মতই এই সব উপদেশাবলী 'নিরর্থক'

মনে হয় না কি? শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা প্রেরণায় আমাদের মনে জাগে যে এ সব উপদেশ কোন গূঢ় অর্থে বলা হইয়াছে—

'ভক্তিরস' কৃষ্ণাকর্ষিণী সুতরাং ভক্তিরস বড় সু-কোমলা। শুষ্ক-বৈরাগ্যের 'কাঠিন্য' ক্রমে দেহেই অভিনিবেশ বাড়াইয়া দেয়। প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্যও তাই করে। প্রাকৃত বিষয়ে ঔদাসীন্য আনে না। এ কারণ, শুষ্ক বৈরাগ্য ভক্তি রক্ষণে বাধা সৃষ্টি করে। 'ভক্তিরসে'র গাঢ় আস্বাদনের লোভ উদিত হইলে (নিখিল , প্রাকৃত বস্তুতে স্বাভাবিক অরুচি জন্মে। প্রাকৃত বস্তুতে ঐরূপে স্বাভাবিক অরুচি বা ভক্তি হইতে উত্থিত বৈরাগ্য জাত হইলে সে সাধকের গ্রাম্যবার্ত্তা শোনারও প্রবৃত্তি হয় না এবং নিজেও গ্রাম্য কথা বলে না। অস্থি, মাংস ও চর্ম্মের আধারে বায়ু, পিত্ত, কফ, মল, মূত্র, কীটের আধার ক্ষণভঙ্গুর তুচ্ছ শরীরকে আচ্ছাদনের জন্য ভাল ভাল বস্ত্রের প্রয়োজন প্রবৃত্তি জাগে না। জিহ্বার লালসায় ভাল খাইবার আগ্রহও থাকে না। **ভক্তি-মহারাণীর করুণায় তুমি 'স্বভাবে বৈরাগী'।** তোমার জীবন আদর্শে—'সাধক-জীব' ভক্তি বৃদ্ধির অনুকূল আচরণে আসক্তি এবং ভক্তির প্রতিকূল বস্তু যত্নে পরিহার করিয়া নিজ নিজ সাধন পথে চলিবে। আরও শোন—

"অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে"

স্থাবর-জঙ্গমাদি সর্ব্বত্র তোমার 'ইষ্ট' স্ফূর্ত্ত হয়। সুতরাং তোমার দৃষ্টিতে কেহই 'অমানী' নয়, হইতেও পারে না। নিজ 'অভিষ্টের' প্রকাশ জ্ঞানে তুমি সকলকেই মান্য দিতেছ।

'কৃষ্ণ' এবং 'কৃষ্ণনাম' অভিন্ন স্বরূপে থাকিয়া মহা-চৌরের কার্য্য সাধন করিতেছে। তোমার ন্যায় বিশুদ্ধ আধার পাইয়া নাম নিজ উল্লাসে (প্রয়োজনেই) তোমার জিহ্বায় অখণ্ড ভাবে নৃত্য করিতেছেন। সাধক জীবের ইহাই সাধন। 'নিরন্তর জিহ্বাতে নাম উচ্চারণ'। 'নামের' করুণায় ধীরে ধীরে সেই স্বয়ং 'নামই' (সাধকের)

হৃদয়ে আপন আসনের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবেন। তখন সেই জীব "নিজ ইষ্ট নাম'—অচেতন সচেতন সর্ব্ব অবস্থায় হৃদয়ে স্মরণ ও জিহ্বায় উচ্চারণ করিতে থাকিবে। ঐ অবস্থার গাঢ়তা ভাব আসিলে সর্ব্বত্র 'অভিষ্টের' সাক্ষাৎ পথে অগ্রগতি হইবে। তখন (স্বভাবে) অমানীকে মান দান সম্ভব হইবে। প্রাকৃত হিসাবের পথ বুঝিয়া ভজন পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই সাধক জগতে গ্রহণীয়। এখনো গৌরহরির বলা শেষ হয় নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন—

'ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে'

(চরিতামৃত)

এই সু-গম্ভীর বাণী অনুভব করিবার জন্য বিশেষ 'ধীর'* হইতে হইবে। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় যথা মতি আমরা আলোচনা করিতেছি—

রঘুনাথের 'প্রভু' বা সর্ব্বস্ব হইতেছেন 'স্বরূপ'। স্বরূপ-দামোদরের 'সেবা' বা তাঁহাকে সুখ দিতে হইলে তাঁহার প্রিয় (উপাস্য) গৌরসুন্দরকে সুখী করিতে হয়। গৌরহরিকে সুখী করিতে হইলে 'রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ' বা 'রাধাকৃষ্ণের সেবা' (সুখ বিধান) করিতে হইবে।

শ্রীরঘুনাথ অনুভব করিলেন—গৌর স্বরূপে রাধা ও কৃষ্ণের নিত্য স্থিতি, কখনও ছাড়াছাড়ি নাই। তিনি নীলাচলে। সুতরাং নীলাচল ও ব্রজভূমি অভিন্ন। সু-রসিক ভক্তবৃন্দ এই নীলাচলকে নদীয়ার 'চোরা-কুঠরী' বলেন। স্বরূপের আনুগত্যে একীভূত রাধাকৃষ্ণেরই সেবা করিতেছেন রঘুনাথ।

* চৈতন্য চরিত্র (হয়) এই পরম গম্ভীর।
সে বুঝে, তাঁর পদে যার মন 'ধীর'॥' (চরিতামৃত)

"রাত্রি দিনে করে তেঁহো 'নাম সঙ্কীর্ত্তন'।
ক্ষণ মাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ।"
—চরিতামৃত অন্ত্য ৬ষ্ঠ

আগে ত' (পরিপূর্ণ) প্রাপ্তি, তাহার পরই তো 'মানস-সম্ভোগ'! তাই, ষোড়শ বর্ষ ব্যাপী তিনি 'অন্তরঙ্গ-সেবা' করিবেন নীলাচলে। তাহার পর বাকী জীবন ঐ 'অন্তরঙ্গ-সেবার-বিরহ' শ্রীকুণ্ডতটে ভোগ করিবেন। সেই অবস্থায় গৌরাঙ্গ সেবার উপকরণ হিসাবে 'শ্রীরাধা-কৃষ্ণের' নাম-রূপ-গুণ-লীলা বন্দনাদি করিবেন।

ঠাকুর হরিদাসের চরিত্রেও "সচল জগন্নাথ" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার উপাস্য। কিন্তু, তাঁহার তিরোভাবের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত 'এ-তথ্য' গোপন ছিল। তিনি নিজে ছাড়া অন্য কেহই জানিতেন না।

ঠাকুর হরিদাসের আজীবন অন্য কোন স্মরণ মনন ছিল না। তিনি প্রত্যহ কেবল তিন লক্ষ 'মহামন্ত্র' (হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥) 'নাম' গ্রহণ করিতেন।

(এই মহামন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব দশমী দশায় রাধারাণীর শ্রীমুখে। কৃষ্ণ বিরহিনী-উন্মাদিনী রাইমণি প্রথম 'হরে' উচ্চারণে শুনিতে পাইলেন যেন 'কৃষ্ণ' কদম্ব বনে বংশী বাজাইতেছেন। পর পর নাম স্ফুরণে পূর্ব্বরাগ হইতে পর পর সব লীলাই তিনি 'প্রকট' অনুভব করিলেন। শেষ 'হরে' স্ফুরণে মহারাস বিলাস ভোগ করিলেন। তাঁহার চরম বিরহ দশার অবসান ঘটিল।)

'ঠাকুর হরিদাসের' দেহ অবসানের দিন ভক্তবৃন্দ জানিতে পারিলেন "তাঁহার সেব্যনিধি" গম্ভীরার গুপ্তনিধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এবং ঐ 'মহামন্ত্র', 'জপ' ও 'কীর্ত্তন' করিয়া তিনি আজীবন গৌরসুন্দরেরই সেবা করিয়াছেন। এবং ভাবীকালের সাধকদের প্রতি তাহার করুণা রজ্জুটি রাখিয়া গিয়াছেন। সেটি তাঁহার জীবন সাধনার 'জীবন্ত

বাণী'। তাঁহার 'সাধ্য' ও 'সাধন' বস্তু ছিল শ্রীহরিনাম। এই নামেরই পূর্ণ-মূর্ত্তি 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর'।

'হরে কৃষ্ণ নাম সাধন ফলে

প্রাণ যায় গৌরাঙ্গ বলে

'সাধ্য' সাধন' নির্ণয় হল

ঠাকুর হরিদাসের চরিতে— সাধ্য সাধন নির্ণয় হল

অনুমান নয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ

(শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়)

'ভজন-চতুর' ঠাকুর হরিদাসের কৃপাস্নাত শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীকে রঙ্গিয়া গৌরহরি (তাই) বলিযাছেন—

'ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে'

(এই প্রসঙ্গ হইতে) সাধক জীবের কি আদর্শ পথ ?

সাধকের একমাত্র কাম্য বা লক্ষ্য শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান। সাধক চিন্তা করিবেন নন্দসুত হরিই শ্রীগুরু রূপ ধারণ করিয়া এই মর-জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার আগমনের মুখ্য হেতু— শ্রীহরিবিলাস দেহে, আনুগত্যে শ্রীহরি-নাম-রূপ-গুণ-লীলা আস্বাদন। শ্রীগুরুদেবের প্রতি যদি এই ভাব জাগ্রত না হয় তবে তাহা হইবে 'আত্ম-সুখ'।

দুই দিকে নজর রাখা চাই—

(১) শ্রীগুরুদেবই আমার সর্ব্বস্ব।

(২) তাঁহার সুখের জন্যই তাঁহার অভিষ্ট মূর্ত্তির স্মরণ মনন আদি। এই দুইটির একটিকেও বাদ দিলে চলিবে না।

গৌরহরি উপসংহারে বলিলেন—

'তৃনাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তাৎপর্য্য ঃ—প্রাণের রঘু! এই বাক্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ তুমি এবং তোমার জীবন আদর্শ ভুবন পাবন ঠাকুর হরিদাস।

সাধকের (সমাগত) জীবনে 'উচ্চ হরি সঙ্কীর্ত্তনই' প্রথম কর্ত্তব্য। এই সঙ্কীর্ত্তনের করুণায় অমানীকে মান দানের স্বভাব জাগিবে। তাহার পর ঐ সঙ্কীর্ত্তন কৃপাতেই তরুর স্বভাব জাগিবে। তরু যেমন নিজের মাথায় রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়াও অন্যকে আশ্রয় দেয় ও পালন করে, নিজে শুকাইয়া মরিলেও স্থানুর স্বভাবেই কাহারও নিকট জল-কণাও প্রার্থনা করে না ও সহজেই পরম সহিষ্ণুতাগুণে অবস্থান করে। সাধকও তেমনি 'পরোপকারী ও পরম সহিষ্ণু' স্বভাব লাভ করিবে। সেই নাম সঙ্কীর্ত্তন সাধন ফলেই পরবর্ত্তী কালে 'দীনতা' স্বভাব করিবে।

তৃণ অতি তুচ্ছ পদার্থ, তাহার দীনতাও তুচ্ছ। তৃণের মাথায় পা দিলে সে নিজের অসামর্থ্যতার জন্যই পদাঘাতের চাপ সহ্য করিয়াও নম্রতা ধারণ করে। কিন্তু যখন সে চাপ সরিয়া যায় তখন সে আবার মাথাটি যথাসাধ্য উন্নত করে। প্রাকৃত বস্তুর স্বভাবই এমনি দীনতার আচরণের চিহ্ন পরিস্ফুট হইলেও তাহা কপটতা।

কিন্তু 'চিন্ময় উপচার' নাম সঙ্কীর্ত্তনের করুণায় জীবের হৃদয় কোমল হইতেও সুকোমল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 'ভক্তিরস' আসিয়া উদিত হয়। জীবের সর্ব্ব কাঠিন্য দূর হইয়া যায়। তাহার পরই 'দীনতা' বা যথার্থ নম্রতা আসে।

গৌরহরির উপদেশাবলীর ভঙ্গী ও সু-রসাল তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া রঘুনাথ অত্যন্ত উল্লসিত চিত্তে গৌরহরির শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। তিনিও রঘুনাথকে কৃপালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। এবং আর একবার স্বরূপের স্থানে সমর্পণ করিলেন। এবার একটি বিশেষ অধিকারও দান করিলেন। যথা—

"অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে" (চরিতামৃত অন্ত্য ৬ষ্ঠ)

পিতার কল্যাণেঃ

ওদিকে রঘুনাথের বিরহে হিরণ্যগোবর্দ্ধন পরিবারবর্গের সহিত শোকে মুহ্যমান হইয়া আছেন।

পাঁচ সাত মাস যাবৎ ক্রমাগত অনুসন্ধানের পর তাঁহারা হতাশ হইলেন। দুর্গম পথে রঘুনাথ একাকী নীলাচল যাইতে পারে এরূপ সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই। এই কারণে তাঁহারা নীলাচলে অনুসন্ধান করেন নাই। গৌড়ের ভক্তবৃন্দ নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যাকুল উদাসী গোবর্দ্ধনদাস একদা প্রখ্যাত সেন শিবানন্দের নিকট পত্র বাহককে পাঠাইলেন। তাঁহার মনের ভাব, যদি কোন দৈবে রঘুনাথ সত্য সত্যই নীলাচল গিযা থাকে তাহা হইলে সেন শিবানন্দের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া যাইবে। পত্র বাহক যথা সময়ে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, রঘুনাথ নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন। এবং স্বরূপের পুত্র স্থানীয় হইয়া গৌরহরির সেবা করিতেছেন। যথা—

> "রাত্রি দিনে করে তেঁহো 'নাম সঙ্কীর্ত্তন',
> ক্ষণ মাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ।"
>
> —চরিতামৃত অন্ত্য ৬ষ্ঠ

এবং রঘুর বৈরাগ্য যাজন সম্বন্ধে শুনিলেন—

> "পরম বৈরাগ্য, তার নাহি ভক্ষ্য পরিধান ;
> যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ।
> দশ দণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া,
> সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া।
> কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ ;
> কভু উপবাস কভু করেন চর্ব্বণ।"
>
> —চরিতামৃত অন্ত্য ৬ষ্ঠ

'আঃ আমার রঘুনাথ বাঁচিয়া আছে। মনের আনন্দে আছে। সকলের প্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। রঘুনাথের জন্য কুল পবিত্র হইল। আমরা ধন্য হইলাম।'—

মনে মনে এই সব বিচার করিয়া পরম বিচক্ষণ ও গম্ভীর আশায় গোবর্দ্ধনদাস রঘুনাথের জন্যই নিজেরা নীলাচলে গেলেন না। কিম্বা রঘুনাথের মাতা বা স্ত্রীকে নীলাচলে পাঠাইলেন না।

অল্প কয়েক মাস পরেই গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের 'বাৎসরিক উৎসবে' নীলাচল যাত্রা করেন। গোবর্দ্ধনদাস তাঁহাদের সহিত দুইজন সেবক, দুইজন ব্রাহ্মণ এবং চারি শত টাকা পাঠাইলেন।

নীলাচলে পঁহুছিয়াই সেবক ও ব্রাহ্মণদ্বয় হিরণ্যগোবর্দ্ধনের শিক্ষা অনুসারে রঘুনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—

'আপনার জ্যাঠামশাই, পিতা, মাতা ও স্ত্রী আপনার অদর্শনে মৃত-প্রায়। কিন্তু, আপনি তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ সেবায় অধিক আনন্দ পাইতেছেন এই অনুভবে তাঁহারা নিজেরা আসিলেন না। আমাদের পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা আপনার সুখেই সুখী হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এই সুখময় গৌর গণের সঙ্গ ছাড়িয়া আর বাড়ী ফিরিতে হইবে না। আপনি এইটুকু কৃপা করুন—

আপনার আহার্য্য ও বস্ত্রাদি, শরীর রক্ষার জন্য যাহা অবশ্য প্রয়োজন সেই দ্রব্যগুলি যখন যতটুকু দরকার গ্রহণ করুন। আমরা এখানে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিয়া সেগুলি আপনাকে যোগান দিই। এইটুকু অঙ্গীকার করিয়া পিতা-মাতার মনে সুখ দান করুন।'

(নিজ) জ্যেষ্ঠতাত, পিতা. মাতা, স্ত্রী, পরিজন সকলের স্মৃতি রঘুনাথের মনে ক্ষণিকের জন্য উদয় হইল। তাহাদের দুঃখে সান্ত্বনা ও হৃদয়ে বল দিবার জন্য মনে মনে গৌরহরির শ্রীচরণে নিবেদন জানাইলেন। তাঁহার পিতার বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, ও নির্ম্মল পুত্রস্নেহ জানিয়া মনে মনে প্রশংসা করিলেন। প্রকাশ্যে

ব্রাহ্মণ ও সেবকদের বলিলেন—“অপ্রাকৃত চিন্ময় প্রেম শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ কমলের সেবায় আমি এখানে আসিয়াছি। পিতা মাতার পুণ্যে ও আশীর্ব্বাদেই তাহা পাইয়াছি। তাঁহাদের শ্রীচরণে শত শত দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইবেন। অপ্রাকৃত আনন্দের মধ্যে অন্য কোন বিজাতীয় বস্তুর প্রতি আমার রুচিও নাই এবং প্রয়োজনও নাই। আপনারা বাড়ী ফিরিয়া যান।”

রঘুনাথের এইরূপ উত্তর পাইবার পর একজন ব্রাহ্মণ ও একজন সেবক (গোবর্দ্ধনদাসের পূর্ব্ব আদেশ মতে) রঘুনাথের ঐ সু-দৃঢ় অভিমত ও স্বভাব বৈরাগী রঘুনাথের নীলাচলবাসের মধুর মধুর আচরণ সমূহের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সপ্তগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। অবশিষ্ট দুই জন মুদ্রাসহ নীলাচলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথের শোকাতুরা মাতা, বিরহিনী স্ত্রী, মহা দুঃখী পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত নীলাচল হইতে প্রত্যাগত ব্রাহ্মণ ও সেবকের মুখ হইতে গত এক বৎসব যাবৎ রঘুনাথের নীলাচল বাসের বিভিন্ন সংবাদ ও ঘটনা গভীর মনোযোগেব সহিত শুনিলেন। কোন অজ্ঞাত করুণায় তাঁহাদের হৃদযের ভার লাঘব হইল। এত শোক তাপ ও দুঃখের মধ্যেও তাঁহাবা প্রত্যেকেই একটা অনীর্ব্বচনীয আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। অতঃপর রঘুনাথের প্রসঙ্গই তাঁহাদের জীবাতু হইল।

এই কারণেই যাবৎ-জীবন হিরণ্যগোবর্দ্ধন নীলাচলগামী গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সঙ্গে প্রতি বৎসরই সেবক' পাঠাইতেন। ঐ সেবক নীলাচলে রঘুনাথের অগোচরে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সহিত চারিমাস কাল নীলাচলে অবস্থান করিয়া রঘুনাথের নব নব বিবিধ চেষ্টা ও বিভিন্ন আচরণের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের গোষ্ঠি মধ্যে বর্ণনা করিতেন।

গর্ভধারিনী মাতা ও জন্মদাতা পিতার পারমার্থিক কল্যাণ

কামনায় রঘুনাথ দুই বৎসর কাল গৌরহরিকে মাসে দুইবার নিমন্ত্রণ করিতেন। সেই নিমন্ত্রণে প্রতিমাসে যে কৌড়ী ব্যয় হইত তাহা তিনি পিতার প্রেরিত সেবকদের দ্বারা নির্ব্বাহ করাইতেন।

ভক্তি রাণীর করুণায় একদা রঘুনাথের অকস্মাৎ বিচার আসিল—"ধিক আমাকে! বিষয়ী পিতার ধন দ্বারা প্রাণ-গৌরের সেবা করিতেছি। ইহা কি বিশুদ্ধ আচরণ? গৌরহরির মুখেও ত উল্লাস দেখি না। তাছাড়া, আমার এ আচরণের ফল তো 'প্রতিষ্ঠা।"

এইরূপ বিচার মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থির করিলেন এই ব্যবহার ত্যাগ করিতে হইবে। দৃঢ়চিত্ত রঘুনাথ অতঃপর পিতার ধনে গৌরহরিকে ভিক্ষাদান বন্ধ করিলেন।

পর পর দুইটি নিমন্ত্রণ বাদ পড়ায় গৌরহরি একদা সহাস্যে স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্বরূপ! কি ব্যাপার? তোমার রঘু আমার মহাপ্রসাদের নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিলা।"

'স্বরূপ' নিমন্ত্রণ বন্ধের হেতুর বিবরণ দিলেন।

এবার, রঙ্গিয়া গৌরহরি মৃদু মধুর হাসিয়া বলিলেন—

'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥' —চরিতামৃত

আর একবার প্রকাশ পাইল যে, প্রেমধন রক্ষার আদর্শ পাত্র রঘুনাথ।

বৈরাগ্যের ক্রম প্রকাশঃ

গৌড়দেশীয় ভক্তবৃন্দ (প্রতি বর্ষে) যে চারি মাস নীলাচলে থাকিতেন সে কয় মাস প্রতি দিনই বিরাট উৎসব হইত। নদীয়া

ও নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ প্রায় সকলেই সেই উৎসবে প্রসাদ পাইতেন। রামাই শঙ্কর, আদি গৌরগোষ্ঠির সেবকবৃন্দ এই সব উৎসবে হাট বাজার, জল, বাসন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের সেবক ও সাথী। এবং সেই সব উৎসবে তাঁহারাও প্রসাদ পাইতেন।

আবার প্রতি বৎসরের বাকী সাত আট মাস সময়ের মধ্যে—

(১) নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ যে সব দিন গৌরহরিকে সগোষ্ঠি নিমন্ত্রণ করিতেন

এবং

(২) রঘুনাথ ভট্ট, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি আদি ভক্তবৃন্দ নীলাচলে আসিতেন—

সেই সব ভক্তের হাট বাজার, জল, বাসন মার্জ্জন, কাঠ, রসুই আদি সর্ব্ব প্রকার প্রয়োজনাবলীর সু-সমাধানের জন্য গৌর-গোষ্ঠির সেবকবৃন্দ (রঘুনাথ রামাই শঙ্কর আদি) নিযুক্ত থাকিতেন। ঐ সব দিনগুলিতে উৎসব স্থানে "রঘুনাথ" ও অন্যান্য সেবকবৃন্দ প্রসাদ পাইতেন।

চতুর্থ বর্ষের প্রথমদিক হইতে সিংহদ্বারের ভিক্ষাবৃত্তিও তিনি ত্যাগ করিলেন। ঐ বৃত্তিতে দুইটি প্রধান অন্তরায় আসিতেছে (রঘুনাথ) ইহা মনে প্রাণে অনুভব করিলেন। যথা—প্রথমতঃ উত্তম উত্তম বস্তু দ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ* প্রস্তুত হয়। এসব সু-স্বাদু উপাদান জিহ্বার প্রাকৃত সংস্কারের লালসাকে বাড়াইয়া দিতে সহায়তা করে।

দ্বিতীয় ঃ—সিংহদ্বারে অযাচক বৃত্তিতে দাঁড়াইয়া থাকা কালে মন্দির হইতে জগন্নাথের সেবক ও বিভিন্ন ভক্ত সামনে দিয়া গমন

* জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদে যে অপ্রাকৃত আস্বাদ থাকে সাধক-দশায় 'জীব' তাহা সঠিকভাবে ধরিতে পারে না। প্রাকৃত বস্তু ও রন্ধন পরিপাটি বোধই প্রসাদ গ্রহণ সময়ে সাধক ভোগ করে। যেমন ভোগ, তদনুরূপ দৃষ্টি ও ক্রিয়া হইবে।

করে। ঐসব সেবকেরা দৃষ্টিপথে পড়িলেন মনে আশা জাগা স্বাভাবিক যে, 'ইনি আমায় কিছু দেবেন।' তিনি তাহা না দিয়া চলিয়া গেলে মনে হয়—'কৈ দিল না ত?' আবার পরক্ষণে অন্য একজনের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। তিনি হয়ত খুব সামান্য দিলেন, ফলে মন প্রসন্ন হইল না। আবার হয়ত অন্য কেহ পরিমাণে বেশী দিলেন কিন্তু তাহার সহিত অন্য কোন একটা ক্রুটী মনে আসিতে পারে। ইত্যাদি 'বিবিধ মানসিক উদ্বেগ' এবং সর্ব্বোপরি ঐসব ভুবন-পাবন জগন্নাথ সেবকদের 'নিন্দা' বা 'প্রশংসা' রূপ বিচার—অপরাধের জনক।

(সাধক দশায়) 'জিহ্বার লালসা' ও 'ঈশ্বরের সেবকবৃন্দের আচরণে বিচার' এ দুইই স-যত্নে বর্জ্জনীয়। সেই কারণেই এই 'অযাচক বৃত্তি' অনর্থের জনক, ইহা আচরণের দ্বারা (সাধককে) বুঝাইয়া ইহা—হইতে কম অপরাধের পথে জীবন নির্ব্বাহ ব্যবস্থা করিলেন।

অতঃপর রঘুনাথ ছত্রে ছত্রে মাগিয়া খাইতে লাগিলেন। সে সময় বহু ধনী বিষয়ী ব্যক্তি ভিক্ষুককে কিছু দান করা পুণ্য কার্য্য হিসাবে নিজ নিজ ব্যয়ে অন্নছত্র স্থাপন করিযাছিলেন। ঐসব ছত্রে দিবসের মধ্যে কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিত, সেই সময় যে কোন ভিক্ষুক, উদাসী কিম্বা 'অযাচক' উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সকলকেই প্রসাদ দেওয়া হইত। সিংহদ্বারের মত বিশেষ পরিপাটির প্রসাদ থাকিত না। ছত্রের এই প্রকার অন্নে জীবন ধারণ হয় এবং জিহ্বার লালসা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই সব 'ছত্র' বিষয়ীদের অর্থে পরিচালিত। বিষয়ীর সংস্পর্শ ঘটিলেই 'ভক্তিদেবী' সঙ্কুচিত হইয়া দূরে পলায়ন করেন। ভক্তি-ধনের উল্লাস বর্দ্ধন করিতে হইলে 'বিষয়' এবং 'বিষয়ীর সম্পর্ক'ও ত্যাগ করিতে হইবে। এই আদর্শ স্বীয় আচরণের দ্বারা সাধক-জীবের আদর্শ পথ প্রদর্শকরূপে রঘুনাথ অতঃপর ছত্রে ছত্রে ভিক্ষা ত্যাগ করিলেন।

ইহার পর রঘুনাথ যে আদর্শের পথ গ্রহণ করিলেন সেটি সু-গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ। সিংহদ্বারে অযাচক বৃত্তি ত্যাগ, ছত্রে ছত্রে ভিক্ষা ত্যাগ অন্তে জীবন ধারণের যে উপায় অবলম্বন করিলেন তাহা কোন সাধারণ বা অসাধারণ সাধকের স্বপ্নেও আসিতে পারে না। রঘুনাথের আত্মিক আদর্শ এক পরম বিচিত্র রূপে দেখা দিল।

অতঃপর রঘুনাথ রাস্তায় রাস্তায় নিক্ষিপ্ত পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত 'অন্ন-মহাপ্রসাদ' হইতেই জীবন ধারণের আহার্য্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের বহুবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়। যাঁহারা ঐ সমস্ত 'প্রসাদ' বিক্রয় করেন তাঁহাদিগকে 'পসারী' বলা হয়। যে সব 'অন্ন-মহাপ্রসাদ' দুই তিন দিনেও বিক্রয় হইত না—তাহা দান করিলেও কেহ লইবে না জানিয়া 'পসারীরা' ঐসব 'অন্ন-মহাপ্রসাদ' রাজপথের পার্শ্বে গাভীদের মুখের সামনে ঢালিয়া দিতেন। কিন্তু সেগুলির এমন অবস্থান্তর ঘটিত যে গাভী-গণেও ঐসব মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিত না। রাস্তাতেই পড়িয়া থাকিত। আমাদের রঘুনাথ রাত্রির বিরল লোক চলাচলের সময় ঐ অন্ন-মহা-প্রসাদই কুড়াইয়া নিজ কুটিরে লইয়া আসেন। বহু পরিমাণে জল দিয়া সেই সকল পর্য্যুসিত 'অন্ন'গুলি ধুইয়া আহার্য্য অন্ন সংগ্রহ করেন। লবণ দিয়া ঐ 'অন্ন' ভোজনে প্রাণ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথ ও স্বরূপ একই কুটিরে বাস করেন। রঘুনাথের মহা প্রসাদে (আলোকিক) নিষ্ঠা ও জীবন ধারণের অভূতপূর্ব্ব চেষ্টা দেখিয়া স্বরূপ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। 'হা গৌর! প্রাণ গৌর!' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সংগ্রহ করা এই অভূতপূর্ব্ব মহাপ্রসাদে স্বরূপের অত্যন্ত লোভ জন্মে। সেই লোভে একদিন তিনি রঘুনাথের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ 'ঐ মহাপ্রসাদ' চাহিয়া লন। আস্বাদনে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়া তিনি বলিলেন—

"ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি ,
আমা সবায় নাহি দাও কি তোমার প্রকৃতি ?'
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

এই অপরূপ সংবাদ একদা গম্ভীরার গুপ্তনিধি গৌরহরির কর্ণ গোচর হইল। মহাভোগী গৌর। **অশেষ বিশেষ ভোগের জন্যই এই 'ছন্ন অবতার।** তিনিও লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সেই রাত্রেই হঠাৎ স্বরূপের বাসায় আসিলেন। প্রণয় কোন্দলে 'স্বরূপ' ও 'রঘুনাথ' উভয়কেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন--

'তোমরা ত' খাসা (সু-উত্তম) বস্তু খাও। আমায় কেন অংশ দ ও না ?' এই বলিয়াই ঠিক লোভাতুরের আগ্রহে স্বহস্তে রঘুনাথের সংগৃহীত ধৌত মহাপ্রসাদের একটি 'গ্রাস' গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় গ্র স গ্রহণের জন্য পুনরায় হস্ত প্রসারণ করিতেছেন দেখিয়া স্বরূপ তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিলেন। গৌরহরি উল্লাসের সহিত বলিলেন—

"নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই ;
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই।"
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

সোনার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর 'এই প্রশংসা' কি অতি স্তুতি ?

ব্যবহারিক দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে—

নিজ প্রিয়ের প্রতি 'প্রীতির ক্ষুধা' যেমন যেমন বাড়ে তাহার সম্পর্কীয় বস্তুতেও সেই পরিমাণে স্বাদ বা অনুরাগও সহগামী হইয়া থাকে। এ ছাড়াও মহাজনদের বাক্যও আছে—

'প্রেম ভুখা-প্রাণ গৌরাঙ্গ উপচারের বাধ্য নয়।'

সুতরাং গৌরও তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—স্বরূপের উপরোক্ত প্রশংসা যথার্থ ও তাঁহাদের অন্তরের অনুভব।

সপ্তম তরঙ্গ

ভূমিকা

'পরমকরুণ গৌরহরির ভক্ত অসংখ্য। তাঁহারা প্রত্যেকেই 'পতিত-পাবন', প্রত্যেকেই 'পরম প্রেমিক', প্রত্যেকেই 'পরম-রসিক'। প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইয়া সময় সময় যেমন মরুভূমিকেও ভাসাইয়া ডুবাইযা ফেলে, তদ্রূপ গৌরহরির নীলাচল বিহারকালে, গৌর-ভক্ত-বৃন্দ প্রত্যেকেই রাধা প্রেমের প্রবাহ বহাইয়া সংসার কূপে পতিত জনগণের কৃষ্ণ বিমুখতারূপ শুষ্ক নীরস চিত্তকে বা অভক্ত পতিতদের চিত্তকে প্রেমে পরিপ্লাবিত করিয়াছেন।*

'সচল-জগন্নাথ' গৌরহরিকে দর্শন করিতে নীলাচলে যান নাই—এমন গৌড়ীয় ভক্ত অতি বিরল; সকলের কথা 'গ্রন্থে' বিস্তারিত লিখিত নাই। মহাজনগণ সূত্ররূপে কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন।

"দাস গোস্বামী" এমন এক অপূর্ব্ব 'মহান-চরিত্র' যে তিনি স্বরূপ-দামোদরের আনুগত্যে গৌর-গোষ্ঠি মধ্যে সুদীর্ঘ ষোড়শ বর্ষ ব্যাপী—নীলাচলবিহারী গৌরহরির 'অন্তরঙ্গ সেবা' এবং সঙ্গ-সুখ লাভ করিযাছিলেন। ফলে, তৎকালে (ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে) যে সমস্ত গৌর ভক্তবৃন্দ †চার ব্রহ্মের বিহার ভূমি মধুর নীলাচলে

---

* অগণ্য ধন্য চৈতন্যগণানং প্রেমবন্যযা।
নিন্যোঽধন্যজন-স্বান্ত-মরুং শশ্বদনূপতাম্॥
(শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

† 'সচল ব্রহ্ম গৌরহরি। অচল ব্রহ্ম জগন্নাথ। দুই স্বরূপের দুই দান—সচল দানে নাম-ব্রহ্ম, অচল দানে অন্ন-ব্রহ্ম। মধুর-নীলাচল মণি—'চার ব্রহ্মের বিহার ভূমি।'

আসিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই 'পুত্র' ও 'ভৃত্যরূপে সেবা করার সৌভাগ্য (তিনি) লাভ করেন। এ হেন সু-দুর্লভ সৌভাগ্য অন্য কোন গৌর পরিকরের ভাগ্যে ঘটিয়াছে এমন কথার উল্লেখ কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর সু-মহান চরিত্রের দিক্‌দর্শনে সহায়তা করে, এইরূপ কয়েকটি গৌর ভক্তবৃন্দের চরিত্র (আংশিক প্রসঙ্গাবলী) এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইতেছে। যে কয়েকটি প্রখ্যাত চরিত্র গ্রহণ করা হইল তাঁহাদের তালিকা—

১) শ্রীরূপ প্রসঙ্গে
২) শ্রীসনাতন প্রসঙ্গে
৩) রায় রামানন্দ প্রসঙ্গে
৪) গদাধর পণ্ডিত প্রসঙ্গে
৫) বল্লভ ভট্ট প্রসঙ্গে
৬) ঠাকুর হরিদাস প্রসঙ্গে
৭) জগদানন্দ প্রসঙ্গে
৮) রঘুনাথ ভট্ট প্রসঙ্গে
৯) বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসঙ্গে

শ্রীরূপ প্রসঙ্গে ঃ

গৌরহরির সন্ন্যাসের সপ্তম কি অষ্টম বর্ষে শ্রীরূপ নীলাচলে আসিয়া দশ মাস ঠাকুর হরিদাসের কুটিরে অবস্থান করেন। গৌরহরি স্বরূপাদির সঙ্গে নিত্য তাঁহাকে দর্শন দানে ও মধুর প্রসঙ্গে কৃতার্থ করিতেন। রঘুনাথ গৌরহরির সন্ন্যাসের নবম বর্ষে নীলাচলে

আগমন করেন। সুতরাং তিনি শ্রীরূপের দর্শন পাইয়াছিলেন কি না সঠিক বলা যায় না।

শ্রীরূপের সহিত গৌরহরির বিবিধ ইষ্ট গোষ্ঠি, যথা—যঃ কৌমার হরঃ শ্লোক প্রসঙ্গ, 'প্রিয় সোহয়ং' শ্লোক প্রসঙ্গ, ঠাকুর হরিদাসের কুটীরে গৌরহরি ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ সম্মুখে প্রখ্যাত 'ললিত মাধব' ও 'বিদগ্ধ মাধব' নাটকদ্বয় আস্বাদন প্রসঙ্গ আদির 'মর্ম্ম' বা তাৎপর্য্য সহিত স্বরূপ গোস্বামী নিজ প্রাণ প্রিয় পুত্র ও ভৃত্য রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন। স্বরূপের করুণায় তিনি মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন যে—

(১) নিগম নিগূঢ় শ্রীচৈতন্যের মনোবৃত্তি প্রকাশ শ্রীরূপের হৃদয়ে।

(২) গৌরের মনোবৃত্তি মুরতি ধ'রে শ্রীরূপ গোস্বামী রূপে বিহরে

রঘু নিজ স্বভাবে এবং গৌরহরির দ্বিতীয় দেহ স্বরূপের উপদেশ ক্রমে শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত নিম্নলিখিত ইষ্টবন্দনা শ্লোক দুইটি তাঁহার যাবৎ জীবন প্রত্যহ প্রাতঃকালীন সর্ব্বপ্রথম ইষ্ট বন্দনা রূপে সুস্বরে স্বকণ্ঠে গীত উচ্চারণ করিয়াছেন।

(১) অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পযতু মুন্নতোজ্জ্বলরসাং সভক্তি শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

—বিদগ্ধমাধব ১।২

অনুবাদ :—চির অনর্পিত উন্নত উজ্জ্বলরসবিশিষ্ট নিজের সেই ভক্তি দান করিবার নিমিত্ত কৃপায় যিনি (এই) কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্বর্ণ হইতেও মনোরম দ্যুতিসমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত, আমার হৃদয়নিকেতন শচীদুলাল গৌরহরি তোমাদের হৃদয় কন্দরে স্ফূরিত হউন।

(২) নিজপ্রনয়িতাং সুধামুদয়মাপ্লুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃত দ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্ম্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥

--ললিতঃ মাধব ১।২

অনুবাদ ঃ—যিনি জগতে (মায়া কবলিত) জীবের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া নিজ বিষযক প্রেম রূপ সুধা বিতরণ করিতেছেন, যিনি সমুদার ব্রাহ্মণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি জগতের অজ্ঞান রূপ অন্ধকার বিনষ্ট করিতেছেন, এবং জগৎবাসীর মনকে স্বীয়, রূপ, গুণ, লীলা দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন সেই শচীমাযের নয়নতারা গৌবহরি সকলের চিত্তে অনির্ব্বচনীয় সুখ দান করুন্।

সনাতনকে নিমিত্ত করিযা গৌরহরি বলিযাছেন—
'কুবুদ্ধি ছাডিয়া কর শ্রবণ 'কীর্ত্তন'।'

গৌরহরিব মনোবৃত্তি শ্রীরূপ গোস্বামী—সনাতন গোস্বামীর প্রতি 'কর—শ্রবণ' 'কীর্ত্তন' রূপ আদেশটি তাঁহাব জন্যও প্রযোজ্য, ইহা মানিয়া লইযা, তাঁহাদের উভয ভ্রাতার কীর্ত্তন জন্য তিনটি অষ্টকে গৌরহরির তিন অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। প্রথম অষ্টকে গম্ভীরার গুপ্তনিধির পুরুষোত্তম ধামে অবস্থানকালীন বর্ণনা, দ্বিতীয় অষ্টকে পুরুষোত্তম হইতে জননী দর্শনের জন্য গৌডে আগত গৌরের বর্ণনা এবং তৃতীয অষ্টকে আবার নীলাচল বিরাজমান বিরহিনী গৌব কিশোরার বর্ণনার স্থান পাইয়াছে।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী ব্রজে যাইবার পর যেদিন রূপ বা সনাতন সঙ্গে থাকিতেন সেদিন তাঁহাদের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া চোখের জলে মুখ বুক ভাসাইয়া ঐ অষ্টক তিনটি আবৃত্তি করিতেন এবং যেদিন একাকী থাকিতেন সেদিন নিজেই ঐ অষ্টক তিনটি রূপ, সনাতন

ও গৌরের বিরহ প্রশমন জন্য চোখের জলে ভগ্ন কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেন।

বর্ত্তমান কালেও দেখা যাইতেছে যে, কি গৃহী কি সন্ন্যাসী সমস্ত বৈষ্ণবেই প্রত্যহ শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা আদি কীর্ত্তন পাঠ করেন। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপা প্রেরণায় আমাদের মনে জাগে যে, গৌরহরির প্রকট বিহার সময় হইতে এ ধারা প্রবর্ত্তিত। এবং সে সময়ে বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত নিচে উদ্ধৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টক তিনটি প্রত্যহ কীর্ত্তন বা পাঠ করিতেন।

শ্রীচৈতন্যাষ্টক

(১)

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদম্ ॥ ১ ॥

শিব-বিরিঞ্চি আদি দেবতা নিকর।
নরবপু ধরি যাঁরে সেবে নিরন্তর॥
স্বরূপ দামোদরাদি ভক্তগণে যিনি।
নিজ ভজন প্রণালী উপদেশ দানি'—
কৃতার্থ করিলা ; সেই সৌন্দর্য্য আধার।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার॥ ১ ॥

সুরেশানাং দুর্গং ; গতিরতিশযেনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ২

ইন্দ্রাদি সুরবর ভয়ত্রাতা যিনি।
উপনিষদ বেদাদির লক্ষ্য যাঁরে মানি॥
মুনিঋষি সাধু-হৃদি-সরবস ধন।
ভক্তের সদনে যিনি মধুময় হ'ন।
ব্রজবালা সকলের যিনি প্রেমসার।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার॥ ২॥

স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈতদযিতঃ
প্রপন্ন শ্রীবাসো জনিতপরমানন্দগরিমা।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতিকৃপোৎসেকতরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৩॥

যাঁর কৃপাপাত্র স্বরূপ মহামতি।
যিনি হ'ন অদ্বৈতের প্রিয়তম অতি॥
ভক্তবর শ্রীবাস যাহাতে প্রপন্ন।
পরমানন্দের যিনি বাড়াইলা মান্য॥
মায়াহারী দীনগতি জগত ঈশ্বর।
উদ্ধারিতে গজপতি করুণা বিস্তার॥
সর্ব্বগুণনিধি যিনি অবতার সার।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার॥ ৩॥

রসোদ্দামা কামার্ব্বুদমধুরধামোজ্জ্বলতনু
র্যতিনামুত্তংসস্তরণিকরবিদ্যোতিবসনঃ ।।
হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিকরুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ।। ৪

ভক্তিরসানন্দাবেগে উনমত যিনি ।
অঙ্গ কান্তি হয় অর্ব্বুদ কন্দর্প জিনি ।।
মুনিঋষি শিরোমণি সর্ব্ব অর্থ সার ।
প্রভাত অরুণরশ্মি বসনাভা যাঁর ।।
কনক কান্তি যিনি অধর কান্তি যাঁর ।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার ।। ৪ ।।

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃতগ্রন্থিশ্রেণীসুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজেঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ।। ৫ ।।

উচ্চারিতে হরেকৃষ্ণ যাঁহার রসনা ।
নৃত্য করে অবিরত হ'য়ে একমনা ।।
গ্রন্থিকৃত কটিসূত্র নাম গণিবারে ।
সুশোভিত সুন্দর বাম করে ধরে ।।
বিশালাক্ষ আজানুলম্বিত ভুজ যাঁর ।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার ।। ৫ ।।

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনমালীকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ ।

ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনবপি দৃশোর্যস্যতি পদম ৬ ।।

হেরিয়া সমুদ্র তীর রম্য উপবন ।
হৃদয়ে হইত যাঁর স্মৃতি বৃন্দাবন ।
অধৈয্য হইয়া নৃত্য প্রেমানন্দ ভবে ।
বসনা যাঁহাব সদা কৃষ্ণনাম কবে ।।
ভকতি রসিক সেই 'বস অবতার' ।
কবে দিবে দবশন চৈতন্য আমাব ।। ৬ ।।

বথাক্রুঢস্যাবাধিপদবি নীলাচলপতে-
বদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পবিবৃততনুবৈষ্ণবজনৈঃ ।
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ।। ৭ ।।

বথারূঢ জগন্নাথ দেবের সম্মুখে ।
যখন বৈষ্ণব পথে নৃত্য কবে সুখে ।।
তা' সবাব সঙ্গী হ'যে নৃত্যোল্লাসে যিনি ।
পুলকে বিবশ অঙ্গ দিবস যামিনী ।।
মনের হরিষে যিঁহো নাচে বহুবার ।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমাব ।। ৭ ।।

ভূবং সিঞ্চন্নশ্রুস্রুতিভিবভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপস্তবকনবকিঞ্জল্কজয়িভিঃ ।
ঘনস্বেদস্তোমস্তিমিততনুরুৎকীর্ত্তনসুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপিদৃশোর্যাস্যতি পদম্ ।। ৮ ।।

ধরাতল সিক্ত করি প্রেমাশ্রু ধারায়।
কীর্ত্তন আনন্দে যিঁহো জগত ভাসায় ॥
কদম্বকেশর জিনি পুলক শরীরে।
সর্ব্বশরীর সিক্ত ঘন ঘর্ম্মনীরে ॥
নয়নানন্দকর প্রেম মূরতি যাঁহার।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার ॥ ৮ ॥

অধীতে গৌরাঙ্গস্মরণপদবীমঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রম্ভস্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্।
পরানন্দে সদ্যস্তদমলপদাম্ভোজযুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেমলহরী ॥ ৯ ॥

বুদ্ধিমান সুধীজন শ্রদ্ধাসহকারে।
চৈতন্য অষ্টক যদি নিত্য পাঠ করে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম হৃদে উছলিবে তা'র।
রূপ গোসাঞির এই প্রার্থনা সার ॥ ৯ ।

শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচলে দশমাস অবস্থান কালে গৌরহরির যে সকল মধুর মধুর লীলা ও শ্রীঅঙ্গে বিকারাবলি সচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, সেইগুলি, 'অক্ষরে যতদূর প্রকাশ করা যায় তাহা এই অষ্টকে দেখা যায়।

গৌর সঙ্গ হারাইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তাঁহাদের ব্রজবাস কালে 'প্রতিটি দিন' এই অষ্টকটি আবৃত্তি করিতেন ও ব্রজের 'রজে' গড়াগড়ি দিয়া উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করিতেন।

বিরহ উপশমের একমাত্র উপায় 'মিলন প্রসঙ্গ'

তাই, নিজেদের গৌর বিরহ উপশমের জন্য শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন এই 'মহৌষধি' নিত্য পান করিতেন।

আমাদের রঘুনাথ তাঁহার ব্রজবাস কালে 'শ্রীরূপ হৃদকেতন' ও 'শ্রীসনাতনের গতি' গৌরহরির বিরহ জ্বালা উপশম জন্য স্বরচিত গৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরু এবং শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের বিরহ জ্বালা উপশম জন্য এই অষ্টকটি নিত্য বা অপতিত ভাবে আবৃত্তি করিয়া ব্রজের রজে গড়াগড়ি যাইবেন।

(২)

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমাভযজন্তে দ্যুতিভরা
দকৃষ্ণং কৃষ্ণাঙ্গংমখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রনজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১ ॥

কলিযুগে সুধীগণ 'নাম যজ্ঞে' যাঁরে।
ভক্তিভরে নিরবধি উপাসনা করে ॥
কৃষ্ণ হ'যে গৌর যিনি রাধাকান্তি ভারে।
চতুর্থাশ্রমী পরম হংস নিত্য পূজে যাঁরে।
পবম পুরুষ সেই পরমেষ্ঠি গুরু।
শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু ॥ ১ ॥

চরিত্রং তন্বানঃ প্রিয়মঘবদাহ্লাদনপদং
জয়োদঘোষৈঃ সম্যগ্ বিরচিতশচীশোকহরণঃ।
উদঞ্চন্মার্ত্তণ্ডদ্যুতিহরদুকূলাঞ্চিতকটিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ২ ॥

হরিনাম সংকীর্ত্তনে ভক্ত গৃহে গৃহে।
স্বনাম ঘোষণা করি ফিরে রাত্রি দিবে॥
শোকাতুরা জননীর দুঃখ গেল দূরে।
অরুণ বসন যাঁর কটিশোভা করে॥
পরম পুরুষ সেই পরমেষ্ঠি গুরু।
শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু॥ ২॥

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ৩॥

ব্রজবালা রূপকান্তি সুধা অপহরি।
আস্বাদিতে মধুরস মনপ্রাণ ভরি॥
স্বরূপ গোপন করি' গৌররূপে যিনি।
মাতাইলা চরাচর অখিল মেদিনী॥
পরম পুরুষ সেই পরমেষ্ঠি গুরু।
শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু। ৩।

অনারাধ্য প্রীত্যা চিরমসুরভাবপ্রণয়িনাং
প্রপন্নানাং দৈবীং প্রকৃতিমধিদৈবং ত্রিজগতি।
অজস্রং যঃ শ্রীমান্ জয়তি সহজানন্দমধুরঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ৪॥

তামসী দেবতাসেবী বুদ্ধিজ্ঞানহারা।
অসুরের ভাবযুক্ত ব্রাহ্মণ যাঁহারা॥

(তাঁ'দের) অনুপাস্য হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দর।
শুদ্ধমতি দ্বিজ পূজ্য নিত্য নিরন্তর ॥
সহজ আনন্দময় পরমেষ্ঠি গুরু।
শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু ॥ ৪ ॥

গতির্যঃ পৌণ্ড্রাণাং প্রকটিতনবদ্বীপমহিমা।
ভবেনালংকুর্ব্বন্ ভুবনমহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্।
পুনাত্যঙ্গীকারাদ্ভুবি পরমহংসাশ্রমপদং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫

পুণ্ড্রদেশ ভক্তগণ যিঁহো নিস্তারিল
নদীয়া মহিমা রাশি যিঁহো প্রকাশিলা।
বেদোজ্জ্বল বিদ্যাবান বংশে জনমিলা
জগৎপূজ্য হইলেন বংশ উজলিয়া ॥
অঙ্গীকার করি পরমহংসাশ্রম।
পবিত্র করিলা ভক্তি শিখাইয়া উত্তম।
পরম পুরুষ সেই পরমেষ্ঠি গুরু
শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু। ৫

মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃতরসং
দৃশোর্দ্বারা যস্তং বমতি ঘনবাষ্পাম্বুমিষতঃ।
ভুবি প্রেম্ণস্তত্ত্বং প্রকটয়িতুমুল্লাসিততনু
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৬ ॥

'হরিনামামৃতরস' পান করি' মুখে।
অশ্রু ছলে উঘারয়ে সেই রস আঁখে ॥

প্রেমে উল্লসিত তনু প্রেমতত্ত্বসার।
জগজনে শিক্ষা দিতে চেষ্টা অনিবার ॥
পরম পুরুষ সেই পরমেষ্ঠি গুরু।
শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু ॥ ৬ ॥

তনুমাবিষ্কুর্ব্বন্ নবপুরটভাসং কটিলসৎ-
করঙ্কালঙ্কারস্তরুণগজরাজাঞ্চিতগতিঃ।
প্রিয়েভ্যো যঃ শিক্ষাং দিশতি নিজনির্ম্মাল্যরুচিভিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।

[পথে গমন করিলে সকলেই আমাকে দেখিতে পাইবে, এই ভাবে যিনি করুণা করিয়া তীর্থযাত্রায় চলিয়াছেন।] তৎকালে যিনি অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল শ্রীমূর্ত্তি আবিষ্কৃত করিয়াছেন, যাঁহার কটিতে নারিকেল মালার জলপাত্র অলঙ্কারের মত শোভা পাইতেছে। যুবক গজরাজের মত যিনি ভাবভরে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছেন।

[তীর্থপথে দেবালয়ে দেবালয়ে] শ্রীভগবানের প্রসাদ ও মাল্যাদি নির্ম্মাল্যে অনুরাগ দেখাইয়া যিনি আপন প্রিয়বর্গকে—"তোমরাও এইরূপে ভগবন্নির্ম্মাল্যে আদর করিও" এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, সেই চৈতন্যকৃতি দেবতা আমাদিগের প্রতি অতিশয় করুণা বিস্তার করুন।' —শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

স্মিতলোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।

পদালম্ভঃ কংবা প্রণযতি নহি প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়া ।। ৮ ।।

সর্ব্বশোক হরে যাঁর কটাক্ষ কৃপায় ।
ভুবন মঙ্গল ভাষে জীবেরে নাচায় ।।
পদাশ্রয়ে হয় যাঁব কৃষ্ণো প্রেমোদয় ।
সর্ব্বঅবতাব সার গৌবরসময় ।।
পরম পুরুষ সেই পরমেষ্ঠি গুরু ।
শ্রীচৈতন্য দযাময মোরে দয়া করু ।। ৮ ।।

শচীসূনোঃ কীর্ত্তিস্তবকনবসৌরভ্যনিবিড়ং
পুমান্ যঃ প্রীতাত্মা পঠতি কিল পদ্যাষ্টকমিদম্ ।
সলক্ষ্মীবানেতং নিজপদসবোজে প্রণযিতাং
দদানঃ কল্যাণী মনুপদমবাধং সুখযতু ।। ৯ ।।

"গোবা" গুণগন্ধবাহী পুণ্য পদ্যাষ্টক ।
প্রীতমনে যেইজন পাঠ কবিবেক ।।
পরম কল্যাণ তার হইবে নিশ্চয ।
দয়াময শ্রীগৌরাঙ্গ দিবে পদাশ্রয ।। ৯ ।।

(৩)

উপাসিতপদাম্বুজস্ত্বমনুরক্তরুদ্রাদিভিঃ
প্রপদ্য পুরুষোত্তমং পদমদভ্রমুদ্ভ্রাজিতঃ ।
সমস্তনতমণ্ডলীস্ফুরদভীষ্টকল্পদ্রুমঃ
শচীসুত ! মযি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মন্দে কৃপাম্ । ১

রুদ্রাদি দেবতাগণ নররূপ ধরি।
যাঁর পদ সেবা কৈলা বহু যত্ন করি॥
জগন্নাথক্ষেত্রে যিনি ভ্রমেন আনন্দে।
অভীষ্ট ফল দেন নিজ ভক্তবৃন্দে॥
মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহাপ্রভু! মোরে দয়া কর॥ ১॥

ন্থু বর্ণয়িতুমীশতে গুরুতরাবতারায়িতা
ভবন্তমুরুবুদ্ধয়ো ন খলু সার্ব্বভৌমাদয়ঃ।
পরো ভবতু তত্র কঃ পটুরতো' নমস্তে পরং
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্॥ ২॥

স্বরূপবর্ণনে যাঁর সমর্থ না হয়।
সার্ব্বভৌমাদি পণ্ডিত নিচয়॥
ব্যাস বৃহস্পতিসম সূক্ষ্মবুদ্ধি সুধী।
গুণানুসন্ধানে যাঁর না পান অবধি॥
মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহাপ্রভু! মোরে দয়া কর॥ ২॥

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্গুরুতরাবতারান্তরে।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে! তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্॥ ৩॥

বেদ উপনিষদে নাই যে রত্ন ভাণ্ডার।
কৃষ্ণ অবতারে যাহা না হ'ল বিস্তার।

সেই প্রেম ভক্তি রত্ন দিয়া অকাতরে।
ধন্য কৈলা ভবে যিঁহো কলির জীবেরে॥
মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহাপ্রভু মোরে দয়া কর॥ ৩॥

নিজপ্রণয়বিস্ফুরন্নটনরঙ্গবিস্মাপিত
ত্রিনেত্র। নতমণ্ডলপ্রকটিতানুরাগামৃত।
অহঙ্কৃতিকলঙ্কিতোদ্ধতজনাদিদুর্ব্বোধ হে!
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্॥ ৪।

সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করি বিবিধ প্রকার।
বিমোহিত করি যিনি শিব অবতার॥
সঞ্চারিলা অনুরাগামৃত ভক্ত প্রাণে।
অহঙ্কারী মূঢ়জন কে বুঝিবে তানে॥
মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহাপ্রভু মোরে দয়া কর॥ ৪॥

ভবন্তি ভুবি যে নরাঃ কলিতদুষ্কুলোৎপত্তয়-
স্ত্বমুদ্ধরসি তানপি প্রচুরচারুকারুণ্যতঃ।
ইতি প্রমুদিতান্তরঃ শরণমাশ্রিতস্ত্বামহং
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্॥ ৫॥

নীচজাতি নীচজনে দয়া করি যিনি।
কেশে ধরি উদ্ধারিলা মহাপাপী জানি॥
যাঁহার করুণা বলে হইলা নিস্তার।
পাপাচারী পাষণ্ডী যত দুরাচার॥

মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহাপ্রভু! মোরে দয়া কর।। ৫।

মুখাম্বুজপরিস্খলন্মৃদুলবাঙ্মধূলীরস-
প্রসঙ্গজনিতাখিলপ্রণতভৃঙ্গরঙ্গোৎকর।
সমস্তজনমঙ্গলপ্রভবনামরত্নাম্বুধে।
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্।। ৬।।

যার, মুখপদ্ম বিনিঃসৃত সুধারস ধারা।
নিরবধি পান করি ভকত ভ্রমরা।।
প্রেমানন্দে বিগলিত নিত্য নিরন্তর।
ভুবন মঙ্গল যাঁর নাম রত্নাকর।।
মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহাপ্রভু! মোরে দয়া কর।। ৬।

মৃগাঙ্কমধুরানন! স্ফুরদনিদ্রপদ্মেক্ষণ!
স্মিতস্তবকসুন্দরাধর! বিশঙ্কটোরস্তট
ভুজোদ্ধতভুজঙ্গমপ্রভ! মনোজকোটিদ্যুতে!
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্।। ৭।।

পূর্ণচন্দ্র সমতুল যাঁহার বদন
প্রফুল্লপঙ্কজ জিনি বিশাল নয়ন।
অধরোষ্ঠ মধুহাস্য কুসুমে শোভিত।
পরিসর বক্ষঃস্থল আজানুলম্বিত।
উদ্ধত ভুজঙ্গ সম বাহুর গঠন।
কোটি কন্দর্প জিনি কান্তি সুশোভন

মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহাপ্রভু! মোরে দয়া কর॥ ৭॥

অহং কণককেতকীকুসুমগৌর! দুষ্টঃ ক্ষিতৌ
ন দোষলবদর্শিতা বিবিধদোষপূর্ণেঽপি তে।
অতঃ প্রবণয়া ধিয়া কৃপণবৎসল! ত্বাং ভজে
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্॥ ৮॥

কণক কেতকী গৌর জীবন আমার।
নানা দোষে দুষ্টমতি মুই পাপাচার॥
অদোষ দরশী প্রভু দোষ না দেখহ।
সেই গুণে ভজি তোমা মুঞি অহরহ॥
মোর প্রভু শচীসুত তুমি বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহা প্রভু! মোরে দয়া কর॥ ৮॥

ইদং ধরণিমণ্ডলোৎসব! ভবৎপদাঙ্কেষু যে
নিবিষ্টমনসো নরাঃ পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকম্॥
শচীহৃদয়নন্দন! প্রকটকীর্ত্তিচন্দ্র! প্রভো।
নিজপ্রণয়নির্ভরং বিতর দেব! তেভ্যঃ শুভম্॥ ৯॥

হে 'ধরণী-মণ্ডলোৎসব-কীর্ত্তিচন্দ্র'!
শচীহৃদয়নন্দন আনন্দকন্দ॥
এই পুণ্য স্তোত্র যিনি পড়িবেন নিত্য।
প্রেমসম্পত্তি দানে কর' তারে মত্ত॥

নোট :—এই তিনটি শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টক রত্নের যে বঙ্গানুবাদ (পয়ারে) দেওয়া হইল, সেগুলি পরম ভাগবত—

বৈষ্ণবকুলভূষণ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাভারত রচয়িতা প্রখ্যাত শ্রীল হরিদাস গোস্বামীর স্বরচিত পয়ার।

(২) দ্বিতীয় অষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোকের বাংলা পয়ার উক্ত শ্রীল হরিদাস গোস্বামীকৃত না পাওয়ায় অন্যতম প্রখ্যাত বৈষ্ণবকুলভূষণ শ্রীল অতুলচন্দ্র গোস্বামীর বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল।

(৩) শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী রচিত এই—শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টক রত্ন তিনটির সংস্কৃত টিকা শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ করিয়াছেন।

(৪) এই অষ্টক তিনটি "অমৃতের প্রস্রবণ" ও ইহাতে অনন্ত সুরসাল 'দিক' আছে। এই শ্রীগ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক বোধে আমরা সে সব আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

——○○——

ইতিহাস—এই গ্রন্থে ১০৭ ও ১০৮ পৃষ্ঠায় বিদ্ধৃত

'ললিত মাধব' ও 'বিদগ্ধ মাধব' সম্বন্ধে—

এই উভয় গ্রন্থই আংশিক রচিত হইয়া নীলাচলে ঠাকুর হরিদাসের কুটিরে আলোচিত হইয়াছিল। **গ্রন্থদ্বয় সর্ব্ব** সাধারনের জন্য আত্মপ্রকাশ করে 'গৌরহরির অপ্রকটের পরে।

(২) শ্রীসনাতন প্রসঙ্গে—

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সপ্তগ্রামে অবস্থান কালেই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর অপূর্ব্ব জ্ঞান, ভক্তি ও নানা সু-মধুর 'চতুরাবলী'র প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছেন। সে সবের মধ্যে রঘুনাথের মনে বিশেষ রেখাপাত করিয়াছিল। যথা—

(ক) স্থান কানাই নাটশালার নিকট গৌড় নগর ঃ

শ্রীসনাতন বাদশাহের মন্ত্রী। তিনি দেখিলেন লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গে লইয়া 'নদীয়া জীবন' শ্রীগৌরাঙ্গ 'বৃন্দাবন' যাইতে মনস্থ করিয়াছেন। তিনি গৃহী ও যবনসেবী। আর 'গৌরহরি' বর্ত্তমানে সন্ন্যাসবেশধারী। তাঁহার উপদেশের সমক্ষেত্র কোথায়? 'ভক্তি রসের' বিচিত্র লীলায় তিনি বলিয়াছিলেন—

যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি॥
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটি।

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬

(খ) স্থান: কাশীধাম (চন্দ্রশেখরের বাড়ী)।

(১) বিচিত্র চরিত্র সন্ন্যাসী গৌরহরির সহিত প্রথম মিলনে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রশ্ন করিলেন—
কে আমি?
প্রশ্নের কি অপূর্ব্ব চতুরা।

তখন শ্রীল সনাতন রাজমন্ত্রী। তিনি সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিদ্ এবং আচার্য্যবর্য্য। তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে "বেদ" ঈশ্বরের নিশ্বাস হইতে আবির্ভূত। নিঃশ্বাসের গ্রহণ বা ত্যাগের জন্য 'মন' বা 'বুদ্ধির' প্রয়োজন হয় না "কে আমি" প্রশ্নের 'বেদ নির্দ্দিষ্ট' উত্তর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সমস্ত কথা সবিশেষ আমার জানা আছে। আমার সৌভাগ্যে আজ যখন স্বয়ং ভগবানকে সম্মুখে পাইয়াছি তখন তাঁহার শ্রীমুখে এই "চিরন্তন" প্রশ্নের যে উত্তর পাইব তাহা মন, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা প্রকাশ পাইবে। সুতরাং স্বয়মাগত নিঃশ্বাস 'প্রসূত বেদবাক্য' হইতে অবশ্যই উত্তম ও মধুর হইবে। এবং তাহা ঘটিয়াছে। যথা—

পাঠান্তর লোকের সংঘটি। তাৎপর্য্য অসংখ্য লোক।

জীব—তত্ত্বতঃ **কৃষ্ণদাস (প্রসিদ্ধ ভাষা—স্বরূপে কৃষ্ণদাস)**

(১) আবার—

'কে আমি ? কেন আমায় জারে তাপ ত্রয় ?
ইহা নাহি জানি কেমন হিত হয় ?
সাধ্য সাধনা তত্ত্ব পুছিতে না জানি ,
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি ? চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

শ্রীসনাতনের উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব দিবার সময় প্রসঙ্গত গৌরহরি বলিলেন—

কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম।
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন ;
'প্রেমভক্তি' দিল লোকে লঞা ভক্তগণ।
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন :
প্রেমে মত্ত হঞা নাচে লোক করে সংকীর্ত্তন।' —চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

গৌরহরির এই বাক্য শ্রবণ মাত্রেই পরম উল্লাসের সহিত শ্রীসনাতন ভঙ্গীপূর্ব্বক প্রশ্ন করিলেন—

"এমনে জানিব কলিতে কোন অবতার ?"

'ছন্ন ভগবান' গৌরহরি শ্রীসনাতনের এই প্রশ্নে মনে মনে বুঝিলেন--

'রক্ষা নাই, আজ ধরা পড়িলাম'। তবুও সু-কৌশলে তিনি নিজ মুখে স্বীকার করিলেন না। গৌরহরির পরাজিত অবস্থা দেখিয়া "প্রণয়" উল্লাসে শ্রীসনাতন বলিলেন—

.. ..—"যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ ;

পীতবর্ণ, কার্য্য প্রেমদান-সংকীর্ত্তন।
কলিযুগে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয় ;
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয়।" —চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীরঘুনাথের পূর্ব্ব হইতেই প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা। অথচ চাক্ষুষ দর্শনের সৌভাগ্য ঘটেনি। এক্ষণে নীলাচলে, 'নিজ মনোমত গোষ্ঠি মধ্যে সেই 'সনাতন গোস্বামী'কে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা নাই।

শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচল হইতে গমন করিবার দশদিন পরেই ঝাড়িখণ্ড পথে শ্রীসনাতন গোস্বামী নীলাচলে আসিয়াছেন। যথা,—

"প্রভু কহে—ইঁহা রূপ ছিল দশ মাস,
ইহা হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিন দশ।" —চৈ° চঃ অন্ত্য ৪

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর দেহে 'কুণ্ডরসা' বৃত্তান্ত, অগ্নিসম সমুদ্রের উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া যমেশ্বর টোটায় গমন, সনাতন জগদানন্দ প্রসঙ্গ, ঠাকুর হরিদাসের উপস্থিতিতে সনাতন গৌরহরি প্রসঙ্গ আদি রঘুনাথ কতক স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন এবং অবশিষ্টগুলি নিজ প্রভু স্বরূপের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছেন।

একটি ঘটনা—

গৌরহরি শ্রীসনাতনকে তাহার নিজের যাজনের জন্য কৃপাদেশ করিয়াছেন—

'কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন,
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন'।
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

গৌরহরির এই উপদেশ অথবা কৃপাদেশ অনুযায়ী শ্রীল সনাতন গোস্বামী অপতিত ভাবে "শ্রবণ" ও "কীর্ত্তন" করিয়াছেন। যথা—

(১) নীলাচল ও বৃন্দাবনের মধ্যে সর্ব্বদা পদব্রজগামী পত্র বাহক

সেবকদল এবং বৈষ্ণবদের যাতায়াত ব্যবস্থা তাহারই আয়াস ও যত্নে স্থাপিত হইয়াছে। এই ভাবে গৌর ও গৌর-পরিকরবৃন্দের নীলাচল বিহারের প্রতিটি সংবাদ শ্রবণ করিতেন।

(২) গৌরহরির নীলাচল বিহারের যতটুকু অংশ তিনি ও শ্রীরূপ সাক্ষাৎ দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন সেগুলির একটি অষ্টক এবং অন্যান্য শ্রুত লীলাবলীর দুইটি অষ্টক এই প্রকারে তিনটি অষ্টক * শ্রীরূপ দ্বারে প্রণয়ন করাইয়া উভয় ভ্রাতা

"সঃ চৈতন্য কিং মে পুনরপি দৃশ্যোর্যাস্যতি পদম্"

'কীর্ত্তন' করিতেন ও ব্রজের ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন।

এই ঘটনার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী। শ্রীগৌরাঙ্গের অদর্শনে ব্রজে গমন পূর্ব্বক তিনিও ঐ 'শ্রবণ' ও 'কীর্ত্তন' যাজনে তাঁহাদের (শ্রীরূপ ও সনাতনের) পরম আদরের সঙ্গী হইয়াছিলেন।

আর একটি সু-গম্ভীর ঘটনা—

সে দিন ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পথে, প্রান্তরে ও নদীতটে যত যত মন্দির ও বিগ্রহ ছিলেন সমস্ত ভগ্নস্তূপে পরিণত। দিল্লীর কাছে হিন্দুর প্রিয় মথুরাপুরীতে তখন একটিও মন্দির দাঁড়িয়ে ছিল না। সবই আগন্তুক ধর্ম্ম বিদ্বেষের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে অতি করুণ এক শ্মশানশয্যায় লুটিয়ে পড়েছিল। গৌরসুন্দর সে দিনের ভারতের ঐ নিদারুণ পরিবেশে দিল্লীর পাশে এবং মথুরার ছায়ার কাছে বৃন্দাবনেই তাঁহার প্রচারের পটভূমি স্থাপনের জন্য করোয়া কন্থাধারী নিষ্কিঞ্চন শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আদেশ দিলেন—

"কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সেবা প্রবর্ত্তন।
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ."

—চরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ

---

* ইতিপূর্ব্বে শ্রীরূপ প্রসঙ্গে এই অষ্টক তিনটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রতি উপরি উল্লিখিত বিভিন্ন আদেশের মধ্যে অন্যতম আদেশ—

লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিবে

এই প্রসঙ্গে শ্রীগুরু প্রেরণায় আমাদের কিঞ্চিৎ নিবেদন :

আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য হচ্ছে ভারত। খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যে ভারতের কয়েকটি অংশ রাজনৈতিক কারণে সাংস্কৃতিক বা ধর্ম্মীয় ঐক্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হয়। কারণ, থাকিলেও অর্থাৎ জৈন বৌদ্ধদের আমলে এবং অশোকের সময়টি ছাড়া খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ভারতবাসীর জীবন রাজনৈতিক বোধে ঐক্য সম্বন্ধে ইতিহাসের নজীর সহযোগী সাক্ষ্য দেয় না তবে, বৌদ্ধ জৈন ও পৌরাণিক ধর্ম্মবোধে এক একটি সঙ্ঘের ভাবতায় সাংস্কৃতিক ও স্বাদেশিক বোধ ভারতের একটি অখণ্ড রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজদের ভারত বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবাসীর জীবন আকাশে এর উদ্ধে আর ঐতিহাসিক নজীর নাই।

ভারত একটি 'তত্ত্ব'। ভারতের বিশেষ একটি সাত্ত্বিক রূপ আছে এই 'অনুভব' ও 'উপলব্ধি' পঞ্চদশ শকে সচল জগন্নাথ গৌরহরির আচারে ও প্রচারে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনই সেই অখণ্ড সংস্কৃতির সচল মূর্ত্তি।

বুদ্ধ শঙ্করের পরবর্ত্তী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রচারিত উদার ভারততত্ত্ব আমাদের মহান ভারতের অখণ্ড ঐতিহ্য সুদৃঢ় করে রেখেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রচারিত ভারত তত্ত্ব বিশ্বইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সব মনীষী জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার আদর্শকে বৃহত্তর মানবতার পরিপোষক উদার সংস্কাররূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, তাঁরা অনেক

ভাল কথা বল্‌লেও আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরণ পূর্ণ অভিমতের পীঠভূমিতে তা প্রচার করেছেন। আর একথা মনে করার কারণও আছে যে, তাহার বেশী নূতন কথার রূপ অন্যত্র দেখা যায় না।

(তখন) যাঁরা ছিলেন দেশের রাজশক্তি ও শাসক, তাঁদের স্বপ্নে ও কাজে তখন প্রতিজ্ঞাই ছিল দেশটিকে অহিন্দুর দেশে পরিণত করতে হবে। সেকালে 'বিগ্রহ' ও মন্দিরের ধ্বংস সাধন করা অহিন্দু রাজশক্তির একটি ধর্ম্মীয় অঙ্গই ছিল। এ হেন রাজশক্তি বা ধর্ম্ম বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ স্বরূপ দিল্লীর নিকট বৃন্দাবনে ভক্তিবাদ প্রচারের কেন্দ্র স্থাপনের আদেশ দান করিলেন, এই আদেশ দাতা ও আদেশ পালন কর্ত্তার স্বরূপ 'বৈভব' চিন্তা ও অনুশীলন এ যাবৎ উপযুক্ত রূপে না হওয়ার ফলে আজ দেশে ও জগতে ঘোর অশান্তির দাবানল।

প্রসঙ্গতঃ লিখি—

নবদ্বীপের কাজীর নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে জনতার যে অভ্যুত্থান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নেতৃত্বে হয়েছিল ইহাও রাজশক্তির বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ। ঘটনাটি—

'গৌরহরির নদীয়া বিহার কালে, একদিন সন্ধ্যার সময় নদীয়ার বিচারপতি চাঁদকাজী নদীয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি অপূর্ব্ব হরিনামের কথা শুনিয়াছেন। নদীয়ার দুষ্ট লোকে নিমাই পণ্ডিতের নামে তাঁহার কর্ণে অনেক কথাই লাগাইয়াছে। সেদিন নদীয়ার পথে বাহির হইয়াই কাজির কর্ণে উচ্চ হরিনামের সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি তাঁহার লোকজন দ্বারা সঙ্কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ মন্দিরা সহ বৈষ্ণব দলকে তর্জন শাসন করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

বৈষ্ণবদিগকে শাসন করিয়া দিলেন, যেন এমন কর্ম্ম আর কেহ না করে। এবং ভয় দেখাইয়া বলিলেন—

"ক্ষমা করি যাও আজি, দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন লাগি পাইলেই লৈব জাতি॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ

পরধর্ম্মে অসহিষ্ণু অহিন্দু রাজার ভয়ে নদীয়ার ভক্তবৃন্দ শঙ্কিত হইয়া শচীদুলাল গৌরহরির নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে মনদুঃখ জানাইলেন—

"কাজির ভয়েতে আর না করি কীর্ত্তন।
প্রতিদিন বুলে লই সহস্রেক জন॥
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্যস্থানে।
গোচরিল এই 'দুই' তোমার চরণে॥"

—চৈঃ ভা মধ্য ২৩শ

আমাদের গৌরগুণমণি এই কথা শুনিবা মাত্র বজ্রনাদে হুঙ্কার করিয়া বলিলেন—

"(হরিদাস) নিত্যানন্দ। হও সাবধান।
এই ক্ষণে চল সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থান॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখ মোর কোন কর্ম্ম করে কোন জন॥"

—চৈ, ভাগব

তারপর তাহার নিকট আবেদনকারী বৈষ্ণবগণকে লক্ষ্য করি বলিলেন—

"দেখোঁ আজি পোড়াও কাজির ঘর দ্বার
কোন কর্ম্ম করে দেখ রাজা বা তাহার।
প্রেম ভক্তি বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডী গণের হইব আজি কাল॥

হে আমার ভাই সব তোমরা শীঘ্র যাও এবং—
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন।।”

এবং সকলকে বলিবে যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৌতুক রঙ্গ দেখিবার জন্য যার যার বাসনা তাহারা সকলে (আজ সন্ধ্যায়) যেন—

‘একো মহাদীপ লই আসিবেক সেই।।

তিনি আজ কি করিবেন তাহারও পূর্ব্বাভাষ দিলেন। যথা—

‘ভাঙ্গিয়া কাজির ঘর কাজির দুয়ার।
কীর্ত্তন করিমু, দেখোঁ কোন্ কর্ম্ম করে।।’

অতঃপর কাজির অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত নবদ্বীপবাসীগণের মনে সকল প্রকার সংশয় নিরসনের জন্য বলিলেন—

‘অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।
মুঞি বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ?’

উপসংহারে বলিলেন—

‘তিলার্দ্ধেকো ভয় কেহ না করিহ মনে।
বিকালে আসিব ঝাট করিয়া ভোজনে।।’

—চৈঃ ভাগবত

সন্ধ্যাকাল আগতপ্রায়। নিজ গৃহের আঙ্গিনা হইতে প্রচণ্ড হুঙ্কার করিয়া ‘গৌরহরি’ হরিধ্বনি করিতে করিতে দীপ জ্বালিবার সঙ্কেত করিলেন। সহস্র কণ্ঠে গগনভেদি হরিধ্বনি উত্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র দীপ জ্বলিয়া উঠিল। নদীয়া নগরীর চতুর্দ্দিক দীপালোকে উজ্জ্বলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। নদীয়া বিনোদিয়া গৌরহরি নিজ মন্দির হইতে বাহির হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গার ধারে পথ লইলেন। এই পথ দিয়া কাজির ভবনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মহাপ্রভু আজ মনের আনন্দে সর্ব্ব লোক সমক্ষে নব নব ভাবে মধুর নৃত্য ভঙ্গীর সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছেন—এবং তাঁহার পশ্চাতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি হরিধ্বনি

করিতে করিতে চলিযাছে। সঙ্কীর্ত্তন পিতা গৌরহরির অগ্রে কীর্ত্তনের দল চলিয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সর্ব্বাগ্রে, তারপর ঠাকুর হরিদাস, তারপর শ্রীবাস পণ্ডিতের দল। এই রূপে ভক্তগণের দল সহ পশ্চাতে গৌরসুন্দর চলিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে 'গদাধর' ও 'চাঁদ নিতাই' আছেন। ক্রমে ক্রমে এই অপূর্ব্ব সঙ্কীর্ত্তনের শোভাযাত্রা গিয়া কাজির বাড়ীর চৌহুদ্দি ঘিরিয়া ফেলিল। অগণিত জনের উদ্দাম কণ্ঠের হরি ধ্বনিতে স্থানীয লোক চমকিত।

কাজী ভয় পাইয়া নিজ প্রাসাদে বিশেষ প্রকোষ্ঠে আত্মগোপন করেন। গৌরহরি তাঁহাকে ডাকাইলেন। ভীত ত্রস্ত কাজী দীনতার সহিত আসিতেই গৌরহরি সস্নেহ কথা বলিতে লাগিলেন। স্বল্প দর্শন ও অঙ্গ স্পর্শ প্রভাবেই কাজীর হৃদয়ের ভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

নেত্র হইতে কাজির জলধারা পড়িতে লাগিল। তিনি তাঁহার কৃপা-ভিক্ষা করিলেন।

কাজির বংশধরগণ ধারাবাহিক ক্রমে আজ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর অনুগত ভক্ত।

'দেখ মোর কোন কর্ম্ম করে কোন জনে'

উপরে বর্ণিত বাণীগুলি সুধু ধর্ম্ম নিষ্ঠার বাণী নিশ্চয় নয় তীক্ষ্ণ কর্ক´শ রাজ প্রতাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী। এবং অনেকেই জানেন, এই বাণীতে সংগ্রাম পদ্ধতির যে পরিচয় আছে 'বারদোলির জনতা' হুবহু সেই ভাবে সেই প্রকারে সত্যই ঘরে ঘরে দেউটি জ্বালিয়ে ইংরাজ সরকারের অনাচারের নির্দ্দেশ তুচ্ছ করেছিল।

গৌরসুন্দরের রাজনৈতিক ধারণা ও উদ্দেশ্যের দিক দর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যায়—

বাংলার নবাব হোসেন সাহ উড়িষ্যার হিন্দু রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করার যে পরিকল্পনা করেছিলেন, সে পরিকল্পনার প্রতিবাদ ক'রে অসহযোগ করতে কুণ্ঠিত হননি গৌরকৃপাস্নাত শ্রীসনাতন গোস্বামী হোসেন সাহেরই মন্ত্রী "সনাতন।"

'লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করতে হলে মুসলিম রাজশক্তির কোপ ভাজন হবার পরিণামও স্বীকার করে নিতে হবে'—

এ বাস্তব সত্যটুকু গৌরহরির নিশ্চয় অজানা ছিল না। তাঁরই নেতৃত্বে অখণ্ড-ভারত-বোধ এবং মূর্ত্তি ও মন্দিরের খাতক সেই ভযানক বিদ্বেষের প্রতিরোধ জাগ্রত হয়েছিল। ভারতের ইতিহাস রচযিতা পণ্ডিতেরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের 'লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার পরিকল্পনার' বৃহত্তব তাৎপর্য্য ঠিক বিচার করে বুঝতে পারেননি কিম্বা বিচার করতে ভুলেই গেছেন তাহা মনীষীবৃন্দের অনুশীলনের বস্তু।

কি দুর্ভাগ্য! এ হেন সুদৃঢ় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আমাদের মনে কোন রেখাপাত করেনি। অথচ, দেশের, জাতির, সমাজের কল্যাণ ও মানসিক উন্নতির সহজ উপায় ঐতিহাসিক ভগবান গৌরহরি ও তাঁহার ভক্ত পরিকরবৃন্দের চরিত্র স্কুলে, কলেজের পাঠ এবং সভা সমিতিতে আলোচনা।

(৩)

রায় রামানন্দ প্রসঙ্গেঃ

'রঘুনাথ' নীলাচলে প্রবেশের প্রথম দিন হইতেই প্রত্যহ 'রামরায়ের' দর্শন লাভ করিতেছেন। রামরায় ও স্বরূপ দামোদর গৌরহরির যে কিরূপ অন্তরঙ্গ তাহা রঘুনাথ খুব ভাল ভাবেই অনুভব করিয়াছেন।

রঘুনাথ সপ্তগ্রামে অবস্থান কালে গোদাবরী তীরে গৌরহরি ও

রামরায়ের দশরাত্রি ব্যাপি প্রখ্যাত মিলন প্রসঙ্গ সংবাদ পাইয়াছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে রঘুনাথের মনে একটি খট্‌কা—

গোদাবরী তীরে মধ্যাহ্ন কালে, রামরায় গৌরসুন্দরের প্রথম দর্শন লাভ করেন। সে সময় তিনি তাঁহাকে 'সন্ন্যাসী স্বরূপ' দেখিয়াছেন। কিন্তু সেই দিন রাত্রি হইতে পর পর দশরাত্রি —রাত্রির প্রথম প্রহর হইতে শেষ প্রহর পর্য্যন্ত তিনি গৌরহরির সন্নিকটে উপবেশন করিয়াছেন, পরম ঘনিষ্ঠতায় ইষ্টগোষ্ঠি করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই তিনি সন্ন্যাসী স্বরূপের পরিবর্ত্তে দেখিয়াছেন—

"কাঞ্চন প্রতিমার গৌরকান্তিতে আচ্ছাদিত—গোপবেশ বেণুকর শ্যামসুন্দর"—

এই ঘটনাও রঘুনাথের খট্‌কার হেতু নয়।

তারপর দশম রাত্রিতে রামরায় গৌরহরির শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন—

"এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে ;
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে।
পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ ;
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ।"

এবং প্রার্থনা জানাইলেন—

"অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার।"

—চরিতামৃত মধ্য ৮ম

রঙ্গিয়া রসিয়া গৌরহরি স্মিত হাস্যে বলিলেন—"তুমি পরম ভাগবত। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও তুমি তোমার ইষ্টদেবকেই দেখিতেছ ইষ্টে গাঢ় অভিনিবেশ জন্য আমার রূপ দেখিতে পাইতেছ না।"

রামরায় নিজ সংশয়ের নিজেই মনে মনে মীমাংসা করিয়া পরে গৌরহরিকে উক্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং গৌরহরির চাতুরী-পূর্ণ আত্মগোপন চেষ্টা দর্শনে, প্রণয় কোপ সহকারে তিনি বলিলেন—

"প্রভু তুমি ছাড় ভারিভূরি ;
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি।"

এই বলিয়াই নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন—

"রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার ;
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার।
নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন ;
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন।"

—চরিতামৃত মধ্য ৮ম

এখন কপটতা ছাড়। নিজমুখে স্বীকার কর।

গৌরহরির হাসি এবার আরও কৌতুকময় হইল। তিনি আনন্দ উচ্ছ্বাসে বলিলেন—

"প্রিয় রামরায়! তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ তাহা আংশিক সত্য। যাহা হউক, প্রথমেই তুমি প্রার্থনা করিয়াছ "অকপটে কহ" কিন্তু, বন্ধু! এ ত' বলার নয়, এ কেবল চোখে দেখার জিনিষ। তোমাকে দেখার চোখ দিচ্ছি, এবার চেয়ে দেখ। যথা—

"তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ—
"রসরাজ মহাভাব" দুই এক রূপ।"

—চরিতামৃত মধ্য ৮ম

রঘুনাথের খট্‌কা—এর পরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া—

"দেখি রামানন্দ হৈলা 'আনন্দে মূর্চ্ছিতে'

'ধরিতে না পারে দেহ" পড়িলা ভূমিতে।'

—চরিতামৃত মধ্য ৮ম

রঘুনাথের মনের প্রশ্ন—রামরায় সম অধিকারী এমন কোন্ 'রসরাজ' ও এমন কোন 'মহাভাব' স্বরূপ দ্বয়ের—'বিলাস' বা একীভূত অবস্থা দেখিলেন যাহার ফলে তাঁহার অবস্থা—

"ধরিতে না পারে দেহ ও আনন্দ, মূর্চ্ছা"

তারপর 'সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হইল মন।"

—চরিতামৃত মধ্য ৮ম

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর স্বল্পাক্ষরে বর্ণিত এই ঘটনার উদঘাটন দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনে ও প্রসঙ্গের মধ্যে। খুব সংক্ষেপে তাহা নীচে বর্ণিত হইতেছে; যথা—

(১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী গৌরহরির সন্ন্যাস বেশ "শ্রীনিত্যানন্দ" :

(২) "বিবর্ত্তে বিলাস রঙ্গ ঘটে" এ অনুভব রামরায়ের ছিল না। তাই গোদাবরী তীরে "রসরাজ গৌর" ও "মহাভাব নিতাই" এই দুই এর একত্র মিলন দর্শনে রামরায়ের "আনন্দ মূর্চ্ছা"।

(২)

রঘুনাথ বিশিষ্ট জমীদারের পুত্র। বাল্যে ঠাকুর হরিদাসের কৃপা তাঁহার উপর প্রবলভাবে বর্ষিত হইয়াছে। জাগতিক বিষয় বৈভবকে শূকরী বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্য করুণা

বাতুল। ফলে, তিনি রাজোচিত বৈভব হইতে দূরে পলাইয়া আসিয়াছেন।

রায় রামানন্দও রাজতুল্য পুরুষ। কিন্তু তিনি তাঁহার বিষয় বৈভবকে নিজ ভোগের উপকরণ করেন নাই। রায় রামানন্দের এই অসাধারণ সামর্থ্যটি তিনি নীলাচলে আসিবার পর হইতেই দেখিতেছেন।

সেই অপূর্ব্ব প্রভাব রাজর্ষি রামরায় একটি অপার্থিব গুণের পূর্ণ অধিকারী হইয়াছেন জানিয়া রঘুনাথ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন।

ঘটনাটি—

একদা শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ ও লীলার কথা শ্রবণ করিবার ইচ্ছায় প্রদ্যুম্ন মিশ্র গৌরহরির পরামর্শে রামরায়ের প্রাসাদে গমন করেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন রামরায় বাড়ীতে নাই। তাঁহার সেবকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে—

রায় এখন নিভৃতে উদ্যানে আছেন। নৃত্যগীতে নিপুণা পরমা সুন্দরী কিশোর বয়স্কা দুইটি "দেবদাসী"কে * রায রামানন্দ নিজের 'রচিত' জগন্নাথ বল্লভের নাটকের অভিনয়াদি শিক্ষা দিতেছেন। অর্থাৎ জগন্নাথ বল্লভ নাটকে যে সকল গান আছে ও আলাপ প্রসঙ্গ আছে সে গুলির প্রকাশ ভঙ্গীর সময় সুর তান লয় যোগে গান করার প্রণালী ও অন্যান্য উক্তি প্রত্যুক্তিগুলি রামরায় স্বয়ং দেবদাসীদ্বয়কে শিক্ষা দিতেছেন।

শুধু ইহাই নয়। রামরায় সেই দেবদাসীদ্বয়কে--

"স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গমর্দ্দন ;
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সম্মার্জ্জন।

* যে সকল অবিবাহিতা কন্যা নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাতে নৃত্য গীতাদি করে তাহাদিগকে দেবদাসী বা দেবকন্যাও বলা হয়। নৃত্যগীতে তাহাদিগকে নিপুণ করা হয়। কিশোর বযসেই তাহাদের শিক্ষাদান এবং অপরূপ সৌন্দর্য্য মণ্ডিত দেহের অধিকারীও তাহারা।

স্বহস্তে পরাণ বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডল।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।"

—চরিতামৃত অন্ত্য ৫ম

আবার এই 'নির্ব্বিকার' অবস্থা যে কি ধরনের তাহার পরিচয় পাওয়া যায় গৌরহরির বাক্যে। যথা—

"নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম ;
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন।"

—চরিতামৃত অন্ত্য ৫ম

অচল জগন্নাথ দেবের চিত্ত বিনোদনের জন্য রামরামের এই নিভৃত পরিচর্য্যা পরিপাটির কথা শ্রবণে রঘুনাথ বিস্ময়ে হতবাক হইয়াছিলেন।

এ যে কি অবস্থা।

গদাধর পণ্ডিত প্রসঙ্গেঃ

রঘুনাথ গৃহে অবস্থান কালেই শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া বিহার লীলায় গদাধরের গৌর অনুরাগ ও তাঁহার অপূর্ব্ব প্রীতি সেবার মধুর মধুর প্রসঙ্গাবলী শুনিয়াছেন। গৌরহরি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে আগমন করিলে গদাধর পণ্ডিত প্রথম সুযোগে নীলাচল আসেন এবং বাকী জীবন যাহাতে গৌর-সঙ্গহারা হইতে না হয় এই আশায় এবং আশয়ে তিনি "ক্ষেত্র সন্ন্যাস" গ্রহণ করিয়াছেন। নীলাচলবাসী গদাধরের প্রাণের প্রতিমা গৌরহরি স্বহস্তে শ্রীগোপীনাথের বিগ্রহ

আবিষ্কার করিয়া গদাধরকে তাহা উপহার দেন। গৌরের প্রীতি ও প্রীতির দান হিসাবে তিনি গোপীনাথ সেবা অঙ্গীকার করেন।

গৌরহরি সন্ন্যাস গ্রহণের পর পঞ্চম বর্ষে 'বিজয়া দশমী' তিথিতে নীলাচল হইতে গৌড় দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। জননী ও জাহ্নবা দর্শনান্তে তিনি শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন। এইরূপ ঘোষণায় বহু ভক্ত ও তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন। তিনি দেখিলেন গদাধর পণ্ডিতও তাঁহার সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চলিয়াছেন।

"ক্ষেত্র সন্ন্যাস না ছাড়িহ"

এই বাক্য বলিয়া গৌরহরি গদাধরকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—

"যাঁহা তুমি সেই নীলাচলে ;
ক্ষেত্র সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতলে।"

—চরিতামৃত মধ্য ১৬শ

তখন গৌরহরি পরম স্নেহে ও অমিয়া ভাষে বলিলেন—

"প্রাণ গদাই ! এখানে থাকিয়া গোপীনাথের সেবা কর।"

এবার অভিমানে উত্তেজিত কণ্ঠে গদাধর জবাব দিলেন—'কোটি সেবা ত্বৎপদদর্শন'।

গৌরহরি গদাধরের প্রীতি ও অভিমান দর্শনে অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল হইয়া ভঙ্গিতে বলিলেন—

"তুমি এখানে থাক তাহাতেই আমার সন্তোষ। আর তুমি গোপীনাথ সেবা ও ধাম ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে গেলে সকলে আমাকেই দোষ দিবে।"

গৌরহরির এই বাক্য শুনিয়া গদাধর হৃদয়ে আহত হইলেন এবং প্রণয় ক্রোধ ও অভিমানে বলিলেন—

"·········সব দোষ আমার উপর ;
তোমা সঙ্গে না যাইব, যাইব একেশ্বর।

আই দেখিতে যাব, না যাব তোমা লাগি ;
প্রতিজ্ঞা সেবাত্যাগ দোষ, তার আমি ভাগী।”

—চরিতামৃত মধ্য ১৬শ

প্রেমমাখা মধুর মধুর উপরোক্ত বাক্যগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গৌরহরির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে পথ চলিতে লাগিলেন। গৌরহরি আপাতত নীরব রহিলেন।

“পণ্ডিতের চৈতন্য প্রেম বুঝন না যায় ;”

—চরিতামৃত মধ্য ১৬শ

কটক পর্য্যন্ত এই ভাবে গদাধর পণ্ডিত (একক) গমন করিলেন। গৌরহরির অন্তরে সন্তোষ আর বাহিরে প্রণয় রোষ। তিনি গদাধর পণ্ডিতকে নিকটে ডাকাইয়া এখন আর এক ভঙ্গী গ্রহণ করিলেন। গদাধরের দুটি হাত ধরিয়া প্রণয় রোষে বলিতেছেন,

“দেখ গদাধর ! ‘ক্ষেত্র সন্ন্যাস’ ও গোপীনাথ সেবা ছাড়িয়া বহু দূর আসিয়াছ। তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তুমি আত্ম-সুখ বাসনায় আমার সঙ্গে থাকিতে চাও। কিন্তু তোমার আচরণে আমার দুঃখ এবং তোমার দুইটি ধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে। আমার সুখ ও আন্তরিক ইচ্ছা তুমি নীলাচলে ফিরে যাও। এরপর যদি কিছু বল বা আমার ইচ্ছা পূরণ না কর তবে আমার শপথ রইল।”

“এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা,
মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথাই পড়িলা।”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

গদাধর মুরছিত মহানদী কূলে
হা গৌর ! প্রাণ গৌর বলে’ গদাধর মুরছিত মহানদী কূলে

“পণ্ডিত লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিল।”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

রঘুনাথ যখন দ্বিতীয় বার গৌরদর্শনে শান্তিপুরে যান, তখন তিনি সেখানে এই নিবিড় 'গৌর-গদাধর প্রণয়' প্রসঙ্গটি শুনিয়াছিলেন।

টোটায় গদাধর পণ্ডিত; (সিদ্ধ) বকুলতলে ঠাকুর হরিদাস; জগন্নাথ বল্লভে রামরায়; জগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও গোপীনাথ আচার্য্য; স্বর্গদ্বারের বেলাভূমিতে (আজও সেখানে 'সাতাসন' মঠ বর্ত্তমান) স্বরূপ পুরুষোত্তম আদি অনেক মূর্ত্তিই অবস্থান করিতেছেন। আইটোটা সন্নিধানে পরমানন্দ পুরী ও প্রায় সকলের কেন্দ্রস্থলে কাশীমিশ্রালয়ে নীলাচল বিহারী গৌরচন্দ্র বিরাজমান। রঘুনাথ স্বরূপের কুটিরে অবস্থান করেন।

ইঁহাদের দর্শন ও সঙ্গ প্রভাবে রঘুনাথের মনে একদিন (অতীতের) শ্রুত ঘটনায়) গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে গদাধরের কটকের মহানদীতটে মূর্চ্ছা, তাৎকালীন সার্ব্বভৌমের চিন্তা ও পরে যথা কর্ত্তব্য বিধানের চেষ্টায় ও আলোচনায় মহনীয় সিদ্ধান্ত জাগরূক হইল। যথা—

"কৃষ্ণের আমি সর্ব্বোত্তম প্রিয় পাত্র ও ভক্ত" উদ্ধবের এই অভিমান নষ্ট করিবার জন্য পরম কৌতুকী কৃষ্ণ তাঁহাকে 'ছলে' ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। অনুরূপ ঘটনাই বুঝি সমন্বিত হইয়াছে।

১৪৩১ শকে দোল যাত্রার পূর্ব্বে গৌরহরি নিলাচল বিজয় করেন। * চৈত্রে সার্ব্বভৌম বিমোচন ও বৈশাখে দক্ষিণ দেশ বিজয়ে যান। সেই সময় গৌরহরি ভট্টাচার্য্যের আজ্ঞা চাহিলেন—

---

* "মাঘ শুক্ল' পক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস;
'ফাল্গুনে' আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস।
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল;
প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যগীত কৈল।
'চৈত্রে' রহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন;
'বৈশাখে'র প্রথমে দক্ষিণে যাইতে হৈল মন।"

—চরিতামৃত মধ্য ৭ম

"আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে যাইব ;
তোমার আজ্ঞাতে সুখে নেউটি আসব ।"

—চরিতামৃত মধ্য ৭ম

গৌরহরির এই বাক্য শ্রবণে সার্ব্বভৌম অত্যন্ত কাতর হইয়া গৌরহরির শ্রীচরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—

"শিরে বাজ পড়ে যদি পুত্র মরি যায়,
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না হয় ।"

—চরিতামৃত মধ্য ৭ম

অর্থাৎ সার্ব্বভৌমের একমাত্র পুত্র চন্দনেশ্বর । তিনি অবলীলাক্রমে গৌরহরিকে বলিলেন, "যদি চন্দনেশ্বর মরিয়া যায় তাহাও সহ্য করিতে পারি কিন্তু তোমার বিচ্ছেদ আমার পক্ষে অসহ্য ।

আর একদিনের ঘটনা—

গৌরের প্রীতি সেবার পরম বৈরী তাঁহার জামাতা অমোঘ বিষুচিকা রোগে আক্রান্ত হয় । ক্রমে মৃত্যু পথের পথিক হয় ।

এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সানন্দে ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন—

"সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য ।"

—চরিতামৃত মধ্য ১৫শ

এ হেন সার্ব্বভৌম যখন গৌরহারা গদাধরের মহানদী তটে বিরহ দশায় মূর্চ্ছা দর্শন করিলেন তখন তাঁহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল ভাগবতের চিত্র ঃ

রাস রজনীতে একাকী বিজন বনে কৃষ্ণহারা মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধা ।

গদাধরের গৌর বিরহ দর্শনে শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌমের অভিমান দূর হইল ।·········

———

অপর এক ঘটনা ঃ

নরেন্দ্র সরোবর তীরে প্রায় প্রত্যহই গদাধর পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। নীলাচল বিহারী গৌরহরি ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দ এবং ভক্তবৃন্দও সে পাঠ শুনিতে যান। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীও স্বরূপের আনুগত্যে 'পাঠ' শ্রবণ করিতে যান।

সেখানে—ভাগবত বক্তা—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রধান শ্রোতা—গৌরহরি (বিরহিনী রাধা)

এই ঘটনার মধ্যে রঘুনাথের মনে একদা একটি ভাবের উদয় হইল যে—

"রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট"

এই বাক্য সার্থক হইয়াছে এই নীলাচলে এই পাঠের মধ্যে।

এখানে রাধারাণী কি এক স্বরূপে বক্তা অপর স্বরূপে শ্রোতা? অপর দিকে যিনি বক্তা তিনিই শ্রোতা। আসল কথা হইল উভয়ে যদি এক স্বভাবের না হয় তবে এক স্বরূপকে অন্য স্বরূপ সেবা ক'রে সুখী করতে পারে না।

রঘুনাথ আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতেছেন যে—

ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি "ভক্ত চরিত্রই" পুনঃ পুনঃ পাঠ হইতেছে। কিন্তু, ব্রজরামাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গ কোন দিনই পাঠ হয় না। রসিক ভক্তবৃন্দ এ তথ্যের গভীর মর্ম্ম উদঘাটন করিবেন।

অপর একটি কথা; নিখিল বিশ্বের ভগবৎ বহির্ম্মুখ জীবের প্রতিনিধি ধ্রুব ; আর নিষ্কাম পুরুষদের প্রতিনিধি প্রহ্লাদ। হরিভজন সকলেরই বাসনা পুরণের একমাত্র সুগম ও সহজ উপায়। প্রহ্লাদ চরিত্রের দিক (১) অসুর পুরীতে থেকেও সে "নিষ্কাম"। (২) (ক) ভগবত উন্মুখতার মূল সাধুর "সন্তোষ" (খ) ভগবত বিমুখতার মূল সাধুর "অসন্তোষ"।

বল্লভ ভট্টের প্রসঙ্গেঃ

বল্লভ ভট্টের মনে অভিমান ছিল যে তিনি যেরূপ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত জানেন তেমনটি কেহই জানে না। আবার বেদের সার সম্বলিত মহাপুরাণ শিরোমণি যে শ্রীমদ্ভাগবত তাহার যথার্থ অর্থবোধ একমাত্র তাঁহারই মনে পরিস্ফুট হইয়া আছে। অন্য কাহারও হয় নাই। এইরূপ মনোবৃত্তি ও অহঙ্কার লইয়া তিনি নীলাচলে গৌরহরির নিকট আসিয়াছিলেন। সু-চতুর, সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি, অযাচিত কৃপাকারী, পরম করুণ গৌরহরি দৈন্য করিয়া তাঁহাকে নিজপরিকরবৃন্দের গুণ মহিমা বর্ণন পূর্ব্বক ভট্টের গর্ব্ব অহংকারে আচ্ছন্ন চিত্তের মালিন্য ক্ষালন করিবার জন্য একদা (ভট্টকে) বলিলেন—

আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। আমার মন নির্ম্মল ছিল না। অদ্বৈত আচার্য্যের সঙ্গপ্রভাবে আমার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে। অদ্বৈত আচার্য্য সাধারণ জীব নহেন; তিনি 'মহাবিষ্ণু' বা ঈশ্বর তত্ত্ব। নিখিল শাস্ত্রেই অদ্বৈত আচার্য্যের অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তাঁহার মত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা কোন জীবে সম্ভব নয়। শাস্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধিতে, শাস্ত্রসম্মত আচরণে, ম্লেচ্ছাদি জীবেও কৃষ্ণভক্তি প্রদানে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই বা জগতেও সম্ভব নয়।

"সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নহে যাঁর সম ;
অতএব অদ্বৈত আচার্য্য তাঁর নাম।
যাঁহার কৃপায় ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি ;
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা শক্তি ?'

—চরিতামৃত অন্ত্য ৭ম

পরে নিতাই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

(ঈশ্বরের অভিন্ন তনু) নিত্যানন্দ—অবধূত বেশ ধারণ

করিয়াছেন। তিনি সাধারণ জীবের মধ্যে থাকিয়াও অসাধারণ পুরুষবর্য্য। তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখন বা নৃত্য করেন; সর্ব্বদাই মহাভাগবত, উন্মাদবৎ অবস্থা। দূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভ করিলেও 'জীব' কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হয়। প্রেমধনে ধনী হয়।

"নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর,
ভাবোন্মাদে মত্ত, কৃষ্ণপ্রেমের সাগর।"

—চরিতামৃত অন্ত্য ৭ম

ভট্ট। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মহিমা শোন—

সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্ব মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা, ঔপনিষদিক, বেদান্ত এই 'কয়টি দর্শনে' সার্ব্বভৌম সাক্ষাৎ বৃহস্পতিতুল্য।

শুধু ইহাই নহে, তিনি ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণ। সার্ব্বভৌমের কৃপাতেই আমি জানিয়াছি জীবের একমাত্র অভিধেয়, একমাত্র কর্ত্তব্য কৃষ্ণভক্তি। এবং ভক্তিযোগই সুগম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন পথ।

ভট্ট! এখন রায় রামানন্দের কথা শোন—

তিনি (১) 'মহাভাগবত প্রধান' (২) অনর্গলরসবেত্তা ও প্রেমসুখানন্দ।

"এসব শিক্ষাইল মোরে রায় রামানন্দ।
অনর্গলরসবেত্তা প্রেমসুখানন্দ॥"

অনর্গলরসবেত্তা—রসতত্ত্ব সম্বন্ধে বাধাশূন্য অভিজ্ঞতা। তত্ত্ব-বিচারে প্রতিপক্ষ কোন কূট প্রশ্ন উত্থাপন করিলে তাহার মীমাংসায়

রামরায়ের যুক্তি প্রণালীতে বাধা (অর্গল) পড়ে না। যে কেহ যে কোন প্রশ্নেরই উত্থাপন করুক না কেন, প্রশ্ন উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই 'রামরায়' তাহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন। আবার তিনি এমন ভাবে তাঁহার যুক্তি প্রণালী প্রদর্শন করেন যে নিজেই সকল রকমের সম্ভাবিত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া এমন ভাবে সে সমুদয়ের সু-মীমাংসা করিয়া দেন যে, আর কাহারও কোন সন্দেহ থাকে না। তাঁহার রসতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এত অধিক এবং তাঁহার তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রণালী এতই প্রাঞ্জল ও যুক্তিপূর্ণ যে, যে কেহই অবাধে সেই যুক্তি প্রণালীতে প্রবেশ করিয়া অনায়াসে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারে।

প্রেমসুখানন্দ—ইষ্ট-সুখ-তাৎপর্য্যময়ী সেবা দ্বারা নিজের ইষ্টের সুখ বিধানই যাঁহার একমাত্র সুখ, অন্য কোন কার্য্যেই যাঁহার সুখ জন্মে না, তিনিই "প্রেমসুখানন্দ"। ইহা 'রস' সম্বন্ধে সু-অনুভব অবস্থা।

ভট্ট! এখন তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ঐ স্বরূপের অবস্থা শোন—

ইনি প্রেম রসের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। ইহার দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই ভক্তিরসের পরিপাকে 'প্রেমে' গঠিত।

(ব্রজে যে সব রসতত্ত্ব মহা মহা সাধকের বাক্যে ও অনুভবের গোচর ছিল এবার সে সব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকটিত হইয়াছে।)

ভট্ট! এখন বকুলতলে সদা অবস্থিত 'হরিদাসে'র কথা শোন—

এ যাবৎ জগতে বিভিন্ন মহাশয়বৃন্দ 'পূজা' বা ভগবত সেবার জন্য যে সমস্ত উপচার ও উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন সে সবই সৎ-চিৎ-আনন্দ হইতে ভিন্নতর।

ঠাকুর হরিদাসের সেবা উপকরণ কেবল 'চিন্ময়-আনন্দরস'।

এখন সংক্ষেপে উপসংহার করিতেছি, শোন—জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর, কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারী তাহাছাড়া আর আর যে সব ভক্তবৃন্দ গৌড়দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা জীবের দরজায় দরজায় গমন করিযা আচার ও প্রচার করিতেছেন যে—

এ যুগের 'ধর্ম্ম'·······সদা নাম সংকীর্ত্তন
এ যুগের 'কৃত্য'········সদা নাম সংকীর্ত্তন

সচল জগন্নাথ গৌরহরির শ্রীমুখে এই সব ভুবন পাবন গৌর-পরিকরবৃন্দের মহিমা শ্রবণে অভিমানী ভট্টের * হৃদয় নির্ম্মল হইল।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই সব প্রসঙ্গের সময গৌরের সান্নিধ্যেই (নিজ সেবা কার্য্যে) উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকট শ্রবণ করিযাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার বিরচিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্য খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ বর্ণন করিয়াছেন।

* চৈঃ চঃ শ্রীগ্রন্থে বল্লভ ভট্টের গৌর নিষ্ঠা সু-প্রতিষ্ঠিত। যথা—
নিজ গৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গে লইযা।
আনন্দিত হৈয়া ভট্ট দিল দিব্যাসন,
আপনি করিল প্রভুর পদ প্রক্ষালন।
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল,
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ মহা পূজা কৈল,·· ······
(পরে ভোজনান্তে—)
"মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শযন, আপনি ভট্ট করেন প্রভুর পাদ সম্বাহন।" এ হেন অধিকারীর মনের অভিমান গৌরহরির এক অপূর্ব্ব ভঙ্গী। যেমন ঋষি দুর্ব্বাসাকে দিয়া রাজা অম্বরীশের 'অধিকার' ও 'অবধি' প্রকট হইযাছে। সেইরূপ বল্লভ ভট্টের মনে অভিমান ও অহঙ্কার দান করিয়া গৌরহরি তাঁহার নদীয়া ও নীলাচলের পরিকরবৃন্দের 'অধিকার' ও 'অবধি' সম্মুখে প্রকাশের পটভূমিকা করিয়াছেন। বল্লভ ভট্ট যে অনন্ত ভাবনিধি গৌরহরির অতি প্রিয পরিকর তাহার প্রমাণ তিনি (ভট্ট) আজ সু-প্রতিষ্ঠিত আচার্য্য।

নিগূঢ় চৈতন্য লীলা বুঝিতে কা'র শক্তি ?

ঠাকুর হরিদাসের প্রসঙ্গে ঃ

ঠাকুর হরিদাস যে সময় বলরাম আচার্য্যের আশ্রয়ে চাঁদপুরে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় বালক রঘুনাথ প্রত্যহই তাঁহার দর্শনে যাইতেন। ঠাকুর হরিদাসের পূত বৈরাগ্যময় জীবনের আচরণ দেখিয়া বাল্যেই তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁহারই কৃপা কটাক্ষে ও আদর্শে আজ রঘুনাথের এই নিষ্কিঞ্চন বেশে স্বরূপের আনুগত্যে নীলাচলে গৌরহরির শ্রীচরণ সরোজ লাভ ও মধুর সমাবেশ দর্শন। সেই ঠাকুর হরিদাস আজ নীলাচলবাসী। এ কারণেই রঘুনাথের মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। তিনি প্রত্যহই ঠাকুর হরিদাসের শ্রীচরণ দর্শনে যান। তাঁহাদের এই মধুর মিলনের রঙ্গ সুখ অন্যে কে বুঝিবে ?

কয়েক বৎসর এইরূপ সুখে অতিবাহিত হইলে পর, একদা ঠাকুর হরিদাসের অপ্রকট দিন সমাগত হইল। সে দিনের বিরহ মিলনের আনন্দে রঘুনাথের যে অবস্থা তাহা অবর্ণনীয়। ঐ দিনটি রঘুনাথের কত সুখের, আবার কত দুঃখের ! সে রহস্যে কে প্রবেশ করিবে ?

ঐ দিন রঘুনাথ স্বচক্ষে দেখিলেন ও স্বকর্ণে শুনিলেন যে—

"বাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া"

এই মহাবাক্যটির আদর্শ ঠাকুর হরিদাস। তিনি আজীবন মহামন্ত্র (হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে) কীর্ত্তন ও জপ করিতেন। সেই হরিদাসই যখন (স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরণের পথ অঙ্গীকরে করিয়া) 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীমুখ দর্শন করিতে করিতে এবং জিহ্বায় 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম

উচ্চারণ করিতে করিতে দেহের ঐহিক প্রাকট্য সম্বরণ করিলেন তখন সবিস্ময়ে সকলেই বুঝিলেন—

"হরে কৃষ্ণ নাম সাধন ফলে—প্রাণ যায় গৌরাঙ্গ বলে—"
ঠাকুর হরিদাস তাঁহার এই মধুর ও সুচতুর পন্থায় 'সচল জগন্নাথ গৌরহরির উপাসনাটি প্রাণের কত গভীর স্তরে রক্ষা করিয়াছিলেন রঘুনাথ তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া মুগ্ধ ও লুব্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে একটি মনোরম গোবৰ্দ্ধন শিলা ও একটি গুঞ্জামালা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি প্রীতির উপহার নিদর্শন করিয়া ঐ 'শ্রীশিলা' ও 'মালা' গম্ভীরার গুপ্তনিধি গৌরহরিকে প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-বিরহিনীর ভাবমণ্ডিত শ্রীগৌর তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত উক্ত গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালাকে কখনও মস্তকে ধারণ, কখনও নাশায় তাহাদের আঘ্রান, কখনও চক্ষে দর্শন, কখনও বক্ষে ধারণ করিতে করিতে তন্ময় হইতেন। তৎকালীন অবস্থায় নিরন্তর প্রেমাশ্রুতে পরিসিক্ত ঐ শ্রীশিলা ও মালা দুইটিকে পরম রঙ্গিয়া গৌরহরি রঘুনাথকে আদর করিয়া উপহার দিয়া কৌতুক পূর্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ ;
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ।
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন ;
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন।"

—চরিতামৃত অন্ত্য ৬ষ্ঠ

এই ঘটনাটি ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যানের পূর্ব্বে কি পরে আজ সঠিক ধরা শক্ত। যাহা হউক 'গৌরহরি'র এই স্নেহের দান ও

স্মৃতির নিদর্শন 'গোবর্দ্ধন শিলা' ও 'গুঞ্জামালা' রঘুনাথ পরমানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর হরিদাসের আদর্শে সু-চতুর পন্থায় নিজ প্রাণনাথ গৌর-হরির উপাসনার পরম সহায় হইবে তাঁহারই প্রীতির দানে গুঞ্জামালা ও গিরিধারী। গৌরহরির সঙ্গসুখস্মৃতি বিজড়িত এই গিরিধারী ও গুঞ্জামালা তাঁহার (গৌর বিরহে) ব্রজবাসের কালে বিরহ জ্বালা প্রশমনের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। যথা—

"গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে রাখে মনোভৃঙ্গরাজে"
প্রকাশিলেন দাস গোসাঞি
আপন প্রাণের ভোগের কথা প্রকাশিলেন দাস গোসাঞি
'শ্রীচৈতন্য স্তবকল্পবৃক্ষে' প্রকাশিলেন দাস গোসাঞি

কবিরাজের গলা ধরে কাঁদে
স্তবকল্পবৃক্ষ বর্ণন ক'রে কবিরাজের গলা ধরে কাঁদে
গৌর হবে না কি নয়ন গোচর
রথের আগে নটন পর গৌর হবে না কি নয়ন গোচর
কাঁদে আর্ত্তনাদ ক'রে
রঘুনাথ দাস গোসাঞি কাঁদে আর্ত্তনাদ ক'রে
রাধাকুণ্ড তীরে ব'সে কাঁদে আর্ত্তনাদ ক'রে
(কৃষ্ণদাস) কবিরাজের গলা ধরে কাঁদে আর্ত্তনাদ ক'রে
প্রাণ গৌরাঙ্গের নীলাচল বিহার বলতে বলতে—
কাঁদে আর্ত্তনাদ ক'রে
(বলে) বল বল কবিরাজ

আর কি আমি দেখ্‌তে পাব
সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু আর কি আমি দেখ্‌তে পাব
গৌরের নীলাচল বিহার আর কি আমি দেখ্‌তে পাব

বলে এই দেখ কবিরাজ
গুঞ্জা গিরিধারী দেখায়ে বলে, এই দেখ কবিরাজ
এই আমার প্রভুর গুঞ্জামালা
এই শিলা প্রভুর বক্ষে ছিলা—এই আমার প্রভুর গলার গুঞ্জামালা

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে
'গুঞ্জা' 'গিরিধারী' বুকে ধ'রে—
বাহু প্রসারি জড়ায়ে ধ'রে
ভাবাবেশে বলে রে

আর ছেড়ে দেব না
পেয়েছি তোমায় চিত-চোর আর ছেড়ে দেব না
গৌর অঙ্গ সঙ্গ ভোগ করে
গুঞ্জা গিরিধারী বুকে ধ'রে গৌর অঙ্গ সঙ্গ ভোগ করে

না হ'বে বা কেন রে
সে যে প্রাণ গৌরাঙ্গের বুকে ছিল না হ'বে বা কেন রে
গৌর অঙ্গ সঙ্গ ভোগ করে
আবার ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে
হা গৌর ! প্রাণ গৌর ! বলে আবার ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে
(বলে) পাব কি গৌরাঙ্গ ধনে
আমার প্রভু স্বরূপের সনে (বলে) পাব কি গৌরাঙ্গ ধনে

"স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়"

(শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী)

———

জগদানন্দ প্রসঙ্গেঃ

চাঁদ নিতাই, প্রভু সীতানাথ, পণ্ডিত গদাধর, পণ্ডিত জগদানন্দ আদি পরম গম্ভীর গৌর পরিকরবৃন্দ সেই ভাবপূর্ণ গৌরহরিকে "নাগর" স্বরূপে ভাবনা করিয়া নিয়তই স্মরণ মনন করেন—তাঁহাদের আচরণ অনুষ্ঠান ও সেই সব মধুর রসের বিচিত্র বিচিত্র লীলাবলীর দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন 'দাস রঘুনাথ'।

অপরূপ মধুর-রসের লীলা-সহচর পণ্ডিত জগদানন্দকে রঘুনাথ নীলাচল প্রবেশের প্রথম দিন হইতেই সুদীর্ঘ ষোড়শ বৎসর ব্যাপী পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াছেন। সুধু দর্শনই নয়—'পুত্র' ও 'ভৃত্যে'র ন্যায় তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্যও তিনি বহুবার পাইয়াছিলেন। যথা—

"রসুয়ের কার্য্য করিযাছে রামাই 'রঘুনাথ'
ইহা সবায দিতে চাঁহো কিছু ব্যঞ্জন ভাত।"

এই "নাগরী" ভাবের আস্বাদক পণ্ডিত জগদানন্দের যে সকল সুমধুর প্রেমময় চেষ্টাগুলি রঘুনাথের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, এই প্রসঙ্গে আমরা সে সবের কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিব।

(১)

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী একবার ঝাড়িখণ্ড পথে নীলাচলে আসেন। পথে জল হাওয়ার দোষে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডুরসা হয়। নীলাচলবাসীদের প্রাণ-স্বরূপ সচল জগন্নাথ গৌরহরি প্রত্যহ

সেই সনাতনকে বলাৎকারে আলিঙ্গন করেন। সনাতনের শ্রীঅঙ্গের কণ্ডুর 'রক্ত' 'রস' গৌরহরির সর্ব্বাঙ্গে লাগে। সুতরাং সনাতন মরমে মরিয়া যান। একদা তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকট নিজের মনোব্যথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

"পণ্ডিত! তুমি জান যে প্রভুকে একবার দর্শন করিয়া পরে রথের চাকার তলায় এই পাপ শরীর বিসর্জ্জন দিবার বাসনায় আমি নীলাচলে এসেছিলাম। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু আমার সে বাসনায় বাদ সাধিলেন। তোমরা সকলেই দেখিতেছ আমার সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডু রসা। শত শত নিষেধ সত্বেও তোমার পরাণ বঁধু গৌরহরি বলাৎকারে আমায় আলিঙ্গন করেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের বীভৎস কণ্ডু হইতে সর্ব্বদা নিঃসৃত রক্ত ও রস তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লাগিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া আমার ও তোমাদের সকলের প্রাণ দুঃখে যেন ফাটিয়া যায়। মৃত্যু হইতেও মর্ম্মান্তিক এই যন্ত্রনা হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাই তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।

গৌরের প্রেয়সী জগদানন্দ আবেশে আবিষ্ট সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন—

"তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন;
রথযাত্রা দেখি তাহা করহ গমন।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

এই ঘটনার পর অপর একদিন সনাতন গোস্বামী সদৈন্যে গৌরহরিকে বলিলেন—

প্রভু! তুমি—

"বীভৎস স্পর্শিতে নাহি কর ঘৃণা লেশ"

—চরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ

কিন্তু সেই অপরাধে আমার সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। কৃপা পূর্ব্বক তুমি অনুমতি দাও আমি ব্রজে যাই। এ বিষয়ে আমি পণ্ডিত জগদানন্দেরও যুক্তি লইয়াছি।

মর্য্যাদা পুরুষোত্তম গৌরহরি এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধেই যেন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—

কি? এত বড় স্পর্দ্ধা?

"কালিকার বড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল?"
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

গৌরহরির ক্রোধ দর্শনে তীক্ষ্ণধী সনাতন বিস্মিত চমৎকৃত ভাবিলেন—

জগদানন্দ প্রভুর অতি আপন জন, এ কারণেই ঐ রূপ তিরস্কারের ভাষা। আমি দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম প্রভুর মতে তাহা অন্যায়। তিনি তাহার জন্য আমায় তিরস্কার করেন নি। যুক্তি দ্বারা আমার অন্যায় বুঝাইয়া দিয়া আমার গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এখন তাঁহার শ্রীচরণ ত্যাগ করিয়া স্বাতন্ত্র্য স্বার্থসুখ রক্ষা করিবার আশায় ব্রজ গমনে ইচ্ছা করিয়াছি। সম্ভবত ইহাও প্রভুর মনঃপুত নয়। তবু তিনি আমাকে তিরস্কার করিলেন না। অতঃপর তিনি নিজ দুর্ভাগ্যকেই স্মরণপূর্ব্বক গৌরহরিকে বলিলেন—

"জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল!"

"জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান।"

(২)

"চৈতন্যের 'প্রেমপাত্র' জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে, সে-ই মানে 'পাইল চৈতন্য' ॥"

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২শ

এ হেন পণ্ডিত জগদানন্দ একদা প্রখ্যাত পুরুষ সেন শিবানন্দের * গৃহে উপস্থিত হইয়া সেখানে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাও করিতেন এবং কাঞ্চনপল্লীর প্রখ্যাত জমিদার ছিলেন। ঐ সময় একমাত্রা (ষোল সের) চন্দনাদি তৈল সংগ্রহ করিলেন। গৌরের ভাব-প্রেয়সী জগদানন্দ মনে করিয়াছিলেন যে বায়ু ও পিত্যাধিক্য জনিত তাঁহার পরাণ বঁধু গম্ভীরা-বিহারী গৌরহরির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এই জন্য তিনি তাঁহার কথা শোনেন না—ভাল খান না—ভাল পরেন না—উত্তম শয্যায় শয়ন করেন না। এই চন্দনাদি তৈলটি নীলাচলে গিয়া তিনি গৌরহরিকে মাখাইবেন। তাঁহার মস্তক সুশীতল এবং স্থির হইবে। এই আবেশে প্রমত্ত হইয়া তিনি ঐ চন্দনাদি তৈলের কলসটি—

"নীলাচলে লঞা আইলা যতন করিয়া"

তাহার পর গৌরহরির সেবক গোবিন্দকে আদেশের সুরে বলিলেন—

"প্রভু অঙ্গে দিও তৈল"

গোবিন্দ মহা বিপদে পড়িলেন, কারণ শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাসী ও কঠোর ব্রতধারী। গৌরহরির শ্রীচরণে যাহা হউক একদিন তিনি নিবেদন করিলেন—

* ইঁহাই পুত্র মহাকবি কর্ণপুর শিবানন্দ সেনের আদি নিবাস মালঞ্চ আর শ্বশুরালয় কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া। শ্রীনিত্যানন্দের প্রযাশঃ অবস্থান ইঁহার গৃহে হইত। জগদানন্দ শিবানন্দের সহিত দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন।

"তোমার 'জগদানন্দ' গৌড়দেশ হইতে এক কলস 'চন্দনাদি তৈল' অতি যত্ন পূর্ব্বক আনিয়াছেন। ঐ তৈল ব্যবহার করিলে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ নাশ হয়, ধাতু পুষ্ট হয়, শরীরে বল বৃদ্ধি হয়। এই তৈল প্রত্যহ একটু করিয়া তুমি মস্তকে ব্যবহার কর, ইহাই পণ্ডিতের একান্ত বাসনা।"

রঙ্গিয়া গৌরহরি গোবিন্দকে বলিলেন—"তোমাদের পণ্ডিত প্রেমে অন্ধ হইয়া এই কার্য্য করিয়াছে। সে কি জানে না যে সামান্য তৈল ব্যবহারেও সন্ন্যাসীর অধিকার নাই। তাহাতে আবার জগদানন্দের আনীত তৈলটি পরম সুগন্ধি। ইহার ব্যবহারও অত্যন্ত লজ্জার কথা। এক কাজ কর—ঐ তৈল জগন্নাথের প্রদীপ জ্বালিবার জন্য সেখানে পাঠাইয়া দাও—তাহাতে তাঁহার কষ্ট করিয়া তৈল আনার শ্রম সফল হইবে।"

গৌরহরির উত্তর শুনিয়া গোবিন্দ বেশ চিন্তিত হইলেন। তিনি নিশ্চয় করিয়া জানেন যে, এই কথা শুনিলে 'জগদানন্দ' অত্যন্ত দুঃখ পাইবেন। কিন্তু উপায় কি? তাই, যথা সময়ে গোবিন্দ অত্যন্ত ভীত হইয়া গৌরহরির অভিমত জগদানন্দকে জানাইলেন।

বিচিত্র প্রেম। পণ্ডিত জগদানন্দ গৌরহরির এই আদেশ শুনিয়া কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না। তাঁহার তাৎকালিক ভাব দেখিয়া গোবিন্দের ভয় অধিকতর হইল। তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। জগদানন্দও নিজ কুটিরে ফিরিয়া গেলেন। এই ভাবে দশ দিন চলিয়া গেল, এ সম্বন্ধে আর কোনও কথাই হয় নাই। জগদানন্দের সহিত গোবিন্দের নিত্য দেখা হয়—তিনিও কিছু বলেন না—গোবিন্দও কিছু বলিতে সাহস করেন না। কিন্তু জগদানন্দের মুখের ভাব দেখিয়া গোবিন্দ বুঝিতে পারেন তিনি মহাপ্রভুর বাক্যে ও ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছেন। গোবিন্দ মনে মনে ভাবিলেন যে, আর একবার প্রভুকে বলিয়া দেখি। দাম্পত্য কলহে সেবকের যে দুর্দ্দশা—গোবিন্দের আজ সেই দশা। যাহা হউক অপর

একদিন অত্যন্ত বিনয় ও অনুরোধপূর্ব্বক গোবিন্দ গৌরহরিকে ভয়ে ভয়ে ভগ্নস্বরে বলিলেন --

"পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল প্রভু করে অঙ্গীকার"

এবার, গৌরহরি সক্রোধে বলিলেন—

"মর্দ্দনিয়া রাখ এক করিতে মর্দ্দনে"

"ছিঃ। এই সুখ ভোগের জন্য কি সন্ন্যাস গ্রহণ? ইহাতে আমার সর্ব্বনাশ, আর সকলে তোমাদিগকেও পরিহাস করিবে। সুগন্ধি তৈল মাখিয়া রাস্তায় বাহির হইব, আর ঐ গন্ধ পাইয়া লোকে মনে করিবে আমি নিশ্চয়ই গোপনে বিলাসিতা করি এবং সেই বিলাস রঞ্জনের নিমিত্তই ঐ তৈল ব্যবহার করিয়াছি।" গোবিন্দ সবই বোঝেন। তিনি নিরুপায় হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

এই ঘটনার পরের দিন সকাল। জগদানন্দ প্রত্যহ সকালে যেমন দর্শনে আসেন তেমনি আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌরহরি নিজেই বলিলেন—

"পণ্ডিত! তৈল আনিলে গৌড় হইতে,
আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে,
জগন্নাথে দেহ লঞা, দীপ যেন জ্বালে,
তোমার সকল শ্রম হইব সফলে।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২শ

পণ্ডিত জগদানন্দ গোবিন্দের মুখে গৌরহরির এই অভিমত পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। তখন তিনি মৌনী ছিলেন, কোন কথা বলেন নি। তিনি অভিমানী ভক্ত। তাঁর মনের ভাব— সেবকের মারফৎ এই সংবাদ! দেখা যাইবে তুমি আমার বাসনা পূরণ

করিতেছ কি না? আজ স্বকর্ণে গোবিন্দর মুখে শোনা কথার আবৃত্তি 'গৌর' মুখে শুনিলেন। তিনি প্রণয় রোষে বলিতেছেন—

"আমি গৌড় হইতে তৈল আনিয়াছি—এ মিথ্যা কথা তোমায় কে বলিল? আমি তৈল আনি নাই।" এই কথা বলিয়াই তিনি কম্পিত কলেবরে দ্রুতবেগে ঘর হইতে তৈলের কলসটি বাহিরে আনিয়া 'গৌরহরি'র সম্মুখে কলসটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এই আচরণ দ্বারা প্রণয় রোষজনিত অভিমানটিই ব্যক্ত করিলেন যে—

"আমি তোমার জন্য তৈল আনিয়া যে অন্যায় করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি দেখ!" অতঃপর ক্রোধে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে নিজ কুটিরে গমন পূর্ব্বক দরজা বন্ধ করিয়া ভূ-শয্যা গ্রহণ করিলেন। এই ভাবে দুই দিন ও দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল।

বিদগ্ধ চূড়ামণি গৌরহরি তৃতীয় দিন সকালে স্বয়ং জগদানন্দের দরজায় উপস্থিত হইয়া প্রেম মধুর স্বরে বলিতেছেন—

"পণ্ডিত। ওঠ! অবুঝ হইও না। আজ মধ্যাহ্নে তোমার হাতের রান্নার প্রসাদ গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

স্বপ্ন দর্শনবৎ জগদানন্দের সব অভিমান মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইল তিনি উঠিলেন। পূর্ণ উদ্যমে, অতি সত্বর রান্নার যোগাড়ের জন্য ব্যস্ত হইলেন। এই অল্প সময়ে বহুবিধ অন্ন ব্যঞ্জনের যোগাড়ের জন্য ঐ দিন রঘুনাথ ও রামাই প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া জগদানন্দের মনে তৃপ্তি ও আনন্দ দান করিয়াছিলেন। তিনি আজ মনের সুখে ভোজ্যান্ন প্রস্তুত করিলেন—বহু প্রকার শাক, মোচার ঘণ্ট, সুক্ত, লাফ্রা ব্যঞ্জন কিছুরই বাকি রাখিলেন না। মোট কথা—যে সমস্ত ব্যঞ্জনে গৌরহরির প্রীতি ও তৃপ্তি হয় সে সমুদয় ব্যঞ্জনই রন্ধন করিলেন।

প্রথম দর্শনেই অভিমানী 'জগদানন্দ'কে উল্লাস দিবার আশয়ে গৌরহরি মধ্যাহ্ন কৃত্য শেষ করিয়া 'একক' জগদানন্দের কুটিরে আসিলেন। জগদানন্দের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কারণ, আজ

তিনি মনের তৃপ্তিতে 'নিজ পরাণ নাথকে' ভোজন করাইতে পারিবেন। যথাযথ পরিপাটীর সহিত জগদানন্দ গৌরহরিকে ভোজনে বসাইলেন। রঙ্গিয়া গৌরহরি ঈষৎ মধুর হাসিয়া রসিকতার সহিত বলিলেন—

"দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্ন ব্যঞ্জন ;
তোমায় আমায় একত্র আজি করিব ভোজন ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২শ

এই বলিয়া শ্রীহস্ত উত্তোলন করিয়া তিনি আসনে বসিয়া রহিলেন।

কত নিবিড় মধুর-রসের এই ব্যবহার।

লজ্জিত হইয়া প্রেম গদ গদ বচনে জগদানন্দ বলিলেন—

"আপনি প্রসাদ লউন পাছে মুঞি লইব ;
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিব ?"

—চরিতামৃত অন্ত্য ১২শ

গৌরহরি প্রসাদ পাইতেছেন। পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় জগদানন্দ নিকটে বসিয়া প্রতিটি বস্তু পরম প্রেমভরে পরিবেশন এবং ভোজনে উৎসাহ দান করিতেছেন। ভোজন করিতে করিতে পরিহাসপটু গৌরহরি বলিতেছেন—

"ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে হয় এত স্বাদ ?"

আজ জগদানন্দের মান ভঞ্জনের জন্যই এই ভোজন রঙ্গ। সুতরাং পণ্ডিত যত কিছু পরিবেশন করিতেছেন রসিকশেখর গৌরহরি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সে সমস্ত গ্রহণ করিতেছেন। সাধারণতঃ প্রত্যহ মধ্যাহ্নে গৌরহরি যে পরিমাণ প্রসাদ গ্রহণ করেন

আজ তাহা হইতে অনেক বেশীই গ্রহণ হইল। তবুও জগদানন্দ ক্ষান্ত হইতেছে না দেখিয়া অতি কাতরে গৌরহরি বলিলেন—

"দশ গুণ খাওয়াইলে এবে কর সমাধান"

রক্ষা কর। আর খাওয়াইও না; পেট ফাটিয়া গেল। জগদানন্দ। তোমার হাত ধরি আর কিছু দিও না।

অতঃপর জগদানন্দ প্রেমানন্দে গৌরহরিকে আচমন, তাহার পর মাল্য ও চন্দনে ভূষিত করিলে পর গৌরহরি জগদানন্দের মুখের দিকে কৃপা দৃষ্টি করিয়া সহাস্য বদনে প্রেম গদ গদ স্বরে বলিলেন—

"জগদানন্দ। তুমি আমার সামনে বসে এবার ভোজন কর।"

স্বামীর সম্মুখে পতিব্রতা স্ত্রী ভোজন করেন না। আজ আবার গৌরহরি গুরু ভোজনে ক্লান্ত। সত্বর তাঁহার বিশ্রাম দরকার বিবেচনায় জগদানন্দ বলিলেন—

"প্রভু যাই করুন বিশ্রাম,
মুঞি এবে প্রসাদ লইব করি সমাধান।
রসুয়ের কার্য্য করিয়াছে রামাই 'রঘুনাথ';
ইহা সভায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত।"

—চরিতামৃত অন্ত্য ১২শ

অভিমান জনিত প্রণয় রোষ উপশমিত হইয়াছে। আর ভয়ের কোন কারণ নাই জানিয়াও গৌরহরি প্রেমের বিশেষ পরিপাকে গোবিন্দকে আদেশ করিলেন—

"গোবিন্দ! তুমি ইহাই রহিবে,
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে।"

—চরিতামৃত অন্ত্য ১২শ

পরে, 'হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি নিজ বাসায় গমন করিলেন।

মহাপ্রভু গোবিন্দকে পাহারা দিতে রাখিয়া গেলেন। জগদানন্দ জানেন যে ভোজনান্তে গোবিন্দ পাদসেবন না করিলে গৌরহরির পূর্ণ বিশ্রাম হয় না। আজ আবার অতিরিক্ত ভোজন হইয়াছে। তাই প্রেমপরিপাটিতে তিনি গোবিন্দকে বলিলেন—

"তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদ-সম্বাহনে ;
কহিও পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২শ

এবং তোমার জন্য প্রসাদ ধরা থাকিবে। প্রভু নিদ্রা গেলে পর তুমি আসিবে। এই বলিয়া তিনি গোবিন্দকে গৌরহরির পাদ সম্বাহরনে জন্য সত্বর পাঠাইলেন। তাহার পরে তিনি রামাই, নন্দাই, গোবিন্দ এবং রঘুনাথের জন্য প্রসাদ বণ্টন করিয়া নিজে গৌরহরির অবশেষ পাত্র গ্রহণ করিলেন।

গোবিন্দকে সত্বর আসিতে দেখিয়া গৌরহরির সন্দেহ হইল। পরে গোবিন্দের মুখে সত্য তথ্য জানিয়া মৃদু হাসিলেন। অতঃপর তিনি গোবিন্দকে পুনরায় জগদানন্দের কুটিরে পাঠাইলেন। জগদানন্দের কুটির হইতে প্রত্যাগত হইয়া গোবিন্দ বলিলেন—

জগদানন্দ সত্য সত্যই প্রসাদ পাইতেছেন। এখন মহাপ্রভু স্বচ্ছন্দে নিদ্রা গেলেন।

এই প্রসঙ্গে দাস গোস্বামীর প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভব কবিরাজের পয়াররূপে মূর্ত্তি ধরিয়াছে—

"জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা ?

জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহই উপমা।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২শ

(৩)

রাই-কানুর ভাববিগ্রহ হইয়াও গৌরহরি শ্রীকৃষ্ণবিরহে জর্জ্জরিত। ফলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছে। আবার তাঁহার আদেশে শুষ্ক কলার খোলা পাতিয়া গোবিন্দ শয্যা রচনা করিয়া দেন।

ইহা দেখিয়া ভক্তবৃন্দের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। প্রেমান্ধ 'জগদানন্দ' 'গৌরহরির' দৈহিক কষ্ট দূরীকরণ নিমিত্ত এক অপরূপ উপায় উদ্ভাবন করিলেন। যথা—

সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি গিরি দিয়া রঙ্গাইল ;
শিমূলের তূলা দিয়া তাহা পুরাইল।'

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৩শ

সেই অভিনব বিছানাটি সেবক গোবিন্দের হাতে দিয়া বলিলেন—

"প্রভুকে শোয়াইও ইহায়—"

প্রেমের রীতির বিচিত্র গতি। জগদানন্দ জানেন গৌরহরি তাঁহার দেওয়া এই শয্যা স্বীকার করিবেন না। তবুও তাঁহার মন বোঝে না। এইরূপ প্রেম চেষ্টায় যে সুখ তাহা প্রেমিকেরাই বুঝিতে পারে। জগদানন্দ মনে প্রাণে অনুভব করিলেন যে গোবিন্দের কথায় গৌরহরি ঐ শয্যা অঙ্গীকার করিবেন না। তাই তিনি গৌরহরির 'দ্বিতীয় দেহ' স্বরূপ গোস্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া নির্জ্জনে লইয়া গিয়া মহা অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেন—

"প্রাণ প্রিয় স্বরূপ। আমি নূতন শয্যা প্রস্তুত করিয়া গোবিন্দের হাতে দিয়াছি। আজ তুমি সেই আমার প্রাণ বঁধুকে শয়ন করাইও। জগদানন্দের ভয়ে স্বরূপ গোস্বামী তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন। জগদানন্দ কিছুটা আশ্বস্ত হইলেন।

গৌরহরির শয়ন কালে আজ স্বরূপ গোস্বামী জগদানন্দের দত্ত শয্যাটি পাতিয়া দিলেন। 'সর্ব্বজ্ঞ' গৌরহরি তুলার শয্যা বালিশ ইত্যাদি দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ইহা করাইল কোন্ জন ?"

(চরিতামৃত)

গোবিন্দ ভয়ে চুপ করিয়া আছেন। স্বরূপ গোস্বামী বলিলেন—

"শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি"

প্রণয় রোষে গৌরহরি বলিলেন—

খাট এক আনহ পাড়িতে !'

অতঃপর ঐ সব তুলার বিছানা অপসারণ করিয়া যথা পূর্ব্ব কলার শরলার শয্যা গ্রহণ করিলেন। স্বরূপ কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গৌরহরির মন বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিলেন।

পর দিনের প্রভাত। জগদানন্দ স্বরূপ ও গোবিন্দের মুখে রাত্রির ঘটনা শুনিলেন। তিনি অতীব গম্ভীর হইলেন। তাঁহাকে সুখ দিতে, কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল স্বরূপ কদলীর শুষ্ক পত্র বহু পরিমাণে আহরণ করিয়া আনিলেন। সে গুলি নখ দ্বারা চিরিয়া চিরিয়া অতি সূক্ষ্ম করিলেন। গৌরহরির দুইখানি বর্হিবাসের মধ্যে ঐ সকল সূক্ষ্ম শুষ্ক কদলী পত্রগুলি বিছাইলেন এবং তাহা দ্বারা একখানি যেন তোষক ও অপরটি লেপ তৈয়ার করিলেন। একখানি ভূমিতে পাতিয়া তাহার উপর শয়ন ও অপরটি গায়ে দিবেন। এই ব্যবস্থা করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় এই অভিনব শয্যাটি গৌরহরিকে দেখাইলেন। জগদানন্দের অভূত পূর্ব্ব উৎকণ্ঠার প্রেম চেষ্টা দেখিয়া তাহার এই শয্যাটি গৌরহরি অঙ্গীকার করিলেন।

"জগদানন্দ ভিতর বাহিরে মহাদুঃখী"

———০০———

(৪)

মধুর রসের ভক্ত পণ্ডিত জগদানন্দ। তিনি গৌরহরির সন্ন্যাসব্রত তীব্র হইতে তীব্রতর দর্শন করিতে করিতে মহা ব্যাকুল হইয়াছেন। গৌরহরির কঠোরতা ক্রমশঃ ঘন হইতে ঘনীভূত হইতেছে। জগদানন্দের পক্ষে তাহা স্বচক্ষে দর্শন ও সহ্য করা অসম্ভব হইল। তিনি বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি ক্রোধে ও মহাদুঃখে মনে মনে বিচার করিলেন—

'নীলাচলে থাকিব না' প্রাণনাথের এ অবস্থা চক্ষে আর দেখিব না, বৃন্দাবন পলায়ন করি।" পর মুহূর্তে তাঁহার চিন্তা জাগিল "গৌরহরিকে না দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব?" উভয় সঙ্কটে পড়িয়া তিনি বিষম চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অন্তরের ক্রোধ ও দুঃখ বাহ্যে প্রকাশ না করিয়া তিনি গৌরহরির নিকট বৃন্দাবন যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। 'সর্ব্বজ্ঞ' ও 'রসিক-শেখর' গৌরহরি প্রেমাবেশে বলিলেন—

"মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি:
আমায় দোষ লাগাইয়া হইবে ভিকারী?"

চরিতামৃত অন্ত্য ১৩শ

আমার সঙ্গে চাতুরী! আমার উপর ক্রোধ করিয়া মথুরা যাইতে চাও। না! না! আমি তোমাকে মথুরা যাইবার অনুমতি দিব না। দিব না।

'জগদানন্দ' পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও 'গৌরহরির' নিকট হইতে মথুরা যাইবার আদেশ আদায় করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনের ভাব—"আমার অব্যাহতি নাই। অন্তিম দশা দেখাইয়া তবে ছাড়িবে। কি শঠ!" যাহা হউক, নিজ উদ্দেশ্য সাধন জন্য পুনরায় তিনি স্বরূপকে বলিলেন—

"দেখ স্বরূপ! আমি যেমন 'আই' * দর্শনে নবদ্বীপে যাই ও ফিরিয়া আসি, সেইরূপ একবার বৃন্দাবন যাইতে চাই। আমি বহুবার বলিযাছি। আমার কথা বিশ্বাস করে না। অনুমতি দেয় না। তুমি একথা বলিয়া ব্যবস্থা করে দাও।"

'স্বরূপ' সুযোগ ও সময় বুঝিযা 'গৌরহরিকে 'জগদানন্দকে' বৃন্দাবন যাইবার অনুমতি দিতে প্রার্থনা করিলেন। গৌরহরি ঈষৎ হাসিযা সঙ্গে সঙ্গেই অনুমতি দিলেন।

'গৌরহরি ও 'জগদানন্দের' প্রেমকোন্দলে কে প্রবেশ করিবে?

দাম্পত্য কলহে—অভিমানে পণ্ডিত জগদানন্দ ব্রজের পথে গমন করিলেন। তাঁহার মনের অবস্থা যে কিরূপ তাহা তাঁহারই স্বরচিত 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই অপুর্ব্ব ও মধুর পদ দুইটি 'রঘুনাথের পরম আদরের ধন। নীচে উদ্ধৃত হইল।

গৌরাঙ্গ তোমার. চরণ ছাড়িযা, চলিনু শ্রীবৃন্দাবনে
পূর্ব্ব লীলা তব, দেখিব বলিয়া, হইল আমার মনে।

---

* শচীমাতাকে বৈষ্ণবরা 'আই' বলিতেন।

কেন সেই ভাব, হইল আমার, এখন কান্দিয়া মরি।
তোমারে না দেখি প্রাণ ছাড়ি যায়, না জানি এবে কি করি ॥

ও রাঙ্গা চরণ, মম প্রাণ ধন, সমুদ্র বালিতে রাখি।
কি দেখিতে আইনু, নিজ মাথা খাইনু, উড়ু উড়ু প্রাণ পাখী ॥

যত চলি যাই, মন নাহি চলে, তবু যাই জেদ করি।
প্রেমের বিবর্ত্ত, আমারে নাচায়, না বুঝিয়া আমি মরি ॥

গৌরাঙ্গের সঙ্গ, বুঝিতে নারিনু, পড়িনু দুঃখ-সাগরে।
আমি চাই যাহা, নাহি পাই তাহা, মন যে কেমন করে ॥

গৌরাঙ্গের তরে, প্রাণ দিতে চাই, না হয় মরণ তবু
মরিব বলিয়া, পড়িয়া সমুদ্রে, খাই মাত্র হাবু ডুবু।

সে চন্দ্র বদন, দেখিবার লোভে, শীঘ্র উঠি সিন্ধু তটে।
পুন নাহি দেখি, প্রাণ উড়ি যায়, চলি পুনঃ টোটা বাটে ॥

গোপীনাথাঙ্গনে, দেখি গোরা মুখ, পড়ি অচেতন হৈঞা।
পণ্ডিত গোসাঞি, মোরে লঞা রাখে, দেখি পুনঃ সংজ্ঞা পাঞা

গৌর গদাধর, বসিয়া দুজনে, বলেন আমার কথা।
অমনি কাঁদিয়া, যাই গড়াগড়ি, না বিচারে যথা তথা ॥

ক্ষণেক বিরহ, না সহিতে পারি, গৌর মোর হৃদে নাচে।
মরিতে না দেয়, বাঁচিলে কোন্দল, কিসে মোর প্রাণ বাঁচে?

হেন অবস্থায়, গৌর পদ ছাড়ি, মোর বৃন্দাবন আসা।
এ বুদ্ধি হইল, কেন নাহি জানি, ইহ পরকাল নাশা ॥

আজ্ঞা লইনু যাইতে, আজ্ঞা না পালিলে, তাতে হয় অপরাধ।
গোরাচাঁদ মুখ, না দেখিয়া মরি, সব দিকে মোর বাধ ॥

'গোরাপ্রেম' যার, শঙ্কট তাহার, প্রাণ লৈয়া টানাটানি।
গদাধর গণে, এইত দুর্দ্দশা, সব করে কানা কানি

(২)

ভাই রে বৃন্দাবন যাওয়া হইল না
গোরামুখ না দেখিয়া, গৌররূপ ধেয়াইয়া
পথ ভুলে যাই অন্য দেশ।
সেখান হইতে ফিরি, পুন যদি ধীরি ধীরি
পুন আসি দেখি সে প্রদেশ ॥

এইরূপে কত দিনে, যাব আমি বৃন্দাবনে
না জানি কি হবে দশা মোর।
বৃক্ষতলে বসি বসি কাটি আমি অহনিশি
কভু মোর নিদ্রা আসে ঘোর ॥

স্বপ্নে বহু দূর গিয়া সিন্ধুতটে প্রবেশিয়া
দেখি গোরার অপূর্ব্ব নর্ত্তন।
গদাধর নাচে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ নাচে রঙ্গে
গায় গীত অমৃত বর্ষণ ॥

নৃত্য গীত অবসানে, গোরা মোর হাত টানে
বলে 'তুমি' ক্রোধে ছাড়ি গেলে।
আমার কি দোষ বল তব চিত্ত সুচঞ্চল
ব্রজে গেলে আমা হেথা ফেলে ॥

আইস আলিঙ্গন করি তব বক্ষে বক্ষ ধরি
ছাড়ো মুঞি চিত্তের বিকার।
মধ্যাহ্নে করিয়া পাক দেহ মোরে অন্ন শাক
ক্ষুন্নিবৃত্তি হউক আমার ॥

ছাড়িয়া জগদানন্দে মোর মন নিরানন্দে
ভোজনাদি নৈল কত দিন।
কি বুঝিযা গেলে তুমি, দুঃখেতে পড়িনু আমি
জগা মোর সদা দয়াহীন ॥

শীঘ্র ব্রজ নিরখিযা আইস তুমি সুখী হঞা
মোরে দেহ শাকান্ন ব্যঞ্জন।
তবে ত বাঁচিব আমি তাতে সুখী হবে তুমি
ক্রোধে মোরে না ছাড় কখন।

নিদ্রা ভঙ্গে দেখি আমি বহুদূর ব্রজভূমি
নিকটেতে জাহ্নবী পুলিন।
আহা! নবদ্বীপ ধাম, নিত্য গৌর-লীলা গ্রাম,
ব্রজসার অতি সমীচীন ॥

আনন্দেতে মায়াপুরে প্রবেশিনু অন্তপুরে
নমি আমি আই-মাতা-পদ।

গৌরাঙ্গের কথা বলি শীঘ্র আইলাম চলি
দেখি নবদ্বীপ সুসম্পদ।

ভাবিলাম বৃন্দাবন করিলাম দরশন
আর কেন যাব দূর দেশ।
গৌর দরশন করি সব দুঃখ পরিহরি
ছাড়ি দিব বিরহজ ক্লেশে।

জগদানন্দের নিম্নোদ্ধৃত স্বরচিত 'নাগরী' ভাবের পদটিও রঘুনাথের নিত্য স্বাধ্যাযের ধন ছিল।

চাঁদ নিঙ্গাড়ি কেবা, অমিযা ছানিল রে, তাহে মাজল গোরামুখ।
মোতিম দরপণ সিন্দূরে মাজল, হেরইতে কতই সুখ॥

ভূতলে কি উযল চাঁদ
মদন বেযাধ কি, নারী হরিণী, পাতল নদীযামে ফাঁদ।

গেও মরু ধরম, গেউ মরু মরম, গেও মরু কুলশীলমান।
গেও মরু লাজ ভয়, গুরু গঞ্জনা চায়, গোরা বিনু অথির পরাণ।

গৌর পীরিতে হম, ভেল গরবিত কুলমানে অনল ভেজাই।
জগদানন্দ কহ, ধনি ধনি তুযা লেহ মরি যাঙ লৈযা বালাই।

(গৌর পদ তরঙ্গিনী)

---(০০)---

রঘুনাথ ভট্ট প্রসঙ্গে ঃ

ভূমিকা

প্রখ্যাত তপন মিশ্র, তাঁহার পুত্র "রঘুনাথ" (ভট্ট গোস্বামী) কাশীধাম হইতে দুইবার নীলাচলে আগমন করেন। প্রত্যেক বারই আট মাস যাবৎ গৌরহরির সান্নিধ্যে বাসের সৌভাগ্য লাভ করেন। এই রঘুনাথ ভট্ট রঘুনাথ দাস হইতে বয়সে সামান্য ছোট। নীলাচলে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ঘটে। ভাবী কালে এই ঘনিষ্ঠতার মধুরতা ও গভীরতা প্রকাশ পায় উভয়ের অপ্রকট 'স্থান', 'মাস' ও 'তিথির' মিলনে। শ্রীকুণ্ডে, আশ্বিন মাসে, শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে 'দাস রঘুনাথ' ও 'ভট্ট রঘুনাথ' উভয়েই নিজ নিজ প্রকট লীলা সঙ্গোপন করেন। অদ্যাপি শ্রীকুণ্ডের তটে পাশাপাশি উভয়ের সমাধি দুইটি বর্ত্তমান!

গৌরহরি নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাতায়াতের পথে বারাণসীতে প্রিয় ভক্ত তপন মিশ্রের ঘরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময় রঘুনাথ বালক। বিশুদ্ধ আধার ও বয়সে, বালক নিজ গৃহেই স্বয়মাগত ভাবমণ্ডিতবিগ্রহ অপূর্ব্বদর্শনের পুরুষোত্তম গৌর-হরিকে লাভ করিয়া রঘুনাথ পরমানন্দে দুই মাস হইতে কিঞ্চিৎ অধিক সময় পর্য্যন্ত গৌরহরির শ্রীচরণের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। অন্য কথায় ছায়ার মত থাকিয়া অখণ্ড গৌর-সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। ফলে অনির্ব্বচনীয় প্রেমের টানে পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া রঘুনাথ একদিন নীলাচল পলাইয়া যান। 'সর্ব্ব-চিত্ত-জ্ঞাতা' 'গৌর-হরি' নীলাচলে তার সাক্ষাৎকারেই রঘুনাথকে গাঢ় আলিঙ্গনে কৃতার্থ ও আত্মসাৎ করিলেন। পরে, তপন মিশ্র চন্দ্রশেখর আদি

দাস গোস্বামীর সমাধি

ভট্ট গোস্বামীর সমাধি

কাশীবাসী ভক্তবৃন্দের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। তারপর অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

"ভাল হৈল আইলা, দেখ কমল লোচন ;
আজি আমার এথা করিবে প্রসাদ ভোজন।"
চরিতামৃত অন্ত্য ১৩শ

নিজের অবশেষ পাত্র দানের অন্তে—
"গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইল ;
সঙ্গে স্বরূপাদি ভক্তগণ মিলাইল।"
চরিতামৃত অন্ত্যঃ ১৩শ

গৌরাঙ্গ, গোবিন্দ ও স্বরূপের ইচ্ছায় 'দাস রঘুনাথ আটমাস ব্যাপী ভট্ট 'রঘুনাথের' সেবক সাথী ও বন্ধুরূপে নিযুক্ত হইলেন। স্নান, 'জগন্নাথ' দর্শন, বিভিন্ন বৈষ্ণববৃন্দেব দর্শন, হাট, বাজার সর্ব্ব কার্যে সদাই 'তুই রঘুনাথ' একত্রে থাকেন।

রঘুনাথ ভট্ট মিত্র রঘুনাথ দাসের নিকট গৌরহরির প্রিয খাদ্য দ্রব্যের তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। উভয় বন্ধু পরামর্শ করিযা গৌরের প্রিয় আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। ভট্ট রঘুনাথ রন্ধনে সুপটু ছিলেন। পরিপাটীর সহিত রন্ধন করিয়া মাঝে মাঝে গৌরহরিকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এই রূপে নানাবিধ আনন্দে আটমাস অতীত হইল। অতঃপর একদা গৌরহরি ভট্টকে পরম স্নেহে স্বহস্তে নিজের গলার মালাটি লইয়া পরাইয়া দিযা বলিলেন—

'বৎস রঘু! তোমার পিতামাতা কাশীবাসী। যত দিন তাঁহারা জীবিত ততদিন তুমি তাঁদের সেবা কর এবং কাশীতে কোন বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত পাঠ করিবে। বিবাহ করিও না। পিতা

মাতার দেহান্তে (আবার) আমার নিকট চলিয়া আসিবে।' এই বলিয়া মহাপ্রভু রঘুকে প্রেমালিঙ্গন ও স্নেহ চুম্বন দানে রঘুকে তৃপ্ত করিয়া বিদায় দিলেন।

রঘুর অবস্থা—

'প্রেমে গর গর ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা'

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩শ

স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায় লইয়া ভট্ট রঘুনাথ বন্ধু 'দাস রঘুনাথকে' বুকে জড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ে ক্রন্দন করিলেন। পরে বিগত আটমাসের নীলাচল বাসের সুখ স্মৃতি সম্বল করিয়া গৌর আজ্ঞা পালন করিবার ব্রত লইয়া কাশীর পথে যাত্রা করিলেন।

'ভট্ট রঘুনাথ কাশী প্রত্যাগমন করিয়া চারি বৎসর কাল 'পিতা মাতার সেবা করিলেন। বৈষ্ণব পণ্ডিতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলেন। পিতা মাতা ইহ ধাম পরিত্যাগ করিলে পর তিনি গৃহ বিত্তাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ উদাসী হইয়া পরমানন্দে নীলাচল যাত্রা করিলেন। মনে সুখময় আশা রহিল যে এবার উভয় বন্ধুতে একত্রে পরমানন্দে নীলাচলে গৌরহরির সেবা সুখ ভোগ করিবেন।

'রঘুনাথ' নীলাচলে আসিয়া—

পড়িলেন লুটাইয়া
গৌরাঙ্গের দরশন পেয়ে পড়িলেন লুটাইয়া
তোমার ক্রীতদাস এসেছে বলে পড়িলেন লুটাইয়া

প্রাণ গৌর ভাসে নয়ন জলে
নিজ দাসে করি কোলে প্রাণ গৌর ভাসে নয়ন জলে
(শ্রীপাদ রামদাস)

পূর্ব্ব বারে রঘুনাথ গৃহী ভক্তের মত নিজ অর্থ ব্যয়ে নীলাচলে বসবাস করিয়াছিলেন। এবার, উভয় বন্ধুর (দাস রঘুনাথ ও ভট্ট রঘুনাথ) প্রীতি ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া আরও ঘন হইল। এমন সময় হঠাৎ একদিন গৌরহরি নিজ শক্তি সঞ্চার করিয়া 'ভট্ট রঘুনাথকে' বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিলেন। দাস রঘুনাথের মত বন্ধু ও প্রাণ-মন-উন্মাদকারী গৌরাঙ্গ স্বরূপ এবং তাঁহার অমিয় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া গৌরহরির সুখের জন্য ভট্ট রঘুনাথ ব্রজের পথে যাত্রা করিলেন। একটু যান আর ফিরিয়া পিছনের দিকে চাহিতে চাহিতে অশ্রুসজল দৃষ্টিতে অগ্রসর হন।

অনির্ব্বচনীয় দশা। নয় কি?

৪৫৫ শকাব্দের পরে আবার উভয় বন্ধুতে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতটে। মিলিত হইয়াছিলেন।

বাণীনাথ প্রসঙ্গেঃ

(শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার বিরচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীগ্রন্থের অন্ত্য খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে এই লীলাটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বর্ণনায় এই ঘটনাটি দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াই তাহার গভীর তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।)

নিত্যমিলনে নিত্য বিরহ এই 'মিলা' 'অমিলা' রসের খেলায় এইরূপ ভাবপ্রমত্ত গৌরহরি নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন। 'জগন্নাথ' দর্শনের ছল করিয়া নানান দেশের লোক নীলাচলে 'সচল জগন্নাথ' দর্শন করিতে আসেন। সচল জগন্নাথ গৌরহরির নাম, যশ, গুণ ও প্রভাব তখন দিগন্ত ব্যাপ্ত।

ত্রি-জগতের লোক আসি করে দরশন ;
যেই দেখে সে-ই পায় কৃষ্ণ প্রেমধন।'

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৯ম

এই সময়, একদিন কোন এক ব্যক্তি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া গম্ভীরা ভবনে গৌরহরির শ্রীচরণে পরম উদ্‌বেগের স্বরে নিবেদন করিল—

'গোপীনাথকে 'বড় জানা' চাঙ্গে চঢ়াইল'

চরিতামৃত

(চাঙ্গে চড়ান কথাটি অধুনা লুপ্ত প্রথা। গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইলে তাৎকালিক প্রথা অনুসারে রাজ আজ্ঞায় একটি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মান করিয়া অপরাধীকে তাহার উপর চড়ান হইত। মঞ্চের নিম্নদেশে শাণিত খড়্গাদি রক্ষিত হইত। উপর হইতে অপরাধীকে নিম্নে সজোরে ফেলিয়া দিয়া তাহার প্রাণ বধ করা হইত। ইহার নাম চাঙ্গে চড়ান।)

অদূরে দণ্ডায়মান ব্যাকুলচিত্ত আগন্তুকের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া গৌরহরি গম্ভীর স্বরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—

"রাজা কেন করয়ে তাড়ন ?"

চরিতামৃত

সে তখন সমম্ভ্রমে নিবেদন করিল—

"প্রভু ! গোপীনাথ রায় রামানন্দের ভ্রাতা। রায়রামানন্দ যেমন রাজমন্ত্রীর শাসম কর্ত্তা ছিলেন, গোপীনাথও সেইরূপও "মাল জাঠ্যা দণ্ডপাট" নামক অঞ্চলের শাসন কর্ত্তা। তিনি মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের কর্ম্মচারী। ঐ অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার

গোপীনাথের উপর। তিনি রাজস্ব আদায় করিয়া নিজের স্বার্থেই ব্যয় করিয়াছেন। ফলে, রাজ সরকারের দুই লক্ষ কাহন তাহার উপর বাকী পড়িয়াছে। রাজ সরকার টাকার তাগাদা দিলে গোপীনাথ বলে যে "আমার হাতে নগদ টাকা নাই, ধীরে ধীরে নিজ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পরিশোধ দিব। আমার দশ বারটি ভাল ঘোড়া আছে তাহাদের উচিত দাম করিয়া লওয়া হউক।" এই বলিয়া তিনি রাজদ্বারে নিজের ঘোড়াগুলি আনাইলেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাত্র মিত্র সহ ঘোড়াগুলি পরীক্ষা করিয়া নিজেদের বিচার মত একটি মূল্য বলিলেন। সে মূল্য গোপীনাথের মনঃপুত হইল না। তিনি নিজ দুর্দ্দৈবে ও অহঙ্কারে মত্ত হইয়া রাজপুত্রের (পুরুষোত্তম জানা) প্রতি অতি অপমান সূচক ভাষা প্রয়োগ করিলেন। বিচক্ষণ রাজপুত্র গোপীনাথের অসম্মান জনক বাক্যের কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া (পিতা) মহারাজার নিকট গিয়া বিস্তারিত নিবেদন অন্তে বলিলেন—

"পিত! গোপীনাথ সহজে টাকা দিবে না। আপনি আদেশ দেন, তাহাকে চাঙ্গে চড়াইলে, তখন প্রাণভয়ে টাকা দিবে।"

রাজা বলিলেন—

'যে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সে উপায়'

বিস্তারিত ঘটনা শ্রবণে গৌরহরি বলিলেন—

"রাজার ন্যায্য প্রাপ্য দেয় নাই বলিয়া রাজা গোপীনাথকে নির্য্যাতন করিতেছে। তাহাতে রাজার দোষ কি? কোনও দোষ নাই।" তাহার পর প্রণয় রোষে পুনঃ বলিতেছেন—"রাজস্ব আদায় করিয়া বেশ্যা ও আমোদ প্রমোদের ব্যয় করিয়াছে। রাজদণ্ডের ভয় নাই। এ কি? চতুর ব্যক্তিরা প্রথমে রাজার প্রাপ্য পরিশোধ করে, পরে যাহা উদ্‌বৃত্ত হয় তাহা নিজের জন্য ব্যয় করে।"

এমন সময়ে গোপীনাথের কল্যাণকামী অপর এক ব্যক্তি ত্রস্ত ভাবে প্রবেশ করিয়া নিবেদন করিল—

"গোপীনাথকে তো চাঙ্গে চড়াইয়াছেই, তাহার উপর আবার গোপীনাথের ভাই বাণীনাথ প্রভৃতি তাহার বংশের সকলকে রাজ আদেশে বাঁধিয়া লইয়া গেল।'

গৌরহরি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট চিত্তে ও ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন—

"রাজা কোন অন্যায় করিতেছেনা। তিনি নিজ পাওনা টাকা উশুলের ব্যবস্থা করিতেছেন। আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী আমি কি করিতে পারি?"

গৌরহরির ঔদাসীন্য দেখিয়া গম্ভীরা মন্দিরে গৌরসমীপে অবস্থিত স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ পরম আর্ত্তির সহিত নিবেদন করিলেন—

"রামরায়ের গোষ্ঠী তোমার দাস। তুমি প্রভু ও রক্ষক। তোমার উদাস হওয়া উচিত হয় না।"

স্বরূপাদি সকলের মুখ হইতে এই বাক্য শ্রবণে গৌরহরি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—

'মোরে আজ্ঞা দেও সবে যাই রাজস্থানে?
তোমা সবার এইমত রাজঠাঁই যাঞা,
কৌড়ি মাগি লই আমি আঁচল পাতিয়া।'

চরিতামৃত

আরও বলিলেন—

'আচ্ছা তোমাদের অনুরোধে যদি বা আমি তাহা করিতেও ইচ্ছা করি তাহাতে কি লাভ হইবে? আমি ভিক্ষুক মাত্র। আমার কথায় রাজা নিজ প্রাপ্য দুই লক্ষ কাহন কেন ছাড়িবেন?

এমন সময় অতি দ্রুত বেগে অপর এক ব্যক্তি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল—

খড্গোপরি গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া

চরিতামৃত

এই বাক্য শ্রবণ মাত্রে গম্ভীরা মন্দিরে সমাগত সকলে ধৈর্য্যহারা হইয়া পরম ব্যাকুলতার সহিত গৌরহরির শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়িয়া পুনরায় অনুনয় পূর্ব্বক সকলে সমস্বরে নিবেদন করিলেন।

'প্রভু! রক্ষা কর। প্রভু! রক্ষা কর'।

'ছন্ন ভগবান গৌরহরি' গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন—"আমি ভিক্ষুক। আমার কোন সামর্থ নাই সুতরাং আমার দ্বারা কিছু হইতে পারে না। তবে গোপীনাথকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের সকলের ইচ্ছা হইলে আমার পরামর্শ শোন 'তোমরা সর্ব্বসমর্থবান শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণে নিবেদন কর।"

দৈবাৎ সেই সভাতে রাজমন্ত্রী হরিচন্দন উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলের অগোচরে ক্ষিপ্রগতিতে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন—

'মহারাজ। গোপীনাথ পট্টনায়ক আপনার সেবক। প্রভু হইয়া সেবকের প্রাণদণ্ড শোভা পায় না। এছাড়া তাহার নিকট টাকা বাকী আছে। প্রাণ লইলে কি লাভ হইবে? তাহার ঘোড়াগুলির মূল্য নিরুপণ করিয়া লওয়া হউক্। ও সেই মূল্য গোপীনাথের দেয় টাকাতে উশুল হউক। তাহার পর বাকী টাকাও যাহাতে ধীরে ধীরে উশুল হয় তাহাই করা ভাল। না কি?"

হরিচন্দনের মুখে এই সব বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র বিস্মিত হইলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন—

'এ সব তুমি কি বলিতেছ? অতঃপর হরিচন্দনের মুখে বিস্তারিত ঘটনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—এ যাবত এ সবের কিছুই আমার জানা ছিলনা। যাহা হউক তুমিই এখন এ কার্য্যের—ভার লও। গোপীনাথের প্রাণ রক্ষা হয় আর রাজ সরকারের টাকা আদায় হয় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা কর।'

'হরিচন্দন,' 'জানার' সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার সহিত আলাপে তিনি বুঝিলেন—'চাঙ্গে ফেলা জানার আশা নয়'। ভয় দেখাইয় টাকা উশুলের কৌশল মাত্র। যাহা হউক অতঃপর গোপীনাথকে চাঙ্গ হইতে নামান হইল। ঘোড়াগুলি গোপীনাথের অনুমোদিত মূল্যে রাজ সরকারে খরিদ হইল। এবং বাকী টাকার জন্য গোপীনাথ একটি মুদ্দতি অর্থাৎ কতদিন মধ্যে বাকী টাকা উশুল দিবেন তাহা লিখিয়া দিয়া স্বপরিবারে গৃহে গমন করিলেন। এ ঘটনা তখনও গৌরহরি ও গম্ভীরা মধ্যে অবস্থিত ভক্তবৃন্দের গোচরীভূত হয় নাই।

'যে বার্ত্তাবহ খবর দিয়াছিল ॥
বাণীনাথাদি সবংশে লঞা গেল বাঁধিয়া'

তাহাকে 'গৌরহরি প্রশ্ন করিলেন—

'বাণীনাথ কি করে ? যবে বান্ধিয়া আনিল'

'গৌরহরির পরম গম্ভীর এই প্রশ্নের জবাবে বার্ত্তাবহ বলিল—'প্রভু ! বাণীনাথের ব্যবহার অভূতপূর্ব্ব ! অত্যাশ্চর্য্য। কারণ, প্রকাশ্যে রাজপথে, অতি অপমান জনক বন্দীদশায়, পদব্রজে গমনের অসম্মানে তাহার লজ্জা, দুঃখ বা উদ্বেগ নাই। তিনি পরম নির্ভয়।

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।'

এই নাম তিনি অবিশ্রান্ত ভাবে মুখে উচ্চারণ করিতেছেন। এই মহামন্ত্র 'জপ' বা 'কীর্ত্তন' যাহাই হউক না কেন ইহার সংখ্যা রাখা শাস্ত্র বিধি এমন কি তুমিও নিজে আচরণ কর। তোমার

কৃপা নির্দ্দেশও তাহা। এ কারণ, তোমার বাণীনাথ বন্ধন দশাতেও অশ্রুত পূর্ব্ব চেষ্টায় মহামন্ত্র নামের সংখ্যা রাখিতেছেন। যথা—

প্রথমে দুই হাতের অঙ্গুলির রেখায় নামের সংখ্যা রাখিতেছেন। ডাইন হাতের অঙ্গুলী পর্ব্বে দশ সংখ্যা এবং বামহাতের অঙ্গুলী পর্ব্বে শত সংখ্যা। এক শত নাম করা হইলে অঙ্গে একটি রেখা টানেন। এইরূপ দশটি রেখা হইলে এক সহস্র নাম হয়।”

ইহা শ্রবণে গৌরহরি পরম আনন্দিত হইলেন। বাণীনাথ যে শুদ্ধ ভক্তের হৃদয় পাইয়াছে তাহা জগতে প্রকটিত হইল।

'সে-ই শুদ্ধ ভক্ত—তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ দুঃখে হয় ভোগ ভাগী॥

এই (**শুদ্ধ ভক্তের নাম**) আদর্শের মূরতি বাণীনাথ'।

সর্ব্ব অবস্থায় 'আমাদের 'আশ্রয়' (এই ঘটনার দ্রষ্টা ও শ্রোতা) রঘুনাথ, ইহা মনে প্রাণে অনুভব করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছদ

নদী-সাগর-সঙ্গমে ভাসি গেলা নীলাচলঃ—

(১৪৩৪শকের রথযাত্রা; ১৪৩০শকের রথযাত্রা এবং ১৪৩৮ শকাব্দ হইতে ১৪৫৫ শকাব্দ প্রত্যব্দে বা (১৮বার) এইরূপে মোট বিংশতিবার গৌড় দেশীয় অদ্বৈতাদি ভক্ত বৃন্দ নীলাচলে আসিয়া ছিলেন। আর রঘুনাথ ১৪৪০ হইতে ১৪৫৫ শকাব্দ পর্যন্ত ষোল বৎসর নীলাচলে বাস করেন।)

রথযাত্রার পূর্ব্বে প্রতিবৎসর গৌড়দেশ হইতে বৈষ্ণববৃন্দ যেদিন নীলাচল প্রবেশ করেন ও গম্ভীরাবাসী গৌরহরি নিজ গোষ্ঠী সহ আঠার নালার নিকট মিলিত হন, সেই মিলনকে "**ভক্ত সম্মিলন**" বলা হয়। 'রঘুনাথ' **ষোল বার** এই ভক্ত সম্মিলন উৎসবে সক্রিয় ভাবে স্বরূপের আনুগত্যে যোগদানেব সৌভাগ্য লাভ করিয়া ছিলেন। অদ্যাপি প্রতি বৎসর গৌণ আষাঢ় চতুর্দ্দশী তিথিতে এই "ভক্তসম্মিলন লীলা" হইয়া আসিতেছে। আজকাল মিলনটি আঠার নালার নিকটে না হইয়া জগন্নাথদেবের সিংহদ্বারের অদূরে হয়।

নিজেদের স্বাভাবিক প্রীতিতে এবং গৌরহরির স্নেহ আজ্ঞাক্রমে যথা—

"প্রত্যব্দে আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে"

প্রতিবর্ষে গৌড়দেশীয় পার্ষদ ও ভক্তবৃন্দ পদব্রজে, সুদীর্ঘ পথ, পরম-সুখকর-বোধে অতিক্রম করিয়া গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে আগমন করিতেন।

'বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি'

চরিতামৃত মধ্য ১ম

প্রায় প্রতিবারই শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য দলের নেতা হইয়া আগমন করিতেন।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১০

এবং 'সেন শিবানন্দ' পথে গমন কালে ভক্তবৃন্দের স্থানে স্থানে রাত্রি যাপনের বাসস্থান, রন্ধনের কাষ্ঠাদি উপকরণ এবং বিভিন্ন নদীতে পারের নৌকা ব্যবস্থা (ঘাটি সমাধান) ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার সুখ সাচ্ছন্দের জন্য নিজ ভৃত্যবর্গসহ সমাধান কার্য্যের সেবক ছিলেন—

'শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান।
সবারে পালন করে দেন বাসস্থান॥'

চরিতামৃত অন্ত্য ১ম

গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের এই বার্ষিক নীলাচল গমন লীলাটি যেন 'গৌরাঙ্গগণ' নদ নদীর সমুদ্র প্রবেশের মত অর্থাৎ গৌররূপ সিন্ধুতে মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়াছে। প্রত্যক্ষ দর্শী মহাজনবৃন্দ এই সু-মধুর গমন লীলাটি বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। দিক দর্শন হিসাবে আমরা সামান্য একটু স্পর্শ করিতেছি—

"কীর্ত্তনের মহারোল ঘন ঘন হরিবোল
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে।"

নীলাচল ধামে প্রবেশ মুখে **'আঠার নালা'**। অর্থাৎ আঠারটি নালা বিশিষ্ট একটি পুল (Bridge) বর্ত্তমান পুরী সহরের মালি পাড়া পুলিশ আউট পোষ্টের অতি নিকটে এই প্রখ্যাত আঠারনালা পুলটি আজও অবস্থিত। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক হরিনামের তুমুল রোল এই আঠার নালা হইতে গম্ভীরায় শোনা যাইত। সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি শ্রবণে গৌড়ীয় ভক্তদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য গৌরহরি সগণে (রামরায় স্বরূপ, গোবিন্দ, শঙ্কর, রামাই 'রঘুনাথ আদি নিজ জন ও নীলাচল বাসী সার্ব্বভৌম গোপীনাথ আচার্য্য আদি) কীর্ত্তন রঙ্গে অগ্রসর হইতেন।

"হেন কালে মহাপ্রভু নিজগণ সঙ্গে।
বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে মহা রঙ্গে ॥"

চরিতামৃত মধ্য ১১

ত্রিকাল সত্য লীলাটি অনুভব করিয়া শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় প্রতি বর্ষ ভক্ত সম্মিলনী (গৌড়দেশ বাসী ও গম্ভীরাবাসী ভক্তবৃন্দের মধুর মিলন) সময়ে যে কীর্ত্তন করেন তাহা নীচে উদ্ধৃত হইল—

'চমকিয়া উঠিলেন প্রভু
(বুঝি) আসিছেন শান্তিপুর নাথ
ঠাকুর অবধূত সনে বুঝি আসিছেন শান্তিপুরনাথ
গৌড় দেশের ভক্ত লয়ে বুঝি আসিছেন শান্তিপুরনাথ

অমনি ত্বরা করি গৌরহরি
(বলেন) চল স্বরূপ রামরায়
(চল) ত্বরা করে যাই আঠার নালায়
ত্বরায় কীর্ত্তন সজ্জা কর

যায় প্রভু নীলাচল পথে
গম্ভীরা হইতে যায় প্রভু নীলাচল পথে

চলিলেন প্রাণ গৌরহরি
অনুরাগ তরঙ্গে হেলে দুলে চলিলেন প্রাণ গৌরহরি
উপনীত আঠার নালায়

পরস্পরে হ'ল দরশন
নদ-নদী আর সিন্ধুতে পরস্পরে হ'ল দরশন
দোঁহাকার গতি রোধ হ'ল

হ'ল সবার গতিরোধ
আর কেউ চলিতে নারে হ'ল সবার গতিরোধ

স্থির 'গৌর' 'গোরাঙ্গগণ'
বহু নয়নে গোরাঙ্গগণ
করিছেন গৌর দরশন
দু'টি নয়নে গৌরহরি
অনুরাগে দেখিছেন পরিকর
হতেছে অপূর্ব্ব রঙ্গ

প্রতি পরিকর করিতেছে মনে
গৌর চেয়ে আমার প্রানে প্রতি পরিকর করিতেছে মনে
এই প্রকার ঐশ্বর্য্য

পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য
প্রতি পরিকর করিছেন মনে
গৌর চাহিছেন আমার পানে প্রতি পরিকর করিছেন মনে

কিছু পরে হই অগ্রসর
জনে জনে কোলাকুলি কিছু পরে হই অগ্রসর
প্রতি পরিকর সনে মিলন কিছু পরে হই অগ্রসর

কি বলব সে মিলন কথা—
'অদ্বৈত নিতাই সনে প্রভুর মিলন রে।
দোঁহে কান্দে ধরি মহাপ্রভুর চরণ রে॥

শ্রীবাসেরে কোলে করি কাঁদেন গৌরাঙ্গ।
প্রেম জলে ভাসি গেলা শ্রীবাসের অঙ্গ॥

অপরূপ প্রেমসিন্ধু গৌরসিন্ধু সনে।
অদ্বৈতাদি মহানদীর হইল মিলনে॥

উঠিল প্রেমের তরঙ্গ
নদী সাগর সঙ্গমে উঠিল প্রেমের তরঙ্গ
ভাগ্যবান নীলাচল বাসী সুখেতে সাঁতার দিচ্ছে
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম-বন্যায় সুখেতে সাঁতার দিচ্ছে

প্রতি বর্ষে গৌড় দেশীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে আসেন। এবং চারি মাস কাল পর্যন্ত্য গৌরহরির সঙ্গে অবস্থান করেন। সুতরাং এই সব গৌড়িয় ভক্তবৃন্দের প্রত্যব্দে চারিমাস নীলাচলে বাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। তবে, প্রথম দিন মধুর মিলন প্রসঙ্গের অন্তে সকলে সমুদ্র স্নানে যাইতেন এবং মধ্যাহ্নকৃত্য 'গৌরহরির' 'গম্ভীরা মন্দিরে' সমাপন পূর্ব্বক পরে সকলে নিজ নিজ বাসায় গমন করিতেন। "রঘুনাথ" "রামাই" প্রভৃতি অনুরূপ যুবক সেবকবৃন্দ পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া গৌড় হইতে আগত গৃহস্থ ভক্ত ও গৌর পরিকরদের জিনিষ পত্র বহন করিয়া প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট পৃথক পৃথক বাস ভবনে স্থাপন তাঁহাদের গৃহ সম্মার্জ্জন, নূতন জলপাত্র সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেকের জন্য পানীয় জল স্থাপন ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার সেবা করিতেন।

রাঘবের ঝালিঃ

'প্রতিবর্ষে আইসে সব গৌড়ের ভক্তগণ,
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গ সম্মিলন।'

চরিতামৃত্য মধ্য ১ম

গৌড়দেশবাসী ভক্তবৃন্দ প্রতিবর্ষে রথযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে আগমন করেন এবং চারিমাস কাল যাবৎ গৌরহরির সঙ্গ সুখ ভোগ করেন। সমাগত ভক্তবৃন্দের প্রায় প্রত্যেকেই গৌরহরিকে উপহার দিবার জন্য সুদূর গৌড়দেশ হইতে অগণিত দ্রব্য সম্ভার আনিতেন। নদীয়ায় যখন শ্রীগৌরসুন্দর অবস্থান করিতেন তখন যে যে দ্রব্যগুলি

তাঁহার প্রিয় ছিল, গৌড়বাসীরা মনে করিতেন আমাদের গৌর তেমনি স্বভাবেই নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা সেই স্মরণেই তাঁহার উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত আনিতেন।

তাঁহাদের এই সব প্রীতি উপহার গৌরহরির সেবক গোবিন্দের হস্তে দিয়া তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ পূর্ব্বক বলিতেন—

"ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি"

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ম

সকল ভক্ত নিজের নিজের উপহার গুলি এইভাবে গোবিন্দের হস্তে সমর্পন করিতেন। এই উপহার দান প্রসঙ্গের এক নাম—

"রাঘবের ঝালি"

রঘুনাথদাস অখণ্ড ভাবে ষোড়ষ বর্ষ প্যাপী 'গৌর' ও 'গৌরগণের' সহিত প্রত্যব্দে চারমাস ব্যাপী সময় তাঁহাদের সঙ্গসুখ লাভ করিতেন এবং এই পরিচ্ছদে বর্ণিত লীলাবলীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের দশম পরিচ্ছদে সু-রসাল বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন এবং ঐ পরিচ্ছেদের বন্দনা শ্লোকে বলিয়াছেন—

"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া॥

অনুবাদঃ—

ভক্তবর্গকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রদত্ত ভক্তের যৎসামান্য বস্তুদ্বারাও যিনি পরম পরিতুষ্টি লাভ করেন, সেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবকে আমি বন্দনা করি'।

ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ আনীত দ্রব্যগুলি গোবিন্দের হস্তে অর্পণ করিতেন। গোবিন্দও যখন যে ভক্ত যে দ্রব্য দিতেন সেই দাতার নাম ও উপহার দ্রব্যের বিবরণ গৌরহরিকে শ্রবণ করাইতেন। প্রত্যেক বারই গৌরহরি উত্তর দেন—

'ধরি রাখ'

কারণ, প্রত্যহ বিবিধ উৎসব ও আনন্দের আতিশয্যে গৌরহরির এই সব উপহার আস্বাদনের সময় হয় না। এবং তিনি সন্ন্যাসী—বহু বার ভোজন, ও রসের আস্বাদন নিয়ম ব্রতের বিরুদ্ধ।

ফলে —

'ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোন ;
শত জনের ভক্ষ্য যত হইল সঞ্চয়ন।'

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ম

গোবিন্দ (বহু কষ্টে) সেই সব সামগ্রী সু-চিহ্নিত ও সু-রক্ষিত করিতেন। গোবিন্দের ইহাও আর একটি শঙ্কট। প্রত্যহ প্রতি ভক্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—

"আমা দত্ত প্রসাদ প্রভুকে করাইলে ভোজন?"

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ম

গোবিন্দ এই উভয় শঙ্কটে পড়িয়া পরম দুঃখে একদিন গৌরহরির শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন—

'অদ্বৈত্য আচার্য্যাদি ভক্তবৃন্দ তোমার সেবার জন্য যে সব দ্রব্য আমার হস্তে দিয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রত্যহ আমায় জিজ্ঞাসা করেন "আমার দ্রব্য প্রভু ভক্ষণ করিয়াছেন ?"

এঁদের সকলকে প্রত্যহ প্রবোধ দেওয়া কিম্বা প্রতারণার বাক্য বলা আমায় অত্যন্ত পীড়া দিতেছে।

গোবিন্দের বিষাদের হেতু ও বিষাদময় বাক্য শুনিয়া রঙ্গিয়া গৌরহরি গোবিন্দকে পরম স্নেহ সম্ভাষণে বলিলেন "যাও। কে কি দিযাছে সমস্ত আন।" এই বলিয়া তিনি ভোজনে বসিলেন। গোবিন্দ পরমানন্দে প্রত্যেকের নাম ও তাঁহার দত্ত উপহার দ্রব্যের নাম ধরিয়া, একে একে গৌরহরির শ্রীহস্তে দিতেছেন। যথা—

'আচার্য্যের এই পৈড (?) পানা সরপুপী (?)'
এই অমৃত গোটিকা মণ্ডা এই কর্পূরকুপি।'

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ম

এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যে শত জনের প্রদত্ত ভক্ষ্য দ্রব্যগুলি গৌরহরি গ্রহণ করিলেন। পরে পরিহাস পূর্ব্বক গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আর কিছু আছে'

গোবিন্দ সবিনয়ে উত্তর দিলেন—

"রাঘবের ঝালি মাত্র আছে"। গৌরহরি বলিলেন 'আজ থাক তাহা পরে দেখিব।"

রাঘবের ঝালিঃ

পানিহাটি গ্রামের অধিবাসী বিখ্যাত রাঘব পণ্ডিত। এখন ট্রেনে বাসে যাওয়া যায়। আজও পানিহাটিতে রাঘব

রাঘব ভবনে মাধবী কুঞ্জ

পণ্ডিতের ভবন, তাঁহার সেবিত শ্রীবিগ্রহ সমূহ ও তাঁহার সময়ের 'মাধবী লতার' বিশাল কুঞ্জটি বিরাজমান।

এই রাঘবের ভগ্নীর নাম দময়ন্তী দেবী। তিনি গৌরহরিকে মধুময় বাৎসল্যের দৃষ্টিতেই সেবা করিতেন। তাঁহার ঝালিতে যে সমস্ত দ্রব্য যাইত সে সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্য গোবিন্দ একটি বৎসর যাবৎ সযত্নে রক্ষা করিতেন এবং গৌরহরিকে প্রতিদিন আহারের সঙ্গে তাহাও অর্পণ করিতেন।

ঝালিতে যে সমস্ত দ্রব্য থাকিত তাহাদের বিবরণ—আম্র *কাসুন্দী, আদাকাসুন্দী, ঝালকাসুন্দী। নেবু, আদা, কুল ও আমের নানান্ পাকে প্রস্তুত দীর্ঘস্থায়ী দ্রব্যাদি (যথা আমসী আম্র-খণ্ড তৈলাম্র)। তাহা ছাড়া পুরাতন পাটপাতাও চূর্ণ করিয়া দিতেন। ইহার আর এক নাম শুক্তা গুড়া। বাৎসল্যময়ী দময়ন্তী দেবী অনুমান করিতেন যে তাঁহার গৌরহরি 'বহু ভক্তের বল্লভ'। ভক্তবৃন্দের অনুরোধে গুরু ভোজন ও অতিভোজন অবশ্যই হইবে। ফলে, আমদোষ ও অরুচি ঘটিবে। সেই দুইটিরই উপশমের জন্য ঔষধ পথ্য রূপে এই শুকতা কাসুন্দীর ব্যবস্থা। সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামনি গৌরহরি দময়ন্তী দেবীর আশয় জানিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইতেন। 'ঝালিতে' আরও অন্যান্য বিবিধ উপাদেয় দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও কবিরাজ গোস্বামী সর্ব্ব প্রথমে এই কাসুন্দী শুক্তাদির বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ঐ সব দ্রব্যের জন্য গৌরহরির যে উল্লাস প্রকাশ করিতেন তাহা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুখে শ্রবণ করিয়া লিখিয়াছেন—

"শুকতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥"

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১০ম

---

* লঙ্কা ও সরিষা চূর্ণ দ্বারা পাকের নাম কাসুন্দী।

ঝালির অন্যান্য দ্রব্যঃ

ধনিয়ার শাঁস, মৌরির শাঁস, এবং শুণ্ঠী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া চিনির পাকে পৃথক পৃথক লাড়ু।

প্রত্যেকটি জিনিও পৃথক পৃথক কাপড়ের থলির (যাহার মুখ প্রয়োজন মত খোলা যাইবে ও বন্ধ হইবে) মধ্যে রক্ষা করিতেন।

শুষ্ককুল, কুলচূর্ণ এবং বহু প্রকারের অতি উপাদেয় আচার সমূহ এই সব আচার উপযুক্ত মাটির পাত্রে রক্ষা করিতেন।

দীর্ঘদিন পযন্ত অবিকৃত থাকার মত নারিকেলের লাড়ু, এবং গুড় দ্বারা প্রস্তুত আরও বিবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন, ক্ষীরের সার, মণ্ড অমৃত কেলি, কর্পূর কেলি, অর্দ্ধ পক্ক শালিধান হইতে প্রস্তুত আতব চিড়া। ঐ চিড়ারই কিছু আবার দোভাজা (ভুডম) করিয়া পুনরায় ঘৃতে ভাজা। ঐরূপ ঘৃত ভাজা চিড়ার কতক অংশ কর্পূর ও চিনির পাকে লাড়ু তৈয়ারী।

শালি ধান্যের চাউল ভাজিয়া চূর্ণ করতঃ ঘৃত ও চিনির পাকে লাড়ু। ঐ সব লাড়ু আবার বিভিন্ন আস্বাদ ও সুবাস জন্য কর্পূর, মরিচ, এলাচি, লবঙ্গ রসবাস দারুচিনি প্রভৃতি দ্বারা পৃথক পৃথক সংযোগে বিবিধ স্বাদ ও গন্ধের লাড়ু।

'শালি ধান্যের খই' প্রস্তুত করতঃ তাহা ঘৃতে ভাজিয়া চিনির পাকে কর্পূরাদি দিয়া বিবিধ লাড়ু।

ফুট্ কলাই (ছোলা ভাজা) চূর্ণ করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া চিনি ও কর্পূরাদি সংযোগে বিবিধ আস্বাদ ও সুঘ্রাণের উপাদেয় লাড়ু।

এই পর্য্যন্ত নামোল্লেখ করার পর কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

'কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার ॥'

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১০ম

ইহার পর বলিয়াছেন—

গৌরহরি প্রতিদিন সকালে দন্ত মঞ্জন করিবেন ইহার জন্য গঙ্গামাটি পাত্‌লা কাপড়ে ছাঁকিয়া সুগন্ধি দ্রব্য সংযোগে পর্পটি তৈয়ারী করিয়া দিতেন।

আচার, চাট্‌নি প্রভৃতি যাহাতে নষ্ট না হয়, এবং অন্ততঃ এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে তাহার জন্য পাত্‌লা পাত্‌লা মাটির পাত্রে সেই সব রক্ষা করিতেন। প্রতিটি জিনিষ একবৎসরের মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার জন্য কিছু কিছু খরচ হইবে ও অবশিষ্ট আবার সুরক্ষিত থাকিবে এই সব চিন্তা ও ব্যবস্থা করিয়া প্রতিটি দ্রব্য প্রথমে পৃথক পৃথক ভাবে রক্ষিত হইত। তাহার পর সমস্ত দ্রব্য আবার ভালভাবে সাজাইয়া বড় ঝালি বা পেটিকা মধ্যে সুরক্ষিত হইত। ঝালি সম্পূর্ণ হইলে বন্ধন স্থলে গালা দিয়া নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ দেওয়া হইত। যেন অবাঞ্ছিত কেহ খুলিতে না পারে। পানিহাটি হইতে সুদূর নীলাচল পর্যন্ত পদব্রজে বহন করিয়া লইবার জন্য তিন জন বোঝারী (মুটিয়া) একজনের পর একজন করিয়া 'ঝালি' বহন করিত। এই ঝালির রক্ষণাবেক্ষন ও ঝালি বাহকদের সুবিধার জন্য 'মকরধ্বজ কর' উপযুক্ত রক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হইতেন। তিনি প্রাণ প্রিয় যত্নের সহিত ঝালি রক্ষা করিতেন।

'ঝালির উপর মৌসীন মকরধ্বজ কর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥'

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১০ম

নীলাচলে আসিয়া রাঘব পণ্ডিত এই ঝালি প্রধান সেবক গোবিন্দের হস্তে সমর্পণ করিতেন। গোবিন্দের সহকারী রূপে 'রঘুনাথ' রামাই এই সব দ্রব্য আবার যথা যথ ভাবে রক্ষা করিতেন।

পবিত্র ঐতিহাসিক এই স্মৃতি চিত্র এবং বৈষ্ণবের মহনীয় উপাসনার মধ্যে গম্ভীবার গুপ্তনিধি গৌরহরির এই সুরসাল লীলা আখ্যানটিকে জাগরূক রাখিযা শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয কথা প্রসঙ্গে বলিতেন—

লীলা ত্রিকাল সত্য 'কেউ কোথাও যায় নাই।
অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌর রায়'

এবং তাহাই তাহাব স্মরণময জীবনেব কীর্ত্তন আলেখ্যটি ন্যস্ত কবিযা শ্রীবঘুনাথেব জীবন স্মৃতিটি লিপিবদ্ধ কবা যায। ইনি প্রতি বৎসরের আষাঢ় মাসেব অমাবস্যা তিথিতে এই ঝালি সমর্পণ লীলাটি ঝালির দ্রব্য সহ গম্ভীরা মন্দিরে গমন পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেন। তাহার ঝালি সমর্পণেব কীর্ত্তন প্রসঙ্গটি যাঁহারা শুনিয়াছেন এবং তাৎকালীন অবস্থা যাঁহারা দেখিযাছেন তাহা তাঁহার জীবন প্রতিমাব একটি দিক্।

নীলাচলে 'ঝাঞ্জপিটা মঠে উপস্থিত হইযা তাঁহাব শ্রীগুরুদেব শ্রীলরাধাবমণ চবণ দাস বাবাজী মহাশয়েব অবস্থান চিত্রপটের নিকট প্রার্থনা জানাইতে জানাইতে উন্মাদ ব্যাকুল কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেন—

'আজু হবে শ্রীরাঘবের ঝালি সমর্পণ।
হেন দিনে কোথা প্রভু শ্রীরাধারমণ॥'

আজ কার্ সঙ্গে যাব মোরা

প্রাণগৌর-লীলা গাইতে গাইতে, আজ কার্ সঙ্গে যাব মোরা
(রাঘবের) অনুরাগের কথা কইতে কইতে—
আজ কার্ সঙ্গে যাব মোরা

আজ তেম্‌নি ক'রে এস প্রভু
নিতাই গৌর প্রেমাবেশে, আজ তেম্‌নি ক'রে এস প্রভু

নিতাই গৌর প্রেমের পাগল,— এস প্রাণের রাধারমণ

আজ শকতি সঞ্চার কর
বাহু পসারিয়ে হিয়ায় ধ'রে আজ শকতি সঞ্চার কর

আজ তেমনি করে এস প্রভু
নিতাই গৌর প্রেমাবেশে, আজ তেম্‌নি ক'রে এস প্রভু

ভাবাবেশে গাও তুমি
"দময়ন্তী-দত্ত দ্রব্যে ঝালি সাজাইয়া !
নীলাচলে আইল রাঘব কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥"
যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে
(দময়ন্তী) দত্ত দ্রব্যের ঝালি মাথে যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে

রাঘব ভাসে নয়ন জলে
হা প্রাণ শচীদুলাল ব'লে রাঘব ভাসে নয়ন জলে

(মঠ হইতে গমন)

যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে

ঝালি মাথে নীলাচল পথে যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে

ঝালি মাথে নীলাচল পথে 'হা গৌর' বলে রাঘব কাঁদে

রাঘব যায় নীলাচল পথে
'গৌর' ব'লে কাঁদতে কাঁদতে রাঘব যায় নীলাচল পথে

(সিংহদ্বারে উপস্থিত)

আসি রাঘব সিংহদ্বারে
প্রণমিয়া শ্রীমন্দিরে
যারে দেখে সুধায় তারে
আসি রাঘব সিংহদ্বারে যারে দেখে সুধায় তারে

(বলে) দয়া করে বলে দাও
ওগো নালাচলবাসী দয়া ক'রে বলে দাও

কোন পথে যাব গো ?
জনে জনে রাঘব সুধায়, কোন্ পথে যাব গো ?
ব'লে দাও নীলাচলবাসী । কোন পথে যাব গো ?
কাশী-মিশ্রালয়ে, আমি— কোন পথে যাব গো ?

কোন্ পথে যাব কাশীমিশ্রের ঘরে
ব'লে দাও গো দয়া করে, কোন্ পথে যাব কাশীমিশ্রের ঘরে

দেখিব সে প্রাণ গোরারে
যাব কাশীমিশ্রের ঘরে

(এই পদ কীর্ত্তন করিতে করিতে কাশীমিশ্রালয়াভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।)

(কাশীমিশ্রের দ্বারে উপস্থিত হইয়া)

আসি কাশীমিশ্রের দ্বারে
রাঘব সুধায় করজোড়ে
এই কি কাশীমিশ্রের বাড়ী ?
করজোড়ে রাঘব শুধায়- এই কি কাশীমিশ্রের বাড়ী ?

॥ ছুট্‌ছে সব নরনারী এই কি কাশীমিশ্রের বাড়ী

ছুট্‌ছে সব নর নারী
ব'লে 'কোথা প্রাণ গৌরহরি' ! ছুট্‌ছে সব নর নারী
এই কি কাশীমিশ্রের বাড়ী

*

আমাদের দয়া করে ল'য়ে চল
ওহে কাশীমিশ্রালয়বাসী ! আমাদের দয়া করে ল'য়ে চল

* যাঁরা সে দৃশ্য দেখেছেন সকলের বুকে আঁকা আছে

একবার দেখ্‌ব মোরা
জগবাসীর প্রাণ গোরা একবার দেখ্‌ব মোরা
নদেবাসীর প্রাণ গোরা একবার দেখ্‌ব মোরা
ল'য়ে চল কাশীমিশ্রালয়বাসী
আমরা দেখব প্রাণে গোরাশশী ল'য়ে চল কাশীমিশ্রালবাসী।

(গম্ভীরার দ্বারে)

আসি রাঘব গম্ভীরার দ্বারে
ব্যাকুল হ'য়ে রাঘব কাঁদে

(বলে) "কোথা প্রাণ বিশ্বম্ভর গোরা নটরায় ?
(আমরা) গৌড় হইতে আসিযাছি দেখিতে তোমায ॥'

এই গম্ভীরার দ্বারে রাঘব ডাকে
কোথা 'প্রাণ বিশ্বম্ভর !' বলে এই গম্ভীরার দ্বারে রাঘব ডাকে

দুনয়নে বহে ধারা
বলে কোথায় আছ প্রাণ গোরা। দুনয়নে বহে ধারা

বলে কোথায় আছ বিশ্বম্ভর ?
এই তো গম্ভীরা ঘর বলে কোথায় আছ বিশ্বম্ভর

"কোথা প্রাণ **বিশ্বম্ভর** গোরা **নটরায়** ।
গৌড় হইতে আসিয়াছি দেখিতে তোমায় ॥"

আমরা এলাম সবাই মিলে
প্রাণ গৌর ! তোমায় দেখ্‌ব ব'লে আমরা এলাম সবাই মিলে

"গৌড় হইতে আসিয়াছি দেখিতে তোমায়

বহুদিন তো দেখি নাই
হরিবোলা রসের বদন— বহুদিন তো দেখি নাই

চকোর আঁখি উপবাসী আছে
ও চাঁদবদন না হেরিয়ে— চকোর আঁখি উপবাসী আছে

"বহুদিন দেখি নাই ও চাঁদ বদন।
বারেক করুণা করি দেহ দরশন ॥"

একবার দেখা দাও
যদি এনেছ নিজগুণে টেনে— একবার দেখা দাও

আসি নাই আমরা আপন মনে
বলাৎকারে এনেছ টেনে আসি নাই আমরা আপন মনে

যদি এনেছ টেনে বলাৎকারে—একবার দেখা দাও দয়া করে

'বারেক করুণা করি দেহ দরশন'

সবাই তো এসেছে
তোমার কৃপা আকর্ষণে — সবাই তো এসেছে
শ্রীগৌড় মণ্ডল হ'তে— সবাই তো এসেছে
তোমার অনুগত দাসদাসী— সবাই তো এসেছে
তোমার অনুগত দাসদাসী, যাদের পরায়েছ প্রেমের ফাঁসি,
—সবাই তো এসেছে

'শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই অগ্রগণ্য'

তাঁরা আগে আগে এসেছেন
"শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ দুহুঁ অগ্রগণ্য।
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাসাদি ধন্য ॥

বাসুদেব দত্ত মুরারি গুপ্ত গঙ্গাদাস।
শ্রীমান সেন শ্রীমান্ পণ্ডিত অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস

মুরারি পণ্ডিত গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খাঁন।"

সবাই তো এসেছে
প্রাণগৌর তোমায় দেখ্‌বে ব'লে— সবাই তো এসেছে
তোমার চাঁদমুখ দেখ্‌বে ব'লে — সবাই তো এসেছে
ঐ রসের বদন দেখ্‌বে ব'লে — সবাই তো এসেছে
হাসিমাখা হরিবোলা রসের বদন দেখ্‌বে ব'লে—
সবাই তো এসেছে
সবাই তো এসেছে

মুরারি পণ্ডিত গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খাঁন।
সঞ্জয় পুরুষোত্তম পণ্ডিত ভগবান্ ॥

শুক্লাম্বর শিবানন্দ আর যত জন।
সবাই আইলা নাম কে করে গণন ॥

কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী বসুরামানন্দ।"

পট্টডুরি ল'য়ে এসেছেন
বসু রামানন্দ— পট্ট ডুরি ল'য়ে এসেছেন

এসেছেন ঠাকুর নরহরি
খণ্ডবাসী সঙ্গে ল'য়ে এসেছেন ঠাকুর নরহরি

তারা তো আন জানেনা
প্রাণগৌর! তোমা বিনে, তারা তো আন জানেনা

"কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী (আর) বসু রামানন্দ।
আইলা দেখিতে সবে তুয়া মুখচন্দ্র ॥"

একবার দেখা দাও
'আইলা দেখিতে সবে তুয়া মুখচন্দ্র।
দময়ন্তীদত্ত দ্রব্য যতনে লইয়া ॥'

যতন করে দিয়েছেন
বাৎসল্যময়ী দময়ন্তী যতন করে দিয়েছেন
সম্বৎসর ভোগ ক'র্‌বে ব'লে, যতন করে দিয়েছেন

দময়ন্তীদত্ত দ্রব্য যতনে লইয়া।
আইলাম নীলাচলে ঝালি সাজাইয়া॥

তোমা না দেখিয়া সবে বিষাদে মগন।
একবার দেখা দাও শ্রীশচীনন্দন !"

একবার দেখা দাও
শচীদুলাল প্রাণগোরা একবার দেখা দাও

এত বলি রাঘব পণ্ডিত
এই গম্ভীরার দ্বারে আসি
(বলে) ধর ধর লও হে গোবিন্দ
(বলে) "ধর ধর লও হে গোবিন্দ রেখো যতন ক'রে
মনোভাব বুঝি তুমি দিও গৌরাঙ্গেরে॥

দময়ন্তী দেবী সাক্ষাৎ বাৎসল্যের মূর্ত্তি।
দিয়াছেন গৌরাঙ্গে করি কত আর্ত্তি॥"

ধর ধর লও হে গোবিন্দ
এই গম্ভীরার দ্বারে রাঘব বলে ধর ধর লও হে গোবিন্দ

"অপরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ্য।
বৎসরেক প্রভু যেন করেন উপভোগ॥"

ধর ধর লও হে গোবিন্দ !
তুমি সময় জেনে জোগাইও ধর ধর লও হে গোবিন্দ !

এই গম্ভীরার দ্বারে রাঘব বলে, ধর ধর লও হে গোবিন্দ

আম্র কাসুন্দি, ঝাল কাসুন্দি আদা কাসুন্দি আর।
নেবু আদা আম্র কলি বিবিধ প্রকার॥"

ধর ধর লও হে গোবিন্দ!
সময় জেনে জোগাইও

সেবা পেয়েছ কাছে থাক, সময় জেনে জোগাইও
ধর ধর লও হে গোবিন্দ।

"আম্‌সি আম্রখণ্ড আর তৈলাম্র আমতা।
চূর্ণ করি দিয়াছেন পুরাণ শুকুতা॥"

বাৎসল্যময়ী দময়ন্তী
"চূর্ণকরি দিয়াছেন পুরাণ শুকতা॥"
আমদোষ নাশিবে ব'লে

'চূর্ণ করি দিয়াছেন পুরাণ শুকুতা॥
শুকুতা বলি' অবজ্ঞা না করিহ চিতে।

শুকতায় যে প্রীতি প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে।

ধনিয়া মহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
লাড়ু বাঁধি দিয়াছেন চিনি পাক দিয়া।

শুঁটিঠখণ্ড লাড়ু হয় আম পিত্ত হর।
পৃথক পৃথক বাঁধা আছে কুথলি ভিতর ॥"

ধর ধর লও হে গোবিন্দ !
সময় জেনে জোগাইও ধর ধর লও হে গোবিন্দ।

"কোল শুঁটিঠ, * কোল চূর্ণ, কোল খণ্ড আর।
কত নাম লব যত প্রকার আচার।

নারিকেল খণ্ড আর লাড়ু গঙ্গা জল।
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার দিয়াছে সকল ॥"

ধর ধর লও হে গোবিন্দ
এই গম্ভীরার দ্বারে রাঘব বলে, ধর ধর লও হে গোবিন্দ

"শালিকাচুটি ধান্যের আতপ চিঁড়া করি।
দিয়াছেন বড় বড় কুথলিতে ভরি ॥

কতক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে লাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া।

শালি-তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃত সিক্তে লাড়ু কৈল চিনি পাক দিয়া ॥"

কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস।
চূর্ণ করি লাড়ু কৈল পরম সুবাস ॥"

* পাকা শুকনা টক কুলকে "কোল" বলে

ধর ধর লও হে গোবিন্দ !

এই গম্ভীরার দ্বারে রাঘব বলে, ধর ধর লও হে গোবিন্দ

"কভু নাহি জানি নাম এ জন্মে যাহার ।
ঐছে নানা দ্রব্য দিল সহস্র প্রকার ॥"

ধর ধর লও হে গোবিন্দ

"গঙ্গা মৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া ।
পাপড়ী করিয়া দিলা গন্ধ দ্রব্য দিয়া ॥

কহিতে না পারি নাম কতেক প্রকার ।
দিয়াছেন দময়ন্তী প্রীতি উপহার ॥"

ধর ধর লও হে গোবিন্দ !

দময়ন্তীর প্রীতির দ্রব্য ধর ধর লও হে গোবিন্দ ।

আমি মাথায় ক'রে এনেছি
মাথায় ক'রে আমি ধন্য

প্রভুর সেবার দ্রব্য মাথায় করে আমি ধন্য

"দিয়াছেন দময়ন্তী প্রীতি উপহার ॥

যতন করিয়া সব করাইও ভোজন ।
যেমতে পায়েন প্রীতি শ্রীশচীনন্দন ॥"

ধর ধর লও হে গোবিন্দ

"দময়ন্তীদত্ত দ্রব্য সঁপিনু তোমার।
অবসর জানি দিও প্রাণ বিশ্বম্ভরে ॥"

তোমার ভাগ্যের সীমা নাই
সদাই প্রভুর কাছে থাক, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই
প্রভুর কাছে থাক, সেবা কর, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই

আমার ভাগ্যে হ'ল না
প্রভুর সঙ্গে থাক্‌ব, সেবা ক'রব, আমার ভাগ্যে হ'ল না

হেনমতে রাঘব পণ্ডিত ঝালি সমর্পিল।
ভোজন গৃহের কোণে গোবিন্দ রাখিল ॥

ঝালি সমর্পিলেন রাঘব পণ্ডিত
ত্রিকাল সত্য লীলায় ঝালি সমর্পিলেন রাঘব পণ্ডিত

রাখিলেন গোবিন্দ দাস
(গৌরের) সেবার জন্য যতন ক'রে রাখিলেন গোবিন্দ দাস
ভোজন-গৃহের কোণে রাখিলেন গোবিন্দ দাস

ভাগ্যবান্ জনে দেখিলেন
ত্রিকাল সত্য গৌর লীলা, ভাগ্যবান্ জনে দেখিলেন

রাঘবের ঝালি সমর্পণ শেষ হ'লে
দাঁড়ায়ে ছিলেন এক পাশে

অতি দৈন্যে শ্রীধর পণ্ডিত, দাঁড়ায়ে ছিলেন এক পাশে
(থোড়) মোচার ঝালি মাথায় ল'য়ে অতি দৈন্যে শ্রীধর পণ্ডিত
দাঁড়ায়ে ছিলেন এক পাশে

মনে মনে গণ্ছিলেন
কেমন ক'রে দিব আমি
এই সামান্য থোড় মোচা, কেমন ক'রে দিব আমি

এনেছেন রাঘব পণ্ডিত
কত সুখাদ্য সুস্বাদ্য দ্রব্য, এনেছেন রাঘব পণ্ডিত
দেবী দময়ন্তীর দত্ত, সুখাদ্য সুস্বাদ্য দ্রব্য,
এনেছেন রাঘব পণ্ডিত

কেমন ক'রে দিব আমি
এই সামান্য থোড় মোচা, কেমন করে দিব আমি

তাই দাঁড়ায়ে ছিলেন একপাশে

ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্ছেন,
ধর পণ্ডিত আপন স্বভাবে, ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্ছেন
কোথা বা আছ হে ?

ঝালি মাথে শ্রীধর কাঁদে, কোথা বা আছ হে ?

কোথায় আছ নিমাই পণ্ডিত !
আপন স্বভাবে শ্রীধর ডাকেন, কোথায় আছ নিমাই পণ্ডিত !

আর কেন যাওনা তুমি ?
নদীয়ার বাজারে আর কেন যাওনা তুমি ?

আমি নিতুই চাই পথ পানে আর কেন যাওনা তুমি ?

আমি নিতুই চাই পথ পানে
থোড় মোচা ল'য়ে বাজারে ব'সে,
আমি নিতুই চাই পথ পানে
কতক্ষণে আস্‌বে ব'লে, আমি নিতুই চাই পথ পানে

কতক্ষণে আস্‌বে ব'লে চিতচোরা শচীনন্দন

কতক্ষণে আসবে বলে

(তাই) চেয়ে থাকি পথ পানে
তুমি হাত হ'তে নিবে কাড়ি
থোড় মোচা জোর করি, তুমি হাত হ'তে নিবে কাড়ি
তাই চেয়ে থাকি পথ পানে

দেখ্‌তে তো পাই না
শুধা'লাম্ নদীয়া বাসিরে
বহু দিন না দেখ্‌তে পেয়ে, শুধা'লাম্ নদীয়া বাসিরে

গৌর কেন আসে না বাজারে শুধা'লাম নদীয়া বাসিরে
তারা সবাই বলে দিলে

তুমি এসেছ নীলাচলে তারা সবাই বলে দিলে
তাই আমি এসেছি

সবাই এসেছেন, তাদের সঙ্গে তাই আমি এসেছি
থোড় মোচা মাথায় ল'য়ে তাই আমি এসেছি

আর কি নদে যাবে না?
প্রাণ শচীত্বলালিয়া আর কি নদে যাবে না?

তেম্নি করে কেড়ে নেবে না?
আমাব হাত হ'তে থোড মোচা, তেম্নি ক'রে কেড়ে নেবে না?

তেম্নি করে নাচ্‌বে না?
আমার হাত হ'তে কেড়ে ল'য়ে তেম্নি করে নাচ্‌বে না?

আর কি নদে যাবে না?

বহুদিন পথ দেখে

এলাম নীলাচলপুরে
থোড় মোচার ঝালি মাথায় ক'রে এলাম নীলাচলপুরে

তেম্নি ক'রে কেড়ে নাও
কোথা প্রাণ শচীত্বলাল! তেম্নি ক'রে কেড়ে নাও

হাসিমুখে আমার পানে চেয়ে তেম্নি ক'রে কেড়ে নাও

না, না, আর কেড়ে নিতে হবে না

বুঝি তাই এসেছ নদে ছেড়ে
ইচ্ছা করে দিই নাই ব'লে বুঝি তাই এসেছ নদে ছেড়ে

না, না, আর কেড়ে নিতে হবে না
আমি থাক্‌লাম্‌ এই নীলাচলে

নিতুই নিতুই যোগাইব
আমি নিতুই দিব থোড় মোচা
এই কাশীমিশ্রের ঘরে, আমি নিতুই দিব থোড় মোচা

(আজ) একবার দেখা দাও
কোথা প্রাণ শচীনন্দন, (আজ) একবার দেখা দাও

এইরূপে ঝালি সমর্পিলেন শ্রীধর পণ্ডিত
ত্রিকাল সত্য লীলায়
-এইরূপে ঝালি সমর্পিলেন শ্রীধর পণ্ডিত

ত্রিকাল সত্য প্রাণগৌর লীলা
আজও হ'তেছে সেই লীলা

সবাই এসেছে নীলাচলে
শ্রীগৌড়মণ্ডলবাসী সবাই এসেছে নীলাচলে

এসেছেন রাঘব পণ্ডিত

দময়ন্তী দত্ত ঝালি ল'য়ে এসেছেন রাঘব পণ্ডিত

করেছেন ঝালি সমর্পণ

অঙ্গীকার করেছেন প্রভু

ঝালি সমর্পণের প্রসঙ্গে বাবাজী মহাশয়ের অনুস্মৃতিতে 'অধিক বিকাশ—

আমাদের একবার দেখা দাও

শ্রীরাঘবের ঝালির প্রীতে আমাদের একবার দেখা দাও

শ্রীধরের ঝালিব প্রীতে আমাদের একবার দেখা দাও

বড় আশা করে এসেছি মোরা আমাদের একবার দেখা দাও

হা গৌর! প্রাণ গৌর! আমাদের একবার দেখা দাও

একবার দাঁড়াও দাড়াও রসের বদন হেরি হে

আমাদের একবার দেখাও হে

কোথা আছ কাশীমিশ্র!

একবার দেখাও হে

তোমার গৃহবাসী গোরাশশী একবার দেখাও হে

কই কথা তো কইছ না

তবে কি গৌর দেখাবে না

হায়, আর্ কার্ কাছে যাব
কে প্রাণগৌর দেখাইবে ? হায়, আর্ কার্ কাছে যাব

তোমরা সবাই এসেছ
শ্রীগৌড় মণ্ডল হতে, তোমরা সবাই তো এসেছ
প্রভু নিতাই অদ্বৈত সাথে, শ্রীগৌড় মণ্ডল হ'তে
তোমরা সবাই তো এসেছ

বিহরিছ প্রাণগৌর সনে
এই কাশীমিশ্রালয়ে বিহরিছ প্রাণগৌর সনে

আমাদের একবার দেখাও হে
কোথায় আছ প্রভু নিতাই ! আমাদের একবার দেখাও হে
কোথায় আছ সীতানাথ ! আমাদের একবার দেখাও হে
কোথায় আছ ঠাকুর নরহরি ! আমাদের একবার দেখাও হে
সে চিতচোরা মুরতি খানি, আমাদের একবার দেখাও হে

কৈ কেউ তো কথা বইলে না

প্রাণগৌর দেখালে না

তবে আর কা'রে শুধাব
আমাদের একবার দেখাও হে
ওহে কাশীমিশ্রালয় বাসী ! আমাদের একবার দেখাও হে

ভয় নাই আমরা ল'যে যাব না
তোমাদের গৌর তোমাদের থাকবে
ভয় নাই আমরা ল'য়ে যাব না

ল'য়ে গিয়ে কিবা করব
ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

আমরা একবার দেখ্‌ব
ঐ হরিবোলা রসের বদন আমরা একবার দেখ্‌ব

হৃদিপটে এঁকে লব

বসে বসে কাঁদব
'হা গৌর! প্রাণ গৌর!' ব'লে, বসে বসে কাঁদব

একবার দেখা দাও
হা চিত্তচোর চূড়ামণি একবার দেখা দাও

তোমা ধনে হৃদে ধরে
যাক্ সবে ঘরে ফিরে

তোমা লয়ে করুক্ সংসার
মায়া বন্ধন ঘুচুক্ সবার তোমা লয়ে করুক্ সংসার

ঘরে ঘরে সবাই ঝুরুক্
'হা গৌর! প্রাণ গৌর!' ব'লে ঘরে ঘরে সবাই ঝুরুক্
জগবাসী নরনারী ঘরে ঘরে সবাই ঝুরুক্

এক নিবেদন শ্রীচরণে

কাল একবার দেখা দিও
শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলায় কাল একবার দেখা দিও

দেখ্‌ব তোমার মার্জ্জন রঙ্গ
আমরা শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে দেখ্‌ব তোমার মার্জ্জন রঙ্গ

নয়ন ভরে দেখব মোরা তোমার গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা

যাই বলিগে নীলাচলবাসীবে
কাল হবে গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
তোমরা যেও নীলাচলবাসী কাল হবে গুণ্ডিচা মার্জ্জন।

গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলাঃ

শ্রীধাম পুরীতে গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলাটি বাৎসরিক উৎসব। অদ্যাপি রথ দ্বিতীয়ার পূর্ব্বদিন বা আষাঢ় শুক্লা প্রতিপদেব দিন সকালে এই লীলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীজগন্নাথ দেব প্রতিবৎসর আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়ার দিন সুভদ্রা ও বলরাম সহ রথারোহণ পূর্ব্বক সাতদিনের জন্য সুন্দরাচল বা বৃন্দাবন বিহারে গমন করেন। জগন্নাথ মন্দির হইতে বিজয় করিযা যে উপবনে এই কয়দিন অবস্থান পূর্ব্বক বিহার করেন তাহাব নাম **গুণ্ডিচা বাড়ী**। *

এই মন্দিরটিতে জগন্নাথ বিজয় করিবেন এ কারণ বিজযেব পূর্ব্বদিন আষাঢ় শুক্লা প্রতিপদের দিন ঐ স্থানটি বিশেষ পরিপাটির সহিত পরিষ্কার করা হয়। গৌরহরি নীলাচলে গমনের পূর্ব্বে এই

* অন্ধ্র এবং কলিঙ্গে গুণ্ডিচা মানে "পর্ণ কুটির"

গুণ্ডিচা মন্দিরের মার্জ্জন কার্যটি জগন্নাথ দেবের পড়িছাবৃন্দই করিতেন। দেবমন্দিরের মার্জ্জন করা নিকৃষ্ট কার্য্য নয় উপরন্তু পরম ভাগ্যের কথা, ইহা প্রাচীন গ্রন্থের কোথাও বর্ণিত থাকিলেও সর্ব্বসাধারণের তাহা অজ্ঞাত ছিল। ১৪৩৪ শকাব্দের রথ দ্বিতীয়ার দুই দিন পূর্ব্বে গৌরহরি এই গুণ্ডিচা মার্জ্জন সেবাটি কাশীমিশ্র, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, এবং প্রধান পড়িছার নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

এই কার্য্যটি যেন হীন কার্য্য তাই গৌরহরির শোভা পায় না বলিয়া তাঁহারা প্রথমতঃ নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিলেন। যথা—

"তোমার যোগ্য কার্য্য সেবা নহে মন্দির মার্জ্জন ;
এও এক লীলা, কর যে তোমাব মন।"

চরিতামৃত মধ্য ১২শ

পরে গৌরহরির কৃপায় যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, বহুভাগ্যে দেবমন্দিরের মার্জ্জনা করার সেবা লাভ হয়। উহা ভাগ্য বশতই পাওয়া যায়, তখন তাঁহারা সানন্দে তাঁহার বাসনা অনুমোদন করিলেন। পরে বলিলেন—

'কিন্তু ঘট সম্মার্জ্জন বহুত চাহিয়ে
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহা আনি দিয়ে।'

চরিতামৃত মধ্য ১২শ

তাঁহাদের প্রার্থনায় গৌরহরি আনন্দিত হইলেন এবং পড়িছার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। ঐ লীলার পূর্ব্ব দিনই একশত ঘট ও একশত সম্মার্জ্জনী কাশীমিশ্রালয়ে আনিয়া রাখা হইল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গম্ভীরার গুপ্তনিধি গৌরহরি নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া ভক্তবৃন্দকে ডাকিয়া শ্রীহস্তে তাঁহাদের অঙ্গে চন্দন লেপন করিলেন। তাঁহাদের গলদেশে মালা পরাইয়া দিলেন। প্রধান প্রধান ব্যাক্তির হস্তে এক একটি সম্মার্জ্জনী ও কক্ষে এক একটি মৃৎকুম্ভ দিলেন।

(রঘুনাথ স্বরূপের আনুগত্যে ষোল বার এই বার্ষিক উৎসবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।)

হঠাৎ গৌরহরির ভাবান্তর উপস্থিত হইল—

"কিশোরী আবেশে আমার শ্রীশচীনন্দন।
স্বরূপ রামানন্দে বলেন মধুর বচন॥"
বলে 'ও ললিতা! ও বিশাখা -'
বলে 'শুন শুন প্রাণ সখি'
আজ নিশি শেষে দেখেছি সুস্বপন
কিশোরী ভাবিত মতি গৌর বলে
আজ নিশি শেষে দেখেছি সুস্বপন
স্বরূপ রামানন্দের গলে ধরি
কিশোরী-ভাবিত-মতি গৌর বলে
আজ নিশিশেষে দেখেছি সু-স্বপন
ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন
আজ নিশি শেষে দেখেছি সুস্বপন
এবে দেখি তার অনুকূল লক্ষণ,
আজ নিশি শেষে দেখেছি সুস্বপন

ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন
কাল নিশি পরভাতে, ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন

আমার পরাণ বঁধু আসৃবে ব্রজে
কাল নিশি পরভাতে আমার পরাণ বঁধু আসৃবে ব্রজে

আসৃবে আমার পরাণ বঁধু
বহুদিন পরে ব্রজে আসৃবে আমার পরাণ বঁধু

চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া
আসৃবে আমার প্রাণ বঁধুয়া চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া
প্রিয় নর্ম্ম সখী সাথে চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

এত বলি গৌর কিশোরী
মৃৎকুম্ভ কাঁখে করি
সম্মার্জ্জনী করে ধরি
বলে 'চল প্রাণ সহচরী
কুঞ্জ সজ্জা সম্ভার সঙ্গে করি বলে 'চল প্রাণ সহচরী
চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

আসবে আমার প্রাণ বঁধুয়া
চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া আসবে আমার প্রাণ বঁধুয়া
"আসবে আমার প্রাণ বঁধুয়া . চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

এই পদ গাহিতে গাহিতে 'মঠ' হইতে গুণ্ডিচা গামী রাজপথে চলিতে লাগিলেন।

এই গমন লীলা শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় যে ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহা নীচে উদ্ধৃত হইল—

নেচে যায় প্রাণ গৌরহরি
স্বরূপ রামরায়ের করে ধরি
নেচে যায় প্রাণ গৌরহরি স্বরূপ রামরায়ের করে ধরি

হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
বিংশতি ভাব হিল্লোলে হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
বিংশতি ভাব ভূষণ পরি হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
সঙ্গে নিতাই অনঙ্গমঞ্জরী হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী
সঙ্গে নিতাই অনঙ্গমঞ্জরী

দক্ষিণে মধুমতী নরহরি সঙ্গে নিতাই অনঙ্গমঞ্জরী
হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী

সঙ্গে নিতাই-গদাধর-নরহরি
হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী সঙ্গে নিতাই-গদাধর নরহরি

নীলাচল ব্রজের পথ আলো করি
হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী
নীলাচল ব্রজের পথ আলো করি

নিকুঞ্জ সেবা সম্ভার সঙ্গে করি
হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী নিকুঞ্জ সেবা সম্ভার সঙ্গে করি

ঘিরে পারিষদ সহচরী
হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী ঘিরে পারিষদ সহচরী

যায় নীলাচলে ব্রজের পথে

নিকুঞ্জ সজ্জা মনোরথে যায় নীলাচলে ব্রজের পথে

রঙ্গিনী সঙ্গিনী সাথে যায় নীলাচলে ব্রজেব পথে

পারিষদ সহচরী সাথে যায় নীলাচলে ব্রজের পথে

যায় গৌরকিশোরী হেলে দুলে

নিকুঞ্জ সাজাবে বলে যায় গৌরকিশোরী হেলে দুলে

হেলে দুলে যায গৌর রাধা

বলে পূরিবে আমার মন সাধা হেলে দুলে যায় গৌর রাধা

পূরাতে অপূর্ণ সাধা হেলে দুলে যায় গৌর রাধা

যায় গৌর কিশোরী হেলে দুলে

নিকুঞ্জ সাজাবে বলে যায় গৌরকিশোরী হেলে দুলে

'গমন নটন লীলা বচন-সঙ্গীত কলা

গমম নটন লীলা

কিশোরী ভাবিত মতি গৌরাঙ্গের— গমন নটন লীলা

আজ চলে যেতে নেচে যেছে

'নটুয়া মূরতি' 'নটন গতি' আজ চলে যেতে নেচে যেছে

বিংশতি ভাব হিল্লোলে আজ চলে যেতে নেচে যেছে

ভাবাবেশে যেন হ'ল নটিনী

'গমন নটন লীলা বচন সঙ্গীত কলা'
গমন নটন লীলা
গমনই নটন লীলা

চলে যেতে নেচে যেছে
নটন মুরতি গৌর আমার চলে যেতে নেচে যেছে
গমন নটন লীলা বচন সঙ্গীত কলা
সঙ্গীতেতে কথা কইছে
চলে যেতে নেছে যেছে সঙ্গীতেতে কথা কইছে

কোকিল কলভাষিণী সঙ্গীতে কথা কইছে

যেন কত শত কোকিল কুহরিছে
পঞ্চম রাগ জিনি যেন কত শত কোকিল কুহরিছে
না না তাতেও তুলনা হয় না

যেন অমিয় সিন্ধু উথলিছে
জগৎ অমৃতময় করবে বলে যেন অমিয় সিন্ধু উথলিছে

আমার গৌর কিশোরী 'হরি' বলিছে
যেন অমিয় সিন্ধু উথলিছে
—আমার গৌর কিশোরী 'হরি বলিছে

মধুর চাহনি আকর্ষণ

তারই আঁখি মন হরিছে
একবার হরিবলে যার পানে চাইছে তারই আঁখি মন হরিছে

তার স্বভাব জাগায়ে দিছে
একবার যার পানে চাইছে তার স্বভাব জাগায়ে দিছে
বরজ গোপীকার তার স্বভাব জাগায়ে দিছে

সবারে কৈল গোপনারী
নীলাচলে যত নরনারী সবারে কৈল গোপনারী

গোরা চাহনি কিবা মধুর
জাগল স্বভাব বরজ বধুর গোরা চাহনি কিবা মধুর

'মধুর চাহনি আকর্ষণ

যায় গৌরকিশোরী হেলে দুলে
কর দিয়ে নিতাই অনঙ্গের গলে
যায় গৌরকিশোরী হেলে দুলে

পরাণ বঁধু আসবে বলে যায় গৌরকিশোরী হেলে দুলে
আজ নিশি গেলে কাল সকালে • পরাণ বঁধু আসবে বলে
যায় গৌরকিশোরী হেলে দুলে

আবেশে বলে গৌরকিশোরী
স্বরূপের করে ধরি আবেশে বলে গৌরকিশোরী
বলে 'ওরে প্রাণ সহচরী

কেমনেতে ধৈর্য্য ধরি !
কাল আসবে বংশীধারী — কেমনেতে ধৈর্য্য ধরি !
আজ দিবা শর্ব্বরী — কেমনেতে ধৈর্য্য ধরি !

তখন হাসি হাসি মিলিল আসি
সীতানাথ পৌর্ণমাসী — তখন হাসি হাসি মিলিল আসি
যার হ'তে এই সব খেলা, — সীতানাথ পৌর্ণমাসী,
হাসি হাসি মিলিল আসি
বলে 'কোথা যাও দিবাভাগে ?

করে ধ'রে বলে 'ও কিশোরী' — 'কোথা যাও দিবাভাগে ?
রঙ্গিনী সঙ্গিনী সাথে — বলে 'কোথা যাও দিবাভাগে ?
সখী সঙ্গে অনুরাগে — বলে 'কোথা যাও দিবাভাগে ?
মনোরথে ব্রজের পথে, — কোথা যাও সঙ্গিনী সাথে ?

আবেশে বলে গৌর-কিশোরী
বলে 'শুন গো মা পৌর্ণমাসি

দুখের নিশি পোহাল আসি
আজ নিশি শেষে দেখেছি স্বপন
(কাল) আসবে প্রাণের বংশীবদন
—আজ নিশি শেষে দেখেছি স্বপন
ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন আজ নিশি শেষে দেখেছি স্বপন

ব্রজে আসবে কালশশী
আজ পোহাইলে দুখের নিশি, — ব্রজে আসবে কালশশী

তাই চলেছি দিবা ভাগে

কুঞ্জ সজ্জা মনসাধে, তাই চলেছি দিবা ভাগে

আজ কুঞ্জ সাজাব।

কাল পরাণ বঁধু পাব ॥

যায় গৌরকিশোরী হেলে দুলে

নিকুঞ্জ সাজাব ব'লে যায় গৌরকিশোরি হেলে দুলে

বলে আজ কুঞ্জ সাজাব নব সাজে

হেরিতে নব যুব রাজে বলে আজ কুঞ্জ সাজাব নব সাজে

কাল প্রভাতে পাব প্রাণ বঁধুকে

—আজ কুঞ্জ সাজাব নব সাজে

হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী

ভাবোল্লাসে ভরা গোরা

আসিয়া গুণ্ডিচা দ্বারে

রাধাভাবে ভোরা গোরা আসিয়া গুণ্ডিচা দ্বারে

স্বরূপ রামরায়ের করে ধরে

বলে 'ও ললিতে! ও বিশাখে!

ডাক ত্বরা বৃন্দাদেবীকে

আবেশে বলে গৌরকিশোরী

যেন সম্মুখে বৃন্দাদেবি হেরি আবেশে বলে গৌরকিশোরী

শুন ওগো বৃন্দাদেবি

আজ নিশিশেষে দেখেছি সুস্বপন

ব্রজে আস্‌বে ব্রজের জীবন আজ নিশিশেষে দেখেছি সুস্বপন

ব্রজে আস্‌বে ব্রজের জীবন

কাল নিশি পরভাতে ব্রজে আস্‌বে ব্রজের জীবন

নিশি শেষে দেখেছি সুস্বপন
সবাই কুঞ্জ সাজাও গিয়া
যাও যাও ত্বরা করি সবাই কুঞ্জ সাজাও গিয়া

কর মঙ্গল আচরণ
ব্রজে আস্‌বে ব্রজের জীবন কর মঙ্গল আচরণ

পূর্ণ ঘট স্থাপন কর
নিকুঞ্জের প্রতি দ্বারে পূর্ণঘট স্থাপন কর

বাঁধ আম্র পল্লব সারি সারি

সাজাও সবে কুঞ্জ পথ
আসবে ব্রজের মনমথ সাজাও সবে কুঞ্জ পথ
সুগন্ধি সুকোমল ফুলে সাজাও সবে কুঞ্জ পথ

যেন চলে যেতে লাগেনা পাযে
সুকোমল পুষ্প দাও বিছায়ে যেন চলে যেতে লাগেনা পাযে
বৃন্তচ্যুত পুষ্প দাও বিছায়ে যেন চলে যেতে লাগেনা পাযে

সাজাও সবে ত্বরা করি
কুঞ্জে আস্‌বে কুঞ্জবিহারী সাজাও সবে ত্বরা করি

ব্রজের জীবন ব্রজে আস্‌বে
দুঃখে নিশি পোহাইলে ব্রজের জীবন ব্রজে আসবে

চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া
আস্‌বে আমার প্রাণ বঁধুয়া চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

আসবে আমায় প্রাণ বঁধুয়া চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

এইরূপ কীর্ত্তন রঙ্গে—

কাশীমিশ্রালয় হইতে গুণ্ডিচার প্রবেশ দ্বারে আসিয়া এখন 'গুণ্ডিচার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পরে স্বরূপ রামরায়ের করে ধরিয়া বলিতেছেন—

ও ললিতে ! ও বিশাখে ! কুঞ্জ সজ্জা কর সবে
নিজ নিজ গণ লয়ে কুঞ্জ সজ্জা কর সবে

চল সাজাই নিকুঞ্জ
মনসাধে সবে মিলে চল সাজাই নিকুঞ্জ

গুণ্ডিচা মন্দিরের মার্জ্জন সেবাকার্য্য আরম্ভ হইল : সকলেরই মুখে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি। সকলেরই হাস্য বদন। প্রথমে সম্মার্জ্জনী দ্বারা মন্দিরের নিম্ন প্রাঙ্গন পরিস্কৃত করা হইল। একেবারে শত শত ভক্ত এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গন (ভূমি) হইতে সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করিয়া সকলে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। স্বয়ং গৌরহরি ঝাড়ু হস্তে সকলকে কাজ শিখাইতেছেন। সকলেই হাতে কাজ করিতেছেন ও মুখে কৃষ্ণনাম লইতেছেন।

'প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে লয় কৃষ্ণ নাম।
ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে করে নিজ কাম॥'

চরিতামৃত মধ্য ১২শ

শ্রীমন্দিরের ভিতর মার্জ্জনা হইলে পর সিংহাসন এবং মন্দিরের সমস্ত দেয়ালগুলি জল দ্বারা ধৌত করা হইল। তাহার পর জগমোহনের মার্জ্জনা হইল। গৌরহরিও সহাস্য বদন। তিনি প্রেমোল্লাসে মন্দিরের মার্জ্জন করিতেছেন। এবং মধুর কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন প্রতিটি গৃহের ভিত্তি, অলিন্দ, এবং বর্হিভাগ সমস্তই পরম যত্নের সহিত মার্জ্জনা করা হইল। গৌরহরির শ্রীঅঙ্গে মন্দির মার্জ্জনার ধূলি লাগিযা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তাঁহার শ্রীবদনে কৃষ্ণনাম, নয়নে ধারা ও হাতে ঝাড়ু। এই অপরূপ মধুর মূর্ত্তি দর্শন বহু ভক্তের কর্ম্মশক্তিকে লুপ্ত করিয়া তাঁহাদিগকে যেন কেহ স্তম্ভন করিল। গৌরহরি ভক্তবৃন্দের কাহাকেও বলিতেছেন—

তুমি এই দিকে এস

কাহাকেও বলিতেছেন —

তুমি ঐ দিকে যাও

কাহাকেও বলিতেছেন—

তুমি এই স্থান মার্জ্জনা কর

এইরূপ কৃপাদেশ করিযা সমস্ত ভক্তের মধ্যে এক পরমোল্লাস ও অপরূপ উন্মাদনা সৃষ্টি করিলেন।

গুণ্ডিচা মন্দিরের মার্জ্জন কার্য্যে নীলাচল ও নবদ্বীপের সকল ভক্তই আছেন। আবার, নীলাচল ধামবাসী বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী এবং জগন্নাথদেবের 'রথযাত্রা' উপলক্ষে উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে ও ভারতের নানান্ প্রদেশ হইতে যে সব দর্শনার্থী (ধামে) আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই অপরূপ উৎসবের স্বাভাবিক আকর্ষনে যোগদান করিয়াছেন।

পরিচিতদের মধ্যে যাঁহারা বিলম্বে আসিলেন 'গৌরহরি' তাঁহাদের পৃষ্ঠে সম্মার্জ্জনীর আঘাত করিয়া পরম উল্লাস সৃষ্টি করিলেন।

শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণের সমস্ত তৃণ ধূলা কঙ্কর প্রভৃতি আবর্জ্জনারাশি একত্র করিয়া ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ বস্ত্রে বাঁধিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিবার উদ্‌যোগ করিলে পর গৌরহরি মধুর হাসিয়া বলিলেন—

'কে কত করিয়াছ মার্জ্জন ;
তৃণ ধূলা পরিমাণে জানিব পরিশ্রম ॥'

—চরিতামৃত মধ্য ১২শ

তখন ভক্তবৃন্দ নিজেদের আনীত আবর্জ্জনাগুলি একত্র করিয়া দেখিলেন যে আশ্চর্য্য ব্যাপার, সকলের আবর্জ্জিত আবর্জ্জনা অপেক্ষা একক গৌরহরির সঞ্চিত আবর্জ্জনার পরিমাণই বেশী। যথা—

'সবার ঝাটি আনি বোঝা একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥

—চরিতামৃত মধ্য ১২শ

অতঃপর মৃদুহাস্যের সহিত অমিয় ঝরাকণ্ঠে সচল জগন্নাথ গৌরহরি বলিলেন—

'মার্জ্জনা কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে জল আনয়ন কর, ধৌত কার্য্য করিতে হইবে।'

সকলে প্রেমোল্লাসের সহিত নিকটস্থ কূপ হইতে শত শত কলস জল আনিয়া তৎক্ষণাৎ গৌরহরির সম্মুখে ধরিলেন।

'জল আন' বলি যবে মহাপ্রভু কৈল।
তবে শত ঘট আনি প্রভু আগে দিল ॥'

—চরিতামৃত মধ্য ১২শ

স্বয়ং গৌরহরি ধৌতকার্য্যে অগ্রণী হইলেন। গুণ্ডিচার অভ্যন্তরে যে কক্ষটিতে 'জগন্নাথ' 'বলরাম' 'সুভদ্রা' আসিয়া বিরাজ করিবেন তাহার ভিতরের ছাদ খাপরাতে জলপূর্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ উর্দ্ধে নিক্ষেপ করতঃ ধৌত করিলেন। তাহার পর সমস্ত দেওয়াল জলদ্বারা ধৌত করিলেন। এইরূপে সম্পূর্ণ অভ্যন্তর ধৌত হইলে পর নিজ হস্ত দ্বারা সিংহাসন মার্জ্জন করিলেন। যথা—

'প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
উর্দ্ধ, অধো, ভিত, গৃহ, মধ্য, সিংহাসন॥
খাপরা ভরিয়া জল উর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে উর্দ্ধ শোধি ভিত্তি প্রক্ষালিল॥'

—চরিতামৃত মধ্য ১২শ

নদীয়া ও নীলাচলের ভক্তবৃন্দ কি কি কার্য্য (প্রতিবন্ধে) করিতেন তাহা দাস গোস্বামীর মুখে শ্রবণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী বিবরণ দিয়াছেন। যথা—

ভক্তগণ করে গৃহ-মধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন॥

কেহ জল আনি দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহ জল দেয় তাঁর চরণ উপরে॥

কেহ লুকাইয়া করে সেই জল পান
কেহ মাগি লয়, কেহ অন্যে করে দা

ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিঃ
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল

নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন।
নিজ বস্ত্রে মহাপ্রভু মাজিল সিংহাসন ॥

শতঘট জলে হৈল মন্দির মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন ॥

নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥

শত শত জন জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থান নাহি কেহ কূপে জল ভরে ॥

পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন ॥

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী আর পুরী।
ইহা বিনা আর সব আনে জল ভরি ॥

ঘটে ঘট ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি' গেল।
শত শত ঘট তাঁহা লোক লঞা আইল ॥

জল ভরে, ঘট ভাঙ্গে, করে হরি ধ্বনি।
'কৃষ্ণ' 'হরি' ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি ॥

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি করে ঘট সমর্পণ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন ॥

যেই যেই কহে, সেই কহে, 'কৃষ্ণ' নামে।
'কৃষ্ণনাম' হইল সঙ্কেত সর্ব্ব কামে॥

প্রেমাবেশে প্রভু কহে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম
একলে করেন প্রেমে শত জনের কাম।

শত হাতে করেন যেন ক্ষালন মার্জ্জন।
প্রতি জন পাশে যাই করান্ শিক্ষণ॥

ভাল কর্ম্ম দেখি তারে করে প্রশংসন।
মন না মানিলে করে পণ্ডিত-ভৎর্সন।
"তুমি ভাল করিয়াছ শিখাও অন্যেরে।
এইমত ভাল কর্ম্ম সেহো যেন করে॥"

এ কথা শুনিযা সবে সঙ্কুচিত হৈঞা।
ভালমত করে কর্ম্ম সবে মন দিযা॥

তবে প্রভু প্রক্ষালিলা শ্রীজগমোহন।
ভোগ-মণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন॥

নাটশালা ধুই, ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গন।
পাকশাল আদি কৈল সব প্রক্ষালণ॥

মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল॥

—চরিতামৃত মধ্য ১২শ

এইরূপে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জনার কার্য্য শেষ হইলে পর গৌরহরি ভক্তবৃন্দকে সারি করিয়া প্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বে বসাইলেন। মধ্যস্থলে তিনি স্বয়ং বসিলেন। বসিয়া স্বহস্তে প্রাঙ্গণের তৃণ কুটা ও কঙ্কর সকল কুড়াইতে লাগিলেন। আর হাসিয়া হাসিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন—

"কে কত কুড়াও সব একত্র করিব ;
যার অল্প তার ঠাঁঞি পিঠা-পানা লব।"

—চরিতামৃত মধ্য ১২শ

গৌরহরির শ্রীমুখের কথা শুনিয়া সকলেই অতিশয় যত্ন ও আগ্রহের সহিত এই কার্য্য করিতে বসিলেন। শ্রীমন্দিরের বিস্তীর্ণ আঙ্গিনা এবং বহির্দ্বারের সমস্ত পথই উত্তম রূপে পরিস্কৃত করা হইল।

তাঁহার এই লীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা দাস গোস্বামীর অনুভব কবিরাজ গোস্বামীর পয়ারে প্রকাশ পাইয়াছে। যথা—

"এই মত সবে পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন॥"

- চরিতামৃত মধ্য ১২শ

গুণ্ডিচা মন্দির সম্পূর্ণ শোধন হইলে পর ঐ মন্দির সংলগ্ন নৃসিংহদেবের মন্দির ও মন্দির সম্মুখের পথ সমস্ত পরিস্কার করা হইল।

ইহার পর প্রেমাবেশে গৌরহরি উন্মত্তের ন্যায় সমস্ত আঙ্গিনায় উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া গৌরসুন্দরকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

সে দৃশ্য অপূর্ব্ব—

"সবাকার করে সম্মার্জ্জনী সবার মুখে হরি ধ্বনি"

———

ইন্দ্রদ্যুম্নে—

"শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন করি শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
পারিষদ সঙ্গে রঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্নে যায়॥"

গুণ্ডিচা মন্দির সংলগ্ন নৃসিংহ মন্দির ও তাহার অদূরে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলার অন্তে শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে উপস্থিত হইলেন। এবং

'মত্ত গোরা ভাবোল্লাসে
কিশোরী আবেশে মত্ত গোরা ভাবোল্লাসে
কুঞ্জ সজ্জা আবেশে মত্ত গোরা ভাবোল্লাসে

ইন্দ্রদ্যুম্নে যায় গৌরকিশোরী
লয়ে নিজগণ সহচরী ইন্দ্রদ্যুম্নে যায় গৌরকিশোরী
গুণ্ডিচা মার্জ্জন করি' ইন্দ্রদ্যুম্নে যায় গৌরকিশোরী

মাঝে নেচে যায় গৌরকিশোরী
লয়ে পারিষদ গোপনারী মাঝে নেচে যায় গৌরকিশোরী
(যেন) গোপী মণ্ডলী ঘেরা ভানুদুলারী
মাঝে নেচে যায় গৌরকিশোরী

(শ্রীলরামদাসবাবাজীমহাশয়)

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের বারি যমুনার বারির বর্ণের সাদৃশ্য দর্শনে গৌরহরির যমুনার উদ্দীপন হইল। যথা—

"ইন্দ্রদ্যুম্ন দেখি গোরা শ্রীযমুনা উদ্দীপনে।
আনন্দে জলকেলি করে নিজগণ সঙ্গে ॥"

প্রায় চারি পাঁচ শত ভক্তবৃন্দের সহিত গৌরহরি জলকেলি লীলারঙ্গ করিতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে নামিলেন। সচল জগন্নাথ গৌরহরিই সকলের অগ্রে জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। শত শত ভক্তবৃন্দও জলে ঝম্প দিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য, অবধূত নিতাইচাঁদ, শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, স্বরূপ দামোদর, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রায় রামানন্দ, শ্রীবাস পণ্ডিত, দামোদর মুকুন্দ, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি সকলেই আছেন। সকলেরই চাপল্যের আবেশ।

রঙ্গিয়া গৌরহরি স্বয়ং ভক্তবৃন্দের গাত্রে বিশেষ করিয়া চক্ষে জলের ছিটা দিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দও তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার চোখে ও সর্ব্বাঙ্গে জল দিতেছেন। আবার সকলেই জল মণ্ডূক বাদ্য করিতেছেন। (জলের উপরে মণ্ডূকবৎ প্লুতগতির আঘাতে যে অতি বিচিত্র বাদ্য ধ্বনি উত্থিত হয় তাহার নাম জল মণ্ডূক বাদ্য।) গৌরসুন্দর জলকেলির রঙ্গে আজ উন্মত্ত। সরোবরের জলে স্নাত গৌরসুন্দরের অপরূপ মাধুরীর প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা কবি কর্ণপুর বর্ণনা করিয়াছেন—

অরুণারুণ পাদপঙ্কজো দ্রুতচামীকর গৌরবিগ্রহঃ।
করুণারুণ লোচনদ্বয় স্ত্রিবিধোত্তাপ বিরামকৃতঃ সদা ॥

অবিলম্ব্য ইত্থমঞ্জসা সরসীং সারসসালসেক্ষণঃ।
ক্ষণবান্ জলকেলি কৌতুকে সহতৈস্তৈবমৃতাংশু বদ্বভৌ

অনুবাদ ঃ যাঁহার পাদপদ্ম সমধিক অরুণবর্ণ, শ্রীঅঙ্গ কষিত কাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ, কমল নয়নদ্বয় কারুণ্যপূর্ণ এবং রক্তাভ। যিনি আধ্যাত্মিক, আদিভৌতিক ও আদিদৈবিক, এই ত্রিবিধ তাপ বিনাশকারী সেই পদ্মনেত্র শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র উৎসবানন্দাভিলাষী হইয়া সরোবরে অবতরণ পূর্ব্বক ভক্তগণের সহিত জলকেলি কৌতুকে অমৃতাংশু শশধরের ন্যায় দীপ্তমান হইয়াছেন।

তারপর দুই দুই জন ভক্তে জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। গৌরহরি তখন দর্শক। কেহ হারিতেছেন, কেহ জিতিতেছেন। গৌরসুন্দর অপরূপ শোভায় জলে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছেন। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু ও নিতাইচাঁদে একদিকে জলযুদ্ধ হইতেছে। বৃদ্ধ শান্তিপুরনাথ জলযুদ্ধে হারিয়া গিয়া নিতাইচাঁদকে অজস্র কটূক্তি বর্ষণ করিতেছেন অন্যদিকে স্বরূপ দামোদর ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিতে বিষম জলযুদ্ধ বাধিয়াছে। মুরারি গুপ্ত এবং বাসুদেব দত্তেও প্রচণ্ড জলসংগ্রাম চলিতেছে। শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত গদাধর পণ্ডিতও ক্রীড়াসংগ্রামে মত্ত হইয়াছেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গে রাঘব পণ্ডিতেরও জল ক্রীড়া যুদ্ধ তীব্র হইয়াছে। গৌরহরির সম্মুখেই রায় রামানন্দ এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বালকের ন্যায় হাতাহাতি করিয়া জলকেলি করিতেছেন। সকলেই ক্রীড়া চাপল্যে বিভাবিত হইয়াছেন মান, সম্ভ্রম, স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য কাহারও কিছুরই বোধ নাই।

'গাম্ভীর্য্য গেল সবার হইল শিশু প্রায়'

গৌরহরি স্মিত হাস্যে কৌতুক দর্শন করিতেছেন। সার্ব্বভৌম ও রামরায়ের চাপল্যাতিশয্য দর্শনে গৌরহরি হাসিতে হাসিতে গোপীনাথ আচার্য্যকে বলিতেছেন—

দেখ আচার্য্য! ভট্টাচার্য্য ও রামরায় উভয়েই প্রাচীন, মহা পণ্ডিত, দেশের অতি গণ্য মান্য লোক, পরম গম্ভীর। উঁহাদিগের

পক্ষে এরূপ চপলতা শোভা পায় না। নিষেধ কর। লোকে নিন্দা করিবে।

'পণ্ডিত গম্ভীর দুঁহে প্রামাণিক জন।
বাল্য চাঞ্চল্য করে, করহ বর্জ্জন॥'

গোপীনাথ হাসিয়া উত্তর দিলেন—

'প্রভু হে তোমার কৃপা সমুদ্রের এক বিন্দুতে 'সুমেরু' 'মন্দর' প্রভৃতি বড় বড় পর্ব্বত ডুবিয়া যায়, এই দুইটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত ডুবিয়াছে ইহা আবার কথা?'

অতঃপর গৌরহরি অদ্বৈত আচার্য্যকে ধরিয়া জলমধ্যে শোয়াইলেন। এবং নিজে তাঁহার বক্ষস্থলে শেষশায়ী অনন্তদেবের ভঙ্গীতে উপবেশন করিলেন। অদ্বৈত প্রভুও প্রেমানন্দে নিজ শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক মহাপ্রভুকে বক্ষে ধারণ করিয়া সরোবরের জলে ভাসিতে লাগিলেন। নয়নের অভিরাম এই লীলা দর্শনে সমবেত ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই সকল মান্যগণ্য লোকের জলক্রীড়া রঙ্গটি নীলাচলবাসী ও রথযাত্রা উপলক্ষে সমাগত ভাগ্যবান সকলেই দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

'ইন্দ্রদ্যুম্নে জলকেলি করি গৌররায়।
নিজগণ সঙ্গে লয়ে আইটোটায় যায়॥'

'ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান করি, আইটোটায় যায় গৌরহরি'

আইটোটায়—

'আইটোটায় আসি আমার শ্রীশচীনন্দন।
নিজগণ লইয়া করেন প্রসাদ ভোজন॥'

সচল নীলাচলচন্দ্র গৌরহরি 'গুণ্ডিচা' মন্দির হইতে ভক্তবৃন্দের সহিত ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে গমন পূর্ব্বক প্রেমানন্দে জলকেলি করিলেন। তাহার পর কীর্ত্তন আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অদূরে অবস্থিত মনোরম 'আইটোটায়' (যুঁই ফুলের বাগান) উপস্থিত হইলেন। ভক্তবৃন্দের সহিত গৌরহরি আইটোটাতে বিজযেব পূর্ব্বেই কাশীমিশ্র, বাণীনাথ ও জগন্নাথদেবের প্রধান পাণ্ডা প্রায় ছয় শত লোকের ভোজনেব উপযুক্ত প্রসাদ, পানা, পিঠা প্রভৃতি বহু প্রকারের অতি উপাদেয বস্তু সমূহ সেই উদ্যানে আনিযা রাখিতেন। জগন্নাথদেবের এই সব অতি উপাদেয প্রসাদ দর্শনে গৌরহরি অসীম আনন্দিত। তাহার পব—

বসাইল সারি সাবি
নিজগণে গৌরহরি বসাইলা সাবি সারি
মাঝে বসিলেন গৌরহরি
(শ্রীলবামদাসবাবাজীমহাশয)

সাতজন পরিবেষ্টা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের নাম, স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ পণ্ডিত, বাণীনাথ পট্টনায়েক, পণ্ডিত দামোদর, কাশীশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য্য ও শঙ্কর পণ্ডিত।

মহাপ্রসাদ করেন ভোজন
নিজগণ সনে প্রাণ শচীনন্দন মহাপ্রসাদ করেন ভোজন

গৌরহরি পরিবেষ্টাদেব বলিতেছেন—

'আমাকে লাফ্‌রা ব্যঞ্জন দাও। পিঠা, পানা, অমৃতগুটিকা, প্রভৃতি উপাদেয় ও মিষ্টদ্রব্য ভক্তবৃন্দকে দাও।'

পণ্ডিত জগদানন্দ 'মধুর রসের ভক্ত।' সহজ প্রীতির প্রগাঢ় আগ্রহে তিনি গৌরহরিকে ছলে, বলে, কৌশলে, নানান্ উপাদেয়

প্রসাদ ভোজন করাইতেছেন। কোন কথা বার্ত্তা না বলিয়া উত্তম উত্তম শাক, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে গৌরহরির পাতে পুনঃ পুনঃ ঢালিয়া দিতেছেন। আবার লক্ষ্য রাখিতেছেন যে তাঁহার দেওয়া প্রসাদ নিজে গ্রহণ করিতেছেন কি অন্য কাহাকেও বিলাইয়া দিতেছেন। জগদানন্দের ভয়ে গৌরহরি সবই গ্রহণ করিতেছেন।

স্বরূপ দামোদর জগন্নাথদেবের উত্তম উত্তম প্রসাদ মিষ্টান্ন নিজ হস্তে ধারণ পূর্ব্বক গৌরহরিকে বলিতেছেন—

'এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন?'

স্বরূপের প্রীতিতে তাঁহার দেওয়া প্রসাদ গৌরহরি কিছু কিছু গ্রহণ করিতেছেন। এইরূপ একবার 'জগদানন্দ' আর একবার 'স্বরূপ' গৌরহরিকে অতি যত্ন পূর্ব্বক মিষ্ট কথায় ভোজন করাইলেন। যথা—

'এই মত দুই জনে করে বারম্বার।
'বিচিত্র' এই দুই ভক্তের স্নেহ ব্যবহার॥'

পরম রঙ্গিয়া গৌরহরি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে নিজের পার্শ্বে বসাইয়াছেন। উত্তম উত্তম প্রসাদ নিজ পাতা হইতে ভট্টাচার্য্যের পাতায় দিতেছেন। কি করুণা!

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্যও পরিবেশন করিতেছেন। গৌরহরির কৃপা পাইবার পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। গোপীনাথ পূর্ব্বকথা তুলিয়া হাসিতে হাসিতে ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন—

'কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড় ব্যবহার
কাঁহা এই পরমানন্দ করহ বিচার ॥'

অতঃপর গৌরহরি একে একে সর্ব্ব ভক্তের নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া তাঁহাদিগকে পিঠা পানা প্রসাদ দেওয়াইতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা সকলেই পরিপূর্ত্তির সহিত প্রসাদ পাইয়াছেন; তবুও গৌরহরির করুণা বর্ষণরূপ এই প্রসাদ বিতরণ অত্যন্ত উল্লাসের সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন।

গৌর-আনা-গোসাঞি সীতানাথ এবং গৌরহরির 'ইচ্ছা' ও 'ক্রিয়া শক্তির' সচল মূরতি অবধূত নিতাইচাঁদ রসকোন্দলের নিমিত্ত পাশা-পাশি বসিয়াছেন। সীতানাথ উচ্চ কণ্ঠে সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতেছেন—

'আজ্ এই অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেছি। জানিনা ইহাতে আমার কি গতি হইবে? প্রভু ত সন্ন্যাসী। তাঁহার অন্নদোষ ঘটিবে না। আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, এই অবধূতের জাতি কূল আচার কিছুই জানি না। ইহার সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন আমার ঘোর অনাচার।'

নিতাইচাঁদ হাসিয়া উত্তর করিলেন—

'তুমি অদ্বৈত আচার্য্য।
অদ্বৈত সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধ ভক্তি কার্য্য ॥

তোমার সিদ্ধান্ত সঙ্গ করে যেই জনে।
এক বস্তু বিনে সেই দ্বিতীয় না মানে ॥

হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ॥'

এইরূপ নানান রঙ্গে উদ্যানে মহাপ্রসাদ গ্রহণ লীলা সমাপ্ত হইল। গোবিন্দ গৌরহরির অবশেষ প্রথমে ঠাকুর হরিদাসের জন্য পৃথক করিয়া রাখিলেন। অবশিষ্ট প্রসাদ হইতে সমস্ত ভক্তকে গৌরহরির অধরামৃত দান করিলেন। তাহার পর নিজে প্রসাদ পাইলেন।

এইভাবে মন প্রাণ-মাতান উদ্যান-ভোজন-লীলার অন্তে গৌরহরি স্বয়ং ভক্তবৃন্দকে দিব্যদর্শন মালা ও চন্দনে ভূষিত করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে বিনোদিয়া গৌরহরি সকলকে সঙ্গে লইয়া পরমানন্দে জগন্নাথ দেবের 'নেত্রোৎসব' * দেখিতে চলিলেন।

নেত্রোৎসব দর্শনে—

পঞ্চদশ দিবস পরে 'নয়নের অভিরাম' শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সর্বলোকের নয়ন গোচর হন। এই কারণেই ঐ দিন শ্রীমন্দিরে অগণিত দর্শনার্থী উপস্থিত হন।

আইটোটা হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগোষ্ঠী সহ সচল জগন্নাথ গৌরহরি সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। তিনি বাহু যুগল উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া ঘন ঘন হরিধ্বনি করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

'সচল জগন্নাথ গৌরহরি' ও 'অচল জগন্নাথ নীলাচলচন্দ্রের' চারি চক্ষুর মিলন হইল। গৌরহরির শ্রীঅঙ্গের অপরূপ ভাবাবলী দর্শনে সঙ্গের ভক্তগোষ্ঠী যেন আনন্দ পাথারে সাঁতার দিতে লাগিলেন। আমাদের দাস রঘুনাথও এই গৌরভক্ত সেবক গোষ্ঠীর মধ্যে আছেন।

গৌরহরি গড়ুর স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া প্রত্যহ জগন্নাথ দর্শন করেন। পনের দিন অদর্শনের পর প্রথম দর্শনে, আনন্দের

* শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার পর পনের দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন বন্ধ থাকে। ১৫দিন পরে সর্ব্বসাধারণে জগন্নাথদেবের প্রথম দর্শন পান সেই দিনটিকে 'নেত্রোৎসব' বলা হয়।

আতিশয্যে তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ হইল। তিনি ভোগ-মণ্ডপে (জগন্নাথ দেবের অতি নিকটে) গমন পূর্ব্বক দর্শন করিতে লাগিলেন।

'দর্শন লোভে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
ভোগ মণ্ডপে যাইযা করে শ্রীমুখ দর্শন॥'

গৌরহবির তাৎকালীন প্রেমাবেশেব বহিপ্রকাশের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা কবিকর্ণপুরের ভাষায়—

নয়নজলঝরৈঃ পদারবিন্দ—
দ্বয নখচন্দ্রমসঃ পবিত্রয়ন্ সঃ।
ন হি জগতি দুরাপমেতদন্যৎ
কিমিতি তদাভিসিষেচ সৌজ্ঘ্র্ পদ্মম্॥ ৭৬ *

নযনযুগমুবাহ শোণপদ্ম—
শ্রিয়মতি কুট্মলতাং ততঃ শবাবং॥
অসিতগিরি সুধাংশু বক্ত্র্চন্দ্রং
রহসি বিলোকযতোঽস্য নিস্পৃহস্য॥ ৭৭ +

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ১৫শ সর্গঃ।)

---

* গৌবসুন্দর নয়নগলিত জলঝব দ্বাবা পাদপদ্ম যুগলেব নখচন্দ্রকে পবিত্র কাবযা "জগন্মণ্ডলে ইহা ভিন্ন আব কিছুই দুর্ল্লভ নয, অর্থাৎ পাদপদ্মই দুর্ল্ভ" এই জ্ঞানেই কি চরণাববিন্দকে অভিষিক্ত কবিতে লাগিলেন?

+ নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ দেবের মুখচন্দ্রকে নির্জনে দর্শন করিয়া স্পৃহাশূন্য গৌরচন্দ্রের নেত্রযুগল রক্তপদ্মের শোভা ধারণ করিল এবং শরীব কুটমল অর্থাৎ মুকুলের ন্যায় হইল।

অল্প কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যেন 'সচল জগন্নাথ গৌরহরি' অচল জগন্নাথ নীলাচলচন্দ্রকে প্রেমাভিমানেই কিছু বলিতেছেন। সে গম্ভীর অন্তরঙ্গ রস কথার অপর প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ও অনুভবী শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর আমাদের সৌভাগ্যেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন—

'আমি তোমা না দেখিলে মরি।
পালটি না চাহ তুমি ফিরি ॥'

গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী (স্বরূপ, গোবিন্দ, রঘুনাথ আদি গম্ভীরার সেবকবৃন্দ) সার্ব্বভৌম, শিখি মাইতি আদি নীলাচলের ভক্তবৃন্দ এবং নিতাই, নরহরি, শ্রীবাস, মুকুন্দ, বসু রামানন্দ আদি নদীয়ার ভক্তবৃন্দ কেহই অচল জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন না। জগন্নাথ দর্শনে গৌরহরি যে সুখ ভোগ করিতেছেন তাহা তাঁহার শ্রীঅঙ্গে 'বিকাশ' পাইতেছে। ভক্তবৃন্দ সেই গৌরহরিকে অপলক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন।

পরবর্ত্তী কালে মিতবাক্ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'দাস গোস্বামীর' সঙ্গ ও প্রসঙ্গ প্রভাবে সে অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন—

'দর্শন আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা'

পুত্র ভৃত্য স্থানীয় রঘুনাথের সহিত স্বরূপ দামোদর গৌরহরির নিকটে আছেন। ক্রমে অপরাহ্নও উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যা হইল। আরতির সময় হইল। গৌরহরির বাহ্য অবস্থা তখনও আসে নাই—

'মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর।
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর ॥'

—চৈঃ চঃ মধ্য ১২শ

স্বরূপ গোসাঞী গৌরহরিকে বলিতেছেন—

"প্রাণনাথ ! আগামী কাল রথ যাত্রা, আজ বাড়ী চল, কাল আবার ভাল করিয়া দেখিও। ভক্তবৃন্দ সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত। তুমি না যাইলে তাঁহারা নিজ নিজ বাসায় বিশ্রাম জন্য যাইতে পারিতেছেন না। চল বাসায় চল।"

গৌরহরি একবার স্বরূপের প্রতি চাহিলেন মাত্র। কোন কথা বলিলেন না। এমন সময় আরতির বাদ্য বাজিল। আরতি আরম্ভ হইল। এবং শেষও হইল। গৌরহরির নয়ন ভৃঙ্গ তখনও জগন্নাথের বদন কমলে নিবিষ্ট।

স্বরূপ গোসাঞী পুনরায় বলিলেন—

'প্রভু ! আরতি ভোগ হইল। রাত্রি চারিদণ্ড অতিবাহিত হইল। চল বাসায় চল, তোমারও বিশ্রাম দরকার। ভক্তবৃন্দ বড়ই শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছেন, তুমি না যাইলে তাঁহারা কি করিয়া বাসায় যান্ ?"

গৌরহরি এবার করুণ নয়নে ভগ্ন স্বরে কথা বলিলেন।

তিনি বলিলেন—

'স্বরূপ ! আর একটু অপেক্ষা কর। আমি একটু ভাল করিয়া আমার বঁধুর বদনচন্দ্র দর্শন করিয়া লই। আজ পনেরটি দিন আমার 'নয়ন' উপবাসী আছে। এই ত দর্শনে আসিলাম। একটু অপেক্ষা কর।'

পুনরায় প্রায় দুই দণ্ড কাল অপেক্ষা করিয়া স্বরূপ বলিতেছেন—

'হা নাথ ! রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড হইল। তোমার ভক্তবৃন্দের শ্রান্ত ক্লান্ত বদন সমূহ দর্শন কর। আজ্ আর না। চল।'

জগন্নাথের সেবকবৃন্দ গৌরহরিকে প্রসাদী মালা দিলে তিনি পরম গৌরবে তাহা শ্রীমস্তকে ধারণ করিয়া বাসায় ফিরিলেন। গৌরহরিকে বাসায় রাখিয়া ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ বাসায় গমন করিলেন। স্বরূপ ও রঘুনাথ আরও কিছু সময় অপেক্ষা করিয়া গৌরহরিকে শয়ন করাইলেন। তাহার পর তাঁহারা পিতা পুত্রে বিশ্রামের জন্য গমন করিলেন।

"পহুণ্ডি বিজয়"

আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া, রথযাত্রা মহোৎসব।

গৌরহরির নদীয়া ও নীলাচলের ভক্তবৃন্দ স্নানাদিকৃত্য সমাপন করিয়া সকলে কাশীমিশ্রালয়ে আগমন করিলেন। তাঁহাদের জীবন সর্ব্বস্ব গৌরহরির সঙ্গে তাঁহারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 'পহুণ্ডি বিজয়' উৎসব দর্শনে ছুটিলেন। শ্রীমন্দিরে যাইয়া দেখিলেন জগন্নাথের সেবকবৃন্দ বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথকে সিংহাসন হইতে উঠাইয়া রথারোহণের জন্য যাত্রা করাইতেছেন। পরম সুকৃতিবান মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সহ সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সগোষ্ঠী গৌরহরির দর্শন মাত্রেই সকলে সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকবৃন্দ হাতাহাতি ধরিয়া শ্রীবিগ্রহদের লইয়া যাইতেছেন। মঙ্গল বাদ্য বাজিতেছে। পাণ্ডাগণের মুখে "জয় জগন্নাথ" রব দিগন্ত কম্পিত করিতেছে। সেই সঙ্গে অগণিত দর্শকবৃন্দের উন্মাদনায়, কণ্ঠের উচ্চ জয়নাদে, গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। সেবকগণের কেহ শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণ ধরিয়াছেন, কেহ শ্রীমস্তক ধরিয়াছেন, কেহ বা স্কন্ধদেশ অবলম্বন করিয়াছেন।

দুইজন কটি দেশে স্থূল পট্টডোরি * দৃঢ় বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে উঠাইতেছেন। পথের মধ্যে তুলার গদি পাতা হইয়াছে, তাহার উপর শ্রীবিগ্রহকে স্থাপন করা হইতেছে এবং উঠান হইতেছে। শ্রীজগন্নাথের অঙ্গের আঘাতে গদিগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, যথা—

'প্রভু পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলি সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥'

—চরিতামৃত মধ্য ১৬শ

এইরূপে শ্রীবিগ্রহের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন যেন নৃত্যের ছন্দেই ঘটিতেছে।

ভক্তগোষ্ঠীর সহিত পরমানন্দে গৌরহরি এই 'পহুণ্ডি বিজয়' দর্শন করিতেছেন। মাঝে মাঝে 'মনিমা' 'মনিমা' বলিয়া তিনি উচ্চ ধ্বনি করিতেছেন। উৎকল ভাষায় অতি সম্মান সূচক শব্দ

* পট্টডোরি—ইহা রেশমের এক প্রকার স্থূল চেন বা কাছী। সাদা কাল, লাল ও হলদে বর্ণের রেশম দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। দেখিতে বড়ই সুদৃশ্য। কুলীনগ্রামবাসীরা প্রতি বৎসর দুইগাছি পাঠাইতেন। ইহার এক এক গাছি লম্বায় ২৪ (চব্বিশ) হাতের কম নয়। স্টীমারের রশির ন্যায় স্থূল। আটগাছি রসিতে একগাছি প্রস্তুত হয়। ছান্দে চারি রঙের ফুল উঠিতে থাকায় দেখিতে মনোরম হয়। ইহা অত্যন্ত দৃঢ় সহজে ছিঁড়িবার নয়

'মনিমা'। * ইহার অর্থ সর্ব্বেশ্বর। বাদ্য কোলাহলে অবর্ণনীয় মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে। রাজা প্রতাপরুদ্র স্বয়ং স্বর্ণ নির্ম্মিত সম্মার্জ্জনী হস্তে পথ মার্জ্জনা করিতেছেন এবং স্বহস্তে চন্দনের জল শ্রীজগন্নাথদেবের গমন পথে ছিটাইতেছেন।

শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও সুভদ্রাদেবী—তিন মূর্ত্তিই পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণ করিলেন। অগণিত বাদ্যভাণ্ড এক সঙ্গে বিপুল রবে বাজিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র শঙ্খ একত্রে নিনাদিত হইল। লক্ষ কণ্ঠের জয় জয় ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল।

—————

রথাগ্রে—

সচল জগন্নাথ গৌরহরি নিজ ভক্তগণের সহিত পরিবেষ্টিত হইয়া 'মল্লবেশে' রথাগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীনীলাচলচন্দ্র যেমন নিজ গোষ্ঠী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রথোপরি ইন্দ্রনীল মনি সদৃশ শোভা পাইতেছেন —শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রও রথাগ্রে নিজ ভক্তবৃন্দ বেষ্টিত হইয়া হেমকান্তির লাবণ্য বিকাশ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন গৌরকান্তিতে নীলাচলচন্দ্র কখনও কষিত কাঞ্চনবর্ণ ধারণ করিতেছেন। আবার, শ্যামকান্তিতে নবদ্বীপচন্দ্রও কখন শ্যামবর্ণ ধারণ করিতেছেন। কেবল পরম সুকৃতিবান ভক্তবৃন্দই এই অপরূপ ভাবসাদৃশ্য দর্শন লাভ করিতেছেন। অচল জগন্নাথ রথে আরোহণ করিয়াছেন, সচল জগন্নাথ রথাগ্রে দাঁড়াইয়া ভক্তবৃন্দের সঙ্গে রথারূঢ় বিগ্রহে নিজ বিগ্রহ দেখিতেছেন।

* বৌদ্ধ তিব্বতীদের উপাসনায় হৃদয়ের মধ্যে বজ্র ধারনার (শূন্য মানে বজ্র) এক নাম মনিমা। ওঁং মণি পদ্ম হুং এই ষডক্ষর মনিমা মন্ত্রটি তাঁরা হাতে চক্র ঘুরিয়ে জপ করেন। মনিমা উপাসনার বাহ্য সাধনা এটি। অন্তর

রথের রজ্জু বিস্তৃত হইল। রথযাত্রা উপলক্ষে সমাগত জনতা, (বিভিন্ন দেশের বিচিত্র বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও নারী) পরম উল্লাসে রথরজ্জু ধরিলেন। সু-মধুর ভঙ্গীতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথ চলিতে লাগিল। প্রেমানন্দে সর্ব্বলোক জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। 'জয় জগন্নাথ' 'জয় জগন্নাথ' রবে গগন মণ্ডল পূর্ণ হইল। শ্বেতবর্ণ বালুকাময় সমুদ্র পথের দুই পার্শ্বে সুরম্য সুরম্য উপবন। দুই দিকের শোভা দর্শন করিতে করিতে পরমানন্দে নীলাচলচন্দ্র রথারোহণে চলিয়াছেন। অগণিত বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া রথের সুদীর্ঘ রজ্জু ধারণ করিয়া চলিয়াছে। রথ কখনও মন্দ মন্দ চলিতেছে আবার, কখনও বা স্থিরগতি হইতেছে। 'সচল জগন্নাথ' গৌরহরি নিজ ভক্তবৃন্দকে স্বহস্তে মাল্য চন্দনে ভূষিত করিয়া শক্তিশালী করিলেন। স্বরূপ গোস্বামী ও শ্রীবাস পণ্ডিত কীর্ত্তনীয়া দলের প্রধান হইলেন। কীর্ত্তনের জন্য প্রথমে চারিটি সম্প্রদায় গঠিত হইল। এই চারি সম্প্রদায়ে চব্বিশ জন গায়ক রহিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে ছয় জন করিয়া গায়ক ও দুই জন মৃদঙ্গ মাদক।

প্রথম সম্প্রদায়ে স্বরূপ দামোদর প্রধান হইলেন। তাঁহার পাঁচজন দোহার, দামোদর পণ্ডিত, রাঘব পণ্ডিত, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দানন্দ ও নারায়ণ। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন গৌর-আনা গোঁসাই শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য।

উপাসনা ধ্যান। উড়িষ্যায় মনিমা শব্দের খুব প্রীতির ও সর্ব্বেশ্বরত্ব অর্থের সঙ্গে এবং শ্রীজগন্নাথের সর্ব্বেশ্বরত্ব জ্ঞাপনের সঙ্গে বৌদ্ধ মনিমা শব্দের এত সাদৃশ্য থাকার মধ্যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার সীমা নাই। নিরঞ্জন শব্দের অপর নাম 'মণিমন্'।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে প্রধান হইলেন শ্রীবাস পণ্ডিত। তাঁহার দোহার, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, ছোট হরিদাস, শুভানন্দ, শ্রীমান ও শ্রীবাস পণ্ডিতের অপর একভ্রাতা। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন, অভিন্ন-চৈতন্য-তনু অবধূত নিতাইচাঁদ।

তৃতীয় সম্প্রদায়ে প্রধান হইলেন মুকুন্দ দত্ত। তাঁহার দোহার বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, শ্রীকান্ত, বল্লভ সেন এবং গোপীনাথ আচার্য্য। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন 'ভুবন পাবন' নামময় জীবন 'ঠাকুর হরিদাস'।

চতুর্থ সম্প্রদায়ে প্রধান হইলেন গোবিন্দ ঘোষ। তাঁহার দোহার তাঁহারই দুই ভাই বাসুদেব ও মাধব, এক হরিদাস, বিষ্ণুদাস এবং অন্য এক রাঘব। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত। তাঁহার মহিমা—

'বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দো দিব্য শরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরাঙ্গ বাহির।'

ইহা ভিন্ন আরও তিনটি সম্প্রদায় গঠিত হইল—

(১) কুলীনগ্রামের সম্প্রদায়ের প্রধান হইলেন 'বসু রামানন্দ'

(২) শান্তিপুর সম্প্রদায়ের প্রধান হইলেন 'অচ্যুতানন্দ'

(৩) শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের প্রধান হইলেন 'নরহরি সরকার'

ইঁহাদের দলে বহু বহু লোক। প্রধান তিন জনে নৃত্য করেন। এইরূপ সাতটি সম্প্রদায় হইল।

পূর্ব্বের চারি সম্প্রদায় রথের অগ্রে থাকিবেন। পরের তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে রথের দুই পাশে দুইদল ও পশ্চাতে একদল।

গৌরহরির আদেশে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। চৌদ্দমাদল বাজিয়া উঠিল। জগন্নাথদেবের সেবকবৃন্দ এ যাবৎ যে সব বাদ্য-ভাণ্ড বাজাইতে ছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশে সে সব স্থগিত হইল।

'সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দমাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল ॥'

গৌরহরির অনন্যসন্ধানে অপরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইল। তিনি সাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই একই সময়ে আবির্ভূত হইযা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। জন মন-লোভা আজানুলম্বিত-বাহু যুগল উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার "জয় জগন্নাথ" "জয় জগন্নাথ" রব এবং সোল্লাস উচ্চ হরিধ্বনি ভক্তমণ্ডলীতে শক্তি সঞ্চার ও উৎসাহ সৃজন করিতে লাগিলেন।

'সাত ঠাঁই বুলে প্রভু বলি হরি হরি।
জয জয় জগন্নাথ কহে বাহু তুলি ॥'

সকলেই দেখিতেছেন সংকীর্ত্তন পিতা গৌরহরি তাঁহাদিগের সংকীর্ত্তনের পুরোভাগে। সকলের আনন্দের অবধি নাই। অত্যন্ত উল্লাসের সহিত কীর্ত্তনে মত্ত হইযা পরস্পরে বলাবলি করিতেছেন—

'সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়ে।
অন্য ঠাঁঞি নাহি যায আমার মাযায ॥'

শ্রীকৃষ্ণ বাস বজনীতে অপ্রাকৃত ব্রজধামে 'ব্রজরামা' অর্থাৎ নিজ হ্লাদিনী শক্তিদের সহিত বিলাস কালে অনন্ত মূর্ত্তি ধাবণ কবিয়াছিলেন। রাইকানুর ভাব মিলিত বিগ্রহ গৌরহবি এই মাযাব জগতে (ঐতিহাসিক সত্য) কলিজীবের নযন গোচর হইযা অসাধনে, আচণ্ডালে যে প্রেমদান লীলা প্রকট করিয়াছেন ইহা কারুণ্যের অবধি।

(ষোড়শ বর্ষ কাল ব্যাপী অবস্থান করিয়া রঘুনাথ এই বাৎসরিক উৎসবের দ্রষ্টা ও স্বরূপের আনুগত্যে অন্তরঙ্গ সাথী)

রথের সম্মুখে নৃত্য করিতে করিতে গুণ্ডিচাবাড়ী পর্য্যন্ত 'জগন্নাথ' ও গৌরহরির গমন প্রসঙ্গে—ত্রিকাল সত্য লীলা দ্রষ্টা শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন * বর্ণিত হইতেছে—

রথের সম্মুখে—

আবেশে বলে গোরারায়
স্বরূপ রামরায়ের করে ধরি, আবেশে বলে গোরারায়
বলে দেখ দেখ প্রাণ সখি !
হেলে দুলে আস্‌ছে
রথোপরি বংশীধারী হেলে দুলে আসছে
(যেন) নব-অনুরাগের হিল্লোলে হেলে দুলে আসছে
আজ নব রসের হিল্লোলে হেলে দুলে আসছে
গোপীর মনোরথ পূরাবে ব'লে হেলে দুলে আসছে

আসছে রথে চড়ে হেলে দুলে।
গোপীর মনোরথ পূরাবে বলে ॥

আসিছে ব্রজের মনোমথ

পূরাইতে গোপীর মনোরথ।
আসিছে ব্রজের মনোমথ ॥

---

* ভাগ্যবান যাঁহারা এ কীর্ত্তন শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই অনুভব আছে যে লীলা ত্রিকাল সত্য। এবং চিহ্নিত দাসদের দ্বারা কীর্ত্তন হইলে তাহা সকলেরই অনুভবে ধরা পড়ে।

(তখন) আবেশে রামরায় ব'লে
ভাবনিধি গোরার মরম জেনে আবেশে রামরায় ব'লে
(আবেশে) রামরায় করে গানে
ভাবনিধি গোরার মরম জেনে রামরায় করে গানে

(আমাদের) "শ্রীরাধারমণ রমনী মনোমোহন,
শ্রীবৃন্দাবন বনদেবা।"

ঐ আসৃছে প্রাণের রাধারমণ
শ্রীবৃন্দাবিপিন বিহারী ঐ আসৃছে প্রাণের রাধারমণ
ঐ রসময় বংশীধারী ঐ আসৃছে প্রাণের রাধারমণ
"শ্রীবৃন্দাবন বনদেবা"

"অভিনব রাস রসিকবর নাগর,
নাগরীকৃতগণ সেবা॥"

নিতুই নিতুই নব নব
আমাদের প্রাণ রাধারমণ নিতুই নিতুই নব নব
নব নব বিভ্রমশালী
বৃন্দাবিপিন-বিহারী বনমালী নব নব বিভ্রমশালী
বরজ-যুবতী-কুলে দিতে কালি নব নব বিভ্রমশালী
ঐ হেলে দুলে আসৃছে নব নব বিভ্রমশালী
ঐ রথে চড়ে আসৃছে নব নব বিভ্রমশালী

"ব্রজ নাগরীকৃতগণ সেবা"

নিশি দিশি সেব্যমান
ব্রজ নাগরী -কৃত নিশি দিশি সেব্যমান
(ব্রজ) "নাগরীগণকৃত সেবা ॥"

"ব্রজপতি-দম্পতি, হৃদয় আনন্দন"
মা যশোদার নীলমনি

দণ্ডে দশবার খায় নবনী
বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমের বশে, দণ্ডে দশবার খায় নবনী

আবেশে রামরায় বলে
এস গো মা যশোদে
এস লয়ে ক্ষীর ননী
ঐ এল তোমার নীলমনি এস লয়ে ক্ষীর ননী

এস লয়ে ক্ষীর ননী।
ঐ এল তোমার নীলমনি ঃ

এস গো মা যশোদে
তোমার নীলমনি এল ব্রজে, এস গো মা যশোদে

(ত্বরা করি) এস মা যশোদে
তোমার নীলমনিকে ননী দিতে এস মা যশোদে

ত্বরা করি এস মা যশোদে ।
নীলমনিকে ননী দিতে ॥

"ব্রজপতি দম্পতি হৃদয় আনন্দন,
নন্দন নব-ঘন-শ্যাম ॥"

মা যশোদার নীলমনি

নন্দ হৃদি আনন্দন
শ্যাম নব-জলদ নন্দ হৃদি আনন্দন

ব্রজাকাশে উদয় হ'ল
ভাগ্যবশে শ্যামজলদ, ব্রজাকাশে উদয় হ'ল
ভাসাবে ডুবাবে বলে ব্রজাকাশে উদয় হ'ল

লীলামৃত বরিষণে, ভাসাবে ডুবাবে ব'লে
ব্রজাকাশে উদয় হ'ল

শ্যামজলদ উদয় হ'ল
নবজীবন দিবে বলে শ্যামজলদ উদয় হ'ল
বিরহে মৃতপ্রায় জনে, নবজীবন দিবে ব'লে
শ্যামজলদ উদয় হ'ল

নব জীবন দিবে ব্রজজনে
লীলামৃত বরিষণে নব জীবন দিবে ব্রজজনে

নব জীবন দিবে ব্রজজনে।
লীলামৃত বরিষণে ॥

"নন্দন নব ঘন-শ্যাম।
নন্দীশ্বর পুর, পুরট পটাম্বর"

ঐ আস্‌ছে ব্রজের কালশশী
নন্দীশ্বর পুরবাসী ঐ আস্‌ছে ব্রজের কালশশী
'নন্দীশ্বর পুর, পুরট পটাম্বর'

(যেন) থির বিজুরি-জড়িত নবঘনে
শ্যাম অঙ্গে পীতাম্বর থির বিজুরি-জড়িত নবঘনে

"নন্দীশ্বর পুর পুরট পটাম্বর
রামানুজ গুণধাম ॥"

বলরামের ছোট ভাই
ঐ যে রথে চড়ে আসছে বলরামের ছোট ভাই

(যাকে) আদর ক'রে সদাই ডাকে
কা— কা—কানাইয়া আদর ক'রে সদাই ডাকে
কা—কা— কানাইয়া
আরে আরে মেরো ভেইয়া ॥

"রামানুজ গুণধাম।
শ্রীদাম সুদাম সুবল সখা সুন্দর ॥"

ঐ রথে চড়ে আস্‌ছে
শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট ভোজী
বিশুদ্ধ সখ্য প্রেমার বশে, শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট ভোজী

খেতে খেতে বেঁধে রাখে
বনফল মিঠ লাগলে খেতে খেতে বেঁধে রাখে

বলে' আর খাওয়া হ'ল না

এ যে বড় মিঠ লাগ্‌ল আর খাওয়া হ'ল না
আধ থাক, ভাই কানাইকে দিব আর খাওয়া হ'ল না

(ধড়ার) অঞ্চলে বেঁধে রাখে
কত যতন ক'রে ধড়ার অঞ্চলে বেঁধে রাখে

ছুটে এসে তুলে দেয়
বাম করে, গলা জড়ায়ে ধরে, চাঁদ মুখে তুলে দেয়

বলে ধর ধর খাও কানাই
বড় মিঠ ফল ভাই খাবে আমার প্রাণ কানাই
মিঠ লেগেছে তাই খেতে পারি নাই, বড় মিঠ ফল ভাই

খাবে আমার প্রাণ কানাই

শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট ভোক্তা
ঐ রথে চ'ড়ে আস্‌ছে

আবেশে রামরায় বলে
কোথায় আছ শ্রীদাম সখা

ঐ এলো তোমার প্রাণসখা।
কোথায় আছ শ্রীদাম সখা॥

আবেশে রামরায় বলে
ঐ রথে চড়ে আস্‌ছে
"শ্রীদাম সুদাম—সুবল সখা সুন্দর"
সুবলের মরম সখা
শ্যাম ত্রিভঙ্গ বাঁকা সুবলের মরম সখা
(আমাদের) রাই বিরহে প্রাণ রাখা।
সুবলের মরম সখা ॥

ব্রজ রাখালের পরাণ

কালিয় দমন শ্যাম, ব্রজ রাখালের পরাণ
ঐ রথে চ'ড়ে আস্‌ছে
কালিয় দমন শ্যাম ঐ রথে চ'ড়ে আস্‌ছে
কালিয় দমন শ্যাম।
ব্রজ রাখালের পরাণ ॥

'শ্রীদাম সুদাম সুবল সখা সুন্দর
চন্দ্রক চারু অবতংস।"
ঐ বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে
আবেশে রামরায় বলে ঐ বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে
দেখ, সখি চেয়ে দেখ, ঐ বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে
ঐ বিনোদ বায়ে বিনোদ বরিহা *
ঐ বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

* 'বরিহা'। মানে ময়ুর পুচ্ছ।

মুরছি পড়ে ভূমিতলে
ঐ চূড়ার দোলন দেখে মদন, মুরছি পড়ে ভূমিতলে

ঐ মকর কুণ্ডল দোলে
যুগল কর্ণে ঐ মকর কুণ্ডল দোলে

কুণ্ডল দোলে গো
মকরাকৃতি কুণ্ডল দোলে গো

মুখ ব্যাদন ক'রে দোলে
ঐ মকরাকৃতি কুণ্ডল মুখ ব্যাদন ক'রে দোলে
মনোমীন গিলিবে ব'লে মুখ ব্যাদন ক'রে দোলে
মনোমীন গিলিবে ব'লে

বরজ ললনার
মনোমীন গিলিবে বলে

"(শিখি) চন্দ্রক চারু অবতংস।
গোবর্দ্ধন ধর ধরনী সুধাকর"

আসছে ব্রজের গিরিধারী
ধরিতে গোপীর বিরহ গিরি আসছে ব্রজের গিরিধারী
"গোবর্দ্ধন ধর ধরনী সুধাকর"

ব্রজাকাশে উদয় হ'ল
বরজ সুধাকর ব্রজাকাশে উদয় হ'ল
লীলামৃত রসপূর, বরজ সুধাকর ব্রজাকাশে উদয় হ'ল

ব্রজাকাশে উদয় হ'ল

সুধা পিয়াইবে ব'লে ব্রজাকাশে উদয় হ'ল
উপবাসী গোপীর আঁখি চকোরে

সুধা পিয়াইবে বলে
ব্রজাকাশে উদয় হলো।

"গোবর্দ্ধন ধর ধরণী সুধাকর
মুখরিত মোহন বংশ।"

বেণূবাদন পর

নব কৈশোর নটবর বেণূবাদন পর
গোপবেশে বেনুকর
নব কৈশোর নটবর,

ঐ আস্ছে প্রাণের রাধারমণ

আবেশে রামরায় বলে ঐ আস্ছে প্রাণের রাধারমণ

যে বেনু বাজাইত

ধীর সমীরে যমুনাতীরে যে বেনু বাজাইত
বংশী-বট তটে যে বেনু বাজাইত
বংশীবট তটে, ধীর সমীরে, যমুনা নিকটে যে বেনু বাজাইত

বেনু বাজায় গো

মধুর পঞ্চম তানে বেনু বাজায় গো

ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে বেণু বাজায় গো
বংশীবট হেলনে বেণু বাজায় গো

বেণু বাজায় গো।
চৌদ্দভুবন আকর্ষিত ॥

যোগী যোগ ভুলে গো
মুনিজনার ধ্যান টলে যোগী যোগ ভুলে গো

(হয়) সচল অচল, অচল সচল

পবনের গতি রোধ হয়

গিরিরাজ চলে গো
পবন স্থির হয় গিরিরাজ চলে গো

(হয়) সচল অচল, অচল সচল

তরল কঠিন, কঠিন তরল সচল অচল, অচল সচল
(হয়) তরল কঠিন, কঠিন তরল

যমুনার জল ঘন হয়
পাষাণ গলিয়া যায় যমুনার জল ঘন হয়

(হয়) তরুলতা পুলকিত
মুরলীর গানে তরুলতা পুলকিত

(হয়) পুষ্পিত ফলিত
নব নব ফল ফুলে পুষ্পিত ফলিত
(হয়) শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত
মুরলীর গানে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত

যমুনা উজান চলে
মোহন মুরলী রোলে যমুনা উজান চলে
উত্তাল তরঙ্গ ছলে নেচে নেচে উজান চলে

মকর মীন নাচে গো
যমুনার জলে হেলে দুলে মকর মীন নাচে গো

যমুনার জলে হেলে দুলে।
মোহন মুরলী রোলে॥

মকর মীন নাচে গো
ত্যজি নিজ কুলে গো
ধায় কাননে ব্রজ কামিনী ত্যজি নিজ কুলে গো

প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ ব'লে।
ধায় কাননে ব্রজ কামিনী॥

"মুখরিত মোহন বংশ॥
কালিয়া দমন গমনজিত কুঞ্জর
কুঞ্জরচিত রতি রঙ্গ॥"

অপ্রাকৃত নবীন মদন
সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ — অপ্রাকৃত নবীন মদন
মন্মথের মন-মথে
চড়ি গোপীর মনোরথে — মন্মথের মন-মথে

আবেশে রামরায় বলে
ঐ আস্‌ছে ব্রজের মন্মথ
গোপীর মনোরথ পূরাইতে — ঐ আস্‌ছে ব্রজের মন্মথ

ঐ রথে চড়ে আস্‌ছে
অপ্রাকৃত নবীন মদন

কেলিরস বিনোদিয়া
নাগর রসিয়া — কেলিরস বিনোদিয়া

কেলিরস তৎপর
রাসরসিকবর — কেলিরস তৎপর

কেলিরস ভূপতি
ঐ হেলে দুলে আস্‌ছে — কেলিরস ভূপতি

শৃঙ্গাররসময় মুরতী
কেলিরস ভূপতি ॥

আবেশে রামরায় বলে
ঐ রথে চড়ে আস্‌ছে

শুনি রামরায়ের বাণী

শ্রীগৌরাঙ্গ গুণমণি, শুনি রামরায়ের বাণী

কিশোরী আবেশে ভোরা

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার কিশোরী আবেশে ভোরা

(আ মরি) নীলাচলে জগন্নাথ রায়
গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যায়
অপরূপ রথের সাজনী
তাহে চড়ে যায় যদুমণি
দেখিয়া আমার গৌরহরি

এই রথের আগে দাঁড়াইয়া

কিশোরী ভাবে ভোরা গোরা এই রথের আগে দাঁড়াইয়া
"দেখিয়া আমার গৌরহরি
নিজগণ লইয়া এক করি
মাল্য চন্দন গলে দিয়া
জগন্নাথ নিকটে যাইযা"

সাজ্‌ল সবে নবোল্লাসে

দেখিয়া গৌরের কিশোরী আবেশে সাজ্‌ল সবে নবোল্লাসে

"মাল্য চন্দন গলে দিয়া।
জগন্নাথ নিকটে যাইয়া॥"

পরিকর ঘেরা গৌরহরি

যেন সহচরী মাঝে রাইকিশোরী পরিকর ঘেরা গৌরহরি

যেন সহচরী মাঝে ভানুদুলারী পরিকর ঘেরা গৌরহরি

"মাল্য চন্দন গলে দিয়া।
জগন্নাথ নিকটে যাইয়া॥
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়।

কীর্ত্তন করয়ে গোরারায়॥"

হ'ল পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডলী

শ্রীজগন্নাথের রথ ঘেরি হ'ল পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডলী

সবাই আনন্দে নাচে গায়

রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়।
সবাই আনন্দে নাচে গায়॥

"রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়।"

সবারই মাঝে গৌর নাচে

"রথে বেড়ি সাত সম্প্রদায়
কীর্ত্তন করয়ে গোরা রায়॥"

(এই) জগন্নাথের রথ ঘিরে

"আজানু লম্বিত বাহু তুলি।
ঘন ঘন হরি বলি॥"

প্রকট হইল ভাবাবলী
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি অঙ্গে প্রকট হইল ভাবাবলী

নাচে গৌরাঙ্গ কিশোরী
এই জগন্নাথের রথের আগে নাচে গৌরাঙ্গ কিশোরী
শ্রীজগন্নাথের বদন হেরি নাচে গৌরাঙ্গ কিশোরী

"ঘন ঘন হরি হরি ধ্বনি।
আন আর কিছুই না শুনি॥"

গগন ভেদি উঠিল রোল

"হরি হরি হরি বোল।
গগন ভেদি উঠিল রোল॥"

"নিতাই অদ্বৈত হরিদাস।
নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস॥"

নিতাই নাচে কাছে কাছে
হেমদণ্ড বাহু পসারিয়ে নিতাই নাচে কাছে কাছে

প্রাণ গৌর ঢ'লে পড়ে পাছে।
(তাই) নিতাই নাচে কাছে কাছে॥

(আজ) সীতানাথ হরি বলে

গৌরহরির বদন হেরে।
সীতানাথ 'হরি' বলে ॥

"নিতাই অদ্বৈত হরিদাস।
নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস ॥"

সবারই মুখে মৃদু হাস
দেখি গোরার ভাবোল্লাস সবারই মুখে মৃদু হাস

"মুকুন্দ স্বরূপ রামরায়।"

বদন পানে চেয়ে আছে
অনিমিখে প্রাণগোরার বদন পানে চেয়ে আছে
ভাব জেনে গান ক'রবে ব'লে বদন পানে চেয়ে আছে

ভাবনিধি প্রাণগৌরাঙ্গের, ভাব জেনে গান কর'বে ব'লে
বদন পানে চেয়ে আছে
বদন পানে চেয়ে আছে

"মুকুন্দ স্বরূপ রামরায়।
মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায় ॥"

ভাব অনুকূল গান ক'রে
ভাবনিধির মরম জেনে, ভাব অনুকূল গান ক'রে
চেয়ে রসের বদন পানে, ভাবনিধির মরম জেনে
ভাব অনুকূল ক'রে গানে

সবে নিযুক্ত নিজ সেবায়

ভাব অনুকূল রস গায়　　　　সবে নিযুক্ত নিজ সেবায়

"মুকুন্দ স্বরূপ রামরায়।
মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায়॥

(গায়) গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ।
যার গানে অধিক সন্তোষ॥

বসু রামানন্দ নরহরি।
গদাধর পণ্ডিত আদি করি॥"

তারা আস্বাদিছে নব মাধুরী

দেখে. কিশোর হ'য়েছে কিশোরী—

জগন্নাথের বদন হেরি,　কিশোর হ'য়েছে কিশোরী

তারা আস্বাদিছে নব মাধুরী

"বসু রামানন্দ নরহরি।"

আস্বাদিছে নরহরি

কিশোরীর প্রেম-মাধুরী　　　　আস্বাদিছে নরহরি

(বলে,) কি মাধুরী মরি মরি!

বলিহারি যাই কিশোরী,　　　　কি মাধুরী মরি মরি

বলিহারি যাই কিশোরী

নাগরে কৈলি নাগরী—　　　　বলিহারি যাই কিশোরী

"বসু রামানন্দ নরহরি।
গদাধর পণ্ডিত আদি করি॥"

আস্বাদিছে গদাধর

কাছে থেকে বদন চেয়ে আস্বাদিছে গদাধর

কি শোভা হ'য়েছে মরি মরি

বঁধু আমার বরণ ধরি কি শোভা হ'য়েছে মরি মরি

গদাধর পণ্ডিত আদি করি ॥
দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস ।
যা সবার গানেতে উল্লাস ॥

এই মত কীর্ত্তন নর্ত্তনে ।
কতদূর করিলা গমনে ॥

গৌর নাচে হেলে দুলে

পরাণ বঁধু পাইনু বলে ।
গৌর নাচে হেলে দুলে ॥

"আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল

আগে নাচাইয়ে নিজ জনে

"আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল ।
সাত সম্প্রদায় সব একত্র করিল ॥

উদ্দণ্ডনৃত্যে প্রভু ছাড়িয়া হুঙ্কার ।
চক্র ভ্রমি ভ্রমে যেন আলাত আকার ॥"

আবেশে নাচে গোরা রায়

হুঙ্কার গর্জ্জন করি আবেশে নাচে গোরা রায়

আলাত-চক্রের প্রায়।
আবেশে নাচে গোরা রায়॥

"নৃত্যে যাঁহা যাঁহা পড়ে প্রভুর পদতল।
সসাগরা শৈলমহী করে টলমল॥"

ধরনী টল্‌মল্‌ করে

শ্রীগৌরাঙ্গ পদভরে ধরনী টল্‌মল্‌ করে

(ধরনী) টলমল হয় প্রেমার ভরে।
প্রাণ গৌরাঙ্গ হৃদে ধ'রে॥

(ধরনী) টলমল হয় প্রেমার ভরে

"ধরনী প্রেমার ভরে টলমল হয়।
যাঁহা পদ পড়ে ধরু পঙ্কজ হিয়ায়॥"

ধরনী হৃদয় কমল বিছায়ে দেয়

গৌর-পদকমল ধর'বে ব'লে, ধরনী হৃদয় কমল বিছায়ে দেয়

("ধরনী) হৃদয় কমল বিছায়ে দেয়।
গৌর-পদ-কমল ধ'রবে বলে॥"

"নৃত্যে যাঁহা যাঁহা পড়ে প্রভুর পদতল।
সসাগরা শৈল-মহী করে টলমল॥

স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য ।
নানাভাব বিকার তাহে গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥"

স্বর্ণবর্ণ হ'ল বিবর্ণ
জগন্নাথের বদন চেয়ে স্বর্ণবর্ণ হ'ল বিবর্ণ

গৌর অঙ্গে হইল বিকাশ
নানা ভাবাবলী গৌর অঙ্গে হইল বিকাশ
জগন্নাথের বদন চেয়ে গৌর অঙ্গে হইল বিকাশ

যেমন নাচে তেমনি গায়

অপরূপ রথ আগে—
"নাচে গোরা রায় সবে মেলি গায়
কত শত মহাভাগে ॥

ভাবেতে অবশ কি রাতি দিবস
আবেশে কিছু না জানে ।

জগন্নাথ মুখ হেরি মহাসুখ
নাচে গর গর মনে ॥"

বলে, পাইনু বংশীবদনে
"রথে জগন্নাথ হেরি বলে, পাইনু বংশীবদনে
নাচে গর গর মনে ॥"

'খোল করতাল কীর্ত্তন রসাল
ঘন ঘন হরিবোল।

জয় জয় ধ্বনি, সুর নর মুনি,
গগনে উঠিল রোল ॥

নীলাচলবাসী, আর নানা দেশী
লোকের উথলে হিয়া।"

আজ সবার আনন্দিত মন
দেখি গোরার প্রেম সংকীর্ত্তন আজ সবার আনন্দিত মন

(তারা) প্রেম পাথারে সবাই সাঁতারে
ভাবনিধি গৌরাঙ্গ হেরে প্রেম পাথারে সবাই সাঁতারে

"নীলাচলবাসী, আর নানাদেশী,
সবার উথলে হিয়া।
প্রেমের পাথারে সবাই সাঁতারে
দুখী যদু অভাগিয়া ॥"

দুখী যদু অভাগিয়া
সবাই গেল প্রেমে মাতিয়া দুখী যদু অভাগিয়া
গৌর লীলা না দেখিয়া দুখী যদু অভাগিয়া

আনন্দের পাথার ব'য়ে যায় রে
রথযাত্রায় এই নীলাচলে, আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

"চৌদিকে মহান্ত মেলি করয়ে কীর্ত্তন কেলি
সাত সম্প্রদায় গায় গীত রে"

ভাবনিধির ভাব জেনে
"সাত সম্প্রদায় গায় গীত রে।"

ভাবনিধির ভাবের অনুকূলে
প্রেমস্বরে গান করে সকলে, ভাবনিধির ভাবের অনুকূলে
গান করে গৌরগণ সকলে, ভাবনিধির ভাবের অনুকূলে

"সাত সম্প্রদায় গায় গীত রে।"

"বাজে চতুর্দ্দশ খোল, গগনে উঠিল বোল
দেখি জগন্নাথ আনন্দিত রে॥"

জগন্নাথ আনন্দে বিভোর
কীর্ত্তন নটন দেখে জগন্নাথ আনন্দে বিভোর

আজ জগন্নাথ আনন্দিত
দেখি শচীসুত ভাবভূষিত আজ জগন্নাথ আনন্দিত
(দেখি) গৌর কিশোরী ভাবে অলঙ্কৃত,
আজ জগন্নাথ আনন্দিত
দেখি জগন্নাথ আনন্দিত রে॥"

"উনমত নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র"

আনন্দ আর ধরে না
আজ প্রভু নিতাই চাঁদের আনন্দ আর ধরে না

আজ প্রভু সীতানাথের আনন্দ আর ধরে না
ভাবনিধির ভাববিকার হেরে আনন্দ আর ধরে না

"উনমত নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র
পণ্ডিত শ্রীবাস ভক্তভূপ রে।

এ সবারে সঙ্গে করি মাঝে নাচে গৌর হরি'

ভুবন মঙ্গল গৌর নাচে
হরি হরি বোল ব'লে ভুবন মঙ্গল গৌর নাচে

"এ সবারে সঙ্গে করি মাঝে নাচে গৌরহরি,
ভকত মণ্ডলী চারিপাশ রে॥

হরি হরি বোল বলে পদ-ভরে মহী টলে"

আনন্দ আর ধ'রে না রে
ভাগ্যবতী ধরনীর আনন্দ আর ধ'রে না রে
ভাবনিধি হৃদে ধ'রে আনন্দ আর ধরে না রে

নয়নে বহয়ে অশ্রুধার রে

"প্রেমের তরঙ্গ রঙ্গ, সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ'
তাহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার রে॥

ভাবাবেশে গোরারায়, নাচিতে নাচিতে যায়,
ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ রে॥"

আর রথ চলে না রে

হ'ল জগন্নাথ অচল, রথও অচল   আর রথ চলে না রে

হ'ল জগন্নাথ বিমোহিত

হেরি ভাবে ভোরা শচীসুত   হ'ল জগন্নাথ বিমোহিত

কেন জগন্নাথ বিমোহিত ?

অনুভব কর ভাই রে-   কেন জগন্নাথ বিমোহিত ?

অনুভব কর ভাই রে

মিলেছে অনুকূল ঠাঁই   অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরু চরণ হৃদে ধ'রে   অনুভব কর ভাই রে

"রাধা-ভাবে দেখে গোরা 'জগন্নাথে বংশীধারী'।
গৌরাঙ্গে জগন্নাথ হেরে 'যুগল মাধুরী' ॥"

অনুভব কর ভাই রে

অনুভব নাই নন্দ-নন্দনের

আপনার মাধুরী   অনুভব নাই নন্দ-নন্দনের

(দর্পণে) দেখি নিজ প্রতিবিম্ব

আপন মাধুরীতে আপনি মুগ্ধ

তাহে রাধা সঙ্গে অধিক মাধুরী

সে তো কখনও দেখে নাই   তাহে রাধা সঙ্গে অধিক মাধুরী

আজ সেই মাধুরী দেখে মুগ্ধ
আপনার গৌরাঙ্গ স্বরূপে   আজ সেই মাধুরী দেখে মুগ্ধ

"(তাই) ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ রে।"
কেমন ক'রে চ'ল্‌বে বল
আপনিই হ'ল অচল

জগন্নাথ ডুবে গেল
গৌর স্বরূপে যুগল মাধুরী হেরে.   জগন্নাথ ডুবে গেল
মাধুর্য্যামৃত পারাবারে,—   জগন্নাথ ডুবে গেল

কেমন ক'রে চল্‌বে বল ?
(হল) রথ অচল, রথী অচল,   কেমন ক'রে চল্‌বে বল ?

রথ রথী হ'ল অচল
ভাবনিধি গৌরাঙ্গ হেরে.   রথ রথী হ'ল অচল

আজ জগন্নাথে করিল লুব্ধ
গৌরাঙ্গ স্বরূপে   আজ জগন্নাথে করিল লুব্ধ

আজ জগন্নাথ আত্মহারা
দেখি ভাবোল্লাসে ভোরা গোরা   আজ জগন্নাথ আত্মহারা
আজ জগন্নাথ বিমোহিত

দেখি রাই-কানু একীভূত
জগন্নাথ বিমোহিত ॥

আজ তাই মুগ্ধ জগন্নাথ
দেখি নিজ স্বরূপ রাধানাথ আজ তাই মুগ্ধ জগন্নাথ

"আজ ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ রে
"আনন্দ-বিস্ময়-মন দেখি প্রেম-সংকীর্ত্তন"
নীলাচলনাথ জগন্নাথ রে

আনন্দ-বিস্ময়-মন দেখি প্রেম-সংকীর্ত্তন
নিজ পরিকরগণ সাথে রে।
দূরে গেল দুঃখ শোক প্রেমায় ভাসিল লোক
সবাই আনন্দে বিহ্বল
দেখি 'রথে' **অচল** 'পথে' **সচল** সবাই আনন্দে বিহ্বল

আনন্দের পাথার ব'য়ে যায় রে
শ্রীরথযাত্রায় এই নীলাচলে আনন্দের পাথার ব'য়ে যায় রে
আজ নীলাচলবাসী আত্মহারা
দেখি 'সচল' 'অচল' চিতচোরা
—আজ নীলাচলবাসী আত্মহারা

"দূরে গেল দুঃখ শোক, প্রেমায় ভাসিল লোক,
স্থাবর জঙ্গম পশু পাখী রে ॥"

সবাই হইল সুখী
'সচল' 'অচল' মুরতি দেখি সবাই হইল সুখী

মধুর গৌরাঙ্গ লীলা

এই রথযাত্রায় নীলাচলে মধুর গৌরাঙ্গ লীলা

এই জগন্নাথের রথের আগে মধুর গৌরাঙ্গ লীলা

নাচে শচীনন্দন দেখে রূপ-সনাতন

নাচে শচীনন্দন

এই জগন্নাথের রথের আগে নাচে শচীনন্দন

গৌর নাচে রাধাভাবে।

এই জগন্নাথের রথের আগে ॥

আ'মরি নাচে শচীনন্দন

নাচে শচীনন্দন দেখে রূপ সনাতন

দেখে রূপ সনাতন

মহারাস বিলাসের পরিণতি দেখে রূপ সনাতন

মূরতিমন্ত প্রেমে বৈচিত্র্য দেখে রূপ সনাতন

নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ দেখে রূপ সনাতন

মিলনে দুই রসের খেলা দেখে রূপ সনাতন

মিলনে, মিলা অমিলা রসের খেলা দেখে রূপ সনাতন

(আমরি) দেখে রূপ সনাতন

শ্রীরাধা-প্রেমের কত বল, তাই দেখে রূপ সনাতন

শ্রীরাধা প্রেমের কত বল

নাগরে নাগরী কৈল শ্রীরাধা প্রেমের কত বল

(মুগ্ধ) রূপ সনাতন চিত

দেখে মূরতীমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য (মুগ্ধ) রূপ সনাতন চিত

দেখে রূপ সনাতন
"গান করে স্বরূপ দামোদর।"
ভাবনিধির ভাব জেনে
'অনুকূল রস' ক'রে গানে ভাবনিধির ভাব জেনে
"গান করে স্বরূপ দামোদর।"

গায় রায় রামানন্দ, মুকুন্দ মাধবানন্দ,
বাসু ঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর ॥

প্রভুর দক্ষিণ পাশে নাচে নরহরি দাসে
বামে নাচে প্রিয় গদাধর।

নাচিতে নাচিতে প্রভু, আওলাইয়া পড়ে কভু"
পরাণ নাথ পাইনু ব'লে
কিশোরী আবেশে গৌরাঙ্গ নাচে, পরাণ নাথ পাইনু ব'লে
"বলে এই সে পরাণ নাথ পাইনু।
যা লাগি মদন-দহনে দহি মৈনু ॥"

এই সে আমার পরাণ বঁধু
আমি যার লাগি ঝুরে মরি, এই সে আমার পরাণ বঁধু

"নাচিতে নাচিতে প্রভু, আওলাইয়া পড়ে কভু,
আবেশে ধরয়ে দোঁহার করে।

শ্রীনিত্যানন্দ মুখ হেরি, বলে পঁহু হরি হরি
না জানি, কি অভাবে করে 'হায়'

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
সঙরি শ্রীবৃন্দাবন, প্রাণ করে উচাটন,"

যেন পেয়েছে নব বৃন্দাবনে
আজ সেই ভাবে ভোরা গোরা যেন পেয়েছে নব বৃন্দাবনে

রথে জগন্নাথ দেখি, যেন পেয়েছে নব বৃন্দাবনে
প্রভাস মিলনে, যেন পেয়েছে নব বৃন্দাবনে

পেয়েও আশ মিটিছে না

"(বলে) সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম হে।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন হে ॥"

বলে বঁধু তোমায় পেলাম বটে
পেয়েও আশা মিটিল না
বঁধু তোমায় পেলাম বটে পেয়েও আশা মিটিল না

যদি কৃপা করে করাও উদয়
ব্রজের জীবন ব্রজাকাশে যদি কৃপা করে করাও উদয়

তবে সাধ পূর্ণ হয় কৃপা করে করাও উদয়

"সঁঙরি শ্রীবৃন্দাবন, প্রাণ করে উচাটন,
আবেশে ধরয়ে রায়ের করে ॥

বলে, 'ওগো প্রাণ সহচরি
তোর করে ধরে মিনতি করি
ব্রজে ল'য়ে চল বংশীধারী তোর করে ধরে মিনতি করি'
ল'য়ে চল বংশীধারী

হোক্ আনন্দ ব্রজপুরী ল'য়ে চল বংশীধারী

কিশোরী ভাবেতে ভোরা
প্রাণ গৌরাঙ্গ আমার কিশোরী ভাবেতে ভোরা

ভাবোল্লাসে মত্ত হ'য়ে
নিজগণ সঙ্গে ল'য়ে ভাবোল্লাসে মত্ত হয়ে
নাচিতে নাচিতে যায়
ভাবোল্লাসে গোরা রায় নাচিতে নাচিতে যায়।

উপনীত গুণ্ডিচার দ্বারে

জগন্নাথের শ্রীমন্দির হইতে গুণ্ডিচাবাড়ার দরজা পর্য্যন্ত নাতি দীর্ঘ পথ, এই ভাবে অপরূপ গমন নৃত্য ও কীর্ত্তন রঙ্গে রথারূঢ় জগন্নাথ ও পথে মল্লবেশে মধুর নৃত্য কীর্ত্তনে উন্মাদ সগোষ্ঠী গৌরহরি উপনীত হইলেন।

'অল্প ভাগ্যে শ্রীচৈতন্য গোষ্ঠী নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বস চৈতন্য গোসাঞী।'

—চৈতন্য ভাগবত

গুণ্ডিচা বাড়ীর দরজায় ঃ—

(গৌরহরি ও জগন্নাথ)

প্রেমস্বরে বলে গোরা
গুণ্ডিচার দ্বারে জগন্নাথ পেয়ে প্রেমস্বরে বলে গোরা
জগন্নাথের বদন চেয়ে প্রেমস্বরে বলে গোরা
ব্রজে কৃষ্ণ পেলাম মেনে প্রেমস্বরে বলে গোরা

কিশোরী আবেশে গৌরাঙ্গ বলে
জগন্নাথের বদন চেয়ে কিশোরী আবেশে গৌরাঙ্গ বলে

বহুদিন পর বঁধুয়া এলে দেখা না হইত পরাণ গেলে

দেখা না হইত পরাণ গেলে
বেঁচে আছি তাই দেখ্‌তে পেলাম্
ঐ অলকা আবৃত বদন বেঁচে আছি তাই দেখ্‌তে পেলাম্

ঐ মূরলী রঞ্জিত বদন বেঁচে আছি তাই দেখ্‌তে পেলাম্

ঐ হাসিয়া বাঁশিয়া বদন বেঁচে আছি তাই দেখ্‌তে পেলাম্

প্রাণ আছে তাই দেখ্‌তে পেলাম্
তোমার অদর্শন বিরহেতে প্রাণ আছে তাই দেখ্‌তে পেলাম্

"দেখা না হইত পরাণ গেলে।
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।"

তোমার কোন দোষ নাই বঁধু
সকলই আমার করমের দোষ, তোমার কোন দোষ নাই বঁধু

"দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ?"

পরাণ বঁধু তুমি ভাল তো ছিলে ?
আমার যা ছিল তাহ'ল কপালে
পরাণ বঁধু তুমি ভাল তো ছিলে ?

"সে সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমারই কুশলে কুশল মানি ॥"

(বঁধু) তোমার সুখেই আমার সুখ
আপন দুখে মানি না দুখ (বঁধু) তোমার সুখেই আমার সুখ

"তোমারই কুশলে কুশল মানি।
এত যে সহিল অবলা ব'লি ॥"

আমার ভাবনিধি গৌরাঙ্গ বলে
(আমার) গৌরাঙ্গ-কিশোরী বলে
এই জগন্নাথের বদন চেয়ে (আমার) গৌরাঙ্গ-কিশোরী বলে

এই গুণ্ডিচার দ্বারে, জগন্নাথের বদন চেয়ে
কিশোরী আবেশে গৌরাঙ্গ বলে
ভাসি দু'টি নয়ন জলে কিশোরী আবেশে গৌরাঙ্গ বলে

"এত যে সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥"

অবলা ব'লে এতই সইল
ফেটে যেত হ'লে শৈল— অবলা ব'লে এতই সইল

"ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে"

(এখন) "গগনে উদয় করুক চন্দ"

আর তো আমি ভয় করি না
আমার গকুলচাঁদ পেয়েছি ঘরে, আর তো আমি ভয় করি না

গগন চাঁদ তুমি উদয় হও রে
যত কলা থাকে বিকাশ ক'রে গগন চাঁদ তুমি উদয় হও রে

"গগনে উদয় করুক চন্দ।
মলয় পবন বহুক মন্দ॥"

মলয় পবন মন্দ বও রে
আমার মদনমোহন এল ঘরে, মলয় পবন মন্দ বও রে

"মলয় পবন বহুক মন্দ।
কোকিলা আসিয়া করুক্ গান।
ভ্রমরা ধরুক্ পঞ্চম তান॥"

আর তো আমি ভয় করি না
কোকিলের কুহু স্বরে আর তো আমি ভয় করি না

বড় দুঃখ দিয়েছে মোরে
পরাণ বঁধু ছিল না ঘরে বড় দুঃখ দিয়েছে মোরে
আর তো আমি ভয় করি না
(আর) ভয় করি না কুহু স্বরে

মদনমোহন এল ঘরে (আর) ভয় করি না কুহু স্বরে

"বাসুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥"

সকল দুঃখ দূরে গেল
ব্রজের জীবন ব্রজে এল সকল দুঃখ দূরে গেল
কিশোরী আবেশে গৌরাঙ্গ বলে
রামরায়ের করে ধ'রে কিশোরী আবেশে গৌরাঙ্গ বলে

**"কি কহব রে সখি! আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"**

কি কব আনন্দ ওর
গৌরাঙ্গ কিশোরী বলে, কি কব আনন্দ ওর

**"চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল॥"**
—গগনে উদয় হ'য়ে

"পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল।
পিয়া মুখ হেরইতে তত সুখ ভেল।"

আমার সকল দুঃখ দূরে গেল
পরাণ বঁধুর চাঁদ বদন হেরে, আমার সকল দুঃখ দূরে গেল

পিযা-মুখ হেরইতে তত সুখ ভেল ॥

আঁচল ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তবু হাম্ পিয়া দূর দেশে না পাঠাই ॥

শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষের বা.
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥"

শুন শুন মরম সই
গৌরাঙ্গ কিশোরী বলে, শুন শুন মরম সই
স্বরূপ রামরায়ের গলা ধরি বলে, শুন শুন মরম সই
মরম কথা তোমারে কই, শুন শুন মরম সই

"শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥"

আর আমার কেবা আছে
আমার বলিতে ব্রজমাঝে, আর আমায় কেবা আছে
আমার শ্যাম বঁধু বিনে, আর আমার কেবা আছে

"বরিষার ছত্র পিয়া দরিযায় না।
ভনযে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সুজনক দুঃখ দিন দুই চারি॥"

গৌরাঙ্গ কিশোরী বলে
বলে, দুখের নিশি পোহাইল
পোহাইল দুখের নিশি
হিযায ধ'রে কালশশী পোহাইল দুখের নিশি

কিশোরী আবেশে গৌরাঙ্গ বলে
স্বরূপ রামরাযের কর ধরি,
কিশোরী আবেশে গৌরাঙ্গ বলে

'ও ললিতে। ও বিশাখে।'
তোদের করজোড়ে মিনতি করি, ও ললিতে। ও বিশাখে।

যেন কেও কিছু বলিস্ না গো
'বঁধু বিদেশে গিয়াছিল' ব'লে যেন কেও কিছু বলিস্ না গো

ঐ দেখ, আগেই মুখ হ'যেছে মলিন,
যেন কেও কিছু বলিস্ না গো
আগেই মুখ মলিন হযেছে

কেও কিছু বল্‌বি বলে আগেই মুখ মলিন হযেছে
যেন কেউ কিছু বলিস্ না গো

বঁধুর কোন দোষ নাই গো
সকলই আমার কপালের দোষ, বঁধুর কোন দোষ নাই গো

ও ললিতে ! ও বিশাখে !
সবে কর মঙ্গল আচরণ
'ব্রজ-মঙ্গল' ব্রজে এল সবে কর মঙ্গল আচরণ

দাঁড়াও সবে সারি সারি
নিজ নিজ যুথ সঙ্গে করি, দাঁড়াও সবে সারি সারি
নিকুঞ্জের পথে পথে, দাঁড়াও সবে সারি সারি

আইলা নিকুঞ্জ বিহারী দাঁড়াও সবে সারি সারি

মনোমন্দিরে শ্রীগুরু আনুগত্যে লীলা চিন্তনে শ্রীরামদাস-

কিশোরী ভাবাবেশে ভোরা গোরা
এই গুণ্ডিচার দ্বারে, কিশোরী ভাবাবেশে ভোরা গোরা

শ্রীরাধাভাবে ভোরা গোরা
রথারূঢ় জগন্নাথ হেরে, শ্রীরাধাভাবে ভোরা গোরা

এই তো সেই জগন্নাথ
এই সেই রথযাত্রা, এই তো সেই জগন্নাথ

এই সেই জগন্নাথ
এই সেই গুণ্ডিচার দ্বার, এই সেই জগন্নাথ

কোথায় আমার প্রাণ গোরা ?
কিশোরী ভাবেতে ভোরা কোথায় আমার প্রাণ গোরা ?

কিশোরী ভাবেতে ভোরা, কোথায় আমার প্রাণ গোরা ?

আজ একবার দেখা দাও
কোথায় আমার প্রাণগোরা আজ একবার দেখা দাও

এই গুণ্ডিচার দ্বারে একবার দেখা দাও ।
আজ একবার দেখা দাও
বড় আশা ক'রে এসেছি মোরা আজ একবার দেখা দাও
হা গৌর ! প্রাণ গৌর ! আজ একবার দেখা দাও

একবার দেখাও হে
কোথায় স্বরূপ রামরায় ! একবার দেখাও হে
বড় আশা ক'রে এসেছি মোরা একবার দেখাও হে

শ্রীগৌড় মণ্ডল হ'তে, বড় আশা ক'রে এসেছি মোরা

একবার দেখাও হে
কোথায় আছ প্রভু রূপ সনাতন ! একবার দেখাও হে

কোথায় দাঁড়াইয়ে ভোগ করিছ ?
মধুর গৌরাঙ্গ বিহার কোথায় দাঁড়াইয়ে ভোগ করিছ ?
প্রেম-বৈচিত্ত্য লীলা কোথায় দাঁড়াইয়ে ভোগ করিছ ?

(আমাদের একবার দেখাও হে

কোথায় আছ আমার প্রভু নিতাই !

(আমাদের) একবার দেখাও হে

(তোমাদের) প্রাণ গৌর ল'য়ে কোথায় আছ

(আমাদের) একবার দেখাও হে

একবার দেখাও হে

কোথায় আছ সীতানাথ ! একবার দেখাও হে

কোথায় আছ ঠাকুর নরহরি ! একবার দেখাও হে

সবাই তো এসেছ

ত্রিকাল সত্য লীলায় সবাই তো এসেছ

প্রাণ গৌর দেখ্‌তে নীলাচলে সবাই তো এসেছ

প্রভু নিতাই অদ্বৈত সঙ্গে সবাই তো এসেছ

গৌর ল'য়ে কোথায় বিহরিছ ?

আমাদের একবার দেখা দাও

বড় আশা ক'রে এসেছি মোরা, আমাদের একবার দেখা দাও

কোথায় আছ আমার পাগ্‌লা প্রভু ?

গৌর ল'য়ে কোথা বিহরিছ ?

কোথায় আছ আমার পাগ্‌লা প্রভু ?

কোথায় আছ প্রাণের রাধারমণ ?

নিতাই-গৌর প্রেমের পাগল,

কোথায় আছ প্রাণের রাধারমণ ?

কোথা বা বিহরিছ ?

তোমার পরাণ নিতাই গৌর ল'যে কোথা বা বিহরিছ ?

আমরা কত না খুঁজলাম্

এই নীলাচলে এসে অবধি আমরা কত না খুঁজলাম্

আমরা কত না খুঁজেছি

'কাশী-মিশ্রালযে' গিয়ে আমবা কত না খুঁজেছি

'ভক্ত সম্মিলন দিনে' আমবা কত না খুঁজেছি

আমবা কত না ডেকেছি

একবাব দেখা দাও ব'লে, আমবা কত না ডেকেছি

দেখা পাই নাই কেঁদে ফিবেছি

আবাব আশায বুক বেঁধেছি

নিশ্চয়ই দেখ্‌তে পাব ব'লে, আবার আশায় বুক বেঁধেছি

আশায বুক বেঁধে গেছি

(শ্রীরাঘবের) ঝালি সমর্পনের দিন আশায় বুক বেঁধে গেছি

তাই নিশ্চযই দেখ্‌তে পাব

দেখ্‌তে পাব প্রাণ শচীদুলালে

রাঘবেব ঝালি সমর্পনকালে দেখ্‌তে পাব প্রাণ শচীদুলালে

কৈ দেখতে তো পেলাম না

কেঁদে কেঁদে কত ডাক্‌লাম কৈ দেখতে তো পেলাম না

একবারদেখা দাও ব'লে কেঁদে কেঁদে কত ডাক্‌লাম
দেখিতে তো পেলাম না

কারও দেখা পেলাম না
গণসনে প্রাণ গৌরাঙ্গের, কারও দেখা পেলাম না
কেঁদে কেঁদে ফিরে এলাম, কারও দেখা পেলাম না

আবার প্রাণে আশা জাগ্‌ল
কাল নিশ্চয় দেখতে পাব
'গুণ্ডিচা মার্জ্জন কালে'— কাল নিশ্চয় দেখ্‌তে পাব
এই আশায় বুক বেঁধে
এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে
গুণ্ডিচা মার্জ্জন সম্ভার সঙ্গে ক'রে,
—এলাম আমরা ভাই ভাই বলে

দেখলাম সবেই উনমত
সহস্র সহস্র নরনারা দেখলাম সবেই উনমত
'করে সম্মার্জ্জনী' 'কাঁকে কুম্ভ' দেখলাম সবেই উনমত

সকলেই আনন্দে মাতা
আমি মনে মনে ভাবিলাম
এরা গৌর দেখেছে
আমি কেবল নিরানন্দ
কারও দেখা পেলাম না
যারে দেখ্‌তে নীলাচলে এলাম, তার দেখা তো পেলাম না।

গুণ্ডিচা মার্জ্জন শেষ হ'ল
প্রাণ গৌর দেখ্‌তে পেলাম না
কেঁদে কেঁদে ফিরে গেলাম প্রাণ গৌর দেখ্‌তে পেলাম না

আবার আশা বুকে জাগ্‌ল
আজ নিশি পরভাতে, আবার আশা বুকে জাগ্‌ল

আজ নিশ্চয় দেখ্‌তে পাব
এই জগন্নাথের রথের আগে আজ নিশ্চয় দেখ্‌তে পাব
চিতচোরা প্রাণগোরা আজ নিশ্চয় দেখ্‌তে পাব
কিশোরী ভাবিত মতি চিতচোরা প্রাণগোরা
আজ নিশ্চয় দেখতে পাব

"(হায়রে) নীলাচলে যব মঝু নাথ
দেখিব আপনে জগন্নাথ
রামরায় স্বরূপ লইয়া
নিজভাব কহে উখাড়িয়া

হায়রে মোর কি হইব হেন দিনে
সে লীলা কি দেখিব নয়নে ॥"

(হায়) আমি কি দেখ্‌তে পাব
(হায়রে) "মোর কি এমন দশা হব
সে কথা শ্রবণে শুনিব ॥"

হায় আমি কি শুন্‌তে পাব
সে হৃৎকর্ণরসায়ণ কথা হায় আমি কি শুন্‌তে পাব

এই আশায় বুক বেঁধে
এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে
পাগলা প্রভু ! তোমায় হৃদে ধরে,
এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

আজ একবার দেখা দাও
যদি নিজ গুণে এনেছ টেনে আজ একবার দেখা দাও

নিতাই গৌর প্রেমের পাগল আজ একবার দেখা দাও

বহুদিন তো দেখি নাই
একবার দেখা দাও
এই জগন্নাথের রথের আগে একবার দেখা দাও
প্রাণ নিতাই গৌর ল'যে একবার দেখা দাও
কীর্ত্তন নটন রঙ্গে একবার দেখা দাও

পাগলা প্রভু দেখা দাও
নিতাই গৌরাঙ্গ ল'য়ে পাগলা প্রভু ! দেখা দাও

—প্রাণে প্রাণে স্ফূরণ করাও
ভাবোল্লাসে মিলন রঙ্গ, প্রাণে প্রাণে স্ফুরণ করাও

প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও
জগন্নাথ নন্দনন্দন সনে, ভাবোল্লাসে মিলন-রঙ্গ
প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও

জগন্নাথ নন্দনন্দন সনে গৌরকিশোরীর মিলন রঙ্গ

—প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও
প্রাণে প্রাণে গাই মোরা
ভাই ভাই ভাই মিলে, প্রাণে প্রাণে গাই মোরা

"গৌরাঙ্গ রাধা জগন্নাথ শ্রীনন্দনন্দন।
গুণ্ডিচা নিকুঞ্জবনে, দোঁহাকার হ'ল মিলন॥"

গৌরকিশোরী মিলিল রঙ্গে
জগন্নাথ নন্দনন্দন সঙ্গে।
গৌরকিশোরী মিলিল রঙ্গে॥

"গুণ্ডিচা নিকুঞ্জবনে, দোঁহাকার হ'ল মিলন॥"

গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল॥

নবম তরঙ্গ

নিতাই প্রসঙ্গে ঃ

(কোন এক বারের ঘটনা)

জগৎজীবন গৌরসুন্দর এবং তাঁহার ভাবমণ্ডলের অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দকে গৌড়দেশেই প্রচার কার্য্যে (অবিচারে আচণ্ডালে অকাতরে শ্রীহরি উন্মুখ চিত্তবৃত্তি করিবার জন্য প্রেমদান লীলায়) পাঠানোর সময় রঙ্গিয়া রসিয়া গৌরহরি আদেশ করিয়াছিলেন—

'প্রতি বর্ষে তুমি নীলাচলে আস্‌বে না। কারণ, নদীয়া নীলাচল গমনাগমনে বহু সময় লাগ্‌বে, ফলে, প্রচার কার্য্যে ক্ষতি হবে।'

কিন্তু স্বাভাবিক প্রেমের স্বভাবে, নিতাইচাঁদ গৌরহরিকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না। প্রকাশ্য ভাষায় এই 'মানা' কিন্তু 'বুকে উৎকণ্ঠা বাড়ান'। নিগূঢ় গৌর-লীলার অনুভবী মহাজন তাই লিখিয়াছেন—

"নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য ইচ্ছায়।"

আবার মহাজনের এই বাক্যটিকে 'সম্পূর্ণ' ও 'প্রস্ফুটিত' করিয়াছেন শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়—

সে এক পা চলিতে নারে

গৌর যার হৃদে আছে — সে এক পা চলিতে নারে

গৌর ইচ্ছা না হইলে — সে এক পা চলিতে নারে

তাইতে প্রভু মানা করে

প্রাণ ধ'রে সদাই টানে — তাইতে প্রভু মানা করে

"নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য ইচ্ছায়।"

নিতাইচাঁদের গমন ভঙ্গিটিও 'ত্রিকাল সত্য লীলার অনুভবি দ্রষ্টা' শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনের অক্ষরে ধরা আছে। যথা—

"চলিল গৌর প্রেমের পাগল
মুখে 'গৌর' 'গৌর' নয়নে জল, চলিল গৌর প্রেমের পাগল
প্রাণ গৌর দেখ্‌ব ব'লে চলিল গৌর প্রেমের পাগল"

———

এইরূপে আসিতে আসিতে পুরীধামের অদূরে 'কমলপুর' গ্রাম, যেখান হইতে জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে আসিয়া অবর্ণনীয় প্রেমোৎকণ্ঠায় 'হা প্রাণ শচীনন্দন' বলিয়া নিতাইচাঁদ মূর্চ্ছিত হইলেন।

'কমলপুরেতে আসি প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া॥'

কিছুক্ষণ পরে, নিরবধি নয়নে প্রেমের ধারা এবং প্রেমস্বরে, 'ঐ ত মন্দির দেখা যায়,' 'গৌর তুমি কোথায় আছ'? এই কথা বলিতে বলিতে 'নিতাই' আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক পুষ্পবৃক্ষের উদ্যানে গোপনে রহিলেন।

এখানে প্রসঙ্গত আমরা উল্লেখ করি যে, অতিগূঢ় নিতাইচাঁদের সমগ্র লীলায় দেখা যায়—

১। 'নিজ সেব্য নিতাই ধনে—গৌর রাখিতে চান গোপনে'

২। নিতাই গৌরের যখন যখন মিলন হয় তখন অন্য কেহ সেখানে থাকে না।

পূর্ব্বাপর সকল মহাজনরাই বলিয়াছেন—নিতাই চৈতন্য অভিন্ন। লীলা বা বিহার জন্য তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন। এবং তাঁহাদের দুইজনার মর্ম্ম তাঁহারা ছাড়া অন্যে জানিতে পারে না। তাই নিতাইচাঁদ নীলাচলে আসিয়া গোপনে থাকিলে কি হয়, প্রীতির টানে গৌরহরি তাহা বুঝিতে পারিলেন। স্বরূপ আদি সঙ্গী ও সেবকবর্গকে গম্ভীরায় রাখিয়া তিনি একেশ্বর চলিলেন। যে পুষ্পোদ্যানে ধ্যানানন্দে নিতাই আছেন সেই স্থানে গৌরহরি শুভ বিজয় করিলেন। তিনি দেখিলেন চাঁদ নিতাই ধ্যানস্থ! অশেষ বিশেষে নিজেকে ভোগ করাই গৌর স্বরূপের স্বভাব। **'নিজ পরিক্রমায় কি মাধুরী'** এই অশ্রুতপূর্ব্ব ভোগলালসা গৌরহরির চিত্তকে চঞ্চল করিল। তিনি—

"শ্লোক বন্দে নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণিয়া"

ঐ ধ্যানানন্দে অবস্থিত নিতাইচাঁদকে পরিক্রমা করিতে লাগিলেন।

গৌরহরি পরম করুণাময় স্বভাবে নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে জীব জগতকে সাবধান করা হইয়াছে যে—

লীলার স্বাভাবিক গতিতে 'লীলা' সঙ্কোচ ও প্রসারতা লাভ করে। ভবিষ্যতে 'লীলার' আবরণমুখী গতিতে নিত্যানন্দ শক্তিতে আবরণের বহিপ্র্রকাপ নানান্ ভাবে দেখা যাবে।

নিতাই নিজ হৃদয়ে গৌরকে সর্ব্বদাই ধারণ করিয়া আছেন। ধ্যানানন্দ অবস্থাতেও গৌর তাঁহার বক্ষে আছেন। সুতরাং গৌরহরি (বিশেষ ভোগের লালসায়) যখন তাঁহাকে পরিক্রমা করিতেছেন, তিনি তাহা অনুভব করিয়া প্রথমে পরম সম্ভ্রমে "হরি" "হরি" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন। পরে—

গৌরহরির 'ইচ্ছা' ও 'ক্রিয়া' শক্তি নিতাই তাঁহাকে অধিক উল্লাস দিবার জন্য—

'দুই জনে প্রদক্ষিণ করেন দোঁহারে।
দুহে দণ্ডবৎ হই পড়েন দুহারে॥'

দুইজনেই ভাবতরঙ্গে টলটল। গৌরাঙ্গ হৃদয়ে নিতাই আর নিতাই হৃদয়ে গৌর। **কে কা'র উপাস্য?** কিছুক্ষণ পরে লীলার সঞ্চারি শক্তি স্বভাবে দুইজনই প্রেম আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। এ আলিঙ্গন রাই-কানুর ভাব বিগ্রহের একীভূত স্বরূপের 'মহাভাব' ও 'প্রেমরসের' মিলন। আবার কিছুক্ষণ পরে উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই পরমানন্দে গড়াগড়ি যাইতেছেন। মহামত্ত সিংহের গর্জ্জনকে তুচ্ছ করিয়া উভয়েই গর্জ্জন করিতেছেন। পর মুহূর্ত্তেই নিজ নিজ মহিমা জানাইবার জন্য দুইজনেই দুইজনকে জোড়হস্তে নমস্কার করিতে .ছন। কোন শাস্ত্রে বর্ণনা নাই এইরূপ অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, বিবর্ণ উভয়ের শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ পাইতে লাগিল। অতঃপর গৌরহরি জোড় হস্তে নিত্যানন্দের স্তুতি করিলেন। এই সব স্তুতির কিছু অংশ তাঁহার একান্ত জন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাবাজী মহাশয়ের আখর সমন্বিত কীর্ত্তন সামান্য নীচে কিছু বিধৃত হইয়াছে. যথা—

জগতে জানায় রে
নিত্যানন্দ স্তুতি ছলে — জগতে জানায় রে
তাঁর অতি গূঢ় নিত্যানন্দ — জগতে জানায় রে

প্রাণে প্রাণে ধর ভাই
শ্রীগুরু চরণ হৃদে ধরে' — প্রাণে প্রাণে ধর ভাই
অপরূপ রহস্য কথা — প্রাণে প্রাণে ধর ভাই

শ্রীমুখে বলেছেন গৌরহরি

"নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।"

আপন কথা বলেছেন

ইঙ্গিতেতে গৌরহরি আপন কথা বলেছেন

আমার নামের রূপ মানি

তোমার রূপ আমার রূপ মানি, আমার নামের রূপ মানি।

"শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত॥

যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গ অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ অবতার॥"

ভক্তিযোগ অবতীর্ণ

তোমার পরশে নিজেরে করিতে ধন্য ভক্তিযোগ অবতীর্ণ

"স্বর্ণ-মুক্তা-রূপা-কাঁসা-রুদ্রাক্ষাদি রূপে।
নববিধা-ভক্তি ধরি আছে নিজসুখে॥"

তোমার শ্রীঅঙ্গে মূর্ত্তিমান

ভক্তি বল্‌তে যার নাম তোমার শ্রীঅঙ্গে মূর্ত্তিমান

তোমার অঙ্গ সেবা করে

অলঙ্কার রূপ ধ'রে তোমার অঙ্গ সেবা করে

ভক্তিযোগ অবতার

তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার ভক্তিযোগ অবতার

'নীচ জাতি পতিত অধম যত জন।
'তোমা' হৈতে সভার হইল বিমোচন॥'

নিতাই তোমার অবতার

উদ্ধারিতে পতিত সবার নিতাই তোমার অবতার

পতিতের বন্ধু তুমি
ওহে নিতাই গুণমণি পতিতের বন্ধু তুমি

এমন কার প্রাণ কাঁদে?
ওহে নিতাই তুমি বিনে এমন কার প্রাণ কাঁদে?
পতিত দুর্গতি দেখে এমন কার প্রাণ কাঁদে?

তোমা হ'তে রক্ষা হল
আমার প্রতিজ্ঞা তোমা হ'তে রক্ষা হল

"যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর-সিদ্ধ-মুনি-যোগেশ্বরে॥

'স্বতন্ত্র' করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কহে।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়ে॥"

তোমার হাতে বেচা কেনা
কৃষ্ণ পরতত্ত্ব সীমা তোমার হাতে বেচা কেনা
ব্রজের সেই কালসোনা তোমার হাতে বেচা কেনা

"তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার ?
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস অবতার ॥"

জানাইছেন নিজ গুণে

অতিগূঢ় নিতাই ধনে জানাইছেন নিজ গুণে

কেমনে বা জান্‌বে আনে ?

যদি গৌর না জানায় নিজ গুণে, কেমনে বা জান্‌বে আনে ?

আজ জানাইছেন নিজ গুণে

গৌরহরি নিজ নিতাই ধনে আজ জানাইছেন নিজ গুণে

নিত্যানন্দ স্তুতি ছলে আজ জানাইছেন নিজ গুণে

তুমি বট 'নিত্যানন্দ'

কৃষ্ণরস মূর্ত্তিমন্ত, তুমি বট নিত্যানন্দ

বিহরিছে মূরতি ধ'রে

কৃষ্ণরস যারে বলে বিহরিছে মূরতি ধ'রে

ওহে নিতাই তোমা-রূপে বিহরিছে মূরতি ধ'রে

আবরণ দিয়ে বল্‌ছেন

এ যে অতি গোপনকারী লীলা আবরণ দিয়ে বল্‌ছেন

আপন স্বরূপের রহস্য কথা আবরণ দিয়ে বলছেন

তুমি 'আমার' রসের অবতার

ওহে ও নিতাই আমার, তুমি আমার রসের অবতার

" 'বাহ্য নাহি জান' তুমি সঙ্কীর্ত্তন সুখে
অহনিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে ॥

কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর ।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ বিলাসের ঘর ॥"

আপনি ত বলবে না
আপনার মহিমা আপনি ত বলবে না

ইঙ্গিতেতে বলছেন প্রভু
আমার ক্রীড়ার বসতি ভূমি
নিতাই তোমার স্বরূপ খানি আমার ক্রীড়ার বসতি ভূমি

আজ জানাইছেন নিজ গুণে
ভাগ্যবান কলিজীবে আজ জানাইছেন নিজ গুণে
নিতাই মহিমা বর্ণন ছ'লে আজ জানাইছেন নিজ গুণে

প্রাণ নিত্যানন্দ কলেবর
আমার গূঢ় বিলাসের ঘর, প্রাণ নিত্যানন্দ কলেবর

"অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে ।
সত্য সত্য প্রভু কৃষ্ণ না ছাড়েন তারে ॥"

ইঙ্গিতে বলেন গৌরহরি
সেই'ত প্রীতি করে আমারে
নিতাই তোমারে যে প্রীতি করে, সেই'ত প্রীতি করে আমারে

আমি বাঁধা তারি প্রেম-ডোরে

তোমারে যে প্রীতি করে আমি বাঁধা তারি প্রেম-ডোরে

আমার হাতে সে পড়েছে

যে তোমারে প্রীতি করেছে আমার হাতে সে পড়েছে

আত্ম প্রশংসা শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া নিতাইচাঁদ বলিতেছেন—

'আমি একান্ত ভাবে 'তোমার'। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে একমাত্র তোমার সুখই আমার কাম্য। তুমি আমাকে প্রদক্ষিণ কর, কিম্বা নমস্কার কর কিম্বা মার কিম্বা রাখ বলার কিছু নাই। তুমি 'প্রভু', আমি 'দাস'। তোমার নিজ কৌতুকে যেমন নাচাও তেমনি নাচি।'

ইহার পর উভয়ে

"বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া"

কিছুক্ষণ পরমানন্দে অতিবাহিত হইলে পর নিতাইচাঁদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৌরহরি নিজ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং চাঁদ নিতাই জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া টোটা গোপীনাথে গমনপূর্ব্বক পণ্ডিত গদাধরের বাসায় গমন করিলেন।

— — —

গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রসঙ্গে (১)

"প্রতি বর্ষে আইসে, সঙ্গে রহে চারি মাস।
তাহা সবা লৈয়া প্রভুর বিবিধ বিলাস॥"

কিছু আভাস :

গৃহস্থ আশ্রমে থাকিযাও এবং স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, প্রতিষ্ঠাব মধ্যে মন ডুবিযা থাকিলেও যে ভগবৎ স্মরণ মননে চিত্তকে ফিরাইতে পারা যায়—এ পন্থা, আদর্শ স্থাপন গৌরহরির প্রবর্ত্তিত পথে এক অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব দান। এই ভাবে শ্রীহরি ভজনের পরম চরম আদর্শ স্থাপন করিযাছেন নদীযাবাসী ভক্তবৃন্দ দ্বারা। নদীযাবাসী ভক্তবৃন্দ গৌরহরির সুখের জন্যই সংসারী। তাঁহারা মনে প্রাণে জানেন যে তাঁহারা গৌরহরির 'দাস'। তাঁহাদের সংসারের সকলেই গৌরহরির আশ্রিত। তাহাদের সেবাই তাঁহাদের 'ভজন'।

গৃহস্থ ভক্তের কথা শুনহে সবাই
পদ্ম পত্রে থাকে জল তব লাগে নাই।'

তৎকালে গৌড়দেশ হইতে নীলাচলের পথ সুদূর। পদব্রজে সেই পথ অতিক্রম ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না বলিযাই মনে হয়। প্রতিটি প্রদেশের রাজতন্ত্র তখন ভিন্ন ভিন্ন। হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যের পথ দিযাই গতাযাত। সুতরাং সেই গতাযাতও ছিল একটি দুরূহ ব্যাপার। আজ তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারিব না। সেই অবস্থায় কতখানি প্রীতির টান থাকিলে, এইরূপ দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, সে কার্য্যও বিংশতি বর্ষব্যাপী একটানা।

কিন্তু প্রতি বর্ষেই গৌরভক্তবৃন্দ সোল্লাসে (এই) যাতাযাত

করিতেন। আবার, তাঁহারা (নদীয়াবাসী গৌরভক্তবৃন্দ) কোন কোন বৎসরে স্ত্রী পুত্রের সহিতও আসিতেন।

সেই 'দিব্য' প্রীতির সংবাদটি অনুভব করা ভিন্ন অনুমান করাই যায় না।

'বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি।'

—চৈঃ চঃ মধ্য ১ম

এই গৌড়দেশবাসী ভক্তবৃন্দের গতায়াতের দীর্ঘ দিন ছাড়া চারি মাস কাল নীলাচলেই গৌরহরির সঙ্গে তাঁহারা যাপন করিতেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের প্রতি দিনের কার্য্য—

(১) নরেন্দ্র সরোবর কিম্বা ইন্দ্রদ্যুম্নে জলকেলি। (ইতিপূর্ব্বে গুণ্ডিচামার্জ্জন দিনের কৃত্যের একটি কৃত্যরূপে সে লীলারঙ্গ বর্ণনা হইয়াছে।)

(২) এই চারি মাস কাল একশত বিংশতি জনে ভাগ করিয়া লইতেন। ইহাতেও অনেকে ফাঁকি পড়িলেন দেখিয়া পরামর্শ করিয়া এক এক দিনে দুই তিন জনে গৌরহরিকে নিমন্ত্রণ করিবার অধিকার পাইতেন।

"আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যত দিন।
এক এক দিন করি পড়িল বণ্টন॥

একজন নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মেলি।
এই মত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কেলি॥"

এই যে প্রভুর **নিত্য নিমন্ত্রণ কেলি**,—ইহা এক একটি বৃহৎ **মহামহোৎসব**। যিনি গৌরহরিকে নিমন্ত্রণ করেন তাঁহার (নীলাচল ও নদীয়ার) ভক্তবৃন্দও সেই সঙ্গে নিমন্ত্রিত হন। যে ভক্তের

বাড়ীতেই উৎসব হউক না কেন, গোবিন্দ, 'রঘুনাথ', রামাই আদি গৌরগোষ্ঠীর সেবকবৃন্দ সেই সব নিমন্ত্রণকারীদের সর্ব্ববিধ সেবা সহায়তা করেন। কেহ জগন্নাথদেবের প্রসাদান্ন আনয়ন করিয়া মহোৎসব করেন, কেহ বা গৃহে সমস্ত দ্রব্য পাক করিয়া মহোৎসব করেন।

"একেক দিন একেক ভক্ত গৃহে মহোৎসব,
প্রভু সঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্ত সব ॥'

'কেহ ঘরভাত করে, কেহ প্রসাদান্ন
এই মত বৈষ্ণবগণ করে নিমন্ত্রণ ॥'

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৪শ

(৩) (প্রায় প্রত্যহই) গৌরহরি চারি সম্প্রদায় লইয়া মধুর নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন। তিনি মধ্যস্থলে এবং তাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে কীর্ত্তন সম্প্রদায়। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অশ্রু, কম্প, পুলক, প্রস্বেদ প্রভৃতি অশ্রুত, অজ্ঞাত প্রেমের বিকার দর্শনে ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে আত্মহারা হইতেন। তিনি মাঝে মাঝে হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন। তাঁহার কোমল কমল নয়নদ্বয় দিয়া পিচকারীর ধারার মত প্রেমাশ্রু ধারা নির্গত হইত; তাহাতে চতুর্দ্দিকের ভক্তবৃন্দ সিঞ্চিত হইয়া যেন স্নানের বারিতে সিক্ত হইতেন।

অপূর্ব্ব! অদ্ভুত! অথচ ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা।

কখন কখনও শ্রীমন্দিরের পশ্চাতে রহিয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিতেন। যথা—

'বেড়া নৃত্য করি প্রভু করি কথোক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন ॥

উচ্চৈঃস্বরে চারিদিকে চারি সম্প্রদায়।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌর রায়॥'

—চরিতামৃত

অনেকক্ষণ এইভাবে নিজে উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া তিনি এক স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইতেন। পরে চারিজন মহাত্মকে চারি সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতে আদেশ দিতেন। সাধারণতঃ অদ্বৈতপ্রভু প্রথম সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতেন। নিতাইচাঁদ দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে, তৃতীয় সম্প্রদায়ে বক্রেশ্বর এবং চতুর্থ সম্প্রদায়ে শ্রীবাস পণ্ডিত। এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যস্থলে ভুবন-মোহন-মূর্ত্তিতে তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কখন কখন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইত। যথা—

"চারিদিকে নৃত্যগীত করে যত জন।
সবে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন॥"

আবার নৃত্য করিতে করিতে যিনি গৌরহরির সম্মুখে আসেন তিনি তাঁহাকে সপ্রেম গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করেন। প্রত্যহ এইভাবে মহাসংকীর্ত্তন বা প্রেমদান লীলা প্রকটিত হয়। যথা—

"মহানৃত্য মহাপ্রেম মহাসংকীর্ত্তন।
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচল জন॥"

—চরিতামৃত

গৌড়ায় ভক্তবৃন্দ প্রসঙ্গে (২)

(নৈমিত্তিক উৎসব)

(ক)

'কৃষ্ণ জন্মযাত্রাতে প্রভু গোপাবেশ কৈল।
দধি ভার বহি তবে লগুড় ফিরাইল॥'

—চরিতামৃত মধ্য ১ম

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীর মধ্য রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি—প্রখ্যাত 'জন্মাষ্টমী'। পুরীধামে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিশেষ ধূমধাম হয়। জন্মাষ্টমীর পরের দিন 'নন্দোৎসব'। পরবর্ত্তী সময়ে শারদীয়া দুর্গাপূজা যেমন একটি সর্ব্ব ভারতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে—নন্দোৎসবও সেইরূপ একটি সর্ব্ব ভারতীয় প্রখ্যাত (বৈষ্ণবীয়) উৎসব।

'নন্দোৎসবের দিন' গৌরহরি সু-মনোহর গোপবেশ ধারণ করিতেন। তাঁহার নদীয়া ও নীলাচলের ভক্তবৃন্দেরও গোপবেশ। দাস রঘুনাথও ইঁহাদের মধ্যে ষোড়শ বর্ষব্যাপী ছিলেন।

"গোপবেশ হৈল প্রভু লঞা ভক্ত সব"

গৌরহরি অপূর্ব্ব গোপবেশধারী এবং তাঁহার সমস্ত ভক্তবৃন্দের স্কন্ধে দধি দুগ্ধের ভার, হস্তে যষ্ঠী এবং মস্তকে মনোরম পাগড়ী। সকলেরই বদনে মধুর 'হরি' 'হরি' ধ্বনি। এই সুমধুর ভঙ্গীতে সকলে—

"মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি হরি হরি॥"

—চরিতামৃত

মহোৎসবের স্থানটি যে কোথায়, তাহা গ্রন্থে অনুল্লিখিত। অনুমান করা যায় যে, কানাই খুটিয়া কিম্বা জগন্নাথ মাইতি ইঁহাদের কাহারও বাড়ীতে হইত।/উড়িষ্যা দেশবাসী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবক কানাই খুটিয়া। ইনি নন্দ রাজার বেশে সজ্জিত। জগন্নাথ মাইতি অপর এক ভক্ত মা যশোদার বেশে সজ্জিত। মহারাজ প্রতাপরুদ্র, রাজগুরু কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, তুলসী পাত্র (জগন্নাথের প্রধান পাণ্ডা), অদ্বৈত আচার্য্য, নিতাইচাঁদ, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ অপরূপ গোপবেশে সজ্জিত হইয়া উৎসবোচিত আবেশে আবিষ্ট। সকলেই প্রেমে উন্মত্ত। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-

লীলা কীর্ত্তন হইতেছে। পবিত্র দধি ও হরিদ্রার জলে সকলে পুনঃ পুনঃ স্নাত হইতেছেন। রঙ্গিয়া গৌরহরি গোপবেশে বিচিত্র বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন। অদ্বৈতপ্রভু তাঁহার সম্মুখেই অদ্ভুত ভঙ্গীতে কটিদেশ দুলাইয়া নৃত্য করিতেছেন। আর গৌরহরির শ্রীবদনের শোভা দেখিতেছেন। একবার উভয়ের চারি চক্ষুর মিলন হইল। অদ্বৈতপ্রভু হাসিয়া গৌরহরিকে বলিলেন—

"রাগ করিও না। 'গোপ' সাজে তোমাকে অতি মনোরম দেখাইতেছে। যদি তুমি গোয়ালার মত লগুড় ফিরাইতে পার তবে বুঝিব তুমি প্রকৃতই গোয়ালার ছেলে।" যথা—

'অদ্বৈত কহে সত্য কহি, না করিহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ॥'

—চরিতামৃত

সচল জগন্নাথ গৌরহরির মনের অভিলাষ জানিয়াই যেন অদ্বৈত-প্রভু এই কথা বলিয়াছেন। কারণ, তাঁহার বাক্য শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি প্রকাণ্ড লগুড় হস্তে তুলিয়া লইয়া পাকা লাঠিয়ালের মত অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত তাহা ঘুরাইতে লাগিলেন। দেখাদেখি নিতাই সোনাও আর একখানি লগুড় লইয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। এই কৌতুক রঙ্গ কি মধুর তাহা দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়া রাখিয়াছেন। যথা—

'তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা॥

'শিরের উপরে' 'পৃষ্ঠে' 'সম্মুখে' 'দুই পাশে'।
'পাদ মধ্যে' ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে॥'

'আলাত চক্রের ন্যায়' লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায় ॥'

—চরিতামৃত

সকলে পরম আশ্চর্য্য হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের এই মধুর লীলারঙ্গ দেখিতেছেন। সমাগত ভক্তবৃন্দ এবং নীলাচলবাসী দর্শকবৃন্দ সকলেই "অদ্বৈত আচার্য্যের জয়" এই বলিয়া উচ্চ জয়ধ্বনিতে পরিবেশটি আরও অধিক মাধুর্য্যময় করিলেন। এ জয়গান যথোচিত। কারণ, তাঁহারই করুণায় (সকলের) এই লীলা দর্শন সৌভাগ্য ঘটিল। রাই-কানুর ভাব বিগ্রহের মিলিত স্বরূপ 'গৌরহরি'। অনঙ্গ বলরামের ভাব এবং গৌরের অভিন্ন তনু হইতেছেন 'শ্রীনিত্যানন্দ'। তাই, মিতবাক্ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"কে বুঝিবে তাঁহা দোঁহার গোপ ভাব গূঢ়"

মহারাজ প্রতাপরুদ্র এই 'নন্দোৎসবে' প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয়ে অপর্য্যাপ্ত উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ, ভোজ্য, বস্ত্র প্রভৃতি 'অনর্গল' বিতরণ করেন। ইহা ছাড়া গৌরহরির শ্রীমস্তকে একখানি স্বর্ণখচিত বিচিত্র বহুমূল্য পট্টবস্ত্র বাঁধিয়া দেন। আবার, উৎসবে যোগদানকারী ভক্তবৃন্দের মস্তকেও মনোরম ও মূল্যবান বস্ত্র বাঁধিয়া দিয়া নিজে কৃতকৃতার্থ হন। কানাই খুটিয়া এবং জগন্নাথ মাইতি উভয়েই সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহারা নন্দ মহারাজ ও ব্রজেশ্বরীর পূর্ণ আবেশ পাইয়াছেন। অদ্ভুত প্রেমাবেশ ও স্বাভাবিক বাৎসল্য ভাবে তাঁহাদের গৃহে যাহা কিছু ছিল এই মধুর উৎসব উপলক্ষে সকলই দীন দুঃখীদের দান করিলেন। 'গোপবেশ বেণুকর গৌরসুন্দর' মনোরম বেশ ও অপরূপ আবেশে পিতা মাতা-র (প্রতীক) জ্ঞানে পরম সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাদের শ্রীচরণে প্রণত হইলেন।

"পিতা মাতা জ্ঞানে দোঁহার নমস্কার কৈল" •

কানাই খুটিয়া ও শিখি মাইতি প্রেমানন্দে আত্মহারা, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য,—তাঁহারা প্রণতঃ গৌরহরিকে অপত্যাজ্ঞানে শিরশ্চুম্বন ও কোল দিলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র দত্ত বহুমূল্য পট্টবস্ত্র শ্রীমস্তকে বাঁধা অবস্থায় গম্ভীরার গুপ্তনিধি গৌরহরি প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে রাজ পথের মধ্য দিয়া বাসায় আসিলেন। তিনি যে সন্ন্যাসী, কৌপীন ও কন্থা যে তাঁহার সম্বল—বহুমূল্য পট্টবস্ত্র যে তাঁহার স্পর্শ করিতেও নাই,—বিষয়ীর দত্ত বস্তু তাঁহার যে গ্রহণ করিতে নাই—ইহা প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভুর মনে একবার ধারণাও হইল না। লোকচক্ষে ইহা যে সন্ন্যাসীর অগ্রাহ্য তাহাও বুঝিতে পারিলেন না।

নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ গৌরহরির "শ্রীকৃষ্ণ" আবেশ ও তদনুকূল বিচিত্র বিচিত্র মধুর লীলাবলী বহুবার নবদ্বীপ-লীলায় দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সে সব লীলায় এত মাধুর্য্য বিকাশ পায় নাই।

নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণ-বিরহিনী গৌরাঙ্গের কিশোরীর আবেশে বিচিত্র বিচিত্র লীলা নিত্যই দর্শন করেন। কিন্তু, আজ সেই রাই-কানুর আশ্‌ মিটান স্বরূপ গৌরহরির "কৃষ্ণ" আবেশ ও মন-প্রাণ-মাতান মধুর লীলা দর্শনে তাঁহারা অবর্ণনীয় অপার আনন্দ লাভ করিলেন।

শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের 'নন্দোৎসব কীর্ত্তন' যে সব ভাগ্যবান পাঠক ও ভাগ্যবতী পাঠিকা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের বুকে গাঁথা আছে যে,—ঐ কীর্ত্তনে নন্দোৎসব দিনের 'ব্রজলীলা' এবং 'ব্রজ-লীলার আশ্‌ মিটান গৌরলীলা'—এই উভয় লীলাই এক অপরূপ ভিয়ানে প্রকট হইত। বাণীর ভাণ্ডারে ভাষা নাই যাহা দ্বারা সে 'মাধুর্য্যের' কোন দিক্‌ দর্শন করা যায়।

(খ)
'বিজয়া দশমী'

প্রত্যেক ভারতবাসীর বিশেষতঃ প্রত্যেক বাঙ্গালীর "বিজয়া দশমী" তিথি সারা বৎসরের কামনার ধন। তাঁহাদের রুচি ও আশয় হইতে গৌরহরির অনুভব সু-গূঢ় ও সু-মধুর। কেবলমাত্র গৌর-রসের-রসিক বৈষ্ণববৃন্দ আজও নিজ নিজ গুরু, গৌরাঙ্গ ও গৌরগণের সুখের অনুভবে দুর্গাপূজা উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া আনন্দ লাভ করেন।

এ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর 'কওয়া কথা' আবৃত্তি করিয়া আমরা উপসংহার টানিব। যথা—

"বিজয়া দশমী লঙ্কা বিজয়ের দিনে ;
বানর সৈন্য হৈল প্রভু লৈয়া ভক্তগণে।

হনুমান আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা ;
লঙ্কা-গড়ে চড়ি যেন ফেলায় ভাঙ্গিয়া।"

'কাঁহা রে রাবণা ?'—প্রভু কহে ক্রোধাবেশে ;
'জগন্মাতা হরে পাপী! মারিমু সবংশে'।

এই কয় ছত্র বলার পর তিনি দাস গোস্বামীর অনুভব বর্ণন করিতেছেন—

"গোসাঞির আবেশ দেখি লোক চমৎকার ;
সর্ব্বলোক 'জয় জয়' করে বার বার।।"

নোট :— গৌড়দেশবাসী অভূতপূর্ব্ব ভক্তি-রস-রসিক (প্রায় সকলেই গৃহী) ভক্তবৃন্দ সাধারণতঃ রথযাত্রা হইতে বিজয়া দশমী পর্য্যন্ত নীলাচলে গৌরহরিকে সঙ্গ সুখ দানে উল্লসিত করিয়া নিজেরা

সুখী হইতেন। তাঁহাদের এই অবস্থান কালে যে সব নৈমিত্তিক উৎসব এই গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই তাহাদের মধ্যে প্রখ্যাত কয়টি নীচে উদ্ধৃত হইতেছে—

(১) **শ্রীগুরু পূর্ণিমা** (শ্রীগুরুপূজা ও আদিগুরু ব্যাসদেবের আরাধনা উৎসব) আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন এই সু-রসাল উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইত।

(২) **ঝুলন পূর্ণিমা** (ব্রজবিহারী কৃষ্ণ ও নদীয়া-বিহারী গৌর-হরির ঝুলনলীলা মহোৎসব রঙ্গ) শ্রাবণ শুক্লা প্রতিপদ হইতে শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই লীলা অনুষ্ঠান হইত।

(৩) ঠাকুর হরিদাস নির্য্যান—ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যানের পর প্রতি বৎসর ভাদ্র শুক্লা চতুর্দ্দশীর দিন এই স্মরণ মহামহোৎসবটি পরম আবেশে অনুষ্ঠিত হইত।

'ঈশ্বরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরও সেই মত তিথির চরিত্র ॥'

পুনরুল্লেখ বাহুল্য যে, 'আমাদের রঘুনাথ' এই সব লীলার শুধু দ্রষ্টা ও সক্রিয় পার্ষদই নন, তাঁরই অনুভব সমূহ কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে অক্ষররূপে মূর্ত্তি ধরিয়াছে।

————

দশম তরঙ্গ

'শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর'

(শকাব্দ ১৪৪৩।৪৪ হইতে ১৪৫৫ পর্য্যন্ত)

এই পরিচ্ছেদে বর্ণনীয় প্রসঙ্গাবলী—

(১) ঐতিহাসিক ঘটনা—

(২) প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা শ্রীরূপ ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজ নিজ (বিরহ ব্যথা উপশমের উপায় স্বরূপ) স্তবে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩) এ সম্বন্ধে দাস গোস্বামীর অনুভব ও মনোবৃত্তি কবিরাজ গোস্বামীর 'অক্ষরে' ধরা আছে, যথা—

"প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর*।
বুঝিতে না পারি যাহা, বর্ণিতে কে পারে?
সেই বুঝে বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥"

(৪) 'প্রথম চিত্র', 'দ্বিতীয় চিত্র', এইরূপ দশম চিত্র পর্য্যন্ত দশটি অনুপরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) এই পরিচ্ছেদে বর্ণনীয় প্রসঙ্গাবলী পাঠের কাঠিন্য অপনোদন জন্য সর্ব্ব প্রথমে একটি 'উদ্ঘাটন (১, ২, ৩, ৪, ৫) দেওয়া হইতেছে।

---

* ধীর—ধীর, শান্ত, অচঞ্চল, স্বসুখ বাসনামূলক কামাদি নাই বলিয়া যাহার চিত্তে চঞ্চলতা নাই। একমাত্র ভগবৎ চরণে যাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট তিনিই **ধীর**।

উদ্ঘাটন

(১)

অষ্ট সাত্বিক ভাব ঃ

স্তম্ভ ঃ হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ ও অমর্ষ হইতে 'স্তম্ভ' উৎপন্ন হয়। ইহাতে বাক্যাদিশূন্যতা, নিশ্চলতা, শূন্যতাদি জন্মে। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া লোপ পায়।

স্বেদ ঃ হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি বশতঃ শরীরে কম্পন জন্য রস ধাতুর বিকার নির্ঝরকে 'স্বেদ' বলে।

রোমাঞ্চ ঃ আশ্চয্য বস্তুর দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি বশতঃ রোমাঞ্চ হয়। ইহাতে রোম সকলের উদ্গম ও গাত্রসমূহের পরস্পর সংলগ্নতাদি হয়।

স্বরভঙ্গ ঃ বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়। ইহাতে স্বরের বিকৃতি জন্মে। গদগদ বাক্য হয়।

কম্প ঃ ক্রোধ, বিত্রাস ও হর্ষাদি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে যে চাঞ্চল্য হয় তাহাকে কম্প বলে।

বৈবর্ণ ঃ বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি বশতঃ বর্ণ বিকারের নাম বৈবর্ণ।

অশ্রু ঃ হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদি জন্য চক্ষু হইতে জল বাহির হয়। তাহার নাম অশ্রু। হর্ষ জনিত অশ্রু শীতল। ক্রোধ জনিত অশ্রু উষ্ম। কিন্তু সকল অবস্থাতেই চক্ষুর ক্ষোভ, রক্তিমা ও সম্মার্জ্জনাদি থাকে। নাসিকার স্রাব ইহার অঙ্গ বিশেষ।

প্রলয় ঃ সুখ ও দুঃখ বশতঃ চেষ্টাশূন্যতা ও জ্ঞানশূন্যতার নাম প্রলয় বা মূর্চ্ছা। প্রলয়ে ভূমিতে পতন আদি হইয়া থাকে।

এই সব বিকার (স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয়) প্রাকৃত ঘটনা অবলম্বনেও সাধারণ জীবের দেহেও ঘটে। বিশুদ্ধ ভক্তিরসবিদ্‌গণ বলেন—'উহা প্রাকৃতই'।

তবে সাত্ত্বিক 'প্রাকৃত' ভাব হইতেও অপ্রাকৃত সাত্ত্বিক ভাবের অনুভূতি হয়। অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবৎ নাম-রূপ-গুণ-লীলা অবলম্বনে যখন ঐ সব বিকার দেখা যায় তখনই তাহাকে 'সাত্ত্বিক ভাব' বলা হয়।

আধার ভেদে এইসব বিকারের তারতম্য আছে। তাহাদের পর পর ধাপ্‌গুলির নামোল্লেখ মাত্র করা যায়—

শুদ্ধ ভক্তে— ঐ সব বিকার প্রথম স্তরের সাত্ত্বিক ভাব।

নিত্য সিদ্ধগণে— শুদ্ধ ভক্ত হইতে নির্ম্মল

ব্রজ রামাগণে— তাহা হইতেও নির্ম্মল

শ্রীরাধারগণে— তাহা হইতেও নির্ম্মল

শ্রীরাধায়— সু-নির্ম্মল

আর, রাই-কানুর মিলিত ভাব বিগ্রহ গৌরসুন্দরে '**পরম সু-নির্ম্মল**'।

এই 'তথ্য' বা অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের তারতম্যতা বা ক্রমোন্নত অবস্থা স্মরণ রাখিতে হইবে।

পরবর্ত্তী সংবাদ—

দীপ্ত ঃ তিনটি, চারিটি কিম্বা পাঁচটি সাত্ত্বিক ভাব যদি এক কালে অধিকরূপে ব্যক্ত হয় এবং তাহা যখন সম্বরণ করা যায় না তখন তাহাকে দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব বলা হয়।

উদ্দীপ্ত ঃ পাঁচটি কিম্বা সকল সাত্ত্বিক ভাব এককালে ব্যক্ত হইয়া

পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে 'উদ্দীপ্ত' সাত্ত্বিক ভাব বলা হয়।

সুদ্দীপ্ত ঃ উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব যখন সর্ব্বোত্তম আধার শ্রীরাধাতে প্রকাশ পায় এবং তখন যে অনির্ব্বচনীয় পরম উৎকর্ষের প্রকাশ হয় তাহাই সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব।

রাধা-কৃষ্ণের ভাব মিলিত বিগ্রহ গৌরহরির স্বরূপে রাধা ভাবের চরম অবস্থাটি আরও মহনীয়। সুতরাং গৌর-স্বরূপের সুদ্দীপ্ত ভাব মাদনাখ্য মহা ভাববতী শ্রীরাধা অঙ্গে প্রকটিত সুদ্দীপ্ত ভাব হইতে অবশ্যই অধিক অনির্ব্বচনীয়।

(১)

গম্ভীরার গুপ্তনিধি গৌরহরির 'সদাই'

'দিব্যোন্মাদে,'—'ভ্রমময় চেষ্টা' ও 'প্রলাপময় বাক্য'—

এ সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

তিনি কি ভাবে এ সংবাদ পাইয়াছেন ?

তাহা যে দাস গোস্বামীর প্রত্যক্ষ দর্শনের পর তাঁহারই প্রমুখাৎ শ্রুতি বা স্বানুভূতি রূপদান তাহাও কবিরাজ বলিয়াছেন—

'চৈতন্যলীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।'

দিব্যোন্মাদ ঃ—মহাভাব দুই প্রকার 'রূঢ়' ও 'অধিরূঢ়'।

'অধিরূঢ় মহাভাব' আবার দুই প্রকার—'মোদন' ও 'মাদন'।

'মোদন' হ্লাদিনী শক্তির পরমাবৃত্তি : ইহা শ্রীরাধার 'যূথ' ভিন্ন অন্যত্র প্রকটিত হয় না। 'পরিশ্লেষ দশায়' এই মোদনকে 'মোহন' বলে। 'মোহনে' বিরহ বিবশতা বশতঃ সমস্ত সাত্ত্বিকভাব সুদ্দীপ্ত হয়। এই 'মোহন' যখন কোন এক অনির্ব্বচনীয়া বৃত্তি বিশেষ প্রাপ্ত হয়, তখন 'ভ্রম সদৃশী' বৈচিত্রী দশা লাভ করে। তখন ইহাকে 'দিব্যোন্মাদ' বলে।

'উদ্‌ঘূর্ণা' (প্রেম বৈবশ্যের কায়িক বিকাশ) ও 'চিত্রজল্প' (বাচনিক বিকাশ)—ভেদে 'দিব্যোন্মাদ' দশ প্রকার (প্রজল্প, পরিজল্প ইত্যাদি)।

রাই-কানুর ভাবমূর্ত্তি গৌরহরির দিব্যোন্মাদ দশাটি ব্রজলীলায় প্রকটিত মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ দশা হইতেও অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময়।

দিব্যোন্মাদটি প্রাকৃত দেহে অর্থাৎ চিত্ত-বিকারজনিত এবং শোক মোহাদি ঔপসর্গিক বিকারের সাদৃশ্য হইলেও তাহা ব্যাধি। কিন্তু, অপ্রাকৃত উন্মাদ দৈহিক মানসিক ব্যাধি নয়।

প্রাকৃত উন্মাদ, গুণ বিকারের লক্ষণ। সুতরাং প্রাকৃত উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির কোন বিষয়ে চিত্তবৃত্তি নিবেশের ক্ষমতা থাকে না। 'দিব্যোন্মাদ', প্রেমের অনির্ব্বচনীয় গাঢ়তার ফল। প্রাকৃত উন্মাদের কারণ অনুসন্ধানের শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু, দিব্যোন্মাদে অনুসন্ধানী শক্তি নষ্ট হয় না—একই বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। যে যে বিষয়ে এই অনুসন্ধান শক্তির প্রয়োগ থাকে না সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে 'দিব্যোন্মাদগ্রস্ত স্বরূপের আচরণ ভ্রমের ন্যায় প্রতীয়মান হয় মাত্র। বাস্তবিক ইহা 'ভ্রম' নয়।

দিব্যোন্মাদে, যে যে বিষয়ে চিত্তবৃত্তির অভিনিবেশ থাকে না (চিত্তবৃত্তির বাস্তবিক বিবশতা না জন্মিলেও) সেই সেই বিষয় সম্বন্ধীয়

আচরণ যেন চিত্তবৃত্তির বিবশতার ফল বলিয়াই মনে হয়। এই বৈবশ্যকে 'প্রেম বৈবশ্য' বলা হয়। এই মানসিক প্রেম বৈবশ্যের অভিব্যক্তি সাধারণত দুই প্রকার—

'কায়িকী' ও 'বাচনিকী'।

কায়িক বিকাশের নাম 'উদঘূর্ণা' এবং বাচনিক বিকাশের নাম 'চিত্রজল্প।'

(ভাবের বৈচিত্য ভেদে—চিত্রজল্প, প্রজল্প, পরিজল্প প্রভৃতি দশ ভাগে বিভক্ত।)

উদঘূর্ণার দৃষ্টান্ত ঃ

কৃষ্ণ মথুরায়। নিকুঞ্জ অভিসারের কথা রাধার স্মরণ হইল। ঐ স্মরণে চিত্তবৃত্তি এমন গাঢ়ভাবে কেন্দ্রীভূত হইল যে, কৃষ্ণ ব্রজে নাই এ অনুসন্ধান লোপ পাইল (প্রেম বৈবশ্য)। তিনি নিকুঞ্জে অভিসার করিলেন। নিকুঞ্জে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত পুষ্পশয্যা, বনমালা, তাম্বুলাদি নিকুঞ্জ বিলাসের সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করিলেন। প্রেম বৈবশ্যতা বশতঃ এই প্রকার কায়িকী চেষ্টার নাম উদ্‌ঘূর্ণা (ইহা কেবল শ্রীমতী ও গৌরসুন্দরেই বিকশিত)।

চিত্রজল্পের দৃষ্টান্ত ঃ

হরিদাসবর্য্য উদ্ধব ব্রজরামাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত দূত বিষয়ে শ্রীরাধার চিত্তবৃত্তি এমনভাবে কেন্দ্রীভূত হইল যে তাঁহার শ্রীচরণ সান্নিধ্যে একটি ভ্রমর গুঞ্জন করিতে দেখিয়া তিনি সেই ভ্রমরকেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত দূত মনে করিলেন। বাক্-শক্তিহীন বিচারবুদ্ধিহীন একটি ভ্রমর যে দৌত্য কার্য্যের যোগ্য হইতে পারে না এ অনুসন্ধান-শক্তি লোপ পাইল। ভ্রমরকে

শ্রীকৃষ্ণের দূত মনে করিয়া শ্রীরাধা মনের আবেশে অনেক বৈচিত্রী-পূর্ণ বাক্য বলিলেন।

—মেঘদূত কাব্যে মেঘের উদ্দেশের মত।

(এ দৃশ্য দূর হইতে দর্শন করিয়া উদ্ধব বিস্মিত, স্তম্ভিত, মুগ্ধ।)

প্রেম বৈচিত্ত্য ঃ

'প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তি স্তাৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥'

অনুবাদ ঃ প্রিয়জনের নিকটে থাকিয়াও প্রেমের অনির্ব্বচনীয় উৎকর্ষ স্বভাব বশতঃ বিচ্ছেদ বুদ্ধিতে যে পীড়া তাহাকে 'প্রেম-বৈচিত্ত্য' বলে।

ব্রজলীলার এই ভাব (প্রেম বৈচিত্ত্যটি) শ্রীগৌরাঙ্গ দেহেই প্রকাশ পাইয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যেন 'প্রেম বৈচিত্ত্যটিই' মূর্ত্তি-ধারণ করিয়াছে। যথা—

"গৌরাঙ্গ-স্বরূপ,—মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য"

(শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী)

গৌরহরির লীলা পরিকর 'শ্রীখণ্ড গৌরব' শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের বিরচিত পদে—

**"গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়।**

**খেনে খেনে করয়ে বিলাপ।
খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাঁপ॥**

**খেনে ভিতে মুখ শির ঘষে।
কোন নাহি রহু পহুঁ পাশে॥**

খেনে কান্দে তুলি দুই হাত।
কোথায় আমার প্রাণনাথ ॥

নরহরি কহে মোর গোরা।
রাই-প্রেমে হইয়াছে ভোরা ॥"

—পদ কং ১৬৪৩

সুতরাং গৌর-স্বরূপের 'ভ্রমময় চেষ্টা' ও 'প্রলাপময় বাণী' সমূহের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে ব্রজলীলা বর্ণনার অবসরে স্বরূপতঃ স্পৃষ্ট নাই। এবং এ সত্য সংবাদটি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও অনুমোদন করিয়াছেন। যথা—

"লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে* নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসী চূড়ামণি ॥"

—চরিতামৃত মধ্য ১৪শ

(৩)

ব্রজলীলার 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। এই উভয়ের এক অনির্ব্বচনীয় একীভূত ভাবের স্বরূপ প্রকাশ "গৌরহরি"।

'ব্রজলীলার আশ্‌ মিটান লীলা' যে গৌর-লীলা তাহার 'বিষয়' —স্বয়ং গৌরসুন্দর।

এ লীলার সাত্ত্বিকভাব এবং দিব্যোন্মাদাদি ব্রজলীলায় প্রকটিত ভাবাদি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা মাধুর্য্যের অবধি। একমাত্র শ্রীগুরু

---

*শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব কৃত নিখিল ভক্তি গ্রন্থ পাঠের পর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ "শাস্ত্রে নাই শুনি"—প্রকাশ করিয়াছেন।

করুণায় সাত্ত্বিক চিত্তের অনুভববেদ্য। আর, ভাষার যতদূর অবধি তাহার সাহায্যেই কবিরাজ গোস্বামী প্রকাশ করিয়াছেন! যথা—

"প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় 'ধীর'॥

বুঝিতে না পারে যাহা বর্ণিতে কে পারে?
সে-ই বুঝে বর্ণে,—চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥"

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৪শ

(৪)

সু-সংবাদ ঃ—

পরম করুণ অযাচিত কৃপাকারী গৌরহরির লীলাবলীর এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি যে প্রথমে না বুঝুক কোন ক্ষতি নাই। শুনিতে শুনিতে লীলার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, রসের রীতি জানিতে পারিবে এবং চিরঅনর্পিত প্রেমধনে ধনী হইবে। এ এক অপ্রাকৃত অদ্ভুত দান! যথা—

"যেবা নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ
কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি
শুনিলেই হৈবে বড় হিত।"

—চরিতামৃত মধ্য ২য়

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের সমাপ্তির অবসরে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে,

যেমন অতি ক্ষুদ্র রাঙ্গা টুনি পাখী সমুদ্রের একবিন্দু জল পান করিলে তাহার পিপাসা সম্পূর্ণ নিবারিত হয় তিনিও তদ্রূপ অপরূপ গৌরাঙ্গ-লীলার এক কণা হয়ত স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন। এ লীলা সম্বন্ধে তাঁহার সুদৃঢ় অনুভূতি ও অভিমত তিনি অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

'প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে॥'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ

'কৃষ্ণলীলা' ও 'গৌরলীলা' এই উভয় লীলার নিত্য সিদ্ধ পরিকর কবিরাজ গোস্বামী 'গম্ভীরা লীলা' (বা 'শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর')-র সাক্ষী, সাথী ও সেবক শ্রীল দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে শ্রবণ ও তাঁহার বিরহ দশার বিলাপ ও শ্রীঅঙ্গের বিকারাবলী দর্শনের অনুভবে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন পাখীর পাঠের ন্যায় তাঁহার অনুগমনে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ভরসা ঃ—

(১) "ভক্তিদাতা গৌরগুণ কে বর্ণিতে পারে ?
আপনি করয়ে দান, করায়ে সবারে॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ

(২) (গুরু) "কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য ;
ভৃত্যবাঞ্ছা পূর্ণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য।"

—চরিতামৃত মধ্য ১৫শ

প্রথম চিত্র

(শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর)

একদা সখীবৃন্দ সহ শ্রীরাধা বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও নিজ সখাবৃন্দসহ বৃন্দাবনের অপর অংশে অবস্থান করিতেছিলেন। যোগমায়ার প্রভাবে দূর হইতে 'কৃষ্ণ' ও 'রাধা' পরস্পরকে দর্শন করিয়া পরস্পরের রূপ ও মনোহর হাব ভাবপ্রকাশ রূপলীলা মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইলেন। মিলিত হইবার জন্য উভয়েই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শ্রীরাধা ধৈর্য্যহারা হইয়া নিজ সখী শশীমুখী যোগে শ্রীকৃষ্ণের নিকট একখানি প্রেমপত্রী পাঠাইলেন। তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের দূর দরশনে প্রেম চেষ্টাদি উল্লেখ করিয়া তাঁহার সান্নিধ্য প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও পূর্ব্ব হইতেই ব্যাকুল। শ্রীরাধার হস্ত লিখিত প্রেমপত্রী পাঠ করিয়া তাঁহার ব্যাকুলতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। পরম কৌতুকী কৃষ্ণ নিজ মনোভাব গোপন করিয়া ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন। তিনি শশীমুখীকে বলিলেন—

'তোমার সখীকে বলিবে পতিব্রতা-ধর্ম্ম ও কুল-ধর্ম্ম রক্ষা করাই সু-নারীর গৌরব।'

এখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া শ্রীরাধা বিলাপ করিতেছেন।

গম্ভীরার ভিতরে গৌরহরি এই ত্রিকাল-সত্য লীলাটির প্রকট দেখিলেন। 'চিত্রজল্প দশায়' বলিতেছেন—

প্রেমের প্রথম বিকাশ অঙ্কুরিত হইবামাত্র ভগ্ন হইলে যে অবর্ণনীয় দুঃখ জন্মে তাহার অনুভব শ্রীকৃষ্ণের নাই।

নবজাত প্রেমভঙ্গের দুঃখ শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারে না। তাহার কারণ, শ্রীকৃষ্ণ 'শঠ' (শঠ সম্মুখে প্রিয় কার্য্য করে, অসাক্ষাতে অতিশয় অপ্রিয় কার্য্য করে এবং গোপনে অপরাধ করে)। শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই শঠ ; আমাকে মৃত্যুতুল্য যাতনা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। নচেৎ নিজ রূপ মাধুরী ও সু-মধুর হাবভাবে আমাকে মুগ্ধ

ও প্রলুব্ধ করিয়া এখন প্রত্যাখ্যান করেন কেন? বাহ্য ব্যবহারে তিনি 'নাগররাজ' কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি 'শঠ-শিরোমণি।' মধুর দর্শন, মধুর বাক্য, মধুর ভঙ্গী, মধুর ব্যবহার দ্বারা তিনি পরনারীকে প্রলুব্ধ করিয়া পরে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান দ্বারা প্রাণে বধ করেন।

সখি! তুমি হয়ত বলিবে "কৃষ্ণ শঠ, পরনারী বধে নিপুণ, তাহা যদি জান তবে কেন সান্নিধ্য প্রার্থনা করিলে? ইহার হেতু কি তাহা জানিনা। যে আশায় উহা করিলাম, নিজ অদৃষ্ট দোষে বিপরীত দুঃসহ দুঃখ পাইলাম। এ দুঃখে প্রাণ যায়। বিধি যে কপালে এমন দুঃখ লিখিয়াছেন তাহা ত পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই।

প্রেমের স্বভাব ধর্ম্ম (আঁধল প্রেম কি রীতি) ভালমন্দ বিচার বোধ নষ্ট করে। প্রেমের গতি সর্ব্বদা কুটিল। বিবিধ বৈচিত্রী বিধানই প্রেমের রীতি। সর্ব্বদা সোজা পথে না চলিয়া প্রায়শই বক্র পথ তার অনুকূল। যখন প্রথম বিকাশ হয় তখন তো সকলদিকেই অনুকূল দৃষ্টি আসিয়াছিল। আমার অদৃষ্ট বশতঃ হঠাৎ তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া সোজা পথ কোথায় গেল কুটিলপথে তা দুঃখের দিকে অগ্রসর হইল। 'শ্রীকৃষ্ণ শঠ, শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠুর' ইহা জানিয়াও এখন আর আমি তাহাকে ছাড়িতে পারিতেছে না। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরূপ রজ্জু দ্বারা হাতে গলায় বাঁধা পড়িয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও লীলামাধুর্য্য আমাকে বিবশ করিয়াছে। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অশেষ দুঃখ দিতেছেন, জানিয়াও তাঁহাকে ত্যাগ করিবার স্বপ্নও দেখি না।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও লীলা মাধুর্য্যে আবদ্ধ। আবার কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া দুঃসহ দুঃখে পতিত। পরের প্রতি অত্যাচার করার সুন্দর কৌশলী তনুহীন মদন,—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন এই পাঁচটি বান্ সর্ব্বদা আমার উপর নিক্ষেপ করিয়া আমাকে অর্দ্ধমৃত করিয়া দুঃখ দিতেছে।

হে প্রাণ সখি! শাস্ত্রে কথিত আছে, একের দুঃখ অপরে বুঝে

না—ইহা সু-সত্য। তুমি যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সখী, আমার দুঃখে তোমার দুঃখ, আমার সুখে তুমি সুখী, সর্ব্বদা আমার নিকটে আছ,—তুমিও আমার মনের দুঃখ বুঝিতে পারিতেছ না। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমার যে দুঃসহ দুঃখ তাহা যদি অনুভব করিতে তবে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিতে না। এ দুঃখে ধৈর্য্য ধারণ করা যায় না।

সখি! হয়ত তুমি বলিবে কৃষ্ণ দয়ার সাগর, একদিন না একদিন নিশ্চয়ই তিনি অঙ্গীকার করিবেন। এ আশা ব্যর্থ। জীবের জীবন চঞ্চল, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। যতদিনে তিনি কৃপা করিবেন ততদিন আমি বাঁচিলে ত?

সখি! এখন হয়ত তুমি বলিবে, "মানুষের আয়ু শত বৎসর। ইহার মধ্যে কি কৃষ্ণ, কৃপা করিবেন না? এত অস্থিরতা কেন?" আমার প্রতি স্নেহে (তোমার) এ প্রবোধ বাক্য। বিচার পূর্ব্বক নয়। শোন! আমি হয়ত একশত বৎসর বাঁচিতে পারি। ঐ শত বর্ষ মধ্যে কোনও সময়ে কৃষ্ণ হয়তো কৃপাও করিতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণকে সুখী করিবার মত দেহবল থাকিবে কি তখন? **বলহীনের লভ্য নন তিনি।**

'নিষ্ঠুর' ও 'শঠ' কৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ বলি শোন!

স্বীয় জ্যোতির আকর্ষণে অগ্নির যেমন অবোধ পতঙ্গকে প্রলুব্ধ করে আর তাতে আকৃষ্ট হইয়া শেষে অগ্নির তেজেই পতঙ্গকে পুড়িয়া মরিতে হয়, অগ্নির তাহাতে কি দুঃখ? তদ্রূপ কৃষ্ণের নিজ নাম-রূপ গুণ-লীলা (দ্বারা) অবোধ আভীর বালা আমাদের মনকে সম্পূর্ণ রূপে হরণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট করে। পরে প্রত্যাখ্যান করিয়া অপার দুঃখ দেয়।

(ভাবান্তর —)

সহসা ঔৎসুকী সঞ্চারীর উদয়ে শচীদুলাল গৌরহরি বলিতে লাগিলেন—

হা সখি! কৃষ্ণ আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ হইল না। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় এমন কি জীবন পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইল।

আমার নয়ন ব্যর্থ। শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র হইতে 'কণা কণা অমৃত' ধ্বনি রূপে নিঃসৃত হইয়া বংশীর ছিদ্রপথে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্র বংশীগানরূপ অমৃতের বাসস্থান। জগতে যত কিছু সৌন্দর্য্য আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের লাবণ্য বা সৌন্দর্য্যচ্ছটার সামান্যতম আভাস মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ বদন ভিন্ন অন্যত্র স্বয়ংসিদ্ধ কোন সৌন্দর্য্য নাই। লাবণ্যামৃতের জন্মস্থান শ্রীকৃষ্ণবদন।

সুন্দর বস্তু দর্শনই নয়নের সার্থকতা। সমগ্র সৌন্দর্য্যের আধার ও অমৃতের আকর স্বরূপ হইল 'শ্রীকৃষ্ণবদনচন্দ্র'। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন দর্শনই নয়নের পূর্ণতম সার্থকতা। যে নয়ন তাহা দর্শন করে না, সে নয়ন থাকা না থাকা সমান।

সখি! কেবল যে আমার নয়নই ব্যর্থ হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু, আমার দুর্দ্দৈবের কত শক্তি তাহা একবার দেখ! তাহার প্রভাবে আমার দু' একটি ইন্দ্রিয় নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়—আমার দেহ, মন, চিত্ত—আমার সমস্ত জীবন এখন ব্যর্থ।

সখি! এখন কর্ণেন্দ্রিয়ের ব্যর্থতার কথা শোন ঃ

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের হৃদকর্ণ রসায়ন সুললিত সংলাপ যেন অপ্রাকৃত অমৃতের নদী। নদীতে সর্ব্বদা জলধারা প্রবাহিত হয়। নদীতে সর্ব্বদাই পর্য্যাপ্ত জল থাকে। সেই জলের স্পর্শে সকলের দেহ শীতল হয়। সেই জল পানে সকলের তৃষ্ণা দূর হয়। শ্রীকৃষ্ণের বচনামৃতেও সর্ব্বদা অমৃতধারা প্রবাহিত হইতেছে। সর্ব্ব অবস্থাতেই ইহা অমৃত হইতেও স্বাদু। সে বচনামৃত শ্রবণ মাত্রেই মন প্রাণ সু-শীতল হয়। 'শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যময়' সেবার বাসনা ব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ও সু-ললিত কণ্ঠ-

স্বরের শ্রবণই কর্ণের সার্থকতা। ছিদ্রই কানা কড়ির ব্যর্থতার হেতু। যে কর্ণের ছিদ্রে শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাণী প্রবেশ করে না, সে কর্ণের ছিদ্রও ব্যর্থতা সম্পাদক।

সখি! এখন নাসিকার ব্যর্থতার কথা শোন ঃ

সু গন্ধ গ্রহণই নাসিকার সার্থকতা। জগতে কস্তুরী ও নীলপদ্মের গন্ধের সুখ্যাতি আছে। কস্তুরীও নীলপদ্মের মিলনে যে অপূর্ব্ব সুগন্ধ হয় তাহার গর্ব্ব ও মানকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সৌরভ খর্ব্ব করে। সুতরাং সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ সৌরভই শ্রেষ্ঠ। ঐ শ্রীঅঙ্গের গন্ধ গ্রহণই নাসিকার সার্থকতা। যে নাসিকা এই অতুলনীয় অঙ্গগন্ধ গ্রহণে অসমর্থ বা বঞ্চিত সে নাসিকা নাসিকা নহে। ভস্ত্রা* মাত্র।

সখি! এখন জিহ্বার ব্যর্থতার কথা শোন ঃ

শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত (অধর সংলগ্ন অমৃত, চর্ব্বিত তাম্বুলাদি, এবং ভুক্তাবশেষ) ও তাঁহার প্রেম-বশ্যতাদি গুণ, ও তাঁহার মন উচাটন লীলাবলীর তুল্য স্বাদু আর কোন কিছু নাই, হইতেও পারে

* ভস্ত্রা—কামারের জাঁতা। (কর্ম্মকারগণ যে যন্ত্র দ্বারা বাতাস করিয়া লোহা পোড়াইবার জন্য আগুন ধরায়)

নাসাকে 'ভস্ত্রা' বলার তাৎপর্য্য—নাসায় যেমন দুইটি ছিদ্র আছে, ভস্ত্রায়ও তেমনি দুইটি ছিদ্র থাকে। নাসার ছিদ্র দিয়া বাতাস যাতায়াত করে, ভস্ত্রার ছিদ্র দিয়াও বাতাস যাতায়াত করে। ভস্ত্রার ছিদ্রদ্বয় কোনও সুগন্ধ গ্রহণ করিতে পারে না। কেবল ভস্ম মিশ্রিত তপ্ত বায়ুই গ্রহণ করে, আর আগুনে পুড়িয়া মরে। যে নাসা শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গ-সৌরভ গ্রহণ করিতে পারে না বা পায় না সে কেবল প্রাকৃত বিষয়ের ত্রিতাপ দগ্ধ পূতি গন্ধ গ্রহণ করে। ফলে ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।

না। যে জিহ্বার ভাগ্যে ঐ আস্বাদন ঘটে না তাহা নিরর্থক। সে জিহ্বা ভেক* জিহ্বা।

সখি! এক্ষণে ত্বগিন্দ্রিয়ের ব্যর্থতার কথা বলিতেছি শোন:

লোহাকে সোনা করার কাহিনী প্রাকৃত স্পর্শমণিতে ঘটে। কিন্তু অপ্রাকৃত স্পর্শ মণি শ্রীকৃষ্ণের করতল, আর পদতল, তার স্পর্শে প্রাকৃত চিত্তবস্তুও অপ্রাকৃত হইয়া যায়, জড়বস্তু চিন্ময় হইয়া যায়, ত্রিতাপ জ্বালায় তাপিত চিত্তও সু-শীতল হয়। যে দেহ শ্রীকৃষ্ণের কর-কমল ও চরণ-কমলের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত তাহা সর্ব্বদা ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকে এবং কাম ক্রোধাদির পদাঘাতই খায়।

অতঃপর 'রাই-কানুর-আশ্-মিটান-স্বরূপ', গম্ভীরার গুপ্তনিধি শ্রীগৌরসুন্দর (যেন) শ্রীরাধার প্রতি সমবেদনায় অধীরা মদনিকা সখীর মধুর বচন শ্রবণ করিতেছেন—

"সখি রাধে! তুমি এত উতলা হইতেছ কেন? কেতকী কুসুমের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরী তাহার নিকটে যায় কিন্তু যখন দেখে সেখানে মধু নাই, তখন কি ভ্রমরী কেতকীকে ত্যাগ করে না? তুমি শঠ কৃষ্ণের রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলে এখন বুঝিতেছ তাহাতে প্রণয় (মধু) নাই। প্রণয় প্রেম থাকিলে (এই) প্রেম-পাত্রীর অমর্য্যাদা করিতে পারিত না। এ অবস্থায় কৃষ্ণকে ত্যাগ কর না?

সখির প্রীতিতে ও সু-যুক্তি পূর্ণ বাক্য শ্রবণে শ্রীরাধা ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বলিলেন—

*ভেক জিহ্বার সহিত তুলনা করার তাৎপর্য্য—জিহ্বা দ্বারা জীব রস আস্বাদন করে ও শব্দ উচ্চারণ করে। ভেক কর্দ্দমে থাকে, কর্দ্দমাদিই আস্বাদন করে। আর বর্ষা কালে তীব্র শব্দ করিয়া সর্পকে আহ্বান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপ যে জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধায় বঞ্চিত, শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তন করেনা, তাহা কেবল 'প্রাকৃত-বিষয়-রস' আস্বাদন করিয়া দেহকে 'বিষয় বিষে' জর্জ্জরিত করে আর প্রাকৃত বিষয় কথা আলাপ করিয়া ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।

'তবে ত্যাগই করিলাম।'

স্ব-মুখোত্থিত 'কৃষ্ণত্যাগ' বাক্য স্মরণ মাত্রেই সচল জগন্নাথ গৌরহরি মহাভীত চিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে গদ গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন—

'শোন্ সখি! (হঠাৎ) যখন বেণু-বাদন-পর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলাম তখন এক শত্রু 'আনন্দ' (অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন জনিত চিত্তের উন্মাদজনক হর্ষ) অপর শত্রু 'মদন' (অপ্রাকৃত কন্দর্প) আমার চেতনা হরণ করিয়াছিল। আমি সাধ মিটাইয়া শ্রীকৃষ্ণবদন দর্শন করিতে পারি নাই। সে দর্শন যেন স্বপ্নবৎ অলীক বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রাণ সখি! কোন সৌভাগ্যে যদি কখনও আবার আমার চিত্ত-চোরা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাই, তবে, তখন, শ্রীকৃষ্ণ-বদন-সুধামাধুরী ভোগের বাধক ঐ 'মদন' ও 'আনন্দ'কে বিতাড়িত করিয়া মনের সাধে প্রাণবঁধুর বদনসুধা পান করিব। সেই সময়ের প্রতিটি দণ্ড, প্রতিটি ক্ষণ, এমনকি প্রাতটি পলও সে অপরূপ মাধুরী ভোগে সু অলঙ্কৃত করিব।

গম্ভীরার গুপ্তনিধি গৌরহরির এই অপ্রাকৃত পরম অদ্ভুত দশা রামরায় ও স্বরূপ তাঁহারই সম্মুখে বসিয়া যেন চুমুকে চুমুকে পান করিতেছেন। গোবিন্দ, শঙ্কর, 'রঘুনাথ' আদি সেবকবৃন্দ অবশে অভ্যাস বশত দৈনন্দিন সেবা কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা কর্ণে গৌরহরির 'প্রলাপ' শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহাদের চিত্ত সদাই ঐ গৌরগুণমণির ভাবময় চিন্তায় ভরপুর এবং নিজ নিজ সেবা অবসরে চক্ষুদ্বারা 'শাস্ত্র' অগোচর ভাব ভূষণে ভূষিত সে চাঁদবদন দর্শন করিতেছেন।

লীলা বৈচিত্র্যে গৌরহরির কিঞ্চিৎ বাহ্যপ্রকাশ পাইলে তিনি (এতক্ষণ পরে) রামরায় ও স্বরূপের নিজ সম্মুখে উপস্থিতি অনুভব করিয়া তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

আমার কি চেতনা লোপ পাইয়াছিল ?

আমি 'স্ফূরণে' দেখিলাম শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানে শ্রীরাধা মদনিকা সখীর নিকট বিলাপ করিতেছিলেন। তোমরাও কি সে প্রাণ বিদারক প্রলাপোক্তি শুনিয়াছ ?

পরমুহূর্ত্তেই কৃষ্ণ-বিরহিনী গৌর-কিশোরী অপরূপ ভাবান্তরে বলিতেছেন—

'স্বরূপ ! রামরায় ! তোমরা আমার প্রাণের বান্ধব। তোমাদের বলি শোন, আমি কৃষ্ণ-প্রেমধনে বঞ্চিত। আমি সু-দরিদ্র। আমার দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই বৃথা হইয়া পড়িল।'

পরম আক্ষেপের সহিত আবার বলিতেছেন—

ওহে স্বরূপ ! ও রামরায় ! শোন ! শুনিয়া বিচার করিয়া দেখ। হাঁ কি না সার কথা বল। এই বলিয়া (যথাপূর্ব্ব) নিজেই বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'শুদ্ধ কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্যময় যে 'প্রেম' তাহা জাম্বুনদজাত সহজ বিশুদ্ধ স্বর্ণের মত। সে প্রেম মনুষ্যলোকে হয় না। যদি কোন সৌভাগ্যে কাহারও চিত্তে অকৈতব কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হয় তাহা হইলে সেই প্রেমই স্বীয় অচিন্ত্য আকর্ষনী শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ঘটায় এবং ঐ মিলন কখনো খণ্ডিত হয় না ইহাই ঐ প্রেমের সহজ স্বভাব। যদি কোন কারণে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সে প্রেমের বিয়োগ ঘটে তবে সে (ভক্ত) আর বাঁচিতে পারে ?

প্রাণের বন্ধু স্বরূপ ! প্রাণের বন্ধু রামরায় ! লাজ্-লজ্জার মাথা খাইয়া বলিতেছি—অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম সে বহু দূরের কথা, কপট প্রেমও আমার নাই।

এতক্ষণ (গৌর-লীলার) 'চিত্রজল্পে' বাংলা ভাষায় প্রলাপ করিতে ছিলেন। অতঃপর শ্লোকবন্ধে সংস্কৃতে বলিলেন—

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণ পতঙ্গকান্ বৃথা ॥"

—মহাপ্রভুপাদোক্তঃ

ভাবার্থ ঃ শ্রীকৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্য্যময় প্রেমের কথা তো বহুদূরে, নিজের সুখের বাসনাযুক্ত কপট প্রেমের অস্তিত্বও শ্রীকৃষ্ণচরণে আমার নাই। তেমন কপট প্রেমের সম্পর্ক যে নাই তাহা তোমাদের পরিস্কার বলিতেছি শোন—'তোমরা জান যে প্রেমের বিষয় 'বংশী-বিলাসী-চাঁদবদন, তাহা আমার ভাগ্যে দর্শন ঘটে নাই। তথাপি এখনও যে নিজ দেহের লালন-পালন মার্জ্জন-ভূষণ দেখিতেছ এ সব বৃথা, পরমার্থ কিছুই নাই।

আমার আহার, বিহার, শ্বাস, প্রশ্বাসাদি, সমস্তই বৃথা। এ সমস্ত কেবল 'আপ্তকাম' প্রীতিরই পুষ্টি সাধন করিতেছি। কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-শূন্য আমার এই প্রাণ ধারণে ধিক্।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ আমি প্রাণ ধারণ করিয়া আছি এবং নিজের দেহে প্রীতি দেখাইতেছি। সুতরাং আমার অকৈতব প্রেম দূরের কথা, কপট প্রেমও নাই।

(যাহাতে বিন্দুমাত্রও আত্ম-সুখ কিম্বা বিষয়-বাসনারূপ মলিনতা নাই, যাহা তৃণ কর্দ্দমাদি শূন্য গঙ্গাজল (সু-স্বাদু গঙ্গাজল) সদৃশ সু-নির্ম্মল সেই শুদ্ধ প্রেম অমৃতের ন্যায় আস্বাদন চমৎকারিতা আছে। ইহা সিন্ধু তুল্য অপরিমেয়।

পরিস্কার শুক্ল বস্ত্রে অতি ক্ষুদ্র কালির চিহ্নটিও যেমন ধরা পড়ে,

এই সু-নির্ম্মল কৃষ্ণ-প্রেমের সহিত স্ব-সুখ-বাসনার আভাষ পর্য্যন্ত থাকিলে তাহা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে।

এই 'শুদ্ধ-প্রেম'* নৃ-লোকে হয় না। ইহা স্বরূপত বিভু। ইহার এক বিন্দুতে সমগ্র সসীম জগৎ ডুবিয়া যাইবে—এ আর বিচিত্র কি? এই শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের সুখ অবর্ণনীয়। ইহা মুক্-আস্বাদনবৎ। এ সুখে পাগল হইয়া যদি কেহ জগতে প্রকাশ করে তাহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবে না।)

'এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজ ভাব করেন বিদিত।'

—চরিতামৃত মধ্য ২য়

* এই প্রেমের বাহ্য প্রকাশ তীব্র-যন্ত্রণা. নূতন সর্প শাবকের বিষের যে অহংকার তাহাকেও নির্ব্বাসিত করে। অভ্যন্তরে—আনন্দের পাথার।

শীতল ইক্ষু অপেক্ষা তপ্ত ইক্ষুর স্বাদ অধিক। স্বাদাধিক্যের লোভে নিতান্ত কষ্টকর হইলেও লোকে তপ্ত ইক্ষুই চর্ব্বণ করে। সু-নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেম তদ্রূপ বাহিরে বিষবৎ অসহ্য জ্বালা ভিতরে অনির্ব্বচনীয় মধুর ও পরম উপাদেয়।

'রাই-কানুর-আশ-মিটান স্বরূপ' গৌরহরির 'প্রেম বৈচিত্ত্য দশায়' তাঁহার শ্রীবদনে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে সব অনির্ব্বচনীয় ভাবাবলী প্রকাশ পাইত, সে সব (শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর শ্রীঅঙ্গে) স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার অনুভবের আধারে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কিছুটা আমাদের বোধগম্য হয়, এই আশায় উপরোক্ত উপমা দুইটি পয়ারে বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় চিত্র

"শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর" (কবিরাজ)

(রাই-কানুর আশ্-মিটান মূর্ত্তি গৌরহরির—সদাই দিব্যোন্মাদে ভ্রমময় চেষ্টা ও প্রলাপময় বাণী।)

একদা তিনি অভ্যাস বশতঃ জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছেন। সঙ্গে গোবিন্দ 'রঘুনাথ' আদি সেবকবৃন্দ।

(গৌরহরি সর্ব্বদাই জগন্নাথদেবের সম্মুখ হইতে বেশ খানিকটা ব্যবধানে অবস্থিত গড়ুর স্তম্ভের সন্নিকট হইতেই জগন্নাথ দর্শন করিতেন। ঐ গড়ুর স্তম্ভের পার্শ্বে একটি গর্ত্ত ছিল।)

সিংহাসনে বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথদেব দর্শন মাত্র দিব্য স্ফূর্ত্তির আলোকেই তিনি কুরুক্ষেত্র দর্শন করিতেছেন। শ্রীমুখে বলিতেছেন—

"কুরুক্ষেত্রে আসিয়া আমি কৃষ্ণের দর্শন পাইলাম। আমার জীবন সার্থক হইল। আমার দেহ, মন ও চক্ষু জুড়াইল।"

এই দিন গৌরসুন্দর যে কি বিচিত্র বিরহ দশায় জগন্নাথ দর্শন করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন অদ্যাপি পুরীধামে জগন্নাথ মন্দিরে সুরক্ষিত। তাঁহার চরণ পরশে পাষাণও গলিয়া গিয়াছে। সেই গলিত পাষাণে গৌরহরির শ্রীচরণের যে 'ছাপ' পড়ে সেই ছাপ সহ শ্রীপ্রস্তরটি এখনও শ্রীমন্দির অভ্যন্তরে উত্তর দরজার নিকট দর্শন করা যায়। ঐ পাষাণ গলান লীলা বিভূতিটি শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনে স্ফূর্ত্ত হইয়াছে—

একদিন আমার গৌরহরি
করিছেন জগন্নাথ দরশন
গরুড় স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে করিছেন জগন্নাথ দরশন
রাধিকা ভাবিত মতি

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার রাধিকা ভাবিত মতি
শ্রীজগন্নাথের বদন চেয়ে রাধিকা ভাবিত মতি

"বৈবর্ণ স্তব্ধতা আর, গদগদ বাক্যোচ্চার"

স্বর্ণবর্ণ হ'ল বিবর্ণ
জগন্নাথের বদন চেয়ে স্বর্ণবর্ণ হ'ল বিবর্ণ

জ জ জ জ গ গ করে
জগন্নাথ বল্‌তে নারে জ জ জ জ গ গ করে

"বৈবর্ণ স্তব্ধতা আর, গদ গদ বাক্যোচ্চার
কম্প অশ্রু পুলক সঘর্ম্ম।
এই সপ্ত সাত্ত্বিক ভাব, আর দুই অনুভাব
হাস্য নৃত্য সব প্রেম ধর্ম্ম॥"

গৌর অঙ্গে হ'ল বেকত
সাত্ত্বিক বিকার যত গৌর অঙ্গে হ'ল বেকত

গৌর অঙ্গে বিভূষিত
নানা ভাবাবলি ভূষণেতে গৌর অঙ্গে বিভূষিত

বিরাম নাই, বিরাম নাই
অবিরল নয়ন ধারার বিরাম নাই, বিরাম নাই
(যেন) শ্রাবণ মেঘের ধারা বিরাম নাই, বিরাম নাই

(যেন) পিচকারী জল যন্ত্রধারা
শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন ধারা (যেন) পিচকারী জল যন্ত্রধারা

এক এক ধারায় শত শত ধারা (যেন) পিচকারী জল যন্ত্রধারা

ভাসিল সে মুখ কমল
অবিরল নয়ন ধারায় ভাসিল সে মুখ কমল

পড়িল হৃদি কমলে
মুখ কমল ভাসাইয়ে পড়িল হৃদি কমলে

হৃদি কমল ভাসাইয়ে পড়িল চরণ কমলে
চরণ কমল পাখালিয়ে নিম্ন খাল পূর্ণ হোলো
গরুড় স্তম্ভের পার্শ্বদেশের নিম্ন খাল পূর্ণ হোলো
শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন ধারায় নিম্ন খাল পূর্ণ হোলো

পাষাণ গলিয়া গেল
সেই গৌরের পদ পরশে, পাষাণ গলিয়া গেল

পাষাণ গলান গোরা
প্রাণ ভরে বল ভাই তোরা পাষাণ গলান গোরা

মহা সাবধান কবিরাজ গোস্বামী 'পাষাণ গলান গোরার' পূর্ণ চিত্র দেননি। তিনি বলিয়াছেন—

"গরুড় স্তম্ভের তলে আছে এক নিম্ন খালে
সে-খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২য়

গৌরহরি বাহ্য-জ্ঞান-রহিত অথচ প্রতি ইন্দ্রিয় স্বভাবে নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে মাত্র। এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সেবকবৃন্দ তাঁহাকে গম্ভীরায় লইয়া আসিলেন। সেখানেও তাঁহার সেই স্ফুরণ অব্যাহত। গম্ভীরায় ফিরিয়া আসার কিছুক্ষণ পরে বাহ্যবোধ যেন জাগ্রত

হইতেছে। অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনভীষ্টের প্রাপ্তিজনিত চিন্তার বিভ্রম। ফলে, কখনও পূর্ব্বরাগ, কখনও জাগ্রতেই স্বপ্ন সম্ভোগজনিত আচরণটি নখের সাহায্যে মাটি খুঁটিতে ও মাটিতে নানাবিধ আঁক দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই অবস্থান্তর। উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছেন—

"হাহা কাঁহা বৃন্দাবন! কাঁহা গোপেন্দ্র নন্দন!
কাঁহা সেই বংশীবদন!
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম! কাঁহা সেই বেণু গান!
কাঁহা সেই যমুনা পুলিন!
কাঁহা রাস বিলাস! কাঁহা নৃত্যগীত হাম!
কাঁহা প্রভু মদনমোহন!"

ভাবের প্রাবল্যে মনের উদ্‌বেগে ক্ষণকাল কাটাইতে পারিতেছেন না। নানাবিধ সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের প্রাবল্যে ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সহসা তিনি কর্ণামৃতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি সু-স্বরে আবৃত্তি করিলেন—

"অমূল্যধন্যানি দিনান্তরাণি,
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো,
হা হন্ত! হা হন্ত! কথং নয়ামি॥"*

—কর্ণামৃত শ্লোক সংখ্যা ৪১

পর মুহূর্ত্তেই চাপলাখ্য সঞ্চারী ভাবে বলিতেছেন—

প্রাণ বঁধু! তোমার কৈশোর ও আমার চপলতা ত্রিভুবনে অদ্ভুত। এ দুইটি একমাত্র তুমি অথবা আমিই বুঝিতে পারি।

* তোমার দর্শন অভাবে অধন্য এই ক্ষণ-লব-মুহূর্ত্তাদি কাল আমি কিরূপে অতিবাহিত করিব?

অপরে কেহ পারে না। তোমার বংশীবিলাস সম্পন্ন মনোহর মুখ-কমল নয়ন ভরিয়া দর্শনের নিমিত্ত আমি চঞ্চল। কোথায় গেলে, কি করিলে তোমাকে পাই বঁধু তুমিই আমাকে বলিয়া দাও।

এই সময় গৌরহরির শ্রীঅঙ্গে যে সব নয়নের অভিরাম ভাবাবলী প্রকাশ পাইত শ্রীরঘুনাথ সে সমূহ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী সে দর্শন অনুভবটি অক্ষরে মূর্ত্তি দিয়াছেন। যথা—

'নানা ভাবের প্রাবল্য হইল 'সন্ধি' 'শাবল্য'
ভাবে ভাবে হৈল 'মহা রণ'।
'ঔৎসুক্য' 'চাপল্য' 'দৈন্য' 'রোষামর্ষ' আদি সৈন্য
প্রেমোন্মাদ সভার কারণ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২য়

সংক্ষেপ ঃ

'নানা ভাবের প্রাবল্য'—নানাবিধ সঞ্চারী ভাব প্রবল হইয়া উঠিল।

'সন্ধি'—এক কারণ বা বহু কারণ জনিত দুই বা বহু ভাব একত্র মিশ্রিত।

'শাবল্য'—ভাব সমূহের পরস্পর সম্যকরূপে মর্দ্দন।

(ভাবকে শাবলতুল্য বলা হয়। সন্ধিতে শাবলের ঘা দিয়াছে যেন।)

'ভাব শাবল্য'—বহু ভাব একত্র প্রবলবেগে উদিত হইয়া প্রত্যেক ভাবই অপরগুলিকে পরাজিত করিয়া প্রাধান্য লাভের চেষ্টা।

'মহারণ'—ভাব শাবল্যের মহাযুদ্ধ।

'ঔৎসুক্য'—অভিষ্ট বস্তুর দর্শন ও প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা বশতঃ কাল বিলম্ব অসহ্য

'চাপল্য'—রাগ এবং দ্বেষাদি জনিত গাম্ভীর্য্যহীনতা।

'দৈন্য'—দুঃখ, ত্রাস এবং অপরাধাদি বশতঃ নিজেকে নিকৃষ্ট জ্ঞান।

'রোষ'—অপরাধ ও কটূক্তি প্রভৃতি জনিত উগ্রতা বা ক্রোধ।

'অমর্ষ'—তিরস্কার ও অপরাধাদি জনিত অসহিষ্ণুতা।

'সৈন্য'—সৈন্যগণ যেমন প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করে, নানাবিধ ভাবও সেইরূপ গৌরহরির চিত্তে উদিত হইয়া পরস্পরকে পতিপক্ষের মত মর্দ্দন করিতে লাগিল।

উপরোক্ত পয়ারের বর্ণনা আর একটু সরল হইয়া আমাদের কিছুটা অনুভবগম্য হয়, এই আশায় তিনি (কবিরাজ গোস্বামী) দৃষ্টান্তে জাগতিক বলিয়াছেন—

'মত্ত গজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষু বন
গজ-যুদ্ধে বনের দলন।'

—চৈঃ চঃ মধ্য ২য়

যাঁহারা কখন ইক্ষুবনে হস্তীর প্রবেশ দেখিয়াছেন তাঁহারা গৌর-হরির শ্রীঅঙ্গের অবস্থা কিছুটা অনুভব করিলেও করিতে পারিবেন।

ইক্ষুবন মধ্যে উন্মত্ত হস্তীগণের প্রবেশের সঙ্গে যদি সংগ্রাম আরম্ভ হয় তবে ইক্ষুবন যে কিরূপভাবে বিদলিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় তাহা কোনরূপ বর্ণনা দ্বারা বোঝান যায় না।

এইরূপ অনির্ব্বচনীয় শরীর ও মনের অবস্থা মধ্যে অবসাদ এবং তাহা হইতে উত্থিত ভাবাবেশে তিনি কর্ণামৃতের আর একটি শ্লোক রত্ন আবৃত্তি করিলেন। যথা—

"হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈক বন্ধো!
হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈক সিন্ধো!
হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম!
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্ম্মে?"

এই শ্লোকরত্নটি যে আবেশে গৌরহরির শ্রীমুখে উচ্চারিত হইয়াছে তাহা অনুভব করিয়া দাস গোস্বামী—কবিরাজ গোস্বামী দ্বারে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

'উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ স্ফূরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়-মান;
সৌলুণ্ঠ বচন-রীতি মান-পর্ব্ব-ব্যাজ স্তুতি
কভু নিন্দা, কভু বা সম্মান।'

—চৈঃ চঃ মধ্য ২য়

সংক্ষেপ :

উন্মাদের লক্ষণ : দিব্যোন্মাদে নিজেকে অপর, অপরকে নিজ বলিয়া মনে হয়। আবার যাহা আছে তাহা নাই বলিয়া মনে হয়, ইত্যাদি।

কৃষ্ণ-স্ফূরণে : শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে উপস্থিত এই জ্ঞান।

নানাবিধ ভাবের আবেশে :—

মান ঃ প্রেমের পর উৎকর্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে চিত্ত দ্রবীভূত হইলে তাহাকে স্নেহ বলে। 'স্নেহ' উৎকর্ষলাভ করিয়া যখন নূতন নূতন মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং নিজেকে প্রচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে বাম্য ভাবাদি ধারণ করে, তখন তাহার নাম 'মান'।

প্রণয় ঃ মানের উৎকর্ষে প্রিয়জনের সহিত নিজের ভেদ নাই, এই কারণ—সম্ভ্রমশূন্যতা বশতঃ স্বীয় প্রাণ, মন, দেহ, বুদ্ধি ও পরিচ্ছদাদির সহিত কান্তের প্রাণ, মন, দেহ, বুদ্ধি ও পরিচ্ছদাদির 'অভেদ' এই উৎকর্ষ দশার নাম 'প্রণয়'।

'সোলুণ্ঠ বচন ঃ পরিহাসযুক্ত বাক্য ভঙ্গী।

'হে দেব ! হে দয়িত !……"শ্লোকরত্নটির পয়ার ছন্দে কবিরাজ গোস্বামী অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা অপূর্ব্ব ! তাহারই ছায়া অবলম্বনে গদ্যে বিবৃত হইতেছে—

গৌরহরি দিব্য স্ফূর্ত্ত দশায় দর্শন ও প্রলাপ করিতেছেন—কৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধা কুঞ্জ মধ্যে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া আছেন। হঠাৎ নূপুরের শব্দ শুনিতেছেন বলিয়া মনে হইল। উঠিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে সখিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সখি ! কুঞ্জ মধ্যে নূপুরের শব্দ !" কিন্তু কৃষ্ণকে ত দেখিতেছি না। হুঁ ! বুঝিলাম, অন্যত্র ক্রীড়া সঞ্চার হইয়াছে।

(সঙ্গে সঙ্গে ভাবান্তর) তিনি দেখিতেছেন কৃষ্ণ সাক্ষাতে দণ্ডায়মান। বক্রোক্তিতে বলিতেছেন—

'হে দেব (যিনি সর্ব্বদাই ক্রীড়া করেন) ! তোমার আশক্তি অন্যত্র, সেখানেই তুমি ক্রীড়া কর। এখানে আগমন কেন ? তোমার কোন প্রয়োজন নাই। যাও, জগতে তোমার জন্য যাহারা তোমার অপেক্ষা করিতেছে তাহাদের সহিত ক্রীড়া কর।'

'তিরস্কার শুনিয়া কৃষ্ণ চলিয়া গেল'—ইহা মনে ভাবিয়া, ব্যাকুল চিত্তে বলিতেছেন—

"হে দয়িত ! তাৎপর্য্য তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, তুমি কেন আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছ ? দয়া করে এস, দর্শন দাও, আমার ভাগ্য প্রসন্ন কর।"

পরক্ষণেই দেখিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আহ্বানে তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন। দীনতার সহিত বলিতেছেন, অপরাধ ক্ষমা কর। বলিয়া সকাতরে অনুনয় বিনয় করিতেছেন। তখন তিনি পরিহাসপূর্ব্বক বক্রোক্তি সহকারে বলিতে লাগিলেন—

'প্রাণ বঁধু ! কি দোষ ? সকলের চিত্ত সন্তুষ্ট করা তোমারই ত কর্ত্তব্য। তুমি কেবল কি আমার ? তা উচিত নয় ! তুমি ত একা আমার বন্ধু নও ? তুমি হইলে ভুবনের বন্ধু। তুমি তাহাদের মনস্তুষ্টি করিবে না ? নিশ্চয়ই করিবে ! অন্যথায় অন্যায় হইবে। তুমি তাহাদের মনোজয়ে গিয়াছ বলিয়া এত লজ্জিত হইতেছ কেন। বেশ করিয়াছ। আবার যাও। তাহাদের সন্তুষ্টি বিধান কর। এখানে দাঁড়াইয়া কেন ? তারা যে আশার পথ চেয়ে আছে ! যাও ! যাও ! শীঘ্র যাও।

'হায় হায় কটুক্তি শুনিয়া কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন।' 'আর বুঝি আসিবেন না' মনে করিয়া আবার ব্যাকুল হইলেন। এখন মনে ভাবিলেন রূপ গুণ ও লীলা মাধুরীতে শ্রীকৃষ্ণ আমার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে হরণ করিয়াছে। আর মান কেন ? যাহাতে শীঘ্র তাহার দর্শন পাই সেই উপায় করি। তাই অত্যন্ত দৈন্য ভাবে বলিতে লাগিলেন, "তুমি করুণার সিন্ধু। তোমার অন্তঃকরণ নিতান্ত কোমল। আমি তোমার চরণে অপরাধিনী। নিজ কারুণ্যে আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দর্শন দিয়া প্রাণে বাঁচাও। তোমার প্রতি আমার কোন রোষ নাই। বাঁচাও।"

পর মুহূর্ত্তেই শ্রীরাধা মনে করিলেন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন. 'বৃথা মান করিয়া আমাকে কেন কষ্ট দিতেছ? প্রসন্ন হও। কথা বল।

শ্রীরাধার ঔদাসীন্যের উদয় হইল। তিনি বলিতেছেন—

"হে নাথ! একি কথা? তুমি ব্রজের জীবন। ব্রজবাসীদের রক্ষা করার জন্য তোমাকে সর্ব্বদা নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। সুতরাং আমার নিকট আসিতে তোমার সময় হয়ে ওঠে না। আমি কেন মান করিব? আমি কথা বলি নাই বলিয়া তুমি মনে করিতেছ 'মান'? তা নয়। তুমি হইলে আমাদের রক্ষক। তোমার সহিত কথা বলিব না? তবে কি জান? ব্রাহ্মণী আমাকে মৌনব্রত গ্রহণ করাইয়াছিলেন, তাই তোমাকে সম্ভাষণ করিতে পারি নাই। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

"আমি তাঁহাকে কত তিরস্কার করিলাম্ তাই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন।"

আবার পর মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ সমাগত এই অনুভবে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। বাহ্য স্ফূর্তি হইল 'শ্রীকৃষ্ণ নাই' দেখিলেন। অত্যন্ত খেদের সহিত বলিতে লাগিলেন—"হে নয়নের আনন্দদায়ক, হে আমার রমণ, হায় হায়, আবার কখন আমি তোমার দর্শন পাইব।"

আমাদের রঘুনাথ এই প্রলাপের সময় গৌরহরির কিরূপ অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন তাহা কবিরাজের অক্ষরে ধরা আছে। যথা—

"স্তম্ভ, কম্প, প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, উঠি ইতি উতি চায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২য়

মূর্চ্ছায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব বৈচিত্রী সমূহ যাহা দেখিলেন তাহা বর্ণনা করিতেছেন—

ক্রন্দন জনিত বাষ্পাকুল নেত্রে ঠিক চিনিতে না পারিয়া প্রথমে মনে করিলেন,—এই কি তিনি? আর একটু ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন "না" মধুর জ্যোতিরাশি বোধহয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

আর একটু ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—

না, না, এ দ্যুতিরাশি নয়। তাহা এত চমৎকার হইতে পারে না। বোধ হয় স্বয়ং মাধুর্য্যই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

আরও একটু ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—

না, ইঁহার দর্শনে মনে ও নয়নে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি পাইতেছি। কেবল মাধুর্য্যের এত তৃপ্তি হয় না। আমার মন ও নয়নের আনন্দ বিধান জন্য নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ 'অমৃত' আসিয়াছেন।

আরও ভালরূপে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন 'হস্ত পদ দেখিতেছি'। নিশ্চয়ই ইনি অমৃত নন। অমৃতের হস্ত পদ হয় না। তবে ইনি কে?

সম্যকরূপে অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার হৃদয়-বল্লভ, তাঁহার নয়নানন্দ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন।

দাস গোস্বামীর প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভব বর্ণনার অন্তে শ্রীল কবিরাজ নিজ অনুভব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

'কহিবার কথা নহে কহিলে কেহ না বুঝয়ে
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।'

—চরিতামৃত

তৃতীয় চিত্র

("শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর")

একদা রাত্রিতে দিব্যোন্মাদের চরম দশায় ব্যাকুল গৌরহরি গম্ভীরা ভিতরে শয়ন করিয়া আছেন। এমন সময় চিত্ত মধ্যে রাস লীলার উদয় হইল; সে স্মৃতি ক্রমেই তাঁহার নয়ন সমক্ষে প্রতীয়মান হইল। 'শ্যামের' মনোরম ভাব, পীতাম্বরধারী বনমালা সুশোভিত 'মদনমোহন' স্বরূপটি প্রতিভাত হইল।

তাহার পর কৃষ্ণকান্তাবৃন্দ মণ্ডলাকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চারিদিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর ঐ মণ্ডলীর মধ্যস্থলে শ্রীরাধা-সহ কৃষ্ণও নর্ত্তন তৎপর।

'বৃন্দাবনে রাসলীলা-সহ কৃষ্ণ পাইয়াছি'—এই আবেশে তিনি সমস্ত রাত্রি প্রেমাবিষ্ট হইয়া রহিলেন। প্রাতরুত্থানের সময় উত্তীর্ণ দেখিয়া, গোবিন্দ তাহার অন্তর্মগ্ন অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বাহ্য বোধ করাইলেন। ইহাতে তাঁহার স্মরণ (দিব্য স্ফূর্ত্তি) কিঞ্চিৎ স্তব্ধ হইল। তিনি বিষণ্ণ হইলেন। অবশের মত দেহের অভ্যাসে নিত্যকৃত্য সমাধা করিয়া জগন্নাথ দর্শনের জন্য শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। গোবিন্দ ও 'রঘুনাথ' তাঁহার অনুগমন করিলেন; তাঁহারা বুঝিলেন স্মরণ প্রমত্ত গৌরহরির চিত্তে গত রাত্রির স্ফূরণ আবেশ এখনো তিরোহিত হয় নাই। তখনও রাসলীলার স্মরণ আবেশে তিনি টলিতে টলিতে চলিয়াছেন। সে দিব্য দর্শন এখনো অখণ্ড ভাবে চলিতেছে।

গৌরহরি জগন্নাথদেবের দর্শনের জন্য তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থান গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন।

সে দিন জগন্নাথ দেবের কোন বিশেষ উৎসব ছিল। এই কারণে শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির চত্বর দর্শনার্থী দ্বারা পরিপূর্ণ। একটি পরম ভাগ্যবতী উড়িয়া রমণী জগন্নাথ হইতে বহুদূরে ছিল।

তাহার সম্মুখে ও চতুষ্পার্শে বিপুল জন সমাগম দেখিয়া জগন্নাথের শ্রীবদন দর্শনের প্রবল উৎকণ্ঠায় সেই নারী এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিল। গরুড় স্তম্ভে উঠিল। পরম আকাঙ্খিত জগন্নাথদেবের শ্রীবদন দর্শনে রমণী বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দেহে স্মৃতিলোপ পাইয়াছে। সেই ব্যগ্রতা এত প্রবল হইয়াছে যে ঐ রমণীর একটি পা স্তম্ভে স্থান না পাইয়া নিকটে দণ্ডায়মান গৌরহরির স্কন্ধের উপর ন্যস্ত করিল। রমণী কি করিতেছে তাহা জানে না। 'মন' তাহার দেহকে যেন ত্যাগ করিয়াছে। কোথায় দাঁড়াইয়া কি উপায় করিয়াছে তাহাও জানে না। তাহার একটি পা যে সচল জগন্নাথের স্কন্ধের উপর রাখিয়াছে তাহা সে জানে না। উৎকণ্ঠা ব্যাকুল উন্মুখ মন তাহাকে এই গর্হিত কার্য্যের আরম্ভে বাধা দেয় নাই। শ্রীগৌরসুন্দরও পূর্ব্ব রাত্রির রাসলীলারই প্রকট দর্শনানন্দে বিহ্বল হইয়া আছেন। তাঁহারও বাহ্য বোধে কোন স্পর্শ জাগিল না। কোন অনুসন্ধান নাই। জানিতেই পারিলেন না যে তাঁহার স্কন্ধে কোন রমণীর পা অথবা কোন বস্তু অর্পিত হইয়াছে। সামান্যক্ষণ পরে ঐ ঘটনা গোবিন্দের দৃষ্টি গোচর হইল। গোবিন্দ শিহরিয়া উঠিল। মহা সন্ত্রস্ত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহাতে রমণীরও বাহ্য স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। সে তখন উৎকট ব্যস্ততা ও হৃদয় বিদারক আর্ত্তির সহিত গরুড় স্তম্ভ হইতে নীচে নামিয়া বুক ফাটা ক্রন্দন করিতে করিতে গৌরহরির শ্রীচরণ সমীপে পতিত হইয়া বলিতে লাগিল—'প্রভু ক্ষমা কর। রক্ষা কর। আমি মহা অপরাধিনী।'

যখন গরুড় স্তম্ভের উপর হইতে স্ত্রীলোকটিকে নামিতে বলে, তখন গোবিন্দের বাক্য গৌরহরির কর্ণ গোচর হয়। তাঁহার আবেশে ছেদ পড়িল। কিন্তু তিনি সেই ঘটনাটির জন্য পরম স্নেহ সম্ভাষণে গোবিন্দকে মৃদুস্বরে বলিলেন—

"আদিবৈশ্যা* ! এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন ;
করুক যথেষ্ঠ জগন্নাথ দরশন।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪শ

পরে আবার সেই স্ত্রীলোকের আত্তি দর্শনে গৌরহরির উক্তি—

"এত আত্তি জগন্নাথ আমারে না দিলা।
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে ;
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে।"

তাহার পর, ভক্তির পরম উৎকর্ষ স্বভাবে, দৈন্যে বলিলেন—

"অহো ! ভাগ্যবতী এই বন্দি ইঁহার পায় ;
ইঁহার প্রসাদে ঐছে আত্তি আমার বা হয়।"

("ভক্তি" যে 'দীন স্বভাব' ও 'অযোগ্যতা বুদ্ধি' দেয়, তাহার দৃষ্টান্ত আরও আছে। যথা—হস্তিনাপুরে, নারদ ঋষির মুখে যুধিষ্ঠির প্রহ্লাদ চরিত্র-বর্ণন শুনিয়া সদৈন্যে বলিয়াছেন আমার কি এমন ভাগ্য হ'বে যে প্রহ্লাদের ন্যায় আমি ভক্তি লাভ করিব।)

কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে গৌরহরির দিব্য (স্ফুরণ) দর্শনে স্তব্ধতা আসিল। রাসস্থলি. রাসবিহারী, গোপীমণ্ডলী ইত্যাদি সব অন্তর্হিত হইল। এবং স্বতন্ত্র দিব্য স্ফূরণ ঘটিল। তিনি কুরুক্ষেত্র এবং কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন। অথচ বাহিরের দৃষ্টিতে তিনি তখন পুরীধামে ও জগন্নাথদেবের মন্দিরে অবস্থিত। যথা—

"কাঁহা কুরুক্ষেত্রে আইলাম ? কাঁহা বৃন্দাবন ?"

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৪শ

সু-মধুর রাসলীলা দর্শন অন্তর্হিত হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কুরুক্ষেত্র এবং কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ বলরামের অন্যরূপ দেখিতে দেখিতে

* আদি বৈশ্য আদত চাষা। স্নেহের গালি এটা অর্থাৎ খাঁটী বোকা।

গৌরহরির চিত্ত অন্যভাবে ব্যাকুল হইল। ঐ আবেশেই অতি বিষণ্ণ মনে তিনি পুনরায় গম্ভীরায় ফিরিলেন। চক্ষু হইতে প্রবলবেগে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। ক্রমেই সেই অশ্রুপাতে দৃষ্টি রোধ হইল। 'হায় এক পাইলাম এক হারাইলাম', 'হায় এক পাইলাম এক হারাইলাম' এই অবস্থাটিতে গৌরহরির মন ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের ও বিষাদের নিকেতন হইল। যতক্ষণ দিব্য স্ফূরণে তিনি রাসস্থলী রাসবিহারী, রাসমণ্ডলী দর্শন করিতেছেন ততক্ষণ তিনি প্রেমে গর্ গর্। আবার কিঞ্চিৎ বাহ্যাবেশ আসিলে তিনি কুরুক্ষেত্র সহ রাম-কৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন। তখন তাঁহার চিত্ত বিষণ্ণ হইতেছে।

আমাদের রঘুনাথের এ লীলা দর্শনের অনুভব, কবিরাজ গোস্বামীর অক্ষরে ধরা আছে। যথা—

'উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান-নৃত্য ;
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য।'

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৪শ

এইরূপে দিবা অবসান হইল। রাত্রি আসিল। গৌরহরি মরম সখা স্বরূপ ও রামরায়ের দর্শন পাইলেন। নিজ মনের নিগূঢ় কথা তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিলেন। যথা—

**'প্রাপ্তপ্রনষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা,
যযৌ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে,
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ॥**

(এবার) গৌরহরি সংস্কৃতে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এই শ্লোকের যে বাংলা অনুবাদ 'পয়ারে' প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। সেই পয়ারের আনুগত্যে যোমতি গদ্যে নিবেদন করিতেছি—

স্বরূপ ও রামরায়ের কণ্ঠ ধরিয়া পূর্ব্বরাত্রির ঘটনা ও সমস্ত দিনের বিবিধ ঘটনা বর্ণন করিতে করিতে গৌরসুন্দরের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। এখন তিনি (দিব্যোন্মাদে) অভূতপূর্ব্ব বাচাল হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"প্রাণের বান্ধব ! কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে আমার মন এতই উতল হইয়াছে যে আমার মন, দেহ-গেহ-সুখ, লোকধর্ম্ম (লজ্জা শীলতাদি) ও বেদধর্ম্ম (পারলৌকিক মঙ্গলজনক কর্ম্মাদি) উপেক্ষা করিয়া কাপালিকদের বেশ ধারণ করিয়াছে।

(কাপালিক সম্প্রদায়ের সাধকরা নৃকপালাস্থির দ্বারা নিম্মিত কুণ্ডল কর্ণে, হস্তে অলাবু পাত্র, কন্থা ধারণ, ভস্মে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত এবং গুরুদত্ত দ্বাদশ গুণ সূত্রে বাঁধা 'দণ্ড' হস্তে এবং মস্তকে বস্ত্রখণ্ডের ঝুলনা থাকে। তাঁহারা একান্তে নিরঞ্জন আত্মার চিন্তা করিয়া থাকেন ও তাঁহাদিগের শিষ্যগণ গার্হস্থাশ্রম হইতে যাহা ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করে, তাহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।)

আমার মন প্রথমে রাসবিহারী কৃষ্ণকে পাইয়াছিল, পরে হারাইয়াছে তাই সেই বিষাদে দেহরূপ গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া কাপালিক ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যবৃন্দের সহিত বৃন্দাবন গিয়াছেন।

কাপালিকগণ কর্ণে শুভ্র কুণ্ডল ধারণ করে, আমার মন-রূপ-যোগী শ্রীকৃষ্ণের সু-মধুর লীলাবলীর সর্ব্বদা 'শ্রবণ' কর্ণাভরণ করিয়াছে। ভিক্ষা গ্রহণ ও তৃষ্ণার জল পান জন্য কাপালিকদের হাতে অলাবু পাত্র থাকে। আমার মনরূপ মহাবাউলে কাঁধেও ঐরূপ একটি ঝুলি আছে, "কোথায় কৃষ্ণ পাইব ? কখন পাইব ?" এইরূপ আশাই মনরূপ বাউলের ঝুলি। আর কৃষ্ণমাধুরী আস্বাদনের লালসাই তৃষ্ণা নিবারণের সেই পাত্র।

গায়ে দেওয়ার নিমিত্ত বাউলদের কাঁথা থাকে। আমার মনরূপ বাউলের (দশ দশার একদশা) 'চিন্তা' রূপ কাঁথা আছে। কাপালিক

গায়ে ভস্ম মাখে। তাহাতে তাহার শরীর মলিন হয়। আমার মন বাউলের কৃষ্ণবিরহে রজে গড়াগড়ি দিয়া শ্রীঅঙ্গ মলিন।

মনরূপ বাউলকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? কোথায় যাইতেছ? তাহা হইলে সে 'হা হা কৃষ্ণ' বলিয়াই উত্তর দেয়। প্রশ্নের সঙ্গে এই উত্তরের সম্বন্ধ থাকে না। অর্থাৎ প্রলাপই তাহার উত্তর।

কাপালিকদিগের হাতে যেমন 'দ্বাদশ' নামক দণ্ড থাকে, আমার মনরূপ বাউলের হাতেও তদ্রূপ 'উদ্‌বেগ' রূপ দণ্ড আছে। কাপালিকের মাথায় যেমন ঝুলুনি—আমার মনরূপ বাউলের শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির নিমিত্ত চঞ্চলতা বা 'লোভ'* রূপ ঝুলুনি আছে।

কাপালিকদিগকে পরের ঘরে ফল মূল অন্নাদি ভিক্ষা করিয়া দেহ রক্ষা করিতে হয়। ভিক্ষা না মিলিলে তাহাদিগকে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকিতে হয়, একারণ, তাহাদিগের শরীর কৃশ হয়। আমার মনরূপ বাউলের ভক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গুণ-রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ এই ভিক্ষা প্রত্যহ পর্য্যাপ্ত মিলে না। তাই শ্রীঅঙ্গের কৃশতা।

কাপালিকগণ লোকালয়ে বিচরণ কালে তর্জ্জা (যথা শ্রুত অর্থে যাহা বুঝায় প্রকৃত অর্থ তাহা অপেক্ষা অন্য অর্থবোধ বাক্য) আবৃত্তি করিয়া থাকেন। আমার মনরূপ বাউল বহুবিধ অর্থসমন্বিত ব্রজ-লীলা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের শ্লোকাবলী আবৃত্তি করে।

'দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহাবাউল নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিল গমন;
মোর দেহ স্বসদন, বিষয় ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন।'

—চরিতামৃত অন্ত্য ১০ম

* তৃষ্ণা, লোভ ও আশা—

কোথায় ইষ্টবস্তু পাইব, কখন পাইব, মনের এইরূপ ভাবকে 'আশা' বলে। ইষ্টবস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত যে ইচ্ছা তাহাকে 'তৃষ্ণা' বলে। আর ইষ্ট বিষয়ে, বা ইষ্টবস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত যে মনের চঞ্চলতা তাহাকে 'লোভ' বলে।

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় সর্ব্বদা মনের অধীন শিষ্যবৎ। সে কারণ কাপালিকদিগের যেমন শিষ্য থাকে তদ্রূপ দশ ইন্দ্রিয় মনরূপ বাউলের শিষ্য। কাপালিকগণ নিজেদের গৃহ ও গৃহস্থিত ধন সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া বনে যায়। আমাদের দেহই মনের গৃহ। আমার মনরূপ বাউল এই শ্রীঅঙ্গ ত্যাগ করিয়া কাপালিক হইয়াছে।

কাপালিকরা বনে যায়। আমার মনরূপ বাউল রাই-কানুর বিলাসভূমি বৃন্দাবনে গিয়াছে। কিন্তু 'মহাবাউল'। (অর্থাৎ শাস্ত্র বর্ণিত দিব্যোন্মাদের উন্মাদ দশারও চমৎকারী কোন এক অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।) মনরূপ ঐ 'মহাবাউল' দশার আনুগত্যে বা পরিচালনায় ইন্দ্রিয়গণও মহা উন্মাদবৎ আচরণ করিতেছে। যথা—

চক্ষু যে কোন বস্তুতেই নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, সেই বস্তুর রূপ দেখিতে পায় না, দেখে রাসবিহারীর লীলা, কেহ কোন কথা বলিলে কর্ণ সে কথা শুনিতে পায় না সে শোনে বংশীনাদ ও কৃষ্ণের নর্ম্মবচন। কোন জিনিষের গন্ধ নাকে প্রবেশ করিলে নাসা সেই জিনিষের গন্ধ বুঝিতে পারে না সে শ্রীকৃষ্ণঅঙ্গ গন্ধই অনুভব করে। এইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দশা। আমার মহা উন্মাদ মনরূপ বাউল বৃন্দাবন গিয়াছে।

'বৃন্দাবনে প্রজাগণ যত স্থাবর জঙ্গম
বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন ফলমূল পত্রাশন
এই বৃত্তি করে শিষ্য সনে॥'

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৪শ

আমার মনরূপ মহাবাউল তাহার শিষ্য ইন্দ্রিয়গণের সহিত ভিক্ষাবৃত্তিতে স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতাদির দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে।

কৃষ্ণ-অনুরাগিণী ব্রজরামাগণ চক্ষুদ্বারা অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় বংশী-বদন শ্যামরূপ, কর্ণদ্বারা রাসবিহারীর মধুর বচনামৃত, মুরলীনাদাদি; নাসিকা দ্বারা কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের সৌরভ, জিহ্বা দ্বারা অধর-রস, চর্ব্বিত তাম্বুল ও অধরামৃত, ত্বক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গাত্র স্পর্শ ও শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা নিজ নিজ গাত্র স্পর্শ এই সব অপ্রাকৃত অমৃত নিরন্তর আস্বাদন করেন। আমার মনরূপ বাউল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক যে পাঁচটি শিষ্য আছে। তাহারা শ্রীকৃষ্ণ কান্তাদের ভুক্তাবশেষ ভিক্ষা করিয়া আনে। মনরূপ বাউল তাহাতেই জীবন ধারণ করে।

নির্জ্জন কুটিরে কাপালিকবৃন্দ যেমন শিষ্যসহ মহা যোগ অভ্যাসে রত থাকেন আমার মনোরূপ বাউল শিষ্যগণ সহ শূন্য কুঞ্জমন্দিরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সঙ্গ পাইবার লোভে সমস্ত রাত্রি জাগরণে কাটায়। চক্ষু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে শ্রীকৃষ্ণ রূপমাধুরী দর্শন নিমিত্ত। কর্ণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে সু-মধুর কণ্ঠস্বর পাইবার নিমিত্ত। নাসিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে শ্রীঅঙ্গগন্ধ পাইবার নিমিত্ত। জিহ্বা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অধরসুধা পানের জন্য। ত্বক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কোটি চন্দ্র সুশীতল অঙ্গ স্পার্শ লাভের জন্য—যদি বা কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হন এই আশা।

কৃষ্ণ বিরহে আমার মন দেহ শূন্য করিয়া কাপালিকদের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে।

এইরূপ নিজের অবস্থা বর্ণনান্তে গম্ভীরাবিহারী গৌরহরি নীরব হইলেন।

বিরহ জ্বালা উপশমের একমাত্র ঔষধ বা উপায় 'মিলন প্রসঙ্গ'। একারণ, স্বরূপ ও রামরায় পর্য্যায় ক্রমে কৃষ্ণলীলা গান ও কর্ণামৃত, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জগন্নাথ বল্লভ নাটক আদি গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। এই ভাবে প্রায় অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইলে পর রামরায় ও স্বরূপের মনে হইল যেন গৌরহরির কিছু বাহ্য-জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। তখন তাহারা

গৌরহরিকে ভিতর প্রকোষ্ঠে শয়ন করাইলেন। রামরায় বিশ্রাম জন্য নিজ গৃহে গমন করিলেন। গোবিন্দ এবং শ্রীরঘুনাথ সহ 'স্বরূপ' গম্ভীরার দরজার নিকট বাহিরে শয়ন করিলেন।

('মহামন্ত্র' নামে পূর্ব্বরাগ হইতে সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান পর্য্যন্ত প্রতিটি অবস্থা মূর্ত্তি ধরিয়া অবস্থান করিতেছেন।) গৌরহরি (সমস্ত) রাত্রি জাগিয়া একাকী উচ্চৈঃস্বরে 'নাম' করিতে লাগিলেন।

ক্লান্তিতে স্বরূপ, রঘুনাথ এবং গোবিন্দ তিন জনেই কিছু সময়ের জন্য নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের যখন নিদ্রাকর্ষণ ঘটে তখন পর্য্যন্ত তাঁহারা গৌরহরির উচ্চনাম সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়াছেন। স্বরূপ চেতনা পাইয়া অনুভব করিলেন যে গৌরহরির উচ্চ নাম সংকীর্ত্তন বন্ধ হইয়াছে। তিনি মনে করিলেন আমাদের ভাগ্যে হয়ত গৌরহরি একটু শয়ন করিয়াছেন। নিজের অনুমান সত্য কি না তাহা নিশ্চিত-রূপে নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গৌরহরির শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন বিছানায় বা শয়ন কক্ষ মধ্যে গৌরহরি নাই। আশ্চর্য্যের ঘটনা। বিরাট বাড়ী। তিনটি বড় বড় প্রাচীর লঙ্ঘন করিলে তবে বাহিরে যাওয়া যাইবে। সমস্ত দরজাই শৃঙ্খল-অর্গলে আবদ্ধ। তিনি উদ্বিগ্ন চিত্তে গোবিন্দ ও রঘুনাথকে জাগাইলেন। প্রদীপ জ্বালা হইল। প্রথমে উঁহারা গম্ভীরার অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। তাহার পর ব্যাকুল প্রাণে রাস্তায় নামিলেন। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তরে একস্থানে গৌরহরির শ্রীবিগ্রহ ধূলায় লুণ্ঠিত। ঐরূপ অবস্থায় পতিত রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহাদের বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন মন আরও কৌতূহলাক্রান্ত হইল। তাঁহার তাৎকালীক অবস্থা দেখিয়া আরও ব্যাকুল হইলেন। দাস রঘুনাথ সে দৃশ্যের যে দর্শন ও অনুভব করিয়াছিলেন তাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের অক্ষরে আজও ধরা আছে। যথা—

'প্রভু পড়িয়াছে দীর্ঘে হাত পাঁচ ছয় ;
অচেতন দেহ, নাশায় শ্বাস নাহি বয় !'

(প্রভুর দেহ মাটিতে পড়িয়া আছে। দেহ পাঁচ ছয় হাত লম্বা হইয়া গিয়াছে। দেহে বুঝি চেতনা নাই। নাসায় বুঝি শ্বাসও বহিতেছে না।)

'একেক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন হাত ;
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন, চৰ্ম্ম আছে মাত্র তাত।'

(কেবল যে দেহই পাঁচ ছয় হাত লম্বা হইয়াছে তাহা নহে ; প্রভুর দু'টি হাত এবং দু'টি চরণ তিন তিন হাত পরিমাণ লম্বা হইয়া গিয়ছে। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে হাতের কনুই, বাহুমুল, গ্রীবা, কটি, প্রভৃতি সর্ব্বস্থানে যে সকল অস্থি গ্রন্থি আছে সে সমস্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে। প্রতিটি সন্ধি কেবল চর্ম্ম দ্বারাই মাত্র অস্থির সহিত যোগ রহিয়াছে। কিন্তু দুইখানা অস্থির মধ্যে অনেকটা ফাঁক হইয়া গিয়াছে।) যথা—

"হস্ত-পদ-গ্রীবা-কটি-সন্ধি যত ;
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত।"

(প্রভুর হস্ত, পদ, গ্রীবা, কটি, প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে যত অস্থি গ্রন্থি আছে প্রত্যেকটিতেই অস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান শিথিল।)

"চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা ;
দুঃখিত হইলা সভে প্রভুকে দেখিয়া।"

(অস্থি সন্ধির উপরে কেবল চর্ম্মই লম্বা হইয়া দুইখানা অস্থির সংযোগ রাখিয়াছে। প্রতি গ্রন্থির চর্ম্মও এক বিঘত লম্বা হইয়াছিল।)

এ দৃশ্য দর্শনে স্বরূপ রঘুনাথ ও গোবিন্দ কিরূপ দুঃখ দশা প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনার ভাষা হয় না। (রাস রজনীতে বিজন বনে কৃষ্ণ পরিত্যক্ত শ্রীরাধায় এরূপ দশা প্রকট হয় নাই এবং তাহার দর্শনে চন্দ্রাবলী আদি নিখিল কৃষ্ণকান্তাদেরও এত দুঃখ হয় নাই।)

'মুখে লালা ফেনা প্রভুর উত্তান নয়ন ;
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ।'

(প্রভুর মুখ হইতে প্রচুর পরিমাণে লালা নিঃসৃত হইয়া ফেনের আকার ধারণ করিয়াছে। চক্ষুর তারা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এইরূপ হৃদয় বিদারক দৃশ্য দর্শনে স্বরূপাদির প্রাণ মন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রভুকে উঠাইতে যাইয়া নিজেরাই আকুল আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া প্রভুকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

মহাধীর ও বিচক্ষণ স্বরূপ প্রভুর বাহ্য সম্পাদনের জন্য তাঁহার কর্ণের নিকট উচ্চৈঃস্বরে মুহুর্মুহু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে লাগিলেন। দীর্ঘ সময়ের পরে সেই কৃষ্ণ নাম গৌরহরির হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তিনি মুখে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে বলিতে চমকিত দৃষ্টি করিয়া উঠিলেন। যে ভাবের বিক্রমে অস্থি গ্রন্থি সমূহ শিথিল হইয়াছিল, বাহ্যজ্ঞান হওয়াতে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। শ্রীঅঙ্গটি আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

বাহ্য জ্ঞান লাভের পর নিজেকে ও স্বরূপ, রঘুনাথ ও গোবিন্দকে রাত্রি কালে সিংহদ্বারে ঐ অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমরা এখন কোথায়? তোমরা এখানে কি করিতেছ?"

স্বরূপ বলিলেন, "উঠ! বাড়ী চল! সেখানে সমস্ত জানাইব।" এই বলিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ নিজেরা ধরিয়া বাসায় আনিলেন। পারে পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা তাহাকে জানাইলেন। স্বরূপের মুখে নিজের অবস্থার কথা শুনিয়া বলিলেন—

'কি আশ্চর্য্য! কি হইয়াছে কি করিয়াছি আমার কিছুই মনে পড়িতেছে না। এই মাত্র মনে আছে যে, দেখিলাম শ্রীকৃষ্ণ আমার

সাক্ষাতে বিদ্যমান। তাহাও অতি অল্প সময় জন্য (বিদ্যুৎ চমকিতে যতটুকু সময় লাগে।)

এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে এমন সময় নিশান্তে জগন্নাথদেবকে জাগাইয়া আচমনান্তে যে শঙ্খ বাজান হয়, তাহা বাজিয়া উঠিল। স্নানাদি নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া গৌরহরি সেবকদের সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করিলেন।

এই লীলা বর্ণনার অন্তে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজ অনুভব অকপটে বলিয়াছেন। যথা—

এইত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার ;
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার।

**লোকে নাহি দেখে, ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি ;
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসীচূড়ামণি।**

শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয় ;
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয়।

**রঘুনাথদাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি ;
তার মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি।**

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৪শ

চতুর্থ চিত্র

(শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর)

'চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে ;
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে।'

—চৈঃ চঃ মধ্য ২য়

গম্ভীরার গুপ্তনিধি গৌরহরি প্রত্যহই সমুদ্র বারিতে স্নান করিতে যান। একদা সমুদ্র গমনের পথের অদূরে অবস্থিত চটক পর্ব্বতের (বালুকা স্তূপ) প্রতি হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। (নিরন্তর) দিব্য স্ফূর্ত্ত অবস্থায় এই বালুকা পর্ব্বতটিকে দেখিলেন ব্রজের 'গোবর্দ্ধন পর্ব্বত'। এবং শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতে মুগ্ধচিত্তা গোপীর আবেশে 'গোবর্দ্ধনের' সৌভাগ্য বর্ণনার একটি শ্লোকরত্ন উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি ছুটিয়া চটক পর্ব্বত অভিমুখে চলিলেন।

শ্লোকরত্নটি ঃ—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো,
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগেণয়ো স্তয়ো-র্যৎ,
পানীয়সূযবসকন্দর কন্দমূলৈঃ ॥

—ভাঃ ১০।২১।১৮

(অনুবাদ ঃ—সখি! এই অদ্রি ('পর্ব্বত) গোবর্দ্ধন হরিদাস-বৃন্দের মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেহেতু রাম ও কৃষ্ণের চরণ স্পর্শে হৃষ্ট হইয়া উত্তম জল ও কোমল তৃণ দ্বারা গোগণ ও গো-বৎসগণের সেবা করিতেছেন। আবার, উপবেশন ও ক্রীড়া নিমিত্ত গুহা, কন্দ, মূল, ফল, ফুল, রত্ন আদি দ্বারা সখা ও সখিবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।)

গৌরহরি বায়ুর ন্যায় দ্রুতবেগে ঐ চটক পর্ব্বত অভিমুখে ছুটিলেন। ঐ অবস্থা দর্শনে গোবিন্দ ও রঘুনাথ ব্যাকুল হৃদয়ে, উচ্চ চীৎকার করিয়া ঘটনাটিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। গৌরহরির শ্রীঅঙ্গটিকে কোনরূপ আঘাত হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গোবিন্দ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। তাঁহার সঙ্গ পাইতেছেন না। চারিদিক সোরগোল হইল—

"মহাপ্রভু ছুটিতে ছুটিতে কোথায় গেলেন?"

ভক্তবৃন্দ যিনি যেখানে ছিলেন, গৌরহরি যে দিকে গিয়াছেন, সকলে সেই দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে আছেন—স্বরূপ, জগদানন্দ, গদাধর পণ্ডিত, রামাই, নন্দাই, শঙ্কর পণ্ডিত, পরমানন্দ পুরী, ভারতী গোসাঞি, কাশীশ্বর ও 'রঘুনাথদাস'। খঞ্জ ভগবান আচার্য্য, তিনিও ধীরে ধীরে চলিয়াছেন।

প্রেমাবেশে গৌরহরি প্রথমে খুব দ্রুত ছুটিতেছিলেন কিছু দূর যাওয়ার পর অভূতপূর্ব্ব স্তম্ভ ভাবের উদয় হওয়ায় তিনি আর চলিতে পারিলেন না। পরবর্ত্তী অবস্থায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে যে অবস্থা হইল, সে লীলার প্রর্ত্যক্ষ দ্রষ্টা দাস গোস্বামীর বিবরণ কবিরাজ গোস্বামীর লিপিতে আজও সাক্ষী দিতেছে। যথা—

'প্রতি লোমকূপে মাংস ব্রণের আকার;
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার।'

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৪শ

অশেষ বিশেষে আস্বাদনময় লীলায় ভাবনিধি গৌরহরির 'পুলক' উদ্গমে প্রতিটি রোমকূপের মাংস ফুলিয়া ফোঁড়ার মত হইয়াছে। তাহার উপরে রোমের শিহরণে রোমরাজি কণ্টকের আকার ধারণ করিয়াছে। ফলে, প্রতিটি রোমকূপ কদম্ব পুষ্পের আকার ধারণ

করিয়াছে। রোমগুলিকে কদম্ব পুষ্পের কেশরের মত দেখাইতেছিল। অদ্ভুত! অপূর্ব্ব!

আবার—

'প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার;
কণ্ঠ ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার।'

অর্থাৎ, প্রতি রোমকূপ হইতে এত অধিক পরিমাণে এবং এত বেগে ঘর্ম্ম বাহির হইতেছিল যে ঘর্ম্মের সহিত রক্তের ধারাও দেখা যাইতেছিল। এবং কণ্ঠ হইতে অনন্তুভূত ঘর্ঘর শব্দ,—কোন অক্ষর উচ্চারিত হইতেছিল না।

আবার—

'দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার;
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা যমুনা ধার।'

দুইটি নয়নের ধারা দেখিয়া মনে হয় একটি গঙ্গার ধারা, অপরটি যমুনার ধারা। উভয় নয়ন কমল ভাসাইয়া যেন সমুদ্ররূপ চরণ কমলে মিলিত হইল।

আবার—

'বৈবর্ণ্য শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ;
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ।'

এমন বৈবর্ণ দশা যে, গৌরহরির সু-উজ্জ্বল স্বর্ণ কান্তি শঙ্খের মত সাদা মনে হইল। সেই শ্রীঅঙ্গে প্রবল কম্পন। এ কম্পনের মাধুর্য্য উপমা দ্বারা আমাদের বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা—

সমুদ্রের জল তর তর করিয়া মধুর ছন্দে অনবরত কাঁপে। গৌরসুন্দরের শ্রীঅঙ্গও নয়নাভিরাম ছন্দে থর থর করিয়া অনবরত কাঁপিতেছিল।

গোবিন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া আসিতে আসিতে আমাদের 'রঘুনাথ' উপরি বর্ণিত দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে অতঃপর দেখিলেন—

'কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা।'

কাঁপিতে কাঁপিতে গৌরহরি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দও সেখানে পৌঁছিয়া জল পাত্রের জল গৌরহরির শ্রীমুখকমল, নয়ন ও মস্তকে এবং সর্ব্ব অঙ্গে দিলেন। বহির্বাসের সাহায্যে শ্রীঅঙ্গে জলসিক্ত অঞ্চলের বীজন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দও আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। মহাপ্রভুর অবস্থা দর্শনে তাঁহারা সকলে কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

লোকে, কোন শাস্ত্রে কিম্বা ইতিপূর্ব্বে গৌরহরির শ্রীঅঙ্গেও এতাদৃশ আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক ভাব তাঁহারা দেখেন নাই। দাস গোস্বামীর এই অনুভবও কবিরাজ গোস্বামীর অক্ষরে ধরা আছে। যথা—

"প্রভুর অঙ্গে দেখ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার;
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার।"

আবাল্যাৎ গৌরহরির চরিত্রে দেখা যায় তাঁহাকে (অর্থাৎ রাইকানুর আশ্ মিটান স্বরূপকে) 'সুস্থ' করিবার মহৌষধি 'হরিনাম' অর্থাৎ চিন্ময় উপচারে সেবা।

স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ তাঁহার কর্ণের নিকট ব্যাকুল প্রাণে, মধুর উচ্চৈঃস্বরে 'নাম সঙ্কীর্ত্তন' করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার মূর্চ্ছিত শ্রীঅঙ্গ হইতে রজ, সিক্ত বসন সহযোগে অপসারণ করিয়া অপর একটি বস্ত্রে তাঁহাকে শয়ন করাইলেন এবং সু-শীতল জলদ্বারা সর্ব্ব অঙ্গ পুনঃ পুনঃ

সম্মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ যাবৎ 'মনের সেবা' শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন এবং 'শ্রীঅঙ্গের সেবা' সু-শীতল জলে অঙ্গ সম্মার্জ্জন ফলে, অকস্মাৎ 'হরিবোল' বলিয়া গৌরসুন্দর উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ঐ আনন্দময় অবস্থা দর্শনে সমাগত সেবক ও পার্ষদবৃন্দ মহা আনন্দ ও উল্লাসে চতুর্দ্দিক হইতে মঙ্গল সূচক 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্ত ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ এতক্ষণ যে লীলার দিব্য স্ফূর্ত্ত রসে মগ্ন ছিলেন তাঁহার অন্তর্ধানে দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যে লীলা দেখিতে চান তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। কিছু পরে একটু বাহ্য দশা আসিলে তিনি নিজ সেবক ও পার্ষদবৃন্দের উপস্থিতি অনুভব করিলেন। নিজ প্রাণ সখা স্বরূপকে চিনিতে পারিয়া প্রশ্ন করিলেন—

"গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহা আনিল ?"

এ বাক্য—

ক্রোধ, দুঃখ ও অভিমানের পরিচয় দেয়। পার্ষদবৃন্দ নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাঁহার চাঁদ বদন দর্শন করিতেছেন।

গলার স্বর আক্ষেপে ভরা গৌরহরি নিজেই বলিতেছেন—

"লীলাপরায়ণ কৃষ্ণ পাইয়াও দুর্ভাগ্যক্রমে সাধ মিটাইয়া তাহা দর্শন করিতে পারিলাম না।

আরও বলিলেন—

স্বরূপ ! এই স্থান হইতে আজ আমি গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, গোচারণের ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ আছেন কিনা তাহা সঠিক জানা। গোবর্দ্ধনে যাইয়া দেখিলাম তিনি একটি শিলার উপরে সুখে উপবেশন পূর্ব্বক বেণু বাজাইতেছেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া গিরি সানুদেশে ধেনুবৃন্দ বিচরণ করিতেছে।

এমন সময়ে তোমাদের কোলাহলে আমার সেই দিব্য স্ফূর্তি অন্তর্হিত হইল।

অতপর ক্রোধে বলিলেন—

'কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে ?
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে।'

তাহার পর অভিমানে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে অভিমানে কাঁদিতে দেখিয়া স্বরূপাদি সকলেও ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। যথা—

"তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন"

এমন সময়ে পরমানন্দপুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন গৌরহরিরও পূর্ণ বাহ্য আবেশ ঘটিয়াছে। তিনি সম্ভ্রমে তাঁহাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। তাঁহারাও স্নেহালিঙ্গন দানে তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন। কৌতুকে গৌরহরি প্রশ্ন করিলেন—

"দোঁহে কেন আইলা এত দূরে ?"

তাঁহারাও পরিহাস বাক্যে জবাব দিলেন—

"তোমার নৃত্য দেখিবারে"

এ বাক্য শ্রবণে গৌরহরি লজ্জিত হইলেন।

অতঃপর সকলে মিলিয়া সমুদ্র স্নানে গমন করিলেন। সেদিন মধ্যাহ্নে সকলে গৌরহরির আবাসেই প্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন।

'স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা,
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা।'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪শ

এই লীলা বর্ণনার অন্তে কবিরাজ গোস্বামী নিজ অনুভব বলিয়াছেন। যথা—

"এবে প্রভু যত কৈল অলোকিক লীলা ;
কে বুঝিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা ?

সংক্ষেপ করিয়া করি দিকদরশন।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪শ

— ———

পঞ্চম চিত্র

(শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর)

প্রতি দিনের মতই অতি প্রত্যুষে নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া গোবিন্দ আদি সেবকবৃন্দের সঙ্গে গম্ভীরার গুপ্তনিধি শ্রীগৌরসুন্দর যেমন জগন্নাথ দর্শনে যান তেমনি যাইতেছেন। তাহারই মধ্যে এক দিন এক অভাবনীয় ভাবের আবেশে গৌরহরি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া একক জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন। সিংহদ্বারের 'দলাই' বা দ্বারপাল গৌরসুন্দরের দর্শন মাত্রেই তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিল। গৌরসুন্দরের কোন বাহ্যানুসন্ধান নাই। তিনি পরম স্নেহভরে দ্বারপালের হাত দুখানি ধরিয়া সকাতরে বলিলেন—

"সখি! আমার প্রাণবল্লভ কোথায়? আমাকে একবার দেখাইয়া আমার প্রাণরক্ষা কর।"

'রাই-কানুর আশ্-মিটান-স্বরূপ' গৌরহরির মনের ভাব (যেন) তাঁহার মনোচোরা কৃষ্ণের সন্ধান দ্বারপাল বেশে সখিটি জানেন। ভাগ্যবান দ্বারবান কিন্তু গৌরহরিকে উত্তমরূপে জানে ও চেনে। তাই গৌরহরির কথা শুনিয়া দ্বারপাল নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিল। পরম সম্ভ্রমে বলিল,—

"সখি! তোমার ব্রজেন্দ্রনন্দন এই মন্দিরেই আছেন। আমার সাথে এস দর্শন করাইয়া দিতেছি।"

গৌরহরি তখনও দ্বারপালের হাত ধরিয়াই আছেন, তাঁহার মুখে নিরন্তর সেই একই কথা,—

"সখি! আমার প্রাণনাথ কোথায়? দেখাইয়া (আমার) প্রাণ রাখ।"

দ্বারপালের হাত ধরিয়াই তিনি জগমোহনে আসিলেন। গরুড় স্তম্ভের নিকট গৌরহরিকে দাঁড় করাইয়া দ্বারপাল গৌরহরির আবেশের পুষ্টির অনুকূল নিম্নস্বরে বলিল,—

"প্রভু! ঐ দেখ তোমার প্রাণনাথ শ্রীপুরুষোত্তম। এইখানে দাঁড়াইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তোমার প্রাণনাথকে মনের সাধে দেখ।"

গৌরহরির চঞ্চল দৃষ্টি সিংহাসনে শ্রীজগন্নাথদেবের বদন কমলে অর্পিত হইল। অনির্ব্বচনীয় দিব্য স্ফুরণে তিনি দেখিতেছেন—**'মুরলী বদন শ্রীকৃষ্ণ'**।

এমন সময় গোবিন্দ, রঘুনাথ আদি সেবকবৃন্দ তাঁহার সন্ধানে শ্রীমন্দিরে আসিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের পরাণনাথকে গরুড় স্তম্ভের নিকট দর্শন পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রয়োজন বোধে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের রক্ষা ও সেবার জন্য অদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া গৌরসুন্দরের শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব ভাবাবলী দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই লীলাটির 'গৌরব' ও 'গম্ভীরতা' আমাদের পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব। কেবল এইটুকু প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে,—ষোড়শ বর্ষব্যাপী নীলাচলবাসী সচল জগন্নাথ গৌরহরির অন্তরঙ্গ সেবক দাস গোস্বামী গৌরহরির অদর্শনের পর যখন শ্রীকুণ্ড তটে অবস্থান করেন, সেই সময় তাঁহার গৌর-বিরহ-ব্যাথা প্রশমনের জন্য স্বরচিত 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্তব কল্পতরু' বা গৌর-মিলন-প্রসঙ্গ নিত্য স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতেন তাহাতে ৭ম শ্লোকে এই লীলাটি স্থান পাইয়াছে।

ষষ্ঠ চিত্র

(শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর)

এ স্থলে বর্ণনীয় লীলারত্নটি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার বিরচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে অন্ত্য খণ্ডের ১৭শ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ঐ পরিচ্ছেদের বন্দনা শ্লোক,—

'লিখ্যতে শ্রীল-গৌরস্য অত্যদ্ভুতমলৌকিকং।
যৈ দৃ'ষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতং॥'

অন্বয় ঃ—শ্রীল গৌরস্য (শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের) অত্যদ্ভুতং ('শাস্ত্রে নাহি জানি') অলৌকিকং (এবং অলৌকিক) দিব্যোন্মাদচেষ্টিতং (রাই-কানু একীভূত স্বরূপের দিব্যোন্মাদ চেষ্টা) যৈঃ (যাহাদিগ কর্তৃক) দৃ'ষ্ট (দৃষ্ট হইয়াছে এবং এই অচিন্ত্য বিভুলীলা অন্যকে দর্শন করাইতে সমর্থ) তন্মুখাৎ (তাঁহাদের মুখে) শ্রুত্বা (শুনিয়া) লিখ্যতে (লিখিত হইতেছে)।

এক রাত্রির ঘটনা ঃ

(প্রতি রাত্রিতে গম্ভীরা গৃহের-নিধি গৌরহরির সহিত স্বরূপ ও রামরায় কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিতেন। এবং তাঁহাকে শয়ন করাইয়া বিশ্রামার্থে নিজেরা নিজ নিজ আবাসে যাইতেন। রামরায়ের নিজ ভবন জগন্নাথ বল্লভে এবং স্বরূপ থাকেন গম্ভীরার সংলগ্ন একটি কুটিরে। রঘুনাথ তাঁহারই সহচর।)

গম্ভীরা* অভ্যন্তরে শয়ন করিয়া গৌরহরি উচ্চ নাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন। গোবিন্দ গৌরহরির শয়ন কক্ষের বাহিরে শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ মধ্যেই গোবিন্দের নিদ্রাকর্ষণ ঘটিল।

এমন সময়ে, 'নিত্য-মিলনে নিত্য-বিরহ' 'মূর্ত্তিমান প্রেম বৈচিত্ত্য' স্বরূপ 'গৌরহরি' হঠাৎ শুনিলেন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি। অপ্রাকৃত অলৌকিক আকর্ষক সেই বেণুধ্বনি। তিনি বেণুধ্বনির দিক্ নির্ণয় করিয়া অগ্রসর হইলেন। (গৌরহরির শয়ন প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে যাইতে হইলে তিনটি ফটক পার না হইলে রাস্তায় আসা যায় না। চতুর্দ্দিকের সমস্ত প্রাচীরও উচ্চ উচ্চ। গৌরহরির সহজ পথ অবলম্বন করিয়া বাহিরে যাইবার (তখন) কোন উপায় ছিল না।) ভাবাবেশে সহজ পথে গমনের চেষ্টাও তাঁহার অনুসন্ধানে জাগিল না। তিনি এখন শাস্ত্র অগোচর 'মহাবাতুল'। তাই তিনি ছাদে উঠিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সদর রাস্তায় নামিলেন।

(গম্ভীরা মন্দির হইতে প্রায় এক 'ফার্‌লং' দূরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বার। গম্ভীরা হইতে সিংহদ্বার পর্য্যন্ত পথ কৃষ্ণ বেণুনাদে উন্মাদিনী গৌর-কিশোরী কি ভাবে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্রষ্টা কেহ ছিল না। এ কারণ সে সু-মধুর গমন ভঙ্গীর বর্ণনা গ্রন্থে অনুল্লিখিত।)

সিংহদ্বারের দক্ষিণে যে স্থানে তেলেঙ্গা (অন্ধ্র) দেশীয় গাভীগণ দিবা রাত্র ঘুরিয়া বেড়ায়—

সেই স্থান পর্য্যন্ত গিয়াই (সম্ভবতঃ) গৌরহরির বাহ্য আবেশ সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছিল। যাহা হউক—

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই গোবিন্দের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি

---

* যাঁহারা কাশী মিশ্রের আবাস শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মঠটি পুরীধামে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা 'গম্ভীরা' (গৃহ অভ্যন্তরে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ, বাংলাদেশে যাহাকে 'চোরা' কুঠরী বলা হয়) দর্শন করিয়াছেন।

গৌরহরির উচ্চ সংকীর্ত্তন শুনিতে না পাইয়া শঙ্কিত হইলেন। সর্ব্ব প্রথমে স্বরূপ গোস্বামীকে ডাকিয়া আনিলেন। যথা—

'স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া,'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৭শ

অতঃপর 'স্বরূপ' আসিয়া দীপ জ্বালিলেন। তিনি গোবিন্দ, 'রঘুনাথ' শঙ্কর আদি সেবকবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া গম্ভীরা মধ্যে সর্ব্বত্র গৌরহরির অন্বেষণ করিলেন। সন্ধান না পাইয়া তাঁহারা পথে নামিলেন। চতুর্দ্দিকে গভীর দৃষ্টি রাখিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সকলের চিত্ত তখন ব্যাকুলতায় ও উদ্বেগে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা ধীরে ধীরে সিংহদ্বারের দক্ষিণ দরজায় আসিলেন। তাঁহাদের গতি স্তম্ভিত হইল।

দেখিলেন—অদূরে তেলেঙ্গা গাভীবৃন্দের মধ্যস্থলে অলৌকিক দিব্যোন্মাদ চেষ্টায় কূর্ম্মাকৃতি ধারণ করিয়া গৌরহরি ধূলায় লুণ্ঠিত—পড়িয়া আছেন। কেবল অঙ্গ জ্যোতি দর্শনেই বুঝিলেন ঐ তাঁহাদের প্রাণের অধীশ্বর প্রভু। দিব্যস্ফূর্ত্তি ও অনির্ব্বচনীয় আবেশে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যাইতেছে না।

গৌরহরির অন্তরঙ্গ সেবক ও এই লীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা "দাস গোস্বামী"র দর্শন ও অনুভব শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর অক্ষরে ধরা আছে। যথা—

'পেটের ভিতর হস্ত-পাদ কূর্ম্মের আকার ;
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার।'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৭শ

অর্থাৎ—রাই-কানুর ভাব মিলিত বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের হস্ত, পদ সমস্তই (যেন) শ্রীঅঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়াছে। দূর হইতে তাঁহারা

দেখিতেছেন যেন একটি স্বর্ণ-উজ্জ্বল 'কচ্ছপ' পড়িয়া আছে। তাঁহার শ্রীমুখে অপার্থিব ফেনা, দেহে নয়নের অভিরাম অপরূপ রোমাঞ্চ আর নয়নে—নদীর স্রোতের ন্যায় বারিধারা। আরও দেখিলেন—

'অচেতন পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল ;
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ বিহ্বল।'
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৭শ

অর্থাৎ—সেই সোনার শ্রীঅঙ্গ ধূলায় লুণ্ঠিত এবং বাহিরে চেতনার কোন বিকাশ নাই। প্রথম দর্শনে মনে হইবে একটি স্বর্ণবর্ণ অপ্রাকৃত কুষ্মাণ্ড (কুমড়া)। 'মহাবাউল' গৌরহরির দিব্যোন্মাদ দশায় বাহিরে স্তব্ধতা। অন্তরে, কোন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দাধিক্য বশতঃ বিহ্বলতা। আর—

'গাই সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ;
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ।'

ঐ সব গাভীদের কি সু-দুর্ল্ভ সু-কৃতি !

'অদ্ভুত-দয়ালু চৈতন্য, অদ্ভুত বদান্য ;
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনি নাহি অন্য।'
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৭শ

সেই সব গাভীবৃন্দ সর্ব্বদিক হইতে ঐ অপরূপ দর্শন, মনোমদ অঙ্গগন্ধ গৌরহরিকে বেষ্টন করিয়াছে। অপ্রাকৃত রাজ্যের চমৎকারী সে শ্রীঅঙ্গগন্ধ 'গাভীবৃন্দ' লাভ করিতেছে। কি করুণা ! গাভীবৃন্দ মুহুর্মুহু তাঁহার শ্রীঅঙ্গের এই পরম উজ্জ্বল দশার ঘ্রাণ লইতেছে। তাহাদের এমন উন্মাদনা যে অশেষ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে গৌরহরির সন্নিকট হইতে তাড়ান যাইতেছে না।

গৌরহরির শ্রীঅঙ্গের সুস্থতা বিধান জন্য স্বরূপাদি সেবকবৃন্দ—'সেবক' স্বভাবে—

'অনেক করিল যত্ন না হইল চেতন ;
প্রভু উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ।'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৭শ

তাহার পর, গম্ভীরা প্রকোষ্ঠের প্রাঙ্গণে গৌরহরির শ্রীঅঙ্গ যথোচিত ভাবে স্থাপন ও লালন বা সু-শীতল বারি দ্বারা অভিষেক, অঙ্গ সম্মার্জ্জন, বীজন (বাতাস দেওয়া) আদি করিতে লাগিলেন। এবং পরম বিচক্ষণ, ধীর ও অনুভবী স্বরূপের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে 'নাম সঙ্কীর্ত্তন' করিতে লাগিলেন। এইরূপে বেশ কিছু সময় গত হইলে পর গৌরহরির ঐ অলৌকিক ভাবের সম্বরণ হইল। তিনি কিঞ্চিৎ বাহ্য দশা প্রাপ্ত হইলেন। তখন ধীরে ধীরে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এবং ক্ষণকাল পরে, তিনি উঠিয়া বসিলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর স্বরূপকে বলিলেন—

(স্বরূপ !) 'তুমি আমা আনিলে কতি ?'

গৌরহরি যে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন ইহা জানিয়া স্বরূপ মনে মনে আনন্দিত হইলেন। মুখে কিছুই বলিলেন না। স্বরূপের জবাবের অপেক্ষা না করিয়া গৌরহরিই বলিতেছেন—

"স্বরূপ ! শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-মন-উচাটনকারী বেণুধ্বনি শুনিয়া আমি বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। গোষ্ঠে বেণুবাদনপর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলাম। বেণুর সঙ্কেত পাইয়া শ্রীমতি অভিসার করিয়া কুঞ্জগৃহে আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতির (অপ্রাকৃত) আকর্ষণে কুঞ্জে আসিলেন। আমি কৃষ্ণের অনুগমন করিলাম। 'গমনই নটন, বচনই গান' যে কৃষ্ণ

তাঁহার বেশ-ভূষার মধুর ধ্বনি আমার কর্ণকে যেন সম্পূর্ণ হরণ করিয়া লইল। তথায়, শ্রীরাধা ও তাঁহার সখিবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণ সহিত মনোরম হাস্য নর্ম্মোক্তি ও পরিহাস বাক্যাদির মাধুর্য্য পাথারে যেন ভাসিতেছিলাম, এ হেন সময়ে তোমরা কোলাহল করিয়া বলাৎকারে আমায় এখানে আনিয়াছ।"

হায়! হায়! তোমরা এ কি করিলে?—

'শুনিতে না পাইনু সেই অমৃতসম বাণী!
শুনিতে না পাইনু ভূষণ মূরলির ধ্বনি!!'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৭শ

শকাব্দ ১৪৩৪ হইতে ১৪৫৫ শক পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী 'সচল জগন্নাথ' গৌরহরির বিচিত্র বিচিত্র লীলাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

'লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসী চূড়ামণি।'*

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৪শ

* শ্রীগুরু কৃপা প্রেরণায় আমাদের মনে জাগে যে কবিরাজ গোস্বামী এই পয়ার দ্বারে যেন আমাদের ইঙ্গিতে জানাইতেছেন যে,—

"শ্রীভগবানের যে কোন লীলাই হউক না কেন তাহা প্রথমে মর জগতে প্রকট হয়। এবং সেই সেই লীলা অন্তে, যথাকালে সেই লীলার গ্রন্থ ও লীলা অবলম্বনে শাস্ত্রাদি বিরচিত হয়। সুতরাং 'রাই-কানুর আশ্ মিটান' স্বরূপ গৌরহরির লীলা অধুনা অপ্রকট হইল। এখনো সে লীলার গ্রন্থ প্রণীত হয় নাই। সেই লীলার অন্যতম সাথী ও সাক্ষী দাস গোস্বামীর সেবক আমি মাত্র সূচনা দিতেছি। প্রভুর ইচ্ছায় যথাকালে শাস্ত্র প্রণীত হইবে।"

সপ্তম চিত্র

(শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর)

শরৎ ঋতুর শুক্লা তিথির জ্যোৎস্নায় ঝলমল একটি রাত্রি—

'মহারাস-বিলাসের-পরিণতি—বিলাস-বিবর্ত্ত-মূরতি' গৌরহরি নিজগণ সঙ্গে সমুদ্র তীরবর্ত্তী একটি মনোরম উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার অবস্থা কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

"রাত্রি দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে।"

তাঁহার সঙ্গে আছেন স্বরূপ, রামরায়, গোবিন্দ, 'রঘুনাথ', শঙ্কর আদি সেবকবৃন্দ। গৌরহরি কৌতুক দেখিতে দেখিতে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। ভাব অনুকূলে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির এক একটি পদ স্মরণ করিয়া কখনও তিনি নিজেই গান করিতেছেন, কখনো স্বরূপ বা রামরায় গান করিতেছেন। এবং তিনি তখন তন্ময় ভাবে নৃত্য করিতেছেন। আবার কখনও কর্ণামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন, আবার কখন বা রামরায় উচ্চারণ করিতেছেন। সে সময়ের 'অবস্থা' প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা দাস গোস্বামীর অনুভব, অক্ষরে ধরা আছে। যথা—

'কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি-উতি ধায় ;
ভূমে পড়ি কভু মূর্চ্ছা, কভু গড়ি যায়।'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮শ

রাস পঞ্চাধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকগুলির কিছু তিনি নিজে আবৃত্তি করিলেন এবং বাকীগুলি রামরায় দ্বারা আবৃত্তি করাইলেন। কিন্তু, প্রতিটি শ্লোকের অর্থ তিনি নিজে করিতেছেন। ঐরূপ শ্লোকের অর্থ

বর্ণন সময়ে গৌরহরির কখন হর্ষ, কখন শোক। এ সব, ভাব বিকার দাস গোস্বামী স্বচক্ষে দর্শন করিয়া কবিরাজ গোস্বামীকে শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক অনুভব করাইয়াছিলেন। এবং কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সে অনুভব ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

প্রথম অনুভব :

'কৃষ্ণেরে নাচাই প্রেমা, ভক্তেরে নাচাই ;
আপনি নাচয়ে,—তিনে নাচে এক ঠাঁঞি।'*

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

দ্বিতীয় অনুভব :

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন ;
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ॥'

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

তৃতীয় অনুভব :

'জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন ;
আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ।'

যাহা হউক, স্বরূপাদি সঙ্গে গৌরহরি কৌতুকে উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে প্রসঙ্গত নিম্নলিখিত শ্লোক রত্নটি আবৃত্ত হইল—

* চিত্ত আনন্দে উদ্বেলিত হইলে 'নৃত্য' প্রকাশ পায়। আত্মারাম, নির্ব্বিকার স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপ এবং যাঁহার আনন্দের এক বিন্দুর কণা জগতকে আনন্দে ডুবাইতে ও ভাসাইতে পারে তাঁহার চিত্তকেও আনন্দে উদ্বেলিত করিতে সামর্থ বা শক্তি ধারণ করে 'প্রেম'। রাসাদিলীলায় শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য প্রসিদ্ধ। (এই 'প্রেম' নৃ-লোকে হয় না। প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়, প্রাকৃত ভাষায় বর্ণনা হয় না। তবে হয় কিসে—কোন্ ভাষায়? হয়, ভাব বিভোর ভক্তের পুলকিত অঙ্গে এবং অপাঙ্গের অশ্রু তরঙ্গে। সু-নির্ম্মল নীরব অশ্রুর ভাষাতেই প্রেমের কিঞ্চিৎ পরিচয় সম্ভব।)

"তাভি র্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ—
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতু ॥"

ভা—১০।৩৩।৩১

এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—

(শারদীয়া মহারাসে রাস-ক্রীড়ায় যে শ্রম হইয়াছিল, জলকেলি দ্বারা সেই শ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে নিজ কান্তাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে অবতরণ করিয়াছিলেন।)

সহসা অদূরে অতীব মনোরম দৃশ্য সমুদ্র, গৌরহরির নয়নে যমুনা বলিয়া প্রতিভাত হইল। সঙ্গে সঙ্গেই—

'ঐ যমুনায় কৃষ্ণকান্তাদের সহিত রাসবিহারী জলকেলি করিতেছেন' ভাবিতে ভাবিতেই—

'যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা ॥'

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

এবং সমুদ্রে পতন মাত্রেই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল। তরঙ্গের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন তরঙ্গের স্রোতে ভাসিয়া যায়, গৌরহরির শ্রীঅঙ্গও তেমনি ভাসিয়া চলিতেছে। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ কখন ভাসিতেছে কখন ডুবিতেছে।

এ ঘটনাটি সহচরবৃন্দের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করিয়াই দ্রুত ঘটিয়া গেল। কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। অকস্মাৎ কি হইতে একি হইল? স্বরূপাদি এত লীলাতন্ময় হইয়াছিলেন যে অকস্মাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের অদর্শন তাঁহাদিগকে চমকিত ও বিভ্রান্ত করিল। এ দিকে গৌরহরির মহা আবিষ্ট শ্রীঅঙ্গ ভাসিতে ভাসিতে কোণার্কের দিকে চলিয়াছে। কখন

ডোবে কখন ভাসে। এ প্রসঙ্গে মহাগম্ভীর কবিরাজ গোস্বামী নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

‘কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট?’

এদিকে স্বরূপাদি সেবকবৃন্দ যখন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাদের জীবন সর্ব্বস্ব তাঁহাদের মধ্যে নাই, অকস্মাৎ অদর্শন হইয়াছেন, তখন তাঁহারা প্রথমে সেই উদ্যান মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। সেখানে না পাইয়া তাঁহাদের মনে প্রশ্ন জাগিল :—

প্রভু কি জগন্নাথ দর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে গেলেন? না কি মহা-উন্মাদ দশায় অন্য কোন উদ্যানে গিয়া মূর্চ্ছিত রহিলেন? না কি গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলেন? না কি নরেন্দ্র সরোবরে গেলেন? চটক পর্ব্বতেই গেলেন না কি? না কি কোণার্কের দিকেই গেলেন? হঠাৎ কোথায় গেলেন?

নিজেদের মধ্যেই পৃথক পৃথক দল হইয়া সম্ভব অসম্ভব সর্ব্বস্থানে খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি শেষ হইল। গৌরহরির কোন সন্ধান মিলিল না।

তাঁহাদের মনে শঙ্কা জাগিল, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের মধ্যেই অবস্থান করিতে করিতে তিনি কোথায় বা কতদূর যাইতে পারেন? তাঁহারা বন্ধু হৃদয়ের স্বভাবেই—

‘অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিশ্চয়ই করিল।’

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮শ

তখন সকলে সমকালে উচ্চৈঃস্বরে হৃদয় বিদারক ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে গৌরহরির কৃপায় ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক ‘গৌরগুণ’ স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহারা সমুদ্র তীরে উপনীত হইলেন। এখন প্রভাত হইয়াছে। কয়েক মূর্ত্তিকে চিরাই

পর্ব্বত অভিমুখে পাঠাইয়া গোবিন্দ ও রঘুনাথ সহ স্বরূপ সমুদ্র তীরে তীরে গৌরগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে চলিলেন।

কিছুক্ষণ পরে স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ দেখিলেন অদূরে তাঁহাদের বিপরীত গতি হইতে জাল স্কন্ধে এক ধীবর আসিতেছে। তাহার পা দুটি টলিতেছে। সে কখন উন্মত্তের ন্যায় হাসিতেছে, কখন বা কাঁদিতেছে, কখন বা গান করিতেছে। মাঝে মাঝে 'হরি হরি' শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। ঐ জালিয়ার আচরণ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন! নিকটে আসিলে সেই জালিয়াকে স্বরূপ গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তোমার এইরূপ অবস্থা কেন? পথে কোন লোককে দেখিয়াছ কি?

ধীবর জবাবে বলিল—'পথে কোন লোক দেখি নাই। এখন আমার এ অবস্থা কেন, তাহা শুনুন্। আমি জাল বাহিতেছিলাম। হঠাৎ খুব ভারি বোধ হইল। অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত—

'বড় মৎস্য বলি আমি উঠাইল যতনে;'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮শ

যথন জালে আবদ্ধ বস্তু আমার দৃষ্টি গোচর হইল, তখন সবিস্ময়ে দেখিলাম—(বাহ্যেন্দ্রিয়) সম্পূর্ণ চেষ্টা রহিত এক মনুষ্য শরীর। তাহা দর্শন মাত্রেই আমি বেশ ভয় পাইলাম। যাহা হউক, মাছ ধরার জালটিই আমার জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র উপায় সুতরাং জালটিকে খসাইয়া লইতে চেষ্টা করিলাম। সেই সময় আমার হাত জালে উঠান ঐ শরীরে স্পর্শ হইল। কি আশ্চর্য্য, সঙ্গে সঙ্গে আমার অবস্থা—

'ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্র বহে জল,
গদগদ বাণী মোর উঠিল সকল।'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮শ

ইহা ব্রহ্মদৈত্য কি ভূতের খেলা নিশ্চিত বলা যাইতেছে না। আরও অদ্ভুত কথা শুনুন্—

'দর্শন মাত্র মনুষ্যের পৈশে সেই কায়'

এখন সে শরীরটি যেমন দেখিয়াছি তাহা তোমাদের জানাইতেছি, শরীর খুব লম্বা পাঁচ হইতে সাত হাত পর্য্যন্ত হইতে পারে। এক একটি 'হাত' এক একটি 'পা' তিন তিন হাতের কম নয়। শরীরের বিভিন্ন স্থানের অস্থি সব আলগা হইয়া গিয়াছে। বাহিরের চামড়াই দেহটি ধরিয়া আছে। এবং ভয়ে—

'তাহা দেখি প্রাণ মোর নাহি রহে ধড়ে।'

আরও শুনুন্—

'মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান-নয়ন,
কভু গোঁ গোঁ করে, কভু রহে অচেতন।'
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮শ

এখনো সে ধীবরের বক্তব্য শেষ হয় নি। সে পুনরায় বলিতেছে—'আমাকে দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারেন যে আমায় ভূতে ধরিয়াছে। এখন আমি যদি মারা যাই তাহ'লে আমার স্ত্রী পুত্রের কি দশা হবে? ভাই সকল! সে ভূতের সব কথা বলা যাচ্ছে না। এখন আমি ওঝার নিকট চলেছি। দেখি! যদি সে এ ভূত ছাড়াতে পারে। আমি ধীবর। সুতরাং নির্জ্জনে ও রাত্রি-কালে মাছ ধরাই আমার বৃত্তি। আমার এতটা জীবন এই ভাবেই কেটেছে। যদি কখন দরকার মনে করেছি 'নৃসিংহ' নাম স্মরণ মাত্রেই ভূত, প্রেত, আদি ভয় সব দূরে পালিয়েছে। এবার দেখছি যে 'নৃসিংহ' নাম গ্রহণ করলে ভূতের প্রকোপ দ্বিগুণ বাড়ছে। বলব কি, সে শরীর এমন বিকট যে দেখা মাত্রই ভয় আসে।

তোমাদের নিষেধ করি সেখানে যেও না। আমার নিষেধ না শুনে যদি যাও, নিশ্চিত জেনে রাখ সে ভূত তোমাদের সকলকেই ধর্‌বে।' যথা—

'সাক্ষাৎ দেখিছ মোরে পাইল সেই ভূত ;
মুই মৈলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রী পুত ?

সেই ভূতের কথা ভাই! কহন না যায় ;
ওঝা ঠাঁই যাইছি যদি সে ভূত ছাড়ায়।

এক রাত্রে বুলি, মৎস মারিয়ে নির্জ্জনে ;
ভূত প্রেত আমায় না লাগে নৃসিংহ-স্মরণে।

এই ভূত নৃসিংহ-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে ;
তাহার আকার দেখিতেই ভয় লাগে মনে ;

ওথা না যাইও আমি নিষেধি তোমারে ;
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে।

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮শ

স্বরূপ গোস্বামী জালিয়ার বিবরণে বুঝিলেন—

জালিয়ার ভয়ের হেতুটি অপর কিছু নয়, তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ গৌরহরি। আর বিলম্ব না করিয়া এই জালিয়াকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর নিকট যাইতে হইবে। তাই, তিনি সুমধুর কণ্ঠে জালিয়াকে বলিলেন—

"আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে"

এই কথা বলিয়াই জালিয়ার বক্ষে ও হস্তে তাঁহার শ্রীহস্ত স্পর্শ করাইয়া মন্ত্র উচ্চারণের মত শ্রীগৌরাঙ্গ নাম বলিতে বলিতে তাহার দেহ ও

মনের ভয় থামাইয়া দিলেন। পরম ভাগ্যবান সেই জালিয়ার মাথায় শ্রীহস্ত স্পর্শ করিলেন। তাহার পর তাহার সৌভাগ্য দর্শনে আনন্দে তাহার পিঠে তিনটি চড় মারিয়া বলিলেন 'যাও! তোমার সব ভয় পলাইল। এখন স্থির হও।'—তাহার ভয় দূর হইল।

অতঃপর স্বরূপ গোস্বামী সেই ধীবরকে বলিলেন—

'ভাই, ধীবর! তুমি যাঁহাকে দেখিয়াছ তিনি তোমাদের 'সচল জগন্নাথ গৌরহরি'। তিনি কোন ভাবে বিভোর হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রেম বিকারের ফলে—

'অস্থিসন্ধি ছাড়ি হয় অতি দীর্ঘাকার।'

গৌরহরির শ্রীঅঙ্গে প্রেম বিকারের যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা জালিয়া ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। কিন্তু, 'গৌরহরি-স্বরূপ' সে বহুবার দেখিয়াছে। খুব ভাল ভাবে চেনে। এ কারণ, সে প্রত্যুত্তরে বলিল 'গোসাঞি আমি তাঁহাকে বহুবার দেখিয়াছি। এ অতি বিকৃত আকার—কখনই আমাদের 'সচল জগন্নাথ' নহেন।

স্বরূপ গোস্বামী বলিলেন—"ভাই, তুমি ত জান আমরা তাঁহার সঙ্গী। সুতরাং তাঁহার সকল অবস্থাই ভাল ভাবে জানি। তোমার বিবরণ শুনিয়া আমরা নিশ্চিত যে তিনিই তোমাদের 'সচল জগন্নাথ'।

স্বরূপের কথা শুনিয়া ধীবর আনন্দিত হইল। সকলকে সঙ্গে লইয়া, যে স্থানে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্থাপন করিয়াছিল, সেই স্থানে লইয়া গেল।

স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ দেখিলেন—

সমস্ত রাত্রি সমুদ্রের জলে অবস্থানের ফলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ অত্যন্ত শুভ্রবর্ণ হইয়াছে; অনির্ব্বচনীয় ভাবের ফলে তিনি মূর্চ্ছিত প্রায়,

শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অস্বাভাবিক বোধ হইতেছে। এমন অবস্থা যে তাঁহার চেতনা সম্পাদন না করিয়া বাসায় লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। সেবক গোবিন্দ কোটি মাতৃ স্নেহে প্রথমে গৌরহরির শ্রীঅঙ্গের আর্দ্র কৌপীন পরিবর্ত্তন করিয়া শুষ্ক ডোর কৌপিন পরাইলেন। তাহার পর শ্রীঅঙ্গের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা আদি সর্ব্ব অঙ্গ হইতে অতি পরিপাটির সহিত বালুকণা অপসারণ করিয়া একটি বহির্বাস উপরে তাঁহাকে শয়ন করাইলেন। তাহার পর সকলে মিলিয়া হর্ষ বিষাদে প্রেম বিগলিত হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বেশ কিছুক্ষণ নাম সঙ্কীর্ত্তন হইলে পর, গৌরহরির কর্ণে 'নাম' প্রবেশ করিল। এবং—

'হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল'

দিব্য ভাবাবেশ কিছু শিথিল হইল। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্বাভাবিক হইতে লাগিল। অর্দ্ধবাহ্য দশায় তিনি অবস্থা ও পরিবেশ বোধগম্য করিবার চেষ্টায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে মহাসাবধান কবিরাজ গোস্বামী আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন গৌরহরির শেষ দ্বাদশ বৎসর নীলাচল বাসে তাঁহার অবস্থা। যথা—

'তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল ;
'অন্তর্দ্দশা' 'বাহ্যদশা' 'অর্দ্ধবাহ্য' আর।'

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

(অন্তর্দ্দশা :—বাহিরের বিষয়ের, কি নিজের দেহের, কোন অনুসন্ধান বা স্মৃতি থাকে না। এক দিব্য স্ফুরণ অবস্থা। রাই-কানুর আশ্-মিটান স্বরূপের লীলাগ্রন্থ এবং লীলা অবলম্বনে শাস্ত্র প্রণীত হয় নাই, এ কারণ ঐ অন্তর্দ্দশার (এর) বেশী বর্ণনা নাই।

বাহ্যদশা :—সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান থাকে। শেষ দ্বাদশ বৎসরে এ অবস্থা খুবই ক্ষণস্থায়ী। এমন কি কোন দিন বাহ্যদশা থাকিতই না।

অর্দ্ধবাহ্যদশা :—অন্তর্দ্দশার ভাগই বেশী, বাহ্যদশার ভাগ অতি সামান্য, অর্দ্ধবাহ্যদশায় বাহিরের শব্দ কানে প্রবেশ করে মাত্র। কোন কোন সময়ে বাহিরের লোক দেখেও, কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারে না বা অতি কষ্টে চেনে। এই দশায় তাঁহার দিব্য স্ফূরণে যা যা দর্শন ঘটে সে সব বাক্যদ্বারা প্রকাশ পায়। তাঁহার ঐ কথাগুলিকে দিব্যোন্মাদে প্রলাপ বলা হয়। দিবা রাত্রির বেশীর ভাগ সময়ই এই অর্দ্ধবাহ্য দশায় কাটিত :

উপরে বর্ণিত অর্দ্ধবাহ্য দশায়, তিনি বলিতে লাগিলেন –

'কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন,
দেখি জলকেলি করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।'

– চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

তাহার পর দেখিতেছেন—

রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মিলি ;
যমুনায় মহারঙ্গে করে জল কেলি।'

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

অতঃপর সে স্থানে তাঁহার নিজের অবস্থান আদি বর্ণনা দিতেছেন—

'তীরে রহি দেখি 'আমি' সখীগণ সঙ্গে ;
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে।'

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

'এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে।'

'সে রঙ্গে' বাক্যটি অবলম্বনে শারদীয়া মহারাসে রাসনৃত্যাদির অন্ত্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণকান্তাদের যে জল-বিহার ও বন্যভোজন বর্ণনা আছে—তাঁহার শ্রীমুখে বর্ণনা ও শ্রীঅঙ্গের বিকার ও ভাবলীলা দ্বারা সে 'বিভু লীলাটি' সমুদ্র তীরে যেন প্রকট বোধ হইতে লাগিল।

অন্তে তাঁহার নিজের অবস্থা বর্ণন করিলেন—

'রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন।'

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

এমন সময়ে মহা কোলাহল করিয়া—তোমরা আমাকে এখানে আকর্ষণ করিলে। (দিব্য স্ফূরণে) যমুনা, বৃন্দাবন, কৃষ্ণ ও গোপীগণের দর্শন ও তাঁহাদের লীলা সুখে মগ্ন ছিলাম। তোমরা আমার সে সুখ ভঙ্গ করিলে।

এই পর্য্যন্ত 'প্রলাপে' বলার পর তাঁহার বাহ্য দশা দেখা দিল। তিনি স্বরূপকে চিনিলেন। তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—

'ইহা কেন তোমরা আমাকে লঞা আইলা?'

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

এতক্ষণ পরে, সময় ও সুযোগ বুঝিয়া স্বরূপ গৌরহরির শ্রীচরণে সজল নয়নে নিবেদন করিলেন—

"হে প্রাণনাথ! আমাদের জীবন সর্ব্বস্ব! গত রাত্রিতে উদ্যান ভ্রমণ রঙ্গে তোমার সঙ্গে আমরা সুখে অবস্থান করিতেছিলাম। হঠাৎ যমুনা ভ্রমে (আমাদের অগোচরে) তুমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া বাহ্য চৈতন্যশূন্য হইয়াছিলে। সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসিয়া এত দূর

আসিয়াছ। এই সুকৃতিবান ধীবরের জালে তুমি তীরে আসিয়াছ। তোমার স্পর্শে ঐ ধীবরের 'প্রেমদশা' নিজ চক্ষেই দেখ। রাস রজনীতে কৃষ্ণহারা ব্রজরামাদের দশা আমার জানা আছে। তাঁহাদের প্রদর্শিত উপায় অবলম্বনে—সমস্ত রাত্রি, তোমার অনুসন্ধানে, তোমার নাম-রূপ-গুণ লীলা কীর্ত্তন-সহ উচ্চ ক্রন্দনে আমাদের অতিবাহিত হইয়াছে। এই জালিয়ার মুখে তোমার সংবাদ পাইয়া, এখানে আসিয়া দেখি তুমি 'বাহিরে মূর্চ্ছিত'। ঐ অবস্থার মহৌষধি, উচ্চনাম সঙ্কীর্ত্তন করার ফলে তোমার অর্দ্ধবাহ্য দশা ফিরিল। সে দশায় তুমি তোমার সমস্ত নিশার মধুময় ভোগের কথা প্রলাপে বর্ণন করিলে। সে সব শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম।

অতঃপর স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের জীবন সর্ব্বস্ব গৌরহরিকে স্নান করাইয়া আনন্দিত মনে বাসায় আনিলেন।

লেখা বাহুল্য এ লীলারও আদ্যন্ত 'রঘুনাথ' দ্রষ্টা ও স্বরূপ আনুগত্যে সেবক।

অষ্টম চিত্র

"শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন—

'কহিবার কথা নহে কহিলে কেহ না বুঝয়ে
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।'

—চৈঃ চঃ মধ্য ২য়

একটি ঘটনা—

পণ্ডিত জগদানন্দ নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া অদ্বৈত আচার্য্যের একটি তর্জ্জা (প্রহেলিকা) গম্ভীরার গুপ্তনিধি গৌরহরিকে বলিলেন। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে গৌরহরি স্বরূপ রামরায়ের সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় নিমগ্ন হইলেন। অকস্মাৎ গৌরহরির শ্রীঅঙ্গে বিস্ময়কর বিরহ দশা উপস্থিত হইল। অর্দ্ধবাহ্য দশায় তাঁহার শ্রীমুখে প্রলাপ উদ্‌গত হইতে লাগিল। তিনি স্বরূপের কণ্ঠ নিজ সুকোমল বাহু দ্বারা বেষ্টন পুর্ব্বক বলিতেছেন—

সখি! নন্দবংশের মুখ উজ্জ্বলকারী শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? ময়ূর-পুচ্ছ ভূষিত কৃষ্ণ কোথায়? মধুরতায় ও গাম্ভীর্য্যে নূতন মেঘের ধ্বনিকে পরাজয়কারী মুরলীধর কোথায়? ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় স্নিগ্ধ ও সুন্দর কান্তি যাঁহার, তিনি কোথায়? রাস রস-তাণ্ডব নর্ত্তক কোথায়?

সে সখি! আমার প্রাণ রক্ষার ঔষধি কোথায়? হায়! হায়! আমার সুহৃত্তম, আমার গৌরবের সম্পত্তি তুল্য সে অমূল্যনিধি কোথায়?

এমন প্রিয়তমের সহিত বিয়োগকারী নিষ্ঠুর বিধাতাকে ধিক্!

গৌরহরি এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে বিষাদে 'হায়' 'হায়'

করিতে লাগিলেন। কেবল বলিতে লাগিলেন—'হা হা কৃষ্ণ! তুমি কোথায় গেলে?'

অন্যদিন রাত্রিতে এইরূপ দশা (অর্দ্ধবাহ্য) হয়। আজ দিবাভাগেই এ অবস্থা দেখিয়া স্বরূপ রামরায় চিন্তিত হইলেন। অভ্যাসের বশেই দিবসের নিত্যকৃত্যাদি সমাপন করিলেন। এইভাবে প্রায় পূর্ণ দিবস ও অর্দ্ধ রাত্রির কাছাকাছি সময় পর্য্যন্ত অর্দ্ধবাহ্যে গৌরহরির বিলাপ দশা চলিয়াছে। সুতরাং স্বরূপ বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। এই বিরহ দশার বিরতি ও গৌরহরির কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কিরূপে ঘটে তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বরূপ সুধা-কণ্ঠে, ভাব বিভোর হইয়া সজল নয়নে সু-মধুর স্বরে গান ধরিলেন—

'রাই! তুমি যে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি।
দিবা নিশি বসি গীত আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে।
তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্ব তলাতে থাকি।
শুন গো কিশোরী চারি দিকে হেরি
যেমন চাতক পাখী।
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি জ্ঞান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর।'

স্বরূপের কণ্ঠে এই গানটি শুনিয়া গম্ভীরাবিহারীর 'মহাবাউল' মন যেন কিছু সুস্থির হইল। তিনি পরম স্নেহভরে স্বরূপের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"প্রাণ সখা স্বরূপ ! এ কথাগুলি কি কৃষ্ণের সরল প্রাণের কথা ? কৃষ্ণ ত কপট চূড়ামণি, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করা যায় কি ?

দীঘল নয়নে চাহিয়া গৌরহরি নীরব রহিলেন।

এই ভাবের রাত্রির আরও কিছু সময় অতিবাহিত হইল। 'স্বরূপ' পরম স্নেহে গৌরহরিকে তাঁহার শয্যায় শয়ন করাইলেন। তাঁহার কৃপাদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক (বিশ্রামের জন্য) রামরায় নিজ আবাসে গমন করিলেন। সে রাত্রি সশিষ্য স্বরূপ ও গোবিন্দ গম্ভীরার গুপ্তনিধির শয়ন প্রকোষ্ঠের বাহিরে বিশ্রাম গ্রহণ জন্য শয়ন করিলেন।

সেদিন দিবাভাগ হইতেই গৌরহরির অনির্ব্বচনীয় উৎকট কৃষ্ণ-বিরহ আবেশ। অর্দ্ধরাত্রির পর স্বরূপের সুধাকণ্ঠের গীত শ্রবণে কিছু সময়ের জন্য তাঁহার 'মহাবাউল' মন স্থির হইয়াছিল। স্বরূপ রামরায় বিদায় লইবার পর আবার সেই উৎকট দশা ফিরিয়া আসিল। তাহা উত্তরোত্তর বাড়িতে বাড়িতে অচিন্ত্যনীয় একটি দশা উপস্থিত হইল। সেই দশায় গৌরহরি আর ক্ষণমাত্র স্থির রহিতে পারিলেন না। গম্ভীরা প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইবার নিমিত্ত মহা বাতুলের চেষ্টা গ্রহণ করিলেন। অন্ধকারে দরজা খুঁজিয়া পাইলেন না। দেওয়ালের বাধা দূর করিয়া বাহির হইবেন এই আশায় সমস্ত রাত্রি দেওয়ালে নিজ নাক, মুখ, ঠোঁট, গাল, কপাল ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কণ্ঠে অব্যক্ত গোঁ গোঁ শব্দ।

ঊষার আবির্ভাবের তখনও কিছু বিলম্ব ছিল, এমন সময় স্বরূপের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। শয়ন অবস্থাতেই তিনি অদ্ভুত গর্জ্জন গোঁ গোঁ

শব্দ শ্রবণ করিলেন। অতি ব্যস্ত ভাবে শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তিত মনে উঠিলেন। দ্বীপ জ্বালিলেন। গোবিন্দ ও রঘুনাথকে জাগাইলেন। পরে তিনি ও গোবিন্দ দীপহস্তে গৌরহরির শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন 'হৃদয় বিদারক দৃশ্য'। দর্শন মাত্রেই উভয়ে সমকালে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, গৌরহরির নাক, কান, ঠোঁট, গাল, কপাল, সর্ব্বস্থান ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। ঐ সমস্ত স্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছে। দেওয়াল ও মেঝেতে রক্তের দাগ।

বিষাদে ও স্নেহে তাঁহারা গম্ভীরা-বিহারীকে প্রথমে বিছানায় বসাইয়া সুস্থ করিলেন। আহত স্থানগুলি পরিষ্কার পূর্ব্বক যথা-বিধি ব্যবস্থা করিলেন। গোবিন্দ ও রঘুনাথ পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। স্বরূপও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের প্রাণকোটি প্রিয়-তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"প্রাণনাথ! তুমি এ কি করিয়াছ? কিরূপে তোমার চন্দ্রবদন এরূপ ক্ষত বিক্ষত হইল?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অপরূপ কণ্ঠে গৌরহরি স্খলিত বচনে ধীরে ধীরে বলিলেন---

"সখা স্বরূপ! তোমরা বাহিরে যাইবার পরই কেমন অস্থির হইয়া পড়িলাম। প্রবল উদ্বেগে এই গৃহ মধ্যে থাকা অসম্ভব বোধ হইল। তাড়াতাড়ি বাহির হইতে চেষ্টা করিলাম। অন্ধকারে দ্বার ঠিক করিতে পারি নাই। ব্যাকুলতায় চারিদিকে দ্বার উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিলাম। দ্বার না পাওয়ায় উত্তরোত্তর ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাহির হইয়া আমার প্রাণকৃষ্ণকে খুঁজিতে পারিলাম না। লাভের মধ্যে এই সব নাকে মুখে ক্ষত।"

বলিতে বলিতে 'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া তিনি পুনরায় নীরব হইলেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য ১৯শ পরিচ্ছেদে এই লীলা প্রসঙ্গটি বর্ণনা অন্তে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লীলাদ্রষ্টা দাস গোস্বামীর অনুভব প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

'উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন ;
যেই করে যেই বলে উন্মাদ লক্ষণ।'

———

নবম চিত্র

("শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর")

স্থান ঃ শ্রীধামপুরীতে অবস্থিত 'জগন্নাথ বল্লভ' নামক উদ্যান।

কাল ঃ বৈশাখ মাস। পূর্ণিমার রাত্রি।

ইহাও এক ঐতিহাসিক সত্য ঃ

সেদিন সন্ধ্যা সমাগমে ভাবনিধি গৌরহরি নিজ বাসা (গম্ভীরা) হইতে 'জগন্নাথ বল্লভ' উদ্যান অভিমুখে চলিলেন। তাঁহার অবস্থা দাস গোস্বামীর অনুভবে দেখা যাইতেছে—

'..................রাত্রি-দিবসে ;
প্রেমসিন্ধুতে মগ্ন রহি কভু ডুবে ভাসে।'

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৯শ

স্বরূপ, রামরায়, গোবিন্দ, 'রঘুনাথ', শঙ্কর পণ্ডিত আদি পার্ষদ ও সেবকবৃন্দও সঙ্গে আছেন। অপরূপ গমন লীলা রঙ্গে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই রাত্রির উদ্যানের শোভা—

'প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন ;
শুক-শারী-পিক-ভৃঙ্গ করে আলাপন।

পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয় পবন ;
গুরু হঞা তরু লতায় শিখায় নাচন।

পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল ;
তরুলতা জ্যোৎস্নায় সব করে ঝলমল।'

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৯শ

সে স্মৃতির চিত্র অদ্যাপি পুরীধামে (জগন্নাথ বল্লভ উদ্যান) বর্ত্তমান। তাহা দর্শন করিলে অনুমান করা শক্ত নয় যে ঐ সময় সত্য সত্যই এই উদ্যানের অবস্থা ভাব চক্ষুর দৃষ্টিতে বৃন্দাবনের ন্যায় মনোরম (প্রকৃতই) ছিল।

সপার্ষদ গৌরহরি উদ্যানে প্রবেশ করিয়া মনে করিলেন যে বসন্ত প্রধান ষড় ঋতু আবির্ভূত হইয়াছে। সমস্ত বৃক্ষ ও লতা প্রস্ফুটিত পুষ্প সমূহে মণ্ডিত হইয়া আছে। ফলবান বৃক্ষ সমূহ ফলভারে অবনত। শুক. সারী, ময়ূর, কোকিলাদি পক্ষীগণ স্থানে স্থানে মধুর কণ্ঠে শব্দ করিতেছে, কোথাও বা নৃত্য করিতেছে। ভ্রমরাবলি মধুর গুঞ্জন করিয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। দক্ষিণ দিক হইতে সুখ স্পর্শ বাতাস বহিতেছে। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে জ্যোৎস্না মণ্ডিত উদ্যান সর্ব্ব বিষয়ে মনোমুগ্ধকর হইয়াছে।

গৌরহরি উদ্যানের শোভা দর্শনে পুলকিত হইয়া মনের উল্লাসে স্বরূপকে গান ধরিতে ইঙ্গিত করিলেন ; স্বরূপ কালোচিত ধুয়া ধরিলেন—

"ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে-
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল কুজিত-কুঞ্জ-কুটীরে।
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে নৃত্যতি যুবতি জনেন
সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে।"

পদটি শুনিতে শুনিতে গম্ভীরা বিহারী গৌরহরির বসন্ত রাস নৃত্য আরম্ভ হইয়া গেল। তিনি প্রতি বৃক্ষ ও প্রতি লতার নিকট গমন করিয়া অপরূপ নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে গমন ও নৃত্য-ভঙ্গীর দৃশ্য দাস গোস্বামী স্বচক্ষে দর্শন করিয়া—কবিরাজ গোস্বামী

দ্বারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বাংলা পয়ারটি দেওয়া গেল। যথা·

'রসের উল্লাস ভরে অপরূপ নৃত্য করে
দুনয়নে বহে প্রেম ধারা।
অপরূপ সে মাধুরী স্মরণ করিয়া হরি
বারি বহে রাঙ্গা দুই নেত্রে॥

বসন্ত উৎসব কালে সেচন করয়ে জলে
যেন পিচকারী জলমন্ত্রে।

সকম্প আনন্দাবেশে দশনে অধর দংশে'

তাহার পর সবিস্ময়ে 'রঘুনাথ' প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—

'হেন প্রেম আছিল কোথায়?'

এ প্রশ্নের হেতু—

তিনি সচক্ষে দর্শন করিলেন—

'একবার যারে হেরে তার আঁখি মন হরে
মোর মন সতত মাতায়।'

গৌর-সুন্দরের অপরূপ নৃত্য ভঙ্গীতে লুব্ধ হইয়া রাসবিহারী কৃষ্ণই (যেন) অদূরে এক অশোক বৃক্ষ তলে হাসি মুখে, মধুর ত্রিভঙ্গিম-ঠামে দণ্ডায়মান। হঠাৎ ঐ কৃষ্ণ মূর্ত্তিটি গৌরহরির নয়নের সম্মুখ হইল। তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে কৃষ্ণ অভিমুখে ছুটিলেন। পরম কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ, গৌরহরিকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মধুর হাস্য প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করিলেন।

"এই এখনি কৃষ্ণের দেখা পাইলাম, হায় পুনরায় হারাইলাম"—এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে গৌরহরি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

অতঃপর অপরূপ ঘটনা ঃ

শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। কিন্তু, নিত্য নবায়মান তাঁহার শ্রীঅঙ্গের গন্ধ গৌরহরিকে অধিক পাগল করিল। তিনি অর্দ্ধবাহ্য দশায় বিলাপে বলিতেছেন—

সখি! আমার প্রাণ-কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের মনোহারিত্বের কথা আর কি বলিব! কিসের সঙ্গে তুলনাই বা দিব! কস্তূরী ও নীলপদ্মের মিলিত সুগন্ধে যে মধুর সুগন্ধের উৎপত্তি হয় তাহা শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গগন্ধের নিকট পরাজিত। অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধের তুলনা জগতে নাই।

'অনির্ব্বচনীয় সৌরভ' শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনকে ভরপূর করিয়া থাকে।

সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক এই অঙ্গ সৌরভ নারীর নাসায় প্রবেশ করিলে সে নারী আনন্দে নয়ন নিমীলিত করে।

সখি! শ্রীকৃষ্ণের মনোরম অঙ্গগন্ধ জগৎকে মত্ত করিয়া ফেলে। ইহা নারীর নাসায় প্রবেশ করিয়া সে চিত্তে স্থায়ী বাসা নেয়। আর যেন নাসায় রজ্জু দিয়া সে নারীকে কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়।

সখি! কমলকে কর্পূর দ্বারা লেপন করিলে ঐ কমলের যে সৌগন্ধ হয় শ্রীকৃষ্ণের নেত্রদ্বয়ে, নাভিতে, শ্রীবদনে, শ্রীকর যুগলে ও শ্রীচরণ যুগলে সেইরূপ অপূর্ব্ব শীতলতা স্নিগ্ধতা ও অপূর্ব্ব সুগন্ধ আছে।

সু-শীতল ও সুগন্ধি চন্দনের সঙ্গে অগুরু, কুঙ্কুম, কস্তূরী ও কর্পূরাদি মিশ্রিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গে লেপন করা হয়। ইহারা

প্রত্যেকেই 'সুগন্ধ'। ইহাদের মিলনে যে সুগন্ধ হয় তাহা অপূর্ব্ব। আবার, শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গের স্বাভাবিক সৌরভের সহিত এই সব সুগন্ধের মিলনে এক অনির্ব্বচনীয় সৌগন্ধের উদ্ভব হয়। ঐ অনির্ব্বচনীয় সৌগন্ধের শক্তির কথা বলি শোন—

"ডাকাইত" যেমন দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহস্বামীর সাক্ষাতেই গৃহের সমস্ত দ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া যায়—গৃহস্বামী কেবল অসহায় দর্শক হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় সৌগন্ধ, কুল-রমণীবৃন্দের নাসা-দ্বারে প্রবেশ করিয়া তাহাদের লজ্জা, ধর্ম্ম, কুল, শীল, সংযম—এক কথায় সর্ব্বস্ব ডাকাইতের ন্যায় লুণ্ঠন করিয়া লয়।

লজ্জা ধর্ম্মাদির আশ্রয়ীভূত গৃহরূপ দেহটিও হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণে অর্পণ করে। কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ গুরুজনের সাক্ষাতে তাঁহাদের কেশ বন্ধন, নীবীবন্ধন খসাইয়া দেয়—পাগলিনী করিয়া ছাড়ে।

'শ্রীকৃষ্ণ' অঙ্গগন্ধের অপ্রাকৃত মোহিনী, যথেষ্ট পরিমাণে আস্বাদন করিয়াও নাসার আশা মিটে না। গন্ধ পাইলেও নাসিকার তৃষ্ণার শান্তি নাই ; কিন্তু যদি না পায় তখন তো নাসার যেন তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া মরিয়া যাওয়ার ন্যায় অনির্ব্বচনীয় কষ্ট।

সখি! কৃষ্ণ, নারী ধরার এক কৌশল করিয়াছে। তিনি একটি হাট বসাইয়াছেন। সেই হাটে বিনামূল্যে তাঁহার শ্রীঅঙ্গগন্ধ বিক্রয় হয়। এই গন্ধের প্রলোভনে জগতের সমস্ত রমণীকে তিনি আকর্ষণ করেন। ঐ হাটে গেলেই বিনামূল্যে "গন্ধ" পাওয়া যায়। রমণীবৃন্দ এইরূপে যখন শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পায়, তখন সেই গন্ধের প্রভাবে তাহাদের চক্ষু, কর্ণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির ক্রিয়া সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়। তাহারা উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হয়। গৃহের কথা, আত্মীয় স্বজনের কথা,

কুল ধর্ম্মাদির কথা কোন বিষয়েই আর তখন তাহাদের কোনরূপ অনুসন্ধান থাকে না।

রাত্রির প্রথম পাদে অশোক বৃক্ষতলে গৌরহরির কৃষ্ণ দর্শন ঘটে। সেই কৃষ্ণ দর্শনে, মহাপ্রভু সেই শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে দৌড়াইয়া গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করেন। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ সেই সময় হইতে সমস্ত রাত্রি তিনি সাক্ষাৎ অনুভব করিলেন। ঐ গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া সমস্ত রাত্রি তিনি দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। উন্মত্তের ন্যায় উদ্যানের প্রতিটি বৃক্ষলতার নিকট ছুটিয়া যান—মনে করেন সেখানে গেলেই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সেখানে গিয়াও কৃষ্ণ দরশন পান না; কেবল কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ অনুভব করেন।

প্রাতঃকাল উপস্থিত দেখিয়া স্বরূপ রামরায় নানান উপায়ে গৌরহরির বাহ্য-স্ফূর্ত্তি করাইলেন। তাহার পর সমুদ্রে স্নান ও জগন্নাথ দর্শনের অন্তে বাসায় (গম্ভীরায়) আনিলেন।

এই লীলাটির গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া "দাস গোস্বামী" নিজ শ্লোকে এ লীলাটিকে আজীবন স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এই লীলা বর্ণনা অন্তে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর সতর্ক বাণী—

(১) 'অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্য শক্তি তার;
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাঁহার।'

(২) অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা বিলাপ শুনিয়া;
তর্ক না করিও শুন বিশ্বাস করিয়া।'

'বিভু' কৃষ্ণ ও 'বিভু' গৌরসুন্দরের অলৌকিক লীলাতে কাহার বিশ্বাস হইবে? সে পাত্রের পরিচয়ও কবিরাজ গোস্বামী দিয়াছেন। যথা—

'মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস ;
যারে কৃপা করে, তার ইহাতে বিশ্বাস।'

তাহার পর, আমাদের প্রতি করুণায় তিনি কৃপা উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

'শ্রদ্ধা করি শুন, শুনিলে পাবে মহাসুখ ;
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুঃখ।'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯শ

———

দশম চিত্র

(শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর)

গৌরহরির স্বরচিত 'শিক্ষাষ্টক' শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীগ্রন্থের অন্ত্য খণ্ডের বিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত। এই বর্ণনীয় বিষয়ের পটভূমিকা কবিরাজ গোস্বামী নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম্।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥

সংস্কৃত টীকা :—

প্রেমেতি। গৌরচন্দ্রস্য লপিতং জল্পনাদিকং ভাগবতৈঃ সাধুভিঃ কর্ত্তৃভূতৈঃ নিষেব্যতে শ্রূয়তে ইত্যর্থ। কথম্ভূতং লপিতং ? প্রেমোদ-ভাবিতং প্রেম্নোঽপ্যুদ্ভূতং হর্ষং আনন্দং ঈর্ষা—গুণেষু দোষারোপনং উদ্বেগং ইতস্ততো ধাবনং দৈন্যং দীনতা আর্ত্তং মনঃপীড়া এতৈ মিশ্রিতম্।

(শ্লোকমালা)

মহাভাবের চরম দশায় উপনীত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার একীভূত স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ। ঐ স্বরূপে (এখন) দিবারাত্র অখণ্ড কৃষ্ণ-বিরহ। ঐ বিরহ দশায় শ্রীধাম পুরীতে অবস্থিত গম্ভীরা মন্দিরে তিনি জাগিয়া কাঁদিয়া রজনী অতিবাহিত করেন। সেই উৎকট বিরহের বিলাপ দশায়—হর্ষ, শোক, রোষ, দৈন্য, উদ্‌বেগ, আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা সন্তোষ হইতে একদা উদ্ভূত এই সু-দুর্ল্লভ মণি সদৃশ "শিক্ষাষ্টক"।

ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তন হইতেছে। কখনও তিনি হর্ষ ভরে উৎফুল্ল, কখনও শোকে অধীর, কখনও দৈন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন—কখন বা প্রেমানন্দে অধীর হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ

হইতেছেন। এই শেষোক্ত ভাব ভরে কোন এক রাত্রিতে পরমানন্দ-ময় গৌরহরি স্বরূপ ও রামরায়কে হর্ষ ভরে বলিলেন—

"………শুন স্বরূপ রামরায়।
'নাম সংকীর্ত্তন' কলৌ পরম উপায়॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ

অর্থাৎ ভগবত প্রাপ্তির যত রকম সাধন আছে, তাঁহাদের মধ্যে **'হরিনাম সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ'**।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকেও পুরীধামের সিদ্ধ বকুলতলে একদা গৌরহরি বলিয়াছিলেন—

'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণ-প্রেম' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ **নাম সংকীর্ত্তন**।
(যে হেতু, নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেম ধন॥'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

('নামের' অচিন্ত্য শক্তিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও মায়াবদ্ধ আমাদের ন্যায় জীবের প্রতি করুণা করিয়া শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বিরচিত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে ১৪৪-১৭৩ শ্লোকে 'নাম সংকীর্ত্তনের' সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন।)

গৌরহরি আরও বলিলেন—

'সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন;
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।'

কলিযুগে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবার বিধি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। যিনি 'সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে' শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন তিনি সু-বুদ্ধি ব্যক্তি। গৌরহরির মন প্রফুল্ল, হৃদয় শান্ত, প্রাণে আনন্দে ভরপুর। তিনি পুনরায় বলিলেন—

'নাম সংকীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস॥'

এই বলিয়া তিনি স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকরত্নটি প্রকাশ করিলেন—

'চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।'

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং॥'

যাহা (১) চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জ্জিত করে (২) সংসাররূপ মহাদাবানলকে নির্ব্বাপিত করে (৩) জীবের মঙ্গলরূপ কৌমুদীকে জ্যোৎস্না বিতরণ করে (৪) বিদ্যাবধূর জীবন সদৃশ (৫) আনন্দরূপ সমুদ্রকে উচ্ছলিত করে (৬) প্রতি পদেই পূর্ণামৃত আস্বাদন দেয় (৭) মন-আদি ইন্দ্রিয় বর্গের তৃপ্তিজনক—সেই 'শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন' সর্ব্বোৎকর্ষে বিজয় করিতেছেন।

—ইহা অর্দ্ধবাহ্য দশায় গৌরহরির স্বগতোক্তির গীতি। কিন্তু, কলি কবলিত মায়া মুগ্ধ জীবকে 'ভজন ক্রিয়াতে' প্রলুব্ধ করিতে পরম সমর্থ এই শ্লোকরত্নটি।

ভরপুর প্রাণের আনন্দে 'সংকীর্ত্তন পিতা' গৌরহরি 'হরিনাম

সংকীর্ত্তনের' মহিমা বর্ণন করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে (প্রেমের স্বভাবে) উদয় হইল যে—

"নামে তাঁহার অনুরাগ নাই"

এবং

"নামের ফল হইতে তিনি বঞ্চিত হইতেছেন"

—সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৈন্য ও বিষাদ দশা প্রাপ্ত হইলেন। এই অবস্থায় বিলাপ করিলেন—

'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি—
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥'

(হে ভগবান! তুমি কৃপা করিয়া প্রত্যেক লোকের নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে ইহ জগতে আপনার বহু নাম প্রচার করিয়াছ। তোমার অনন্ত নামের অনন্ত শক্তি। প্রত্যেক নামেই তুমি তোমার নিজের অনন্ত শক্তি নিহিত করিয়াছ। আবার তুমি জীবের প্রতি দয়া করিয়া তোমার অচিন্ত্য প্রভাব সম্পন্ন নাম স্মরণের 'সময়' 'অসময়' নির্দ্ধারণ কর নাই। জীব শুদ্ধাশুদ্ধ সকল অবস্থায়, 'কাল' 'অকাল' সকল সময়েই তোমার আনন্দ-রস-মূর্ত্তি 'নাম' গ্রহণ করিয়া পবিত্র হইতে পারে। হে দয়াময়! তোমার এতাদৃশ কৃপা সত্ত্বেও আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে, তোমার এই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভুবন-মঙ্গল নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

'খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥'

'অর্দ্ধবাহ্যদশায়' গৌরহরির এই 'বিলাপ' আমাদিগকে যেন 'অনর্থ-নিবৃত্তি' দশায় যে অনুভব তাহা, জ্ঞাপন করিতেছেন—

অতঃপর বিষাদভাব কিছুটা পাতলা, হইলে সদৈন্যে গৌরহরি বলিতেছেন—

" 'যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার 'লক্ষণ' শুন স্বরূপ, রামরায়॥'

এই বলিয়াই তিনি শ্লোকরত্নটির উদয় করিলেন। যথা—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'*

এই শোক রত্নটির ব্যাখ্যা কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

"উত্তম হৈয়া আপনাকে মানে তৃণাধম ;
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম।—
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বলয় ;
শুকাইয়া মৈলে কারে পাণি না মাগয়।

* এই শ্লোক রত্নটির মর্ম্ম—
সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠও যদি হয়, তথাপি সাধক নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা হেয় মনে করিবেন। ঐ অবস্থা স্বভাবে পরিণত হইলে তবে "প্রেম-প্রাপ্তি"।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রেরণায় আমাদের মনে হয় এ 'অবস্থা' বা 'অধিকার' লাভ করিয়া কলিজীব হরিনাম করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।
(এ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই শ্রীগ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় দেখুন।)

যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন ;
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহি আনের করয়ে রক্ষণ।

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ;
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।

এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয় ;
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়।"

—চরিতামৃত অন্ত্য ২০শ

'রাই কানুর আশ্‌ মিটান' 'গৌরহরি স্বরূপের' প্রখ্যাত **শিক্ষা অষ্টকটি** শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা অন্তে নিজের একটি অভিমত দিয়াছেন—

'প্রভুর গম্ভীরা লীলা না পারি বুঝিতে।'

—চরিতামৃত অন্ত্য ১০শ

একাদশ তরঙ্গ

(১)

রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবন—

'প্রভুর বিয়োগে স্বরূপের অন্তর্ধানে।
মহা দুঃখে রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবন ॥'

—ভক্তিরত্নাকর

চারি ব্রহ্মের বিহারভূমি মধুর নীলাচল ধামে সুদীর্ঘ ষোড়শ বর্ষ (শকাব্দ ১৪৪০ হইতে ১৪৫৫ পর্য্যন্ত) সময়ে, শ্রীল রঘুনাথ দাসের যে ভাবে গৌরহরি ও তাঁহার নদে, নীলাচল ও ব্রজের অগণিত ভক্ত-গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলন ঘটিয়াছে **এইরূপ আর একটি চরিত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।**

গৌরহরির অন্তর্ধানের দুঃসহ শোকে তাঁহার দ্বিতীয় দেহ স্বরূপ গোস্বামী সঙ্গে সঙ্গে দেহ রক্ষা করেন।

প্রাণপ্রিয় 'গৌরহরি' ও 'স্বরূপ' এই দুই স্বরূপের লীলা সঙ্গোপনে 'রঘুনাথ' উৎকট বিরহে উন্মাদপ্রায় হইয়া গেলেন। অন্যদিকে গৌর-বিরহে গদাধর পণ্ডিতের মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা ও বিলাপ; রাজা প্রতাপ রুদ্র. রায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, কাশীমিশ্র, গোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি নীলাচলের অগণিত ভক্তবৃন্দের ঘন ঘন মূর্চ্ছা ও হৃদয় বিদারক দশা। সকলের মুখে 'হা প্রাণনাথ এ কি করিলে'? এইরূপ বেদনা বিষাদ তমোময় পরিবেশে অবস্থান করা রঘুনাথের পক্ষে অসম্ভব হইল; রঘুনাথ মনে মনে বিচার করিলেন—

"আর কেন? সোনার গৌরাঙ্গ তাঁহার লীলা সঙ্গোপন করিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় দেহ (আমার প্রভু ও পিতা) স্বরূপ গোসাঞি ও সেই সঙ্গে গেলেন; এ নির্লজ্জ প্রাণ দেহে রহিল কেন? আর জীবন ধারণের ফল কি? এখন মরণই মঙ্গল। এখন মৃত্যুই পরম বন্ধু।

'হা স্বরূপের সর্ব্বস্ব প্রাণ গৌরাঙ্গ'—বলিয়া এ দেহ ত্যাগ করিব।"

কোথায় ও কিরূপে দেহ ত্যাগ করিবেন, সে বিবরণ—

'বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ বন্দিয়া;
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া।'

—চরিতামৃত আদি ১০ম

—এবং মহাদুঃখে তিনি বৃন্দাবন গমন করিলেন।

ষোড়শ বর্ষ পূর্ব্বে 'সপ্তগ্রাম' হইতে বন, কণ্টক, পর্ব্বত, জঙ্গল, পথে হিংস্র জন্তু আদি অতিক্রম করিয়া যখন নীলাচলে আসেন সে আগমন 'পূর্ব্বরাগ দশায়'— মিলন আশা-রূপ অবর্ণনীয় আনন্দ। সেবার যেমন অনাহারে অনিদ্রায় ছুটিয়া চলিয়াছিলেন তেমনি বৃন্দাবন পথে গমনের সময়ও অনাহারে অনিদ্রায় ছুটিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু, এ গমন—অবর্ণনীয় দুঃখের সহিত।

'পরিপূর্ণ মিলনের' বিরহে 'সর্ব্বোত্তমা প্রাপ্তি' তাহা ব্রজের পথে রঘুনাথের ঘটিয়াছে। তাই—

'চৈতন্যের অগোচরে নিজ কেশ ছিঁড়ে করে
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।'
'দেহ ত্যাগ করি মনে গেলা গিরি গোবর্দ্ধন'

'এ ছার দেহে কাজ কি আছে ?
গৌরাঙ্গ বৈমুখ দেহ এ ছার দেহে কাজ কি আছে ?

প্রাণ গৌর যদি বিরূপ হয়েছে এ ছার দেহে কাজ কি আছে ?

আর বেঁচে কাজ কি বল ?
প্রাণ গৌর যদি ছেড়ে গেল আর বেঁচে কাজ কি বল ?

আর আমি রাখব না
শ্রীগৌরাঙ্গ বৈমুখ প্রাণ আর আমি রাখব না'

—শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়

নীলাচল হইতে ব্রজভূমি এই সুদীর্ঘ পথ এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে 'দাস গোস্বামী' গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তটে পঁহুছিলেন।

(২)

'রঘুনাথের' মনের 'আশয়' জানিয়া পরম করুণ গৌরহরি নিজ প্রিয় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে (তাঁহাদের অনুভূত মূর্ত্তিতে) রঘুনাথের মনোবৃত্তি জানাইলেন এবং কৃপাদেশ করিলেন—

"তোমরা দুই জনে অতি সত্বর গোবর্দ্ধন তটে গিয়া আমার 'স্বরূপের রঘুনাথকে' প্রাণে বাঁচাও। অন্যথায় সে আমার বিরহে প্রাণত্যাগ করিবে। আমার অনেক কাজ এখনও বাকী রহিয়াছে। তাহাকে লইয়াই সে সব কাজ হইবে। তোমরা সত্বর গিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা কর।"

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গৌরহরির আদেশ লাভ করিয়া গিরি গোবর্দ্ধনের পথে ছুটিলেন।

গৌরহরি লীলা সঙ্গোপন করিয়াছেন এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ বাতাসে ভর করিয়াই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা সেই হইতেই অসহ্য ব্যথায় মুহ্যমান হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ চরম কৃপাপ্রাপ্ত রঘুনাথের সঙ্গ পাইবেন, তাহার সঙ্গগুণে গৌর-অদর্শন-জ্বালা প্রশমিত হইবে, দুঃসহ দুঃখ মধ্যেও মনে কথঞ্চিৎ স্বস্তি লাভ হইবে ; এই লোভে (অদূরে) গৌরপ্রিয় রঘুনাথের দর্শনের আশায় ছুটিয়া আসিতে আসিতে পথে সেই 'গৌরাঙ্গ বিরহী' শীর্ণ-মূর্ত্তি রঘুনাথকে দুই ভাই জড়াইয়া ধরিলেন। যথা—

'ধরি রূপ সনাতন রাখিল তাঁর জীবন
দেহ ত্যাগ করিতে না দিলা।'

তাঁহারা রঘুনাথকে বলিলেন—

"ভাই রঘুনাথ ! এ কি সঙ্কল্প করিয়াছ ? কাহার দেহ ত্যাগ করিবে ? এ কি তোমার দেহ ? এ দেহে তোমার কি অধিকার ? এ দেহ শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্গীকার করিয়াছেন। গৌরের ক্রীত না এই দেহ ? শ্রীগৌরে উৎসর্গীত এই দেহ।

তাহার পর তাঁহারা (স্বপ্নবৎ অনুভূত) যে গৌরহরির আদেশ পাইয়াছেন তাহা রঘুনাথকে জানাইলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের মাধ্যমে গৌরহরির অভিমত জানিয়া রঘুনাথ—

"দুই গোসাঞির আজ্ঞা পাইয়া রাধাকুণ্ড তটে গিয়া
বাস করি নিয়ম করিলা।"

(৩)

গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জমালা প্রসঙ্গে ঃ

পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে যে শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে একমূর্ত্তি গোবর্দ্ধন শিলা ও একটি গুঞ্জমালা লইয়া গিয়াছিলেন; তিনি ঐ দিব্য শক্তিধর বস্তু দুইটি গম্ভীরাবিহারী গৌরহরিকে উপহার দেন। গৌরহরি তিন বৎসর কাল যাবৎ ঐ দুটিকে অপূর্ব্ব ধন-জ্ঞানে কখনও মাথায়, কখনও নাসায়, কখনও চক্ষে, কখনও বক্ষে ধারণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সঙ্গ সুখ ভোগ করিতেন। গৌরহরির প্রেমাশ্রুতে ঐ শিলা ও মালা নিরন্তর পরিষিক্ত হইত। এইরূপ ভাবে তিন বৎসর কাল ব্যাপী গোবর্দ্ধন শীলা ও গুঞ্জামালাকে নিজ স্নেহ, প্রীতি ও সঙ্গসুখ দান করার পর সেই অপরূপ বস্তুদ্বয় রঘুনাথকে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ দান করিয়াছিলেন।

নীলাচলে ঐ শিলা ও মালা রঘুনাথ নিত্য সেবা করিতেন গৌরহরির অপ্রকটে উৎকট বিরহ ব্যথা প্রশমনের জন্য শ্রীকুণ্ড তটে বাস কালে সর্ব্বদা গৌরপ্রীতির নিদর্শন ঐ বস্তুদ্বয় নিজ নয়ন সমক্ষে রাখিতেন।

‘প্রভুর হস্ত দত্ত এই গোবর্দ্ধন শিলা।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥’

শ্রীকুণ্ডতটে শ্রীল দাস গোস্বামীর বিলাপ বর্ণনেও একথার সত্যতা ও সাক্ষী আছে। যথা—

মহা-সম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া।
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ॥
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং।
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

(শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্তব কল্পতরু)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস (গোস্বামী) বিরচিত অনুবাদ—

'আমি অতি অভাজন, বেষ্টিত সম্পদ বন,
ত্রিতাপ সে বনে দাবানল।

স্বরূপের আশ্রয় দিয়ে, করুণাতে উদ্ধারিয়ে,
প্রকাশিলা আনন্দ প্রবল॥

বক্ষে ধৃত গুঞ্জাহার, গোবর্দ্ধন শিলা আর,
সঁপিলেন দয়া করি মোরে।

এ হেন দয়ার নিধি, হৃদয়ে উদয় যদি,
সে আনন্দ ধৈর্য্য কেবা ধরে॥'

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু॥

দ্বাদশ তরঙ্গ

(১)

রূপ-সনাতন প্রসঙ্গেঃ

'মহাপ্রভুর লীলা যত অন্তর বাহির।
দুই ভাই তার মুখে শুনে নিরন্তর॥'

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের অপরূপ মূর্ত্তি গৌরহরি ও তাঁহার প্রেম চেষ্টা শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তাঁহাদের নীলাচল অবস্থান কালে স্বচক্ষে কিছু কিছু দর্শন করিয়াছিলেন। পরে, ব্রজ ও নীলাচলে পত্র প্রেরকদের হস্তে ও লোকমুখে যৎসামান্যই শুনিতে পাইতেন। এক্ষণে গৌর-হরির ষোড়শ বর্ষব্যাপী অন্তরঙ্গ সেবক দাস গোস্বামীকে পাইয়া তাঁহারা নীলাচল-বিহারী গৌরহরির 'প্রকট কালের লীলাবলী কোটি গুণ উজ্জ্বল প্রকাশে' ভোগ করিতে লাগিলেন। যথা—

বিরহ প্রশমনের একমাত্র ঔষধ 'মিলন প্রসঙ্গ'। সুতরাং, শয়নে স্বপনে জাগরণে দাস গোস্বামী গৌরহরির মিলন প্রসঙ্গই আলাপ করেন। তাঁহার ঐ স্বাভাবিক চেষ্টাতে রূপ-সনাতন আদি ব্রজের গৌর-পরিকর ভক্তবৃন্দ (যেন) সাক্ষাৎ ভাবে গৌরহরির প্রকট লীলা ভোগ করিতেন।

রঘুনাথ দাস সর্ব্বদা শ্রীকুণ্ড তটেই পড়িয়া থাকিতেন। শ্রীরূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব আদি মহাজনবৃন্দ নিজ নিজ ভজন ও গৌরহরির আদেশ পালন জন্য 'ব্রজে' অন্যত্র বাস করিলেও তাঁহারা সকলেই মনে মনে রঘুনাথের সঙ্গ-সুখ ভোগ

করিতেন। এবং যখন যখন ক্ষুদ্র বা দীর্ঘ অবসর পাইতেন, তাঁহারা রঘুনাথের নিকট ছুটিয়া আসিতেন। তাঁহারা রঘুনাথের দর্শনকে গৌর দর্শনের সমান সুখ মনে করিতেন। তাঁহারা যে শ্রীকুণ্ড তটে গমন করিতেন এবং সেই স্থানে মাঝে মাঝে অবস্থান করিতেন তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ আজও শ্রীকুণ্ড তটে ঐ সমস্ত গোস্বামীদের "আসন" (ভজন ও বিশ্রাম স্থান) সংরক্ষিত হইয়াছে। (চিত্র সাহায্যে দেখান হইল)।

প্রাচীন ও প্রামাণিক বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীমুখে শোনা যায় যে—

শ্রীল রঘুনাথ দাস ব্রজে (শ্রীকুণ্ডে) বাসের পর শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, প্রবোধানন্দ সরস্বতী আদি যে সব গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন সে সমস্ত গ্রন্থই শ্রীকুণ্ড তটে ইষ্টগোষ্ঠীর সময় আলোচিত হওয়ার পরই গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে—

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব আদির অনুভবই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন ;
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ।'

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

'ভক্তি রত্নাকর' শ্রীগ্রন্থে পাওয়া যায়—

'সনাতন রূপ রঘুনাথ এক তিনে।
রঘুনাথ চেষ্টা দিগ্‌বিদিক্ ভুবনে॥'

'ব্রজলীলা' ও 'ব্রজের আশ্‌-মিটান গৌরলীলার' যে সর্ব্বোত্তম অধিকারী রঘুনাথ দাস, সে সম্বন্ধে (ইঙ্গিত)—

(১) বৈষ্ণবতোষণী টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন—

'রাধাপ্রিয়প্রেমবিশেষপুষ্টৌ
গোপালভট্টো রঘুনাথ দাসঃ।
স্যাতামুভো যত্র সুহৃৎ সহায়ৌ—
কো নাম সোঽর্থো নভবেৎ সুসিদ্ধঃ॥'

(২) লঘুতোষনী টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন—

'যন্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা।
কৃষ্ণপ্রেমমহার্ণবোর্ম্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দিব্যতি।
দৃষ্টান্তপ্রকরপ্রভাভর মতীতৈবানয়োভ্রাজতো।
স্তন্যস্তত্ব পদং মত ত্রিভুবনে সাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ॥'

(৩) শ্রীজীব অন্যত্র বলিয়াছেন—

'রঘুনাভিধেয়স্ত তয়োমিত্রত্বমীয়ষঃ।
স্তবমালা দানমুক্তাচরিতঃ কৃতিষদিতন॥'

(৪) শ্রীগোপাল চম্পু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

'শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতনরূপকং
গোপাল রঘুনাথস্ত ব্রজবল্লভ পাহিমাম্।'

তিনি স্বয়ং ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন—

"হে শ্রীরঘুনাথদাস নামধামতয়া ইতি প্রসিদ্ধ—
পরমভক্তিপরাবিদ্ধ।"

হরিভক্তি বিলাসের প্রারম্ভ শ্লোকের টীকায়—

(৫) শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—

।রঘুনাথদাসো নাম গৌড়কায়স্থকুলভাস্করং পরমভাগবতঃ ইত্যাদি

(১)

রূপ সনাতনের অদর্শনে ঃ

গৌরহরির বিয়োগে রঘুনাথ অন্ন ত্যাগ করিয়া সামান্য বন্য ফল. তক্র ও দধি মাত্র আহার করিতেন। পরে, আর একটি নিদারুণ বিরহ ব্যথার শেল আসিয়া তাঁহার বিদীর্ণ হৃদয়কে ছারখার করিয়াছে।

"সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে
কেবল করয়ে জল পান।"

আর নিরন্তর বিলাপ—

(বলে) এ জীবনে কাজ কি বল ?
সনাতন যদি ছেড়ে গেল (বলে) এ জীবনে কাজ কি বল ?

কেন ম'রি নাহি যাই
অন্ন-জল বিষ খাই— কেন ম'রি নাহি যাই

আবার, কিছুদিন পর, একটি পঞ্জর খসিয়া যাওয়ার মতই—

শ্রীরূপের অদর্শনে,—

'রূপের বিচ্ছেদ যবে জল ছাড়ি দিল তবে
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ ॥"

পরে—

শ্রীরূপ ও সনাতনের অদর্শনে রঘুনাথ নিরন্তর বিলাপ করিতেন—

'দুই নয়ন তারা হ'লাম হারা
'শ্রীরূপ' 'সনাতন' চলি গেল দুই নয়ন তারা হ'লাম হারা

গৌর গোবিন্দ লীলা দরশনের দুই নয়ন তারা হ'লাম হারা

আর কি বা দেখব আঁখি মেলে
শ্রীরূপ সনাতন গেল চলে আর কি বা দেখব আঁখি মেলে

বৃথা কেন রাখব নয়ন
যদি ছাড়ি গেল রূপ সনাতন
বৃথা কেন রাখব নয়ন যদি ছাড়ি গেল রূপ সনাতন

ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে
হা রূপ সনাতন বলে ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে

'শ্রীচৈতন্য নাম যত তাঁর গণ হয় যত
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।

গুপ্ত ব্যক্ত লীলা স্থল দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব
স্মরিয়াই করয়ে পরণাম ॥'

সবে মিলে কৃপা কর
'লীলাস্থলী' 'গৌরগণ' সবে মিলে কৃপা কর

যেন জন্মে জন্মে পাই হে
শ্রীরূপ সনাতন সঙ্গ যেন জন্মে জন্মে পাই হে

শ্রীরূপ সনাতন সঙ্গ
প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরূপ সনাতন সঙ্গ

যেন জন্মে জন্মে পাই হে
আমার প্রভু স্বরূপ সনে যেন জন্মে জন্মে পাই হে

যেন গৌর বলে মর্‌তে পারি
এই কৃপা কর 'গৌরগণ' 'গৌর-লীলাস্থলী'—।
যেন গৌর বলে মর্‌তে পারি
(শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী)

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

শ্রীকুণ্ড সংস্কারে :

(১)

শ্রীকুণ্ডের ইতিহাস ঃ

শ্রীরাধাকুণ্ডের উৎপত্তির বিষয় একটি বিচিত্র ইতিহাস মিশ্রিত আখ্যান আছে। কিছু পুরাণের কথার সহিত সংশ্লিষ্ট। যথা—

দ্বাপর যুগ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে। একদা কংস রাজার প্রেরিত 'অরিষ্টাসুর' নামক অসুর বৃষ রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ব্রজ-রাজকুমার রাক্ষসী মায়ার ছলনা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে অরিষ্টাসুরকে বধ করেন। এই লীলায় ছলনাময় রৌদ্ররস ও অদ্ভুত রসের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়াছিল।

অরিষ্টাসুর বধের অল্প কিছুক্ষণ পরেই রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী অরিষ্টাসুরের নিধন সংবাদ শুনিয়া মৃদু বক্র ও ঘৃণা ব্যঞ্জক হাস্য ও দৃষ্টির সহিত বলিলেন—

"তোমার ঘৃণা নাই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ নাই। অরিষ্টাসুর অসুর হইলেও সে একটি বৃষের রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিল ত? তুমি গো হত্যা করিয়া বীভৎস কাণ্ড কারয়াছে। ছিঃ! আমাকে ছুঁইও না। তুমি অপবিত্র হইয়াছ। যদি সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া আসিতে পার তবে তোমার দোষ ঘুচিবে।"

রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক হাসির সহিত বলিলেন—

"তীর্থের অন্বেষণে যাইয়া সময় নষ্ট করি কেন? এই খানেই সকল তীর্থ আনিয়া তোমাদের সমক্ষেই স্নান করিতেছি। দেখ।"—

এই বলিয়া **সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও মোহকারী শ্রীকৃষ্ণ** পৃথিবীতে পদাঘাত করিলেন। বিশ্বম্ভরের পদাঘাতে সরোবর প্রমাণ বিরাট গর্ত্ত সৃষ্টি হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত তীর্থের পবিত্র সলিল মহা-উল্লাসে উপস্থিত হইয়া সেই স্থান পূর্ণ করিল। তীর্থগণ আপন আপন পরিচয় দিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন। পরম প্রিয়ার বাসনা পূরণ জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে নিজে সেই সরোবরে স্নান করিলেন। এই কুণ্ডের নাম—**'শ্যামকুণ্ড'**

অতঃপর রস কোন্দলে তিনি শ্রীমতীকে বলিলেন, "সখী! আমার ক্ষমতা দেখিলে ত? তোমাদের এমন ক্ষমতা আছে কি? যাক্, এখন সকলে আমার এই কুণ্ডে স্নান করিয়া পবিত্র হও।"

শ্রীমতী গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বলিলেন—

'সখা! উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। গর্গাচার্য্যের মুখে শুনিয়াছি--'

"উদ্ধৃত্য পঞ্চমৃৎ পিণ্ডান্ স্নায়াৎ পরং জলাশয়ে"

সুতরাং আমরা প্রত্যেকে পাঁচটা করিয়া ঢিলা নিক্ষেপ করিয়া পরে আমরা সরোবরে স্নান করিব। তুমি দাঁড়াইয়া দেখ।'

'রাসেশ্বরী' এই বলিয়া নিজের সখীবৃন্দসহ মৃত্তিকা উত্তোলন করিতে লাগিলেন। তাহাতে অচিরেই আর একটি কুণ্ডের উৎপত্তি হইল। সেই কুণ্ডেও সমস্ত তীর্থ সমাগত হইয়া 'হ্লাদিনীর সার' শ্রীমতীর স্তব স্তুতি করিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। এই কুণ্ডের নাম—**'রাধাকুণ্ড'**।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও এই কুণ্ডতটে বাস করিতেন। তিনি বর্ণনা দিয়াছেন—

'কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধামাধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা॥'

অদ্যাপিও সেই কুণ্ডদ্বয় বর্ত্তমান। মথুরা হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে গোবর্দ্ধন গ্রাম। এবং গোবর্দ্ধন হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে 'শ্রীরাধাকুণ্ড' ও 'শ্রীশ্যামকুণ্ড' অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবসানে উক্ত 'অপ্রাকৃত' কুণ্ডদ্বয় আবরিত হইয়া যায়। পুনরায় গৌরলীলার সময় যখন গৌরহরি শ্রীবৃন্দাবনে* আগমন করেন, তখন তিনি দেখিলেন—

'দুই ধান্য ক্ষেত্র হইয়াছে কুণ্ডদ্বয়'

তিনি ঐ ধান্য ক্ষেত্রের অল্প জলেই হৃষ্ট চিত্তে স্নান করিলেন। বলভদ্র ও তাঁহার সেবক এবং মথুরাবাসী সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ 'গৌর-হরির' এই স্নান লীলা দর্শনে বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। স্নানান্তে গৌরহরি স্তব পাঠ করিলেন—

'গোবর্দ্ধন গিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নায়াৎ হরেঃ প্রিয়ঃ।

নরো ভক্ত্যে ভবেৎ বিপ্র তৎস্থিতস্য প্রতোষনং!'

(শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের প্রকট তিথি কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর দিবস রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে। সেই সময় প্রচণ্ড শীতের সমাগম থাকে

---

* ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভু শীত ঋতুতে শ্রীবৃন্দাবনে আইসেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৭

এই গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীনবদ্বীপদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীগৌড়েশ্বর বৈষ্ণব সম্মিলনী, রাধাকুণ্ডের মোহান্ত ছিলেন।

এবং মধ্য রাত্রি ; কিন্তু অদ্যাপি স্নানার্থে প্রতিবৎসর ঐ সময় অসংখ্য লোকের সমাগম হয়।)

'যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যকুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবেকো বিষ্ণোরতন্ত্য বল্লভা॥' (পাদ্মে)

ইহার পর সেই স্থানের মৃত্তিকা লইয়া তিনি (গৌরহরি) নিজের শ্রীঅঙ্গে তিলক ধারণ করিলেন।

তখন বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার সঙ্গীরা বুঝিলেন যে এই স্থানই **'রাধাকুণ্ড'**।

(২)

মহন্ত শ্রীনবদ্বীপদাস মহাশয় প্রণীত শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস শ্রীগ্রন্থ হইতে জানা যায়—

(১) গৌরহরি ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের শীত ঋতুতে শ্রীবৃন্দাবনে আইসেন।

(২) ১৪৫৫ শকে অথবা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে দাস গোস্বামী ব্রজে আগমন করেন।

(৩) দাস গোস্বামী ব্রজে আসার পরও ১২।১৩ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড চাষের জমি ছিল। কারণ, ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে ৬০৲ মূল্যে ঐ জমি খরিদ হইয়াছে। এবং ঐ ঘটনার প্রায় সাত বৎসর পরে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্যামকুণ্ডের জমি খরিদ হয়।

(৪) ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীকুণ্ড খনন হয় ও ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্যামকুণ্ড খনন হয়।

সুতরাং, ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী কোন সময়ে একদা দাস গোস্বামীর মনে উদয় হইল—

'কুণ্ডদ্বয় জলে পূর্ণ হৈলে হৈত ভাল'

— চরিতামৃত

'রঘুনাথ' নিজের বাসনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতি ছিঃ ছিঃ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার আপন মনে প্রশ্ন জাগিল, এ কি? আমার মনে এ কথার উদয় হইল কেন? কুণ্ডদ্বয় জলে পূর্ণ করাতো অর্থের সম্পর্ককে টানিয়া আনা। নিষ্কিঞ্চন ভিখারীর এ বাসনা কেন?

ভক্তির স্বভাব দীনতায় তিনি নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করিলেন। পরে বিবিধ প্রকারে নিজ মনকে বুঝাইয়া অতি সাবধানে নির্জ্জনে রহিলেন।

ঐ দিনই বদরিকাশ্রমে উপনীত জনৈক ধনী ব্যক্তি 'বদরিনাথ ধামে' অবস্থিত শ্রীনারায়ণের পাদমূলে বহু অর্থ রাখিয়া প্রণাম করিলেন। পরম ভাগ্যবান সেই ধনী ব্যক্তি রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন—

দিবাভাগে যে 'অচল' মুর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন সেই শ্রীমন্ নারায়ণ বলিতেছেন—

'তোমার দেওয়া মুদ্রা আমি গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ঐ মুদ্রা গুলিতে আমার এখানে কোন প্রয়োজন নাই। এগুলি লইয়া তুমি মথুরার সন্নিকটে "অরিষ্ট" গ্রামে যাও। সেখানে এক দিব্য মূর্ত্তি বৈষ্ণব দেখিতে পাইবে। তাঁহার নাম 'রঘুনাথ দাস'। তাঁহাকে বলিও, বদরিকাশ্রমের অধীশ্বরের আজ্ঞায় আপনার জন্য এই টাকা আনিয়াছি।

'রঘুনাথ' এই টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবেন। তখন তাঁহাকে বলিও, তোমার অভীষ্ট দেবের প্রেরণাতেই তোমার মনে শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের সংস্কারের বাসনা উদয় হইয়াছে। এবং তাঁহারই কৃপাদেশে আমি এই অর্থ তোমার দ্বারা রঘুনাথকে পাঠাইতেছি। তিনি অর্থ গ্রহণে (আর) ইতস্ততঃ বা কুণ্ঠা যেন না করেন।

প্রভাতে, পরম সুকৃতিবান সেই ধনী মহাজন কৃত কৃতার্থ বোধে, বদরিকাশ্রমের অধীশ্বরের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণিপাত অন্তে মথুরার পথে অগ্রসর হইলেন এবং যথাকালে সেখানে উপনীত হইলেন। আবার, মথুরা হইতে দ্রুত 'অরিষ্ট' গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। করুণা প্রেরিত মহাজন যথা সময়ে শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাসের শ্রীচরণ দর্শনে কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে (পূর্ব্ব বর্ণিত) বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। সেই ভাগ্যবান ধনী মহাজন দাস গোস্বামীর কৃপা লাভ করিলেন। কাল বিলম্ব না করিয়া শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার কার্য্য আরম্ভ হইল। অচিরেই শ্রীকুণ্ডদ্বয় সু-নির্ম্মল স্বচ্ছ সলিলে পরিপূর্ণ হইল।

(৩)

শ্রীকুণ্ড সংস্কারের কিছুদিন পরের একটি ঘটনা—

ঠাকুর হরিদাসের আদর্শে রঘুনাথদাস 'অনিকেতবাসী'। একদা শ্রীপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে আসিয়া শ্রীকুণ্ডে শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটিরে শুভাগমন করিলেন। মানস পাবন-ঘাটে* স্নান করিতে যাইয়া দেখেন একটি ব্যাঘ্র ঐ ঘাটে জলপান করিতেছে। আর অদূরে শ্রীমদ রঘুনাথদাস বাহ্যবেশ শূন্য অবস্থায় বসিয়া আছেন। ব্যাঘ্র জলপান করিয়া তাঁহারই পাশ দিয়া চলিয়া গেল। যথা—

* 'শ্যামকুণ্ড' তীরে একটি ঘাট।

'রঘুনাথ ধ্যানাবেশে আছেন বসিয়া।
ব্যাঘ্র বনে গেল তাঁর নিকট হইয়া॥'

—ভক্তিরত্নাকর

কিছুক্ষণ পরে 'রঘুনাথের' বাহ্যাবেশ হইলে চাহিয়া দেখিলেন—

সম্মুখে শ্রীপাদ সনাতন। অতি সম্ভ্রমে তাঁহার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। তিনিও পরম স্নেহে রঘুনাথকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন। বিদায় সময়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী 'রঘুনাথকে' বলিলেন—

"প্রাণের ভাই রঘু! তুমি আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর। অতঃপর দিবারাত্র বৃক্ষতলে রহিও না। গোপালের (গোপালভট্ট গোস্বামীর) কুটিরের নিকটে তোমার জন্যে একটি কুটির বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। তুমি এখন হইতে সেই কুটিরে থাকিও।

'শ্রীকুণ্ড তটে' এই স্থানটি এখনো সুরক্ষিত এবং 'দাস গোস্বামীর ভজন কুটি' নামে খ্যাত।

এই স্থানটির চিত্র সংযোজিত হইল।

———

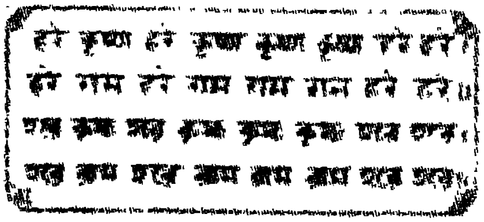

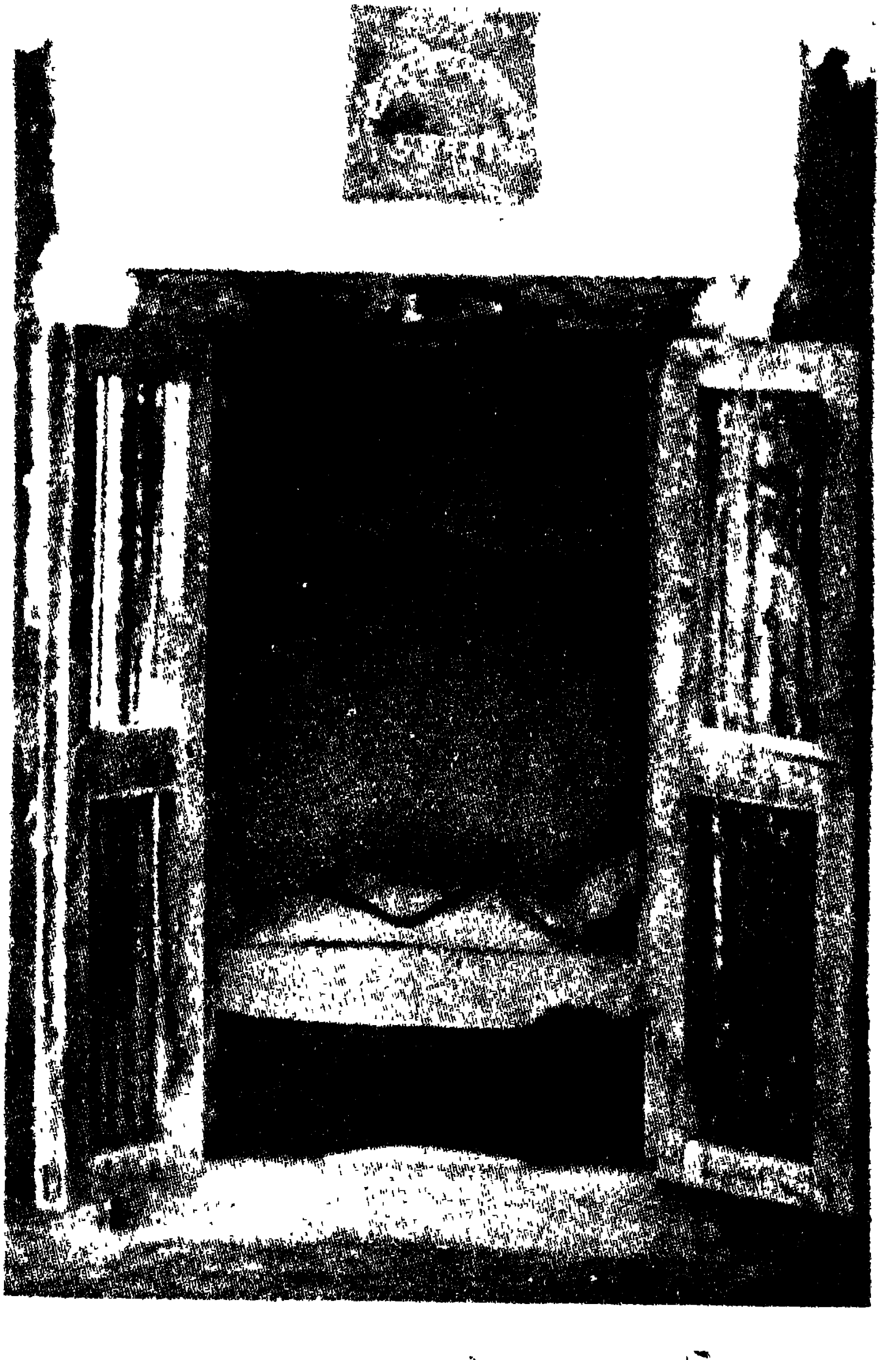

শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামীর "ভজন কুটির"

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ

(১)

শ্রীকুণ্ড তটে ঃ

'রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র চিন্তন॥'

—চরিতামৃত

পরম বিচিত্র চরিত্র গৌরস্বরূপ। তাঁহার লীলাবলীর স্মরণ, মনন ও প্রলাপ বর্ণনই দাস গোস্বামীর—

'মানসে রাধাকৃষ্ণ সেবন'

নীলাচলে 'রঘুনাথ' যেরূপ স্বরূপের 'পুত্র' ও 'ভৃত্য' তেমনি—

শ্রীকুণ্ডতটে কৃষ্ণদাস কবিরাজও দাস গোস্বামীর 'পুত্র' ও 'ভৃত্য'।

এই কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, দাস গোস্বামী শ্রীকুণ্ডতটে যে সুদীর্ঘ কাল বাস করেন সে সময়ের—

(ক) প্রতিটি দিন ও রাত্রি, 'তিনি' রাধাকৃষ্ণের একীভূত স্বরূপ গৌরহরির মানসে সেবা করিয়াছেন। 'সেবা' অর্থে সুখ দেওয়া। (গৌরহরি সুখ পায় কিসে ?—ব্রজলীলার সঙ্গ ও প্রসঙ্গে।)

এবং—

(খ) 'প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র চিন্তন'

এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার অভিষ্টদেব সোনার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অল্প যে কয়টি স্বরচিত 'বন্দনা' রাখিয়া গিয়াছেন এবং এখনো মহা-

কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছে (বঙ্গানুবাদ সহ) সেই-গুলির নাম—

(১) **শ্রীশ্রীশচীনন্দনাষ্টক স্তোত্রম্।**

(২) **শ্রীগৌরাঙ্গ স্তব কল্পবৃক্ষ।**

পরবর্ত্তী বৈষ্ণব মহাজন শ্রীরাধাবল্লভ দাস, তাঁহার বিরচিত দাস গোস্বামীর শোচকে লিখিয়াছেন। যথা—

'শ্রীচৈতন্য শচীসূত তার গণ হয় যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।

গুপ্ত ব্যক্ত নানা স্থলে, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব দলে
সবারে করয়ে পরণাম।'

(২)

শ্রীনিবাস প্রসঙ্গেঃ

প্রথম মিলন—'ভক্তিরত্নাকর' ৪র্থ তরঙ্গ হইতে জানা যায়, কোন এক বৈশাখ পূর্ণিমার দিন কয়েক পরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের দীক্ষা হয়। দীক্ষা দেন শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী। দীক্ষার স্থানঃ শ্রীরাধারমণ মন্দির বৃন্দাবন। ঐ দীক্ষার পর দিনই শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসকে দাস গোস্বামীর কৃপা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে শ্রীকুণ্ডে পাঠান। যথা—

'তার পর দিবস শ্রীজীব শ্রীনিবাসে।
পাঠাইলা শ্রীকুণ্ডেতে গোস্বামী পাশে ॥'

দাস গোস্বামী বাৎসল্যে ও পরম স্নেহে শ্রীনিবাসকে কৃপার অবধি করিলেন। শ্রীকুণ্ড ও গোবর্দ্ধনে তিন দিন রাখিলেন। গোবর্দ্ধন-বাসী রাঘব পণ্ডিত এবং শ্রীকুণ্ডবাসী নিজ সেবক কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দকেও কৃপা আশীর্ব্বাদ করিতে বলিলেন।

'তিন দিন রহি রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনে।
সবা' অনুমতি লৈয়া আইলা বৃন্দাবনে।'
—ভক্তিরত্নাকর ৪র্থ তরঙ্গ

এবং বৃন্দাবনে আসিয়া সকলের অনুমতি গ্রহণ করিয়া শুভদিন ও শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীনিবাস বিদ্যারম্ভ করেন। তাঁহার পাঠের আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে "নরোত্তম" ব্রজে আসেন। তাঁহার দীক্ষা দেন লোকনাথ গোস্বামী। তিনিও শ্রীজীবের নিকট বিদ্যারম্ভ করেন। কালে. শ্রীনিবাস "শ্রীআচার্য্য" পদবী প্রাপ্ত হন। এবং 'নরোত্তম' "শ্রীমহাশয়" পদবী লাভ করেন।

দ্বিতীয় মিলন ঃ

শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে, শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাদিগকে ব্রজের সর্ব্বত্র দর্শনে পাঠান। ঐ কার্য্যে তাঁহাদের সাথী হন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত সন্নিকটে পুছরী গ্রামের নিবাসী প্রখ্যাত রাঘব পণ্ডিত। (এখনো 'রাঘবের গোঁফা' পুছরীতে সুরক্ষিত আছে।)

বিভিন্ন স্থান দর্শন করিয়া পর্য্যায়ক্রমে একদিন তাঁহারা শ্রীকুণ্ডে

আসিলেন। রাঘব পণ্ডিত উভয়কে দাস গোস্বামীর শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের পরিচয় আদি সব বিবরণ নিবেদন করিলেন। দাস গোস্বামী হর্ষ চিত্তে সমস্ত শ্রবণ করিলেন।

'শ্রীনিবাস নরোত্তম অতি সাবধানে।
ভূমে পড়ি প্রণমিলা গোস্বামী চরণে॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ

উৎকট বিরহে—দাস গোস্বামীর দেহ অস্থি-চর্ম্ম-সার এবং অতিশয় দুর্ব্বল। তথাপিও তিনি তাঁহার দুর্ব্বল ও শিথিল বাহুদ্বয় শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে আলিঙ্গন জন্য প্রসার করিলেন। তাঁহাদের আলিঙ্গন করিলেন। পরে শ্রীনিবাসকে খুব ধীরে ধীরে যে সমস্ত কথা বলেন তাহা অপরে শুনিতে পান্ নি। (তখন) এত দুর্ব্বল দাস গোস্বামীর শরীর! কৃষ্ণদাস কবিরাজ, দাস গোস্বামী ও ব্রজবাসীর চেষ্টায় ও আগ্রহে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রাঘব পণ্ডিত শ্রীকুণ্ডে স্নান করিলেন, কুণ্ডবাসী অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং সেখানেই মধ্যাহ্নের প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। দাস গোস্বামী ও শ্রীকুণ্ডবাসী সকলের সহিত যথাযোগ্য বিদায় সম্ভাষণের অন্তে তাঁহারা তাঁহাদের 'ব্রজমণ্ডল' পরিক্রমার পথে চলিলেন।

তৃতীয় মিলন :

প্রথমে শ্রীনিবাস, তাহার পর শ্রীনরোত্তম ব্রজে আগমন করেন। তাহার কিছুদিন পরে শ্যামানন্দও অম্বিকা কালনা হইতে ব্রজে আসেন। এখন তিন জনেই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী। সুতরাং শ্রীজীব আদি ব্রজের বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব লিখিত গ্রন্থ-

রাজী, 'পঠন' 'পাঠন' জন্য, শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে গৌড়ে ও উৎকলে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। যাত্রার দিন স্থির হইল। যথা—

'অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষে পঞ্চমী প্রশস্ত।
সবার সম্মত যাত্রা করাইতে ত্রস্ত॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৬ষ্ঠ তরঙ্গ

গৌড়মণ্ডলে যাত্রার পূর্ব্বে দাস গোস্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য শ্রীজীব, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে শ্রীকুণ্ড পাঠাইলেন। সে সময়ের দাস গোস্বামীর বর্ণনা ভক্তিরত্নাকর ৬ষ্ঠ তরঙ্গ হইতে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—

'শ্রীদাস গোসাঞির কথা কহনে না যায়।
নিরন্তর দগ্ধে হিয়া বিরহ ব্যথায়॥'

কি বিরহ এবং কা'র কা'র বিরহ তাহাও পরবর্ত্তী পয়ারে বলা আছে। যথা—

'কোথা 'শ্রীস্বরূপ', রূপ সনাতন বলি।
ভাসয়ে নেত্রের জলে বিলুঠয়ে ধূলি॥'

এবং উৎকট বিরহের ফলে.—

'অতিক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে॥'

পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে—

'যদ্যপিহ শুষ্ক দেহ, বাতাসে হালয়।
তথাপি নির্ব্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয়॥'

তাঁহার নির্ব্বন্ধ ক্রিয়া সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর পয়ারে জানা আছে। এবং এই তরঙ্গের প্রারম্ভে উল্লিখিত আছে। যথা—

'রাত্রি দিনে রাধা-কৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র চিন্তন ॥'

ভক্তি রত্নাকরে অতিরিক্ত আলোকপাত দেখা যাইতেছে। যথা—

'দিবা নিশি না জানয়ে শ্রীনাম গ্রহণে।
নেত্রে নিদ্রা নাই অশ্রুধারা দু নয়নে ॥'

এবং ভক্তিরত্নাকর শ্রীগ্রন্থ রচয়িতা 'নরহরি দাস' নিজ অনুভব ও অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

'দাস গোস্বামীর চেষ্টা বুঝিতে কে পারে ?
সদা মগ্ন রাধা-কৃষ্ণ চৈতন্য বিহারে।'

শ্রীনিবাস আচার্য্য যে সময় নরোত্তম শ্যামানন্দ সহ শ্রীকুণ্ডে পঁহুছিলেন সে সময় দাস গোস্বামী নির্জ্জনে বসিয়া গ্রন্থ অনুশীলন করিতেছিলেন। শ্রীনিবাস আদি দাস গোস্বামীর দূর দর্শনে নিজদিগকে ধন্য মনে করিলেন। নিকটে গমন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণতঃ হইলে তিনি অতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শ্রীনিবাসের মুখের দিকে তাকাইলেন। অর্থাৎ ব্যাপার কি ? আজ তোমরা তিনজনে একত্রে এসেছ !

শ্রীনিবাস—

গৌড়দেশ গমনের বিস্তারিত প্রস্তুতি ও বিবরণ শ্রীদাস গোস্বামীর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। তাহা শ্রবণে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাহার পর—

'সর্ব্বমতে সাবধান করি শ্রীনিবাসে।
আলিঙ্গন করি দুই নেত্র জলে ভাসে॥'

—ভঃ রঃ ৬ষ্ঠ তরঙ্গ

বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে আর একবার শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ দাস গোস্বামীর চরণ বন্দনা করিলেন। বিদায় কালীন বিচ্ছেদ ব্যথা অবর্ণনীয়। দাস গোস্বামীর ইঙ্গিতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি শ্রীকুণ্ড-বাসী কয়েক মূর্ত্তি শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দর সহিত বৃন্দাবন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। এবং গ্রন্থসহ মথুরা ত্যাগের চাক্ষুষ বিবরণ সহ তাঁহারা শ্রীকুণ্ডে ফিরিয়া দাস গোস্বামীর শ্রীচরণে নিবেদন করেন।

মা জাহ্নবা প্রসঙ্গে ঃ

মা জাহ্নবা যখন ব্রজে যান তখন দাস গোস্বামীর তনু অতিশয় ক্ষীণ তনু। চলিতে বল নাই, আহার নাই, নয়নে নিদ্রা নাই। নিরন্তর 'গৌর' ও 'গৌরগণদের' বিরহের উৎকট যন্ত্রণা ভোগ হয়। মা-জাহ্নবার বৃন্দাবনে শুভ বিজয় সংবাদ কর্ণগোচর হইলে পর দাস গোস্বামী মাতা গোস্বামীকে অভ্যর্থনার জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বৃন্দাবনে পাঠান। কবিরাজ গোস্বামীর প্রমুখ্যাৎ মা জাহ্নবাকে নিজ দশা জ্ঞাপন করাই ছিল শ্রীরঘুনাথের উদ্দেশ্য। এবং তাঁহার একান্ত প্রার্থনাও ছিল যে—মা জাহ্নবা দেবী যেন কৃপাপূর্ব্বক এখানে আসিয়া তাঁহার সন্তানকে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন।

এ সংবাদ শ্রবণে—

'শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী যে হইল অন্তরে।
তাহা বিবরিয়া কে কহিতে শক্তি ধরে?"

—ভক্তিরত্নাকর, একাদশ তরঙ্গ

মা জাহ্নবার ঐ বিহ্বল অবস্থা দর্শনে শ্রীল গোপাল ভট্ট আদি সকলেই সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—

আগামী কল্যই-'শ্রীকুণ্ডে' যাওয়া হইবে।

পরদিন প্রাতঃকালে মা জাহ্নবা শ্রীকুণ্ডতীরে উপস্থিত হইলেন। মাতা পুত্রের দর্শনের জন্য এবং পুত্রও মাতার দর্শনের জন্য ব্যাকুল। এ হেন মনের অবস্থায় যেখানে দাস গোস্বামী বলিয়াছিলেন— মা জাহ্নবা তথায় বিজয় করিলেন। দাস গোস্বামী তাঁহাকে দণ্ডবৎ ও যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। ঠাকুরাণী পরম স্নেহে ও সজল নয়নে বলিলেন—

"তোমাকে দেখিতে মোর উৎকণ্ঠিত মন"

(প্রেমবিলাস)

কিছুক্ষণ মাতা পুত্রে মর্ম্মকথার আলাপনান্তে. স্বভাব দৈন্যে দাস গোস্বামী বলিলেন—

'মা আমাকে চিরদিন নিজভৃত্য বলিয়া মনে রাখিবেন।'

পরে কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিলেন—

'আমি নিতান্ত অভাজন। বিষয়ীর ঘরে আমার জন্ম। আমি ভজন-সাধনহীন। আমার এমন কি গুণ আছে যে শ্রীগৌরসুন্দর আমায় কৃপা করিবেন? আমি একদিনও তাঁহার শ্রীচরণ সেবা করিতে পারিলাম না।

মা জাহ্নবা (নীরবে) বিশেষ চিহ্নিত 'গৌরাঙ্গ-দাস' দাস গোস্বামীর শির চুম্বন করিলেন। আনন্দাশ্রুতে তাঁহার শ্রীমস্তক সিক্ত করিতে লাগিলেন।

বেশ কিছু সময় দাস গোস্বামীর সঙ্গে সুখে যাপন করিয়া তিনি শ্রীকুণ্ডকে প্রণাম করিলেন: তাহার পর পরম বাৎসল্যের ভাবে জননী পুত্রকে রাখিয়া দূরে যাইবার সময় যে ভাবে রোদন করেন.

মা জাহ্নবা রঘুনাথের হাত ধরিয়া তেমনি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রঘুনাথও অবুঝ শিশুর ন্যায় মায়ের বিদায় কালে কাঁদিয়া ব্যাকুল।

'এই মত সেই স্থানে বিদায় হইয়া।
নিজে কান্দি যান রঘুনাথে কাঁদাইয়া॥'

(প্রেমবিলাস)

(৪)

'কবিরাজ যাঁর শিষ্য রহিলেন কাছে।'

(প্রেমবিলাস)

(গৌরহরির প্রকট বিহার কিম্বা তাহার নিত্য-সিদ্ধ-পরিকরগণের দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু, তাহাদের অভিন্ন স্বরূপ নাম-রূপ-গুণ-লীলা সম্বলিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থটি 'বাণী-বিগ্রহ' হইয়া আজও বর্ত্তমান।)

গৌরহরির শ্রীচরণ তলে স্বরূপ, স্বরূপের শ্রীচরণ তলে কবিরাজ গোস্বামী এক অপার্থিব মধুর দৃশ্য।

এ যেন রাই-কানুর ভাববিগ্রহের আশ্-মিটান-লীলাকারী গৌর-হরি 'কল্পবৃক্ষ', সে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা স্বরূপ, পত্র পুষ্পরূপে দাস গোস্বামী এবং সুপক্ক ফল শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের পয়ারে ধৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সনাতন গোস্বামীকে গৌরহরি বলিয়াছিলেন—

'তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।'

আবার রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন—

"দেহ ত্যাগ করি মনে, গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে"

তখন, গৌরহরি স্বপ্নযোগে শ্রীরূপ ও সনাতনকে জানাইলেন—

"রঘুনাথ আমার বিরহে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছে। তোমরা দুইজনে সত্বর গিরি গোবর্দ্ধন তটে যাও এবং আমার রঘুনাথকে প্রাণে বাঁচাও।

আমার রঘুনাথকে প্রাণে বাঁচাও

তাহার দ্বারে আমার অনেক কাজ হবে,

আমার রঘুনাথকে প্রাণে বাঁচাও

খৃষ্টাব্দ ১৫১৮ হইতে খৃষ্টাব্দ ১৫৩৩ পর্য্যন্ত অখণ্ড ষোড়শ বর্ষব্যাপী গৌরহরির সেবক দাস গোস্বামী। শেষ দ্বাদশ বৎসরের অন্তরঙ্গ সেবাতেও তিনি স্বরূপের আনুগত্যে নিত্য সহচর ছিলেন।

প্রাকৃত-রাজ্যে দেখা যায় চন্দন বৃক্ষের তলায় যে সব অন্যান্য বৃক্ষ অবস্থান করে, সেই সব বৃক্ষও চন্দনের গন্ধই দান করে।

যাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা হইতে সকলের সর্ব্বজ্ঞতা সেই গৌরহরি জানিতেন যে, যে দুইটির ভাব উপাদানে এই দেহ গঠিত, সেই দুই উপাদানের অশেষ বিশেষ মহিমা প্রকাশ ও প্রচার না করিলে জগৎ ইহার (গৌর স্বরূপের) 'প্রকাশ' কেন ?

—তাহা জানিতে পারিবে না ও পরিপূর্ণরূপে গ্রহণও করিতে পারিবে না। এই কারণে, ঐ দুই উপাদান (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ) সম্বন্ধে যাহাদের সর্ব্বপ্রকার সাক্ষাৎ জ্ঞান ও সেবা সম্বন্ধ আছে সেই

দুই স্বরূপ (শ্রীরূপ ও সনাতন) কে আদেশ দিলেন *—"তোমার ব্রজলীলা প্রকাশ কর।"

'গৌরলীলা' বা চির-অনর্পিত-অর্পণ লীলার সাথী ও সাক্ষী কে ? ঐ রূপ যোগ্য স্বরূপ হইতেই ত লীলা প্রকাশিত হওয়া চাই ? আবার লীলা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে তাহা প্রকাশ শোভন হয় না।

এই 'মুখ্য' প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই দাস গোস্বামীর স্বরূপ বৈভবটির প্রয়োজন। এবং এই আশয়েই গৌরহরি রূপ-সনাতনকে বলিয়াছেন—

'রঘুনাথকে প্রাণে বাঁচাও তাহার দ্বারা আমার অনেক কাজ হবে'

আচার্য্য পরম্পরায় শ্রুত হয়—

ব্রজলীলার সর্ব্বোত্তমা প্রাপ্তি বা বিরহের অবধি 'ভ্রমর গীত'

এবং

ব্রজলীলার আশ্-মিটান-লীলা যে 'গৌরলীলা', তাহার বিরহের অবধি—

'শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর'

গৌরময়-প্রাণ, উৎকট গৌর-বিরহী, স্বচ্ছদর্পণ দাস গোস্বামী সুদীর্ঘ কাল শ্রীকুণ্ডতটে বাস করিয়া কবিরাজ গোস্বামীর হৃদয়ে গৌরহরির নীলাচল লীলা বিশেষ ভাবে সঞ্চার করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত 'অক্ষররূপে' সে সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

যাঁহারা শ্রীকুণ্ড দর্শন করিয়াছেন (আশাকরি তাঁহারা অবশ্যই দর্শন করিয়াছেন।)

---

* ব্রজলীলার গ্রন্থ, লীলাস্থলী ও শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহার আদেশ পালন বা গৌর-সেবা করিয়াছেন।

১। দাস গোস্বামীর ভজন স্থান

২। কবিরাজ গোস্বামীর ভজন স্থান

আচার্য্য ও পরম প্রিয় (সেবক) শিষ্যের সহিত যতটুকু ব্যবধান থাকা দরকার এ কুটির ত্ব'টি আজও সে সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত সম্পূর্ণ হইয়াছে ১৫৩৭ শকে জ্যৈষ্ঠ পঞ্চমী রবিবার। বিশুদ্ধ জ্যোতিষ গণনায় এই ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশিত হইয়াছে।

অর্থাৎ গৌরহরি ; তাঁহার প্রকট বিহারের সমস্ত পরিকর বা লীলার সাথী ও দ্রষ্টাদের অন্তর্দ্ধানের পর 'সম্পূর্ণ লীলাটি' শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থাকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজীর "ভজন কুটির"

পঞ্চদশ তরঙ্গ

গৌর-বিরহ প্রশমনের ঔষধি ঃ

অনুভবশীল মহাজনবৃন্দের মুখে শোনা যায় যে, শ্রীকুণ্ড বাসের সময় দাস গোস্বামী তাঁহার দুর্জ্জয় গৌর বিরহের প্রশমনের ঔষধিরূপে তাহার স্বরচিত স্তব (শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্তব কল্পতরু) এবং অষ্টক (শ্রীশচীনন্দনাষ্টক স্তোত্রম্) 'নিত্য' পাঠ করিয়া বিলাপ করিতেন। মূল সংস্কৃত ও বাংলা পয়ারে অনুবাদ সহ সে দুইটি যথাক্রমে নীচে উদ্ধৃত হইতেছে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্তব কল্পতরু ঃ

গতিং দৃষ্টা যস্য প্রমদ-গজবর্য্যেঽখিলজনা
মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থুৎকার নিবহম্।
স্বকান্ত্যা যঃ স্বর্ণাচলমধরয়চ্ছীধু চ বচ-
স্তরঙ্গৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয়ং উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ (১)

সকল জনের মন করিবারে আকর্ষণ
বিধাতা কি পাতিয়াছে ফাঁদ।
একবার যেই হেরে সে আঁখি ফিরাতে নারে
মন-উন্মাদন গোরাচাঁদ॥
হেরিয়ে গৌরাঙ্গ-গতি থুৎকৃত-গজেন্দ্র-গতি
গজ সে সামান্য মদে মাতা।

গৌরাঙ্গ বদন হেরে, সকলঙ্ক চন্দ্রোপরে
ঘৃণা করে সকল জনতা ॥

গৌর-কান্তি ঝলমল তার আগে স্বর্ণাচল
অচল সে তারে কি গণিব ।

গৌরাঙ্গ মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিনী
পিলে মন করে পিব পিব ।

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু !
হৃদয়ে উদয় হৈয়া মাতায় আমার হিয়া
ভুলিতে নারিব আর কভু ।

অলঙ্কৃত্যাত্মানং নব-বিবিধ-রত্নৈরিব বলদ্—
বিবর্ণত্ব-স্তম্ভাস্ফুট-বচন-কম্পাশ্রু-পুলকৈঃ ।
হসন্ স্বিদ্যন্নৃত্যন্ শিতি-গিরিপতের্নির্ভরমুদে-
পুরঃ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

ওহে মোর গৌরসুন্দর নটরাজ !
শ্রীল জগন্নাথ আগে বাড়াইয়া অনুরাগে,
নাচে পরি'ভাব-রত্ন সাজ ॥

বৈবর্ণ্য স্তব্ধতা আর, গদগদ বাক্যোচ্চার,
কম্প, অশ্রু, পুলক, সঘর্ম্ম ।

এই সপ্ত সাত্বিকভাব আর দুই অনুভাব
হাস্য, নৃত্য, সব প্রেম ধর্ম্ম ॥

নব রত্ন অলঙ্কার অঙ্গে শোভে চমৎকার
হেরি জগন্নাথ প্রমোদিত।
সে রস যে নিরখিল সেই সে রসে মাতিল
মোর মন করে উন্মাদিত ॥

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু!
হৃদয়ে উদয় হৈয়া মাতায় আমার হিয়া
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ (২)

রসোল্লাসৈস্তির্য্যগ্‌গতিভিরভিতো বারিভিরলং
দৃশোঃ সিঞ্চঁল্লোকানরুণ জলযন্ত্রত্বমিতয়োঃ
মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা মধুর মধরং কম্প-চলিতৈ-
র্নটন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ (৩)

রসের অবধি মোর গোরা।
রসের উল্লাস ভরে, অপরূপ নৃত্য করে,
দু'নয়নে বহে প্রেমধারা ॥

অপরূপ সে মাধুরী স্মরণ করিয়া হরি,
বারি বহে রাঙ্গা দুই নেত্রে।
বসন্ত উৎসব কালে সেচন করয়ে জলে
যেন পিচকারী জলযন্ত্রে ॥

সকম্প আনন্দাবেশে দশনে অধর দংশে
হেন প্রেম আছিল কোথায়।

একবার যারে হেরে তার আঁখি মন হরে
মোর মন সতত মাতায় ॥

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু !
হৃদয়ে উদয় হৈয়া মাতায় আমার হিয়া
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ (৩)

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতি-সুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিক দৈর্ঘ্যং ভূজপদোঃ ।
লুঠন ভূমৌ কাক্বা বিকল-বিকলং গদ্গদবচা ॥
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ (৪)

একদিন কাশী মিশ্রালয়ে—

বসিয়াছেন মহাপ্রভু যা দেখি না শুনি কভু
হেন ভাব উদয় হৃদয়ে ॥

শ্রীনন্দনন্দন হরি বিরহ আবেশে ভরি,
অঙ্গ সন্ধি সব শ্লথ হৈল ।

ভুজ পদ দীর্ঘাকার গদগদ বচনোচ্চার
ভূমে লুঠে কাঁদে সবৈকল্য ॥

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু !
হৃদয়ে উদয় হৈয়া মাতায় আমার হিয়া
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ (৪)

অনুদঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিক-সুরভি-মধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎ-সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরু-বিরহাদ্
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ (৫)

শয়ন মন্দিরে গোরারায় !
কৃষ্ণের বিরহ ভরে, মন্দিরে রহিতে নারে,
বাহিরে যাইতে মন ধায় ॥

কৃষ্ণের বিরহে রাধা, যেন উৎকণ্ঠিত সদা,
কৃষ্ণবেণু শুনি বনে যান।
এই মত আচম্বিতে, বংশী পাইয়া শুনিতে,
সে হেতু বাহিরে যেতে চান ॥

তিন দ্বার আছে রুদ্ধ, তিন ভিত্তি উচ্চ উর্দ্ধ,
তাহা লঙ্ঘে আবেশের বলে।
তেলেঙ্গা গাই-এর মাঝে, দেখি গোরা রসরাজে,
পড়িয়াছে শ্বাস নাহি চলে ॥

ভাব বুঝা নাহি যায়, প্রভু দেখি কুর্ম্ম প্রায়,
অঙ্গ সব সঙ্কুচিত অঙ্গে।
অন্বেষিয়া ভক্তগণ, দীপ জ্বালি দরশন,
করে কূর্ম্মাকৃতি শ্রীগৌরাঙ্গে ॥

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু !

হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ৫ ॥

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদ-সদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ন বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদন-বিধু-ঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো-হৃদয় উদয়ন্মাং-মদয়তি ॥ (৬)

একদিন সে আপন, প্রাণার্ব্বুদ সমান,
ব্রজ লাগি বিরহে বিভোর।
করেন প্রলাপ অতি, তাপ বিকল মতি
অবিরত উন্মাদে উজোর ॥

বাহিরে যাইতে মন, যাইতে না পেয়ে পুন,
ভিতে ঘর্ষে বদন-সরোজ।
অপরূপ প্রেমরাশি, গৌর রস-সুবিলাসী,
হেরি মোহে কোটি মনোজ ॥

হেন গৌর রসরাজ, স্বানুভাবে নটরাজ,
উদয় মোর হৃদয় মাঝার।
জানি না সেহ কেমন, কেমন করয়ে মন,
উন্মাদে যে হয় সে বিভোর ॥

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু!
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ৬ ॥

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে !
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধন্নুন্মদ ইব ।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত-তদ্
ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭ ॥

একদিন গকুলচাঁদে, দরশন মনসাধে,
ঠাকুর মন্দিরে চলি যায় ।
দ্বারে আছে দৌবারিক, তারে দেখি সমধিক,
ভাবোন্মাদে মত্ত গৌররায় ॥

তারে কহে ওহে শুন, তুমি সে বন্ধু আপন,
বল কোথা মোর প্রাণ গোবিন্দ ।
প্রভুর সম্ভাষ শুনি, দৌবারিক সে আপনি,
কহে বুঝি ভাব অনুবন্ধ ॥

চলহ ত্বরিতে দেখ, তোমার সে প্রাণ সখ,
এত শুনি ধরে তার হাত ।
রাধিকা ভাবিত মতি, নিজে গোপী-প্রাণপতি,
আপনে বোলয়ে প্রাণনাথ ॥

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু !
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা—
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮ ॥

নীলাচল নিকটেতে, দেখি চটক পর্ব্বতে,
ভাবে মত্ত গৌর রসরাজ।

যাব সে আমি গকুলে, গৌর গুণমণি বলে,
দেখি গোবর্দ্ধন গিরিরাজ ॥

উন্মাদ বাতুল হেন, পথাপথ নাহি জ্ঞান,
হেন কালে নিজগণে ধরে।

হেন গৌর রসরাজ, উদয় হৃদয় মাঝ,
বিহ্বল করয়ে সদা মোরে ॥

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু!

হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ৮ ॥

অলং দোলা-খেলা-মহসি বর-তন্মণ্ডপ-তলে
স্বরূপেণ স্বেনাপর-নিজগণেনাপি মিলিতঃ।
স্বয়ং কুর্ব্বন্নাম্নামতি-মধুরগানং মুরভিদঃ
সরঙ্গো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৯ ॥

দোল মহোৎসব কালে, বসি দোল মঞ্চতলে,
স্বরূপাদি নিজগণ সনে।
আপনে গৌরাঙ্গ রায়, নিজ নাম গান গায়,
পরিপূর্ণ মাধুর্য্য তরঙ্গে ॥

সে অঙ্গ যে নিরখিল, প্রেমামৃতে সে মজিল,
আর কি ভুলিতে পারে কভু।
হৃদয়ে উদয় ক'রে, সতত মাতায় মোরে,
প্রেমসিন্ধু স্বর্ণ-গৌর প্রভু ॥ ৯ ॥

দয়াং যো গোবিন্দে গরুড় ইব লক্ষ্মীপতিরলং
পুরীদেবে ভক্তিং য ইব গুরুবর্য্যে যদুবরঃ।
স্বরূপে যঃ স্নেহং গিরিধর ইব শ্রীল-সুবলে
বিধত্তে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১০ ॥

গোবিন্দ নামক ভক্ত, তারে দয়া অনুরক্ত,
যেমন গরুড়ে লক্ষ্মীপতি।
পুরীদেবে করে ভক্তি, যেন তাঁর অনুরক্তি,
যদুবর সান্দীপনি প্রতি ॥

স্বরূপে করেন স্নেহ, যেমন একই দেহ,
গিরিধারী যেমন সুবলে।
সে প্রভু ভাবিয়া মনে, মন না ধৈরয মানে,
সদাভাসে প্রেমামৃত জলে ॥

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু !

হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ১০ ॥

মহা-সম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি। ১১ ॥

আমি অতি অভাজন, বেষ্টিত সম্পদ বন,
ত্রিতাপ সে বনে দাবানল।

স্বরূপের আশ্রয়ে দিয়ে, করুণাতে উদ্ধারিয়ে,
প্রকাশিলা আনন্দ প্রবল ॥

বক্ষে ধৃত গুঞ্জাহার, গোবর্দ্ধন শিলা আর,
সঁপিলেন দয়া করি মোরে।

এ হেন দয়ার নিধি, হৃদয়ে উদয় যদি,
সে আনন্দ ধৈর্য্য কেবা ধরে ॥

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু !

হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গোদ্গত-বিবিধ-সদ্ভাব-কুসুম
প্রভা-ভ্রাজৎ-পদ্যাবলি-ললিত-শাখং সুরতরুম্।
মুহুর্যোঽতিশ্রদ্ধৌষধিবর-বলৎপাঠসলিলৈ-
রলং সিঞ্চেদ্ বিন্দেৎ সরসগুরু-তল্লোকন-ফলম্॥ ১২॥

স্তব কল্পবৃক্ষ হয় ইহার আখ্যান।
ইহা যেই পাঠ জলে সিঞ্চে ভাগ্যবান॥

ত্রিসন্ধ্যায় করে যেই পাঠ অবিরত।
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমে সেই হয় উনমত॥

পঠনে শ্রবণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ॥

দাস গোস্বামিপদ হৃদে করি আশ।
কল্পবৃক্ষ ভাষে নবদ্বীপচন্দ্র দাস॥

শ্রীশচীনন্দনাষ্টক স্তোত্রম্

হরিদৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুরগতমাত্মানমতুলং ।
স্বমাধুর্য্যং রাধাপ্রিয়তমসখী বাপ্তুমভিতং ॥
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপর গৌরৈকতনুভাক্ ।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণিং যাস্যতি পুনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীব্রজমণ্ডল মাঝ, ব্রজ নব যুবরাজ,
রসরাজ মাধুর্য্য সাগর ।
রাধা প্রিয়তম সখি, মাধুর্য্যে পরম সাক্ষী,
নিরপেক্ষ প্রেমের আকার ॥

রাধিকার অনুরাগ, বাড়াইতে মহাভাগ,
গোপনে করিয়া নটবেশ ।
দর্পণে দেখেন রূপ, ত্রিজগতে অপরূপ,
স্বমাধুর্য্য অশেষ বিশেষ ॥

নবঘন নীলাঞ্জন, প্রভৃতি উপমাগণ,
কোথা গণি সেহ মূল্যতম ।
সে গাম্ভীর্য্যে ডুবে যায়, সত্যসুখবোধ্যদ্বয়,
শ্যামল সুন্দর নিরুপম ॥

উজ্জ্বল কিরণ তায়, উছলে বিজুলি প্রায়,
রাঙ্গা আঁখি রাধা-অনুরাগে ।
নয়ন ঝাঁপিয়া পৈশে, হৃদয় চাপিয়া বৈসে,
এরূপ বারেক যারে লাগে ॥

মন করে উদাসীন, জল বিনু যেন মীন,
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি সহে।
শুধু রূপের এত ছটা, তাহাতে ভূষণ ঘটা,
পিতাম্বর বেণু শোভে তাহে॥

শুক্ল সু-নির্ম্মল জ্যোতি, রক্ত অনুরাগ রতি,
অন্তরে অন্তরে হিরন্ময়।
স্নিগ্ধ মুগ্ধ চিদাকাশ, শ্যামল বিমব ভাস,
শবল বিচিত্র জ্যোতি তায়॥

আশা মাত্রে পাপ নাশি, উপজায় পুণ্যরাশি,
চিত্ত শুদ্ধি ভক্তি মুক্তি দিয়ে।
রাখিয়ে দুঃখের পরে, প্রেম দিয়া মন হরে,
এ বন্যায় কে পলাবে ধেয়ে॥

সে রূপের নিরীক্ষণে, জগৎ জনার মনে,
বহুমানে ধাতার কৌশল।
অহো ধাতা দয়াময়, জুড়াইতে তাপত্রয়,
রূপে বিশ্ব করিল শীতল॥

নয়ন নিমেষ দুঃখে, মীন চক্ষু বাঞ্ছে লোকে,
প্রতিক্ষণে নব নব শোভা।
এ রূপের কিবা শক্তি, উপজায় প্রেমভক্তি,
নিরবধি জগ-মনলোভা॥

এই মত আত্মা হেরি, বিচার করেন হরি,
স্বমাধুর্য্য করি অনুভব।
রাধাভাবে যদি দেখি, রাধা সম হব সুখী,
যে সুখ 'বিষয়ে' অসম্ভব ॥

মিলিয়া রাধার সনে, রাধাভাব লৈয়া মনে,
রাধা ধ্যানে রসিক শেখর।
শ্রীরাধার ঐকান্তিক, অনুরাগ স্বাভাবিক,
সেই ভাবে মন গর গর ॥

বিচারিতে বাড়ে রতি, ধরিয়া রাধার দ্যুতি,
কি আশ্চর্য্য গৌড় মণ্ডলে।
আর এক নিজ মূর্ত্তি, গৌরাঙ্গ মধুরাকৃতি,
শচীগর্ভে জাত বিপ্রকুলে ॥

সকল রূপের ভূপ, গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ,
হেরিবে এমনি হয় মনে।
রসিক শেখর হরি, অঙ্গে মাখা রাই কিশোরী,
অনুরাগী আপন ভজনে ॥

সে রূপ বারেক হেরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
আশা পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষিতে।
নয়নের পথে কভু, পুন কি মিলিবে প্রভু,
শচীর নন্দন প্রাণনাথে ॥

পুরীদেবস্যান্তঃ প্রণয়মধুনা স্নানমধুরো।
মুহুর্গোবিন্দাদ্য দ্বিশদ পরিচর্য্যার্চ্চিতপদঃ ।।
স্বরূপস্য প্রাণার্ব্বুদ কমল নীরাজিতমুখঃ।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন সরণিং যাস্যতি পুনঃ ।। ২ ।।

এরূপে গৌরাঙ্গরূপে, অবতীর্ণ নবদ্বীপে,
গৃহে থাকি চব্বিশ বৎসর।
লোক ত্রাণ প্রেমাবেশে, বৃন্দারণ্য অভিলাষে,
সন্ন্যাস করিলা অতঃপর ।।

নবদ্বীপের ভক্তগণ, বিরহেতে অচেতন,
জীবন চৈতন্য কৃপা বর্ষে।
মাতৃ আজ্ঞায় নীলাচলে, স্থিতি জানি সবে চলে,
প্রত্যক্ষ দর্শন রসতর্ষে।।

ক্ষেত্রবাসী সর্ব্বত্যাগী, ভক্তগণ সহযোগী,
নানা 'রসে' ভজে রসরাজে।
কেহো স্নেহ কেহো সখ্যে, কেহ দাস্য কেহ মুখ্য,
নিজ নিজ মনোমত কাজে ॥

পরম আনন্দ পুরী, শ্রীপরমানন্দ পুরী,
পরম প্রণয় মধুরসে।
চৈতন্যে করান স্নান, পুরীদেব ভগবান,
অলৌকিক প্রণয় বিশেষে ।।

গোবিন্দ নামক ভক্ত, পাদ সেবা অনুরক্ত,
গুরু নিয়োজিত দয়া-দাস।
গোবিন্দ সমান ভাগ্য, কে হইবে তার যোগ্য,
দেবতার যাহে অভিলাষ ॥

স্বরূপ দামোদর নাম, উজ্জ্বল প্রেমের ধাম,
রাধিকা সখীর সম ভাবে।
চৈতন্যের মর্ম্মজ্ঞানে, প্রাণকোটি নির্ম্মচ্ছনে,
শ্রীমুখ মার্জ্জনে সদা সেবে ॥

সে রূপ বারেক হেরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
আশা পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষিতে।
নয়নের পথে কভু, পুনঃ কি মিলিবে প্রভু,
শচীরনন্দন মোর মাথে ॥ ২ ॥

দধানং কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণং।
প্রকাণ্ডো হেমাদ্রি দ্যুতিভি রভিতঃ সেবিত তনুঃ ॥
মুদা গায়ন্নুচ্চৈ নিজ মধুর নামাবলিমসৌ।
শচীসূনু কিং মে নয়ন সরণিং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৩ ॥

সকল রূপের ভূপ, গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ,
অরুণ কৌপীন বহির্বাস।
প্রকাণ্ড দীঘল তনু, কণক পর্ব্বত জানু,
কান্তি ভরে চৌদিগ প্রকাশ ॥

প্রেমানন্দ রস ভরে,　　নাম-সংকীর্ত্তন করে,
মধুর গম্ভীর স্বর ধাম।
বলে দুঃখহারি কৃপা বর্ষ,　চিত্তাকর্ষি রসোৎকর্ষ,
রতি দাতা 'হরে কৃষ্ণ রাম' ॥

সে রূপ বারেক হেরি,　ধৈরজ ধরিতে নারি,
আশা পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষিতে।
নয়নের পথে কভু,　পুন কি মিলিবে প্রভু,
শচীর নন্দন প্রাণনাথে ॥ ৩ ॥

অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈ ভক্তি-নিপুণৈঃ।
শ্রুতে গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরস ফলাং ভক্তিলতিকাম্ ॥
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতি কৃপাভিঃ প্রকটয়ন্।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন সরণিং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৪ ॥

এ গৌড়মণ্ডলে প্রভু দয়ালু চৈতন্য।
অবতীর্ণ হইয়া ভুবন কৈল ধন্য ॥

প্রকটিল ভক্তি লতা পরম মঙ্গল।
সে লতায় ফলে প্রেমোজ্জ্বল রসফল ॥

চৈতন্য দর্শনে ব্রজভাবে কৃষ্ণ-রতি।
রাগমার্গে ঈশ্বরের ভজনে প্রবৃত্তি ॥

পূর্ব্ব মুনিগণ সবে এ ভক্তি বাঞ্ছিল।
আজ্ঞা বিনা জানাইতে তাহারা নারিল ॥

কর্ম্ম জ্ঞান বৈধী ভক্তি বৈধ-অনুরাগ।
এই সব প্রকাশিল পূর্ব্ব মহাভাগ॥

গোপিকার মত নিরপেক্ষ অনুরাগে।
ভজন যোগ্যতা স্ফুরে প্রভু কৃপা-যোগে॥

তাদৃশ যোগ্যতা বিনে তাদৃশ প্রসাদ।
'রাস' লভ্য নহে, যাতে লক্ষ্মী করে সাধ॥

কাম রতি, ঐশ্বর্য্য রতি স্বাভাবিক রতি।
স্বভাব সামর্থ্য রতি গোকুল যুবতী॥

সেই অধিকারী অন্তরঙ্গ শিরোমণি।
আত্মতত্ত্ব রহস্য প্রকাশ পাত্র মানি॥

শ্রুতিগণ এই তত্ত্ব রাখিল গোপনে।
পরাভক্তি প্রশংসনে প্রাপ্ত গোপীগণে॥

হেন ভক্তি প্রচারিল শচীর নন্দন।
হেন কি হইবে পুন মিলিবে দর্শন॥ ৪॥

নিজত্বে গৌড়ীয়ান জগতি পরিগৃহ্য-প্রভুরিমান্।
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণন বিধিনা কীর্ত্তরত ভোঃ॥
ইতি প্রায়াং শিক্ষাং জনকইব তেভ্যঃ পরিদির্শন্।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন সরণিং যাস্যতি পুনঃ॥ ৫॥

গৌড়বাসী জনে, নিজ জন জ্ঞানে,
বিশেষে করিয়া স্নেহ।

পুত্র প্রায় করি, শিখায়েন হরি,
হরে কৃষ্ণ বলি নেহ ॥

যদ্যপি চৈতন্য, বিশ্ব কৈল ধন্য,
সকলে সমান দয়া।
ভাষাদি সমতা, দেশীয় মমতা,
গৌড়ীয়ে অধিক মায়া ॥

গৌড়বাসী সবে, অসাহসী ভবে,
পূর্ব্বে ছিল অবজ্ঞাত।
চৈতন্য প্রভাবে, বিদ্যা বৃদ্ধ সবে,
রাজগণ অভিমত ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবে, চৈতন্য বৈভবে,
ভজন-রস গভীর।
হেন কি হইবে, পুন দেখা দিবে,
চৈতন্য করুণা বীর ॥ ৫ ॥

পুরঃপশ্যান্নীলাচলপতি মুরুপ্রেম নিবহৈঃ।
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত নিজ দীর্ঘোজ্জ্বলতনুঃ ॥
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়িগরুড়স্তম্ভ চরমে।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন সরণি যাস্যতি পুনঃ ॥ ৬ ॥

নীলাচলেশ্বর, পরম অক্ষর,
নীলাঞ্জন-ঘৃণাকর।
ঈশ্বর ভজনে, অনুরাগ মনে,
প্রভু করে সাক্ষাৎকার ॥

প্রেমানন্দ ভরে, নেত্র বারি ঝরে,
আনন্দ বৈবশ্য ভয়ে।
নিকটে না উঠে, গরুড় নিকটে,
দর্শন লাগিয়া রহে ॥

আপনি অদ্বয়, ভজন বিষয়,
আপনি ভকত ধীর।
হেন কি হইবে, পুন দেখা দিবে,
চৈতন্য করুণাবীর ॥ ৬ ॥

মুদা দন্তৈর্দষ্টাদ্ব্যুতি বিজিত বন্ধুকমধুরং
করং কৃত্বা বামং কটি নিহিত মন্যং প্রবিলসন্।
সমুত্থাপ্য প্রেম্নাগণিত পুলকো নৃত্য কুতুকী।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন সরণিং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৭ ॥

চৌদিকে বেড়িয়া ভক্ত, সঙ্কীর্ত্তনে অনুরক্ত,
মাঝে নাচে চৈতন্য চন্দ্রমা।
কদম্ব কেশর জিনি, প্রব্যক্ত পুলক শ্রেণী,
প্রভু প্রকাশেন প্রেম-সীমা ॥

আনন্দ উদ্রেক অতি, মাতিল ভক্তের প্রতি,
বাঁধুলি অধর চাপে দন্তে।
কটিতটে বাম কর, দক্ষ বাহু উর্দ্ধতর,
সেই শোভা ধাইল দিগন্তে ॥

বারেক সে রূপ হেরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
আশা পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষিতে।
নয়নের পথে কভু, পুন কি মিলিবে প্রভু,
শচীর নন্দন প্রাণনাথে ॥

সরিত্তীরারামে বিরহবিধুরো গকুলবিধো।
র্নদীমন্যাং কুর্বন্নয়নজলধারা বিততিভিঃ ॥
মুহূর্মূর্চ্ছাং গচ্ছন্মৃতকমিব বিশ্বং বিরচয়ন্।
শচীসুনুঃ কিং মে নয়ন সরণিং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৮ ॥

সরিত্তীরে উপবন, মধ্যে শ্রীশচীনন্দন,
উদ্দীপন কৃষ্ণের বিরহ।
নয়ন গলিত জলে, অপরূপ নদী চলে,
মুহূর্মুহু অনুভবে মোহ ॥

সেই দশা যে দেখিল, তার কি না দশা হৈল,
মৃতপ্রায় নাহিক সম্বিৎ।
কার ভাবে গৌরহরি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
ইহা বলি সকলে মোহিত ॥

বারেক সে রূপ হেরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
আশা পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষিতে।
নয়নের পথে কভু, পুন কি মিলিবে প্রভু,
শচীর নন্দন মোর সাথে ॥

শচীসূনোরস্যাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ ।
সদা দৈন্যোদ্রেকাদতি বিশদবুদ্ধিঃ পঠতি যঃ ॥
প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতিকৃপাবেশবিবশঃ ।
পৃথুপ্রেমাম্ভোধৌ প্রথিত রসদে মজ্জয়তি তং ॥

শ্লোক পড়ি প্রেম যোগে, গৌরাঙ্গ দেখেন আগে,
শ্রীদাস গোস্বামী মহামতি ।
অষ্টকে অভিষ্ট দিলো, আপনে প্রতীত হৈলো,
আশীর্ব্বাদ করে লোক প্রতি ॥

শ্রীশচীনন্দনাষ্টক, সর্ব্বাভীষ্ট সম্পাদক,
দৈন্য করি পড়ে যে সুমতি ।
শ্রীচৈতন্য প্রভু তাঁরে, ডুবাবেন প্রেম সাগরে,
সদয় হইয়া তাঁর প্রতি ॥

ইতি শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী বিরচিত শ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্

(১)

শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর স্বরচিত বাংলা পদ কীর্ত্তন ঃ—

(শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা)

"চন্দ্রবদনী ধনী, মৃগ-নয়নী ।
রূপে গুণে অনুপমা, রমণী-মণি ॥

মধুরিম-হাসিনী, কমল বিকাসিনী,
মতিম হারিণী, কম্বুকণ্ঠিনী ।

স্থীর সৌদামিনী, গলিত কাঞ্চন জিনি,
তনু রুচি ধারিনী, পিক-বয়ানী ॥

উজর লম্বিত বেণী, মেরুপর যেন ফণী,
আভরণ বহু মণি গজগামিনী।
বীণা পরিবাদিনী, চরণে নূপুর ধ্বনি,
রতিরসে পুলকিতা জগমোহিনী ॥

সিংহ জিনি মাজা ক্ষীনী, তাহে মণি কিঙ্কিনী,
কাঁপি উছলি তনুপদ অবনী।
বৃষভানু-নন্দিনী, জগজন বন্দিনী,
দাস রঘুনাথ পহু মনোহারিণী।

আরত্রিক বর্ণনা :

"হরত সকল সন্তাপ, জনমকো,
তড়প তড়প যম কাল কি।
(মিঠু তপন তাপ কাল কি)
আরতি কিয়ে মদনগোপাল কি ॥ ধ্রু ॥
গো-ঘৃত রচিত, কর্পূর কি বাতি,
ছলকত কাঞ্চন থাল কি।
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ, • ঝাঁঝরী বাজত,
বেণু বিশাল কি ॥
চন্দ্র কোটি জ্যোতি, ভানু কোটি রশ্মি,
মুখ শোভা নন্দলাল কি।
ময়ূর মুকুট, পীতাম্বর শোহে,
উরে বৈজয়ন্তী মাল কি ॥

সুন্দর লাল, কপোল ছবি মো,
নিরখত মদনগোপাল কি।
সুর-নর মুনিগণ, করতহি আরতি,
ভকত বৎসল প্রতিপাল কি ॥
ঘণ্টা তাল, মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী,
অঞ্জলি কুসুম গোপাল কি।
বন্দিছে রঘু,- নাথ দাস, পঁহু,
মোহন গোকুল বাল কি ॥"

জয়দেবের মহিমা কীর্ত্তন *ঃ

পদ্মাবতী রতিকান্ত!
রাধামাধব, প্রেমভকতি রস,
উজ্জ্বল মূরতি নিতান্ত ॥
শ্রীগীতগোবিন্দ, গ্রন্থ সুধাময়,
বিরচিত মনোহর ছন্দ।
রাধাগোবিন্দ, নিগূঢ় লীলা গুণ,
পদ্মাবলী পদবৃন্দ ॥
কেন্দু বিল্ববর, ধাম মনোহর,
অনুক্ষণ করয়ে বিলাস।
রসিক ভক্তগণ, সে সরবস ধন,
অহর্নিশি রহু তছু পাশ ॥
যুগল বিলাস গুণ, করু আস্বাদন,
অবিরত ভাবে বিভোর।
দাস রঘুনাথ ইহ, তছু গুণ বর্ণন,
কিয়ে করব নব ওর ॥

* আমাদের মনে হয় শ্রীল জয়দেব রচিত শ্রীগীত-গোবিন্দের গান-কীর্ত্তন শ্রবণে, নীলাচলে গম্ভীরা কক্ষে যে মধুময় পরিবেশ ও আনন্দ লাভ হইত তাহারই স্মরণ ও কৃতজ্ঞতায় এই 'জয়দেব' মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"বিরহে" গৌর সেবার উপকরণ ঃ

শ্রীমদ্ দাস গোস্বামী শ্রীকুণ্ডে অবস্থান কালে গৌরহরির সেবার উপকরণ হিসাবে যে সব স্বরচিত স্তব স্তবাবলী কীর্ত্তন করিতেন তাহাদের তালিকা ঃ—

(ক) শ্রীশ্রীস্তবাবলীস্থ-স্তবানাং সূচিকা

	স্তবের নাম	শ্লোক সংখ্যা
১।	শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্	৯
২।	শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরু	১২
৩।	শ্রীশ্রীমনঃ শিক্ষা	১২
৪।	শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিনঃ প্রার্থনা	৪
৫।	শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকন্	১১
৬।	শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাস প্রার্থনাদশকম্	১১
৭।	শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্	৯
৮।	শ্রীশ্রীব্রজবিলাস-স্তবঃ	১০৭
৯।	শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ	১০৪
১০।	শ্রীশ্রীপ্রেমপূরাভিধ-স্তোত্রম্	১১
১১।	শ্রীশ্রীগ্রন্থকর্ত্তুঃ প্রার্থনা	৪

	স্তবের নাম	শ্লোক সংখ্যা
১২।	শ্রীশ্রীস্বনিয়মদশকম্	১১
১৩।	শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশত-নামস্তোত্রম্	৪৭
১৪।	শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্	৯
১৫।	শ্রীশ্রীপ্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ	১৩
১৬।	স্বসঙ্কল্প-প্রকাশ-স্তোত্রম্	২১
১৭।	শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল কুসুমকেলিঃ	৪৪
১৮।	শ্রীশ্রীপ্রার্থনামৃতম্	২১
১৯।	নবাষ্টকম্	৯
২০।	শ্রীশ্রীগোপালরাজস্তোত্রম্	১৫
২১।	শ্রীশ্রীমদনগোপালস্তোত্রম্	১১
২২।	শ্রীশ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্	১৩৪
২৩।	শ্রীশ্রীমুকুন্দাষ্টকম্	৯
২৪।	উৎকণ্ঠা দশকম্	১১
২৫।	শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টকম্	৯
২৬।	অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্	৮
২৭।	শ্রীশ্রীদাননির্ব্বর্ত্তনকুণ্ডাষ্টকম্	৯
২৮।	শ্রীশ্রীপ্রার্থনাশ্রয় চতুর্দ্দশকম্	১৪
২৯।	অভীষ্টসূচকম	১৫

(খ) উপরোক্ত স্তবাবলী ছাড়া—

"শ্রীশ্রীদানকেলিচিন্তামণি" ও "শ্রীশ্রীমুক্তাচরিত" সর্ব্বজনবিদিত গ্রন্থ দুটিও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিরচিত।

———

নোট ঃ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিরচিত—স্তবাবলী, শ্রীশ্রীদানকেলিচিন্তামণি এবং শ্রীশ্রীমুক্তাচরিতের—

'মূল', পদচ্ছেদ', 'অন্বয়' ; 'প্রখ্যাত শ্রীল যদুনন্দন দাসের বাংলা পয়ারে অনুবাদ' এবং ফুটনোটে 'সংস্কৃত টীকা' সহ একটি **স্বতন্ত্র** গ্রন্থ শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রেরণায় প্রকাশের ইচ্ছা রইল।

ষোড়শ তরঙ্গ

ভূমিকা

পণ্ডিতের তর্কযুক্তির আসরে যান্ নাই, ধার্মিকের বাদ প্রতিবাদের সভায় যান্ নাই, মঠ মন্দির স্থাপনে উদ্যোগী হন নাই, অথচ "বহুদিনের লুপ্ত তীর্থস্থানগুলির পুনরুদ্ধার হয়েছে," "বহু প্রাচীন সেবা প্রতিষ্ঠানের পরিপাটি সেবার বন্দোবস্ত হ'য়েছে" "অসংখ্য নরনারী বৈষ্ণবধর্মে গাঢ়ভাবে আনুগত্য লাভ ক'রেছে," কিন্তু **কোথায় মোহান্ত হন নাই, কোথাও কর্তৃত্ব নিয়ে বিষয়ী বৈষ্ণবের পদ গ্রহণ করেন নাই।**

কি অদ্ভুত সংকীর্ত্তনের মোহন আকর্ষণ তাঁর কণ্ঠে বেজেছে!

বাঙ্গালী ও বিশ্বের গর্ব্ব, বাঙ্গালীর সাধনা, বাঙ্গালীর চেতনা, বাঙ্গালী ও বিশ্ববাসীর প্রেরণার উৎস **শ্রীল রামদাস**।

এ হেন শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় যে ভাবে দাস গোস্বামীর চরিত্র 'অনুভব' ও 'অনুশীলন' করেছেন, তাহা পরিবেশন ক'রে আমরা এ গ্রন্থের উপসংহার টানব।

("সূচক-কীর্ত্তন তো স্মরণ করা,—
তোমাদের ব্যবহার রাজ্যে শোচক বা শোক-প্রকাশ।
ভক্তের বিরহই তো, সবচেয়ে দুঃখের, তাইতো 'শোচক'।
ওই সব দিন স্মরণ ক'রে কীর্ত্তন করলে তজ্জাতীয় শক্তিলাভ হয়।
যদি কেউ অন্য ব্রত নাও পারে, কিন্তু শোচক কীর্ত্তন স্মরণ বা পাঠ করা দরকার, তাতে ঢের পাওয়া যায়।")

(বাবাজী মহাশয়)

শ্রীসূচক কীর্ত্তনের গৌরচন্দ্র

প্রেমসিন্ধু গোরারায়

আ'মরি,—প্রেমসিন্ধু গোরারায়

শ্রীরাধাকৃষ্ণ,—প্রেমবিকারের বারিময়—প্রেমসিন্ধু গোরারায়

আ'মরি,—শত শত ধারা বয়

বহে শত শত ধার

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতসার— বহে শত শত ধার

(নিরন্তর),—যাহা হইতে দশদিগে— বহে শত শত ধার

আ'মরি,—অক্ষয় পারাবার

নানাভাব রত্নালয় আ'মরি—অক্ষয় পারাবার—

(আ'মরি,—মহাভাব রত্নালয়—অক্ষয় পারাবার)

"প্রেমসিন্ধু গোরারায়, নিতাই তরঙ্গ তায়",

আ'মরি,—হেলে দুলে খেলায় রে

ওরে ভাই রে আমার,—আমার নিতাই তরঙ্গ—হেলে দুলে খেলায় রে

ওরে ভাই রে আমার,—গৌর প্রেমসিন্ধু হিয়ায়, হেলে দুলে খেলায় রে

(আ'মরি,—কতই না গরব ক'রে—হেলে দুলে খেলায় রে)

"প্রেমসিন্ধু গোরারায়, নিতাই তরঙ্গ তায়,"

—১০

ওকি আহা-মরি,—"করুণা-বাতাস চারি পাশে"।

তা'তে—"প্রেম উথলিয়া পড়ে"

আ'মরি রে,—করুণা বাতাস-পরশে—প্রেম উথলিয়া পড়ে,

'আ'মরি,—করুণা-বাতাস পরশে—

আমার,—নিতাই তরঙ্গসনে অদ্বৈত,—করুণা-বাতাস-পরশে

ওরে ভাই রে আমার, আমার,—

নিতাই তরঙ্গসনে—করুণা-বাতাস পরশে

"প্রেম উথলিয়া পড়ে"

আ'মরি—উথলিয়া ভাসায় রে

আমার,—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমসিন্ধু— উথলিয়া ভাসায় রে

আ'মরি,—প্রেমজলে ডুবায় রে

গৌর, প্রেমসিন্ধু উথলিয়া— প্রেমজলে ডুবায় রে

আ'মরি,—স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা— প্রেমজলে ডুবায় রে

আহা,—"প্রেম উথলিয়া পড়ে, জগত হাফাল ছাড়ে,"

ওকি আহা-মরি,—"তাপতৃষ্ণা সবাকার নাশে ॥"

সেই, প্রেমজলে সিঞ্চিত করে

গৌর, প্রেমসিন্ধু উদ্বেলিত— সেই, প্রেমজলে সিঞ্চিত করে

নিতাই-তরঙ্গ-যোগে উছলিত—

সেই, প্রেমজলে সিঞ্চিত করে

করুণা,—বাতাস-পরশে উদ্বেলিত—

সেই, প্রেমজলে সিঞ্চিত করে

ওকি আহা-মরি,—"তাপ তৃষ্ণা সবাকার নাশে ॥"

ও ভাই দেখ দেখ,—"নিতাই চৈতন্য দয়াময় ।"

এমন,—হয় নাই আর হবার নয় রে

ওরে ভাই রে আমার এমন,—পরম করুণ প্রেমদাতা—

হয় নাই আর হবার নয় রে

'এমন পরম করুণ প্রেমদাতা'

আমার,—**নিতাই-গৌরাঙ্গের মত—এমন, পরম করুণ প্রেমদাতা**

হয় নাই আর হবার নয় রে

ও ভাই,—বড় অবতার রে

বড় অবতার রে

ওরে ভাই রে আমার,—প্রভু নিতাই প্রাণ গৌরাঙ্গ—

বড় অবতার রে

আ'মরি,—"পতিতেরে বিলাওল প্রেমেরই ভাণ্ডার রে ॥"

আ'মরি—যারে তারে যেচে দিল

চির,—অনর্পিত-প্রেমধন— যারে তারে যেচে দিল

'গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে'—

দন্তে তৃণ,—**গলবাসে করযোড়ে গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে**

—যারে তারে যেচে দিল

প্রেম দিল আচণ্ডালে

আপনাকে,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা— প্রেম দিল আচণ্ডালে

আপনাকে,—পুত্র, সখা, প্রাণ-পতি করা—
প্রেম দিল আচণ্ডালে

আপনাকে, বশ ক'রে অধীন করা— প্রেম দিল আচণ্ডালে

প্রেম দিল আচণ্ডালে
আয় আয়,—কে নিবি আমায় কিনিবি বলে—প্রেম দিল আচণ্ডালে
প্রেম দিল আচণ্ডালে

ও ভাই,—বড় অবতার রে

ও ভাই দেখ দেখ,—আমার,— "নিতাই চৈতন্য দয়াময়।"

আহা,—"ভক্ত-হংস-চক্রবাকে, তারা, পিব পিব বলি ডাকে"

ভাইরে,—"পাইয়া বঞ্চিত কেন হয়॥"

তা'তে, "ডুবি রূপ সনাতন"
ওরে ভাই রে আমার, গৌরপ্রেমসিন্ধু মাঝে—ডুবি রূপ সনাতন

তাঁরা, সাঁতার ভুলে ডুবেছিল
এই, দুর্ব্বাসনা তরঙ্গময় সংসার— সাঁতার ভুলে ডুবেছিল

কেমন ক'রে ডুব্‌তে হয় তাই দেখাবার লাগি—
সাঁতার ভুলে ডুবেছিল

কেমন ক'রে ডুবতে হয় তাই জানবার লাগি
—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল
কেমন করে, ডুব্‌তে হয় তাই জানাবার লাগি—

শ্রী, শিক্ষাগুরুরূপী তাঁরা কেমন করে,—
ডুবতে হয় তাই জানাবার লাগি
তাঁরা, সাঁতার ভুলে ডুবেছিল

এই গৌরপ্রেমসিন্ধু মাঝে তাঁরা,—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল
ওহে ও প্রাণ, গৌরাঙ্গ যা কর বলে—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল
(প্রাণ, গৌর হে, যা কর বলে—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল)
'প্রাণ, গৌর হে, যা' কর ব'লে—

আমি তোমার হ'লাম—প্রাণ,—গৌর হে যা' কর ব'লে
তাঁরা, সাঁতার ভুলে ডুবেছিল

নইলে, ডুবা ত' যায় না
সংসার সাঁতার না ভুলিলে—ডুবা ত' যায় না
দুর্ব্বাসনা তরঙ্গময় এই, সংসার সাঁতার না ভুলিলে—
ডুবা ত' যায় না

আমি আমার না ঘুচিলে—ডুবা ত' যায় না
এ সংসারে, আমি আমার না ঘুচিলে—ডুবা ত' যায় না
আমি তোমার না হইলে—ডুবা ত' যায় না
কায়মনোবাক্যে না বিকালে—
আমি তোমার হলাম বলে কায়মনোবাক্যে না বিকালে—
ডুবা ত' যায় না

"ডুবি রূপ সনাতন, তুলি নানা রত্নধন"

ওকি আহা মরি—"যতনে গাঁথিল তার মালা।"

আ'মরি ডুব্ দিয়ে রত্ন তুলে
ওরে ভাই রে আমার, গৌরপ্রেমসিন্ধুমাঝে—
আ'মরি, ডুব্ দিয়ে রত্ন তুলে

প্রাণ গৌর হে, যা কর ব'লে—
এবার আমি তোমার হলাম—প্রাণ গৌর হে, যা' কর ব'লে
আ'মরি ডুব্ দিয়ে রত্ন তুলে

ওকি আহা মরি, "যতনে গাঁথিল তার মালা"
আমরি—"ভক্তিসূত্রে গ্রন্থি করি"

এ মালা—অন্য সূত্রে গাঁথা যায় না
"ভক্তি সূত্রে গ্রন্থি করি"

"লহ জীব কণ্ঠ ভরি"
আ'মরি—ভক্তিসূত্রে গ্রন্থি করি, লহ জীব কণ্ঠ ভরি,
দূরে যাবে ত্রিতাপের জ্বালা ।। ভাই রে !!

মালা—পর রে তর রে
এ যে পর তর মালা, মালা—পর রে তর রে
'বিশুদ্ধ—ভকতিসিদ্ধান্ত রত্নমালা

গৌর, প্রেমসিন্ধুতে ডুব দিয়ে তোলা—
বিশুদ্ধ, ভকতিসিদ্ধান্ত রত্নমালা
শ্রী, রূপ-সনাতন-ডুবারুর তোলা—
বিশুদ্ধ, ভকতিসিদ্ধান্ত রত্নমালা
মালা, পর রে তর রে
কৃষ্ণে, সুদৃঢ় মতি হবে—মালা, পর রে তর রে

ভাই—"দূরে যাবে ত্রিতাপের জ্বালা ॥"

সিদ্ধান্ত করিতে কভু না কর অলস।
সিদ্ধান্তে লাগয়ে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস ॥"

মালা—পর রে তর রে
"দূরে যাবে ত্রিতাপের জ্বালা" ভাই রে !!

"আহা—লীলারস সঙ্কীর্ত্তন"
ওরে ভাই রে আমার—গৌরপ্রেমসিন্ধু মাঝে "লীলারস সঙ্কীর্ত্তন"

নিশিদিশি বিকসিত
শ্রীরাধাকৃষ্ণ, লীলারস সঙ্কীর্ত্তন পদ্ম—নিশিদিশি বিকশিত

যার, মৃণাল খেয়ে জীবন ধরে
যত-ভক্ত-হংস-চক্রবাক, যার—মৃণাল খেয়ে জীবন ধরে

কেউ বা ডুবে কেউ সাঁতারে
আমার—নিতাই-তরঙ্গে-নেচে নেচে—
কেউ বা ডুবে কেউ সাঁতারে
কেউ বা ডুবে কেউ সাঁতারে

যে—সাঁতারে সে ব্রজলীলা ভোগ করে
যে—ডুবে যায় সে নদীয়ালীলা পায়

এ ত' দুটি লীলা নয় রে
ব্রজলীলা আর নদীয়ালীলা—এ ত' দুটি লীলা নয় রে

আমার—শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাসিন্ধু
তার উপরে ভাসে ব্রজলীলা
আর, ডুবিলে নদীয়ালীলা—তার, উপরে ভাসে ব্রজলীলা পায়

যে, ডুবে যায় সে নদীয়ালীলা পায়
করুণা-বাতাস-পরশে—নিতাই-তরঙ্গে নেচে নেচে—যে,
—ডুবে যায় সে নদীয়ালীলা পায়

গৌরলীলায় সেই ডুব্‌তে পারে
ঠাকুর-নরোত্তম বলেছেন—গৌরলীলায় সেই ডুব্‌তে পারে
যে,—রাধামাধব অন্তরঙ্গ হবে—গৌরলীলায় সেই ডুব্‌তে পারে

সে, পরিণতি ভোগ করে
মহারাস বিলাসে—সে, পরিণতি ভোগ করে

মূরতিমন্ত—প্রেমবৈচিত্ত্য লীলা হেরে
দেখে—নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
দেখে—নিত্য মিলনে দুই রসের খেলা
আমার, নিগূঢ় গৌরাঙ্গলীলা--মিলনে, মিলা অমিলা রসের খেলা

আমরি—বিলাস-বিবর্ত্ত-লীলা হেরে

হেরে, রাই কানু একাকৃতি

স্বর্ণপঞ্চালিকা ঢাকা নীলমণি--রাই কানু একাকৃতি

মহাভাব রসরাজ—রাই কানু একাকৃতি

কিন্তু, বিপরীত ভাবে অবস্থিতি

ব্রজের, অপূর্ণসাধ পূরাইতে—কিন্তু, বিপরীত ভাবে অবস্থিতি

দেখে—রাই কানু, কানু রাই

নাগরী নাগর, নাগর নাগরী—রাই কানু, কানু রাই
(রমণী রমণ, রমণ রমণী—রাই কানু কানু রাই)

রাই কানু কানু রাই
যা' দেখে, রামরায় মূরছিত—রাই কানু, কানু রাই
যা' দেখে,—রামরায় মূরছিত
গোদাবরী তীরে যা দেখে—রামরায় মূরছিত
বিবর্ত্ত বিলাস রঙ্গ দেখে—রামরায় মূরছিত
নানা, বিবর্ত্তে বিলাস রঙ্গ দেখে—রামরায় মূরছিত

এ যে গম্ভীরার গুপ্তনিধি
মহা, রাসবিলাসের পরিণতি—এ যে গম্ভীরার গুপ্তনিধি
বিলাস বিবর্ত্ত লীলা হেরে
আহা, "লীলারস সঙ্কীর্ত্তনে, বিকসিত পদ্মবন"

ওকি আহা মরি, "জগত ভরিল যার বাসে।"

আহা, "ফুটিল কমল বন, মাতিল ভ্রমরগণ"

তারা, দলে দলে ছুট্‌ল

সঙ্কীর্ত্তন কমলের গন্ধ পেয়ে— তারা, দলে দলে ছুট্‌ল

"সঙ্কীর্ত্তন কমলের গন্ধ পেয়ে"

গৌর, প্রেমসিন্ধুতে বিকসিত লীলারস—

সঙ্কীর্ত্তন কমলের গন্ধ পেয়ে

তারা, দলে দলে ছুট্‌ছে

ভকত ভ্রমর যত—তারা দলে দলে ছুট্‌ছে

'ভকত ভ্রমর যত'—

প্রেম মধু পানে লুবধচিত—ভকত ভ্রমর যত

তারা দলে দলে ছুট্‌ল

গৌর গুন্ গুন্ গুন্ রবে—তারা, দলে দলে ছুট্‌ল

"গৌর গুন্ গুন্ গুন্ রবে—

প্রেম মধু পিবে ব'লে—গৌর গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ রবে

প্রেমমধু পিবে বলে—

গৌরলীলা, রস সঙ্কীর্ত্তন কমলের—প্রেমমধু পিবে বলে

তারা—দলে দলে ছুট্‌ল

ফুটিল কমল বন, মাতিল ভ্রমরগণ"

হায় রে, "পাইয়া বঞ্চিত কৃষ্ণদাসে" ॥

আমরি—মনভ্রমর মাতল না রে

গৌর প্রেমসিন্ধুতে লীলারস পদ্ম ফুট্‌ল বটে—

কিন্তু আমার, মন ভ্রমর মাতল না রে
গৌর প্রেমসিন্ধুতে, লীলারস সঙ্কীর্ত্তন কমল ফুট্‌ল বটে—
কিন্তু আমার, মন ভ্রমর মাতল না রে

মন ভ্রমর মাতল না রে
বিষয় কেতকীফুলে মজে রইল—কীর্ত্তন কমলেতে মাতল না রে

'বিষয় কেতকীফুলে মজে রইল'—

বাসনা, কণ্টকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েও—
বিষয় কেতকীফুলে মজে রইল
কীর্ত্তন কমলেতে মাতল না রে

প্রেমমধু পিয়ে ধন্য হ'ত—কীর্ত্তন কমলেতে মাতল না রে

হায় হায়—আমি এবার বঞ্চিত হলাম
এমন, প্রেমসিন্ধু অবতারে, হায় হায়—আমি এবার বঞ্চিত হলাম
আমি এবার বঞ্চিত হলাম
এমন, বিশ্বম্ভর অবতারে—আমি প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম

আমার, নামে রুচি হ'ল না রে—আমি প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম

(জগত ভাস্‌ল প্রেমের বন্যায়—আমি কেবল বঞ্চিত হলাম)

আমার—একবিন্দু পরশ হল না রে
আমি, অভিমান মঞ্চে বসে রইলাম—
আমার একবিন্দু পরশ হল না রে

'অভিমান মঞ্চে বসে রইলাম—

ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত এই,—অভিমান মঞ্চে বসে রইলাম

আমার—একবিন্দু পরশ হ'ল না রে

আমি রইলাম বাকী রে

(জগত ভাস্‌ল প্রেমের বন্যায়, কেবল—আমি রইলাম বাকী রে)

এমন, প্রেমসিন্ধু অবতারে কেবল,—আমি রইলাম বাকী রে

প্রেম পেতে রইলাম বাকী

শ্রীগুরুবৈষ্ণবে দিয়ে ফাঁকি— প্রেম পেতে রইলাম বাকী

প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম

আপন দুর্দ্দৈব দোষে— প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম

প্রেমধনে বঞ্চিত হলাম

এমন, গোরা পঁহু না ভজিলাম—প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম

'এমন, গোরাপঁহু না ভজিলাম'—

ভক্ত পদধূলি ভূষণ ক'রে এমন,—গোরা পঁহু না ভজিলাম

।গৌরচন্দ্র সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শোচক কীর্ত্তন

"যবে রূপ সনাতন　　　　ব্রজে গেলা দুইজন"

রূপ সনাতন গেল ব্রজে

শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পেয়ে　　　　রূপ সনাতন গেল ব্রজে

(তা) "শুনইতে রঘুনাথ দাস"

সেই ত রঘুনাথ দাস

হিরণ্য গোবর্দ্ধনের পুত্র　　　　সেই ত রঘুনাথ দাস

সপ্তগ্রামের অধিপতি　　　　সেই ত রঘুনাথ দাস

(রঘুনাথের) স্বাভাবিক গৌর-অনুরাগ

বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে　(রঘুনাথের) স্বাভাবিক গৌর-অনুরাগ

(পরস্পর) লোকমুখে গৌর-কথা শুনে—

(রঘুনাথের) স্বাভাবিক গৌর-অনুরাগ

শুধু কেবল তাই নয়

আরও গূঢ় কথা আছে ভাই

(রঘুনাথের) স্বাভাবিক অনুরাগ প্রকাশ পাবার—

আরও গূঢ় কথা আছে ভাই

বাল্যকালে পেয়েছেন দর্শন

ঠাকুর শ্রীহরিদাসের　　　　বাল্যকালে পেয়েছেন দর্শন

সেই স্বাভাবিক অনুরাগে　　রঘুনাথের মনে ছিল আশ
যাইবারে গৌরাঙ্গ পদপাশ　　রঘুনাথের মনে ছিল আশ

অনেকদিন ছিলেন ধৈর্য্য ধ'রে
লয়ে অতি উৎকণ্ঠা অন্তরে　　অনেকদিন ছিলেন ধৈর্য্য ধ'রে

প্রাণ গৌর-আগমন বার্ত্তা শুনে
শান্তিপুরে সীতানাথের ঘরে　　প্রাণ-গৌর আগমন বার্ত্তা শুনে
শ্রীসন্ন্যাস গ্রহণ পরে　　প্রাণ-গৌর আগমন বার্ত্তা শুনে

শ্রীসন্ন্যাস গ্রহণ পরে
আর রামকেলি হ'তে ফির্‌বার কালে　　শ্রীসন্ন্যাস গ্রহণ পরে

গেলেন রঘুনাথ প্রাণের টানে
দীন হীন কাঙ্গালের বেশে　　গেলেন রঘুনাথ প্রাণের টানে
দুইবার অতি গোপনে　　গেলেন রঘুনাথ প্রাণের টানে
করিবারে প্রভুর দর্শনে　　গেলেন রঘুনাথ প্রাণের টানে

পড়েছিলেন চরণ ধ'রে

(কিন্তু) দুইবার ফিরায়ে দিলেন প্রভু
নানা মতে প্রবোধ দিয়ে (কিন্তু) দুইবার ফিরায়ে দিলেন প্রভু

দ্বিতীয়বারে দিলেন ব'লে
স্থির হও রঘুনাথ না হও বাতুল হে।
ক্রমে ক্রমে পায় জীব ভবসিন্ধু-কুল হে॥

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া হে
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া হে

কেঁদে কেঁদে এলেন ফিরে
দুইবার রঘুনাথ কেঁদে কেঁদে এলেন ফিরে
বাধা পেয়ে হতাশ হ'য়ে কেঁদে কেঁদে এলেন ফিরে
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধ'রে কেঁদে কেঁদে এলেন ফিরে
প্রাণের কথা প্রাণে ধ'রে কেঁদে কেঁদে এলেন ফিরে

ব্যাকুল হয়ে সদাই কাঁদে
ঘরে ব'সে রঘুনাথ ব্যাকুল হয়ে সদাই কাঁদে
নিরজনে নিজ-মনে ব্যাকুল হয়ে সদাই কাঁদে
কত দিনে কৃপা হ'বে বলে ব্যাকুল হয়ে সদাই কাঁদে

পরস্পর শুন্‌তে পেলেন
কিছুদিনে রঘুনাথ পরস্পর শুন্‌তে পেলেন

আসিয়াছেন প্রভু নিতাই
সপার্ষদে পাণিহাটিতে আসিয়াছেন প্রভু নিতাই
মধুর লীলাচল হ'তে আসিয়াছেন প্রভু নিতাই

গৌর-আজ্ঞায় নামপ্রেম বিলাতে আসিয়াছেন প্রভুনিতাই

রঘুনাথ এই বার্ত্তা পেয়ে
চলিলেন নিতাই পাশে

অতি গোপনে ছদ্মবেশে চলিলেন নিতাই পাশে
নিঃসঙ্গে দীনবেশে চলিলেন নিতাই পাশে

হ'য়ে উপনীত পানিহাটিতে
দূর হ'তে দেখ্‌তে পেলেন

আছেন সঙ্কীর্ত্তনে উনমত
নিজগণ সনে নিতাইসুন্দর আছেন সঙ্কীর্ত্তনে উনমত

কীর্ত্তনরঙ্গে ক্লান্ত হ'য়ে
অনুক্ষণ কীর্ত্তন ক'রে কীর্ত্তনরঙ্গে ক্লান্ত হ'য়ে

নিতাই বসিলেন পিণ্ডোপরে
গঙ্গাতীরে বট-বৃক্ষ-মূলে নিতাই বসিলেন পিণ্ডোপরে

অদ্যাপিও বিরাজিছে
সেই 'বৃক্ষ' সাক্ষ্যরূপে অদ্যাপিও বিরাজিছে
গঙ্গাতীরে পানিহাটিতে অদ্যাপিও বিরাজিছে

করিলেন দণ্ডবৎ
দূর হ'তে রঘুনাথ করিলেন দণ্ডবৎ

সেই কালে এক পরিকর
জানাইলেন নিতাইচাঁদে

দেখ দেখ দেখ প্রভু—

তোমায় দণ্ডবৎ করে

রঘুনাথ অদূরে — তোমায় দণ্ডবৎ করে

চির-পরিচিত নিতাইচাঁদের

শ্রীরঘুনাথ দাস — চির-পরিচিত নিতাইচাঁদের

'রঘুনাথ' নাম শুনে

অমনি উঠিলেন নিতাই

স্বাভাবিক স্নেহের বশে — অমনি উঠিলেন নিতাই

গেলেন রঘুনাথের কাছে

বাহু পসারি কৈলেন কোলে

বলিলেন শ্রীমুখেতে -

আজ দণ্ড দিব তোরে

'চোরা' তোরে পেয়েছি কাছে — আজ দণ্ড দিব তোরে

লুকায়ে থাক দূরে দূরে — আজ দণ্ড দিব তোরে

অনুভব কর ভাইরে

এই লীলা-রহস্য — অনুভব কর ভাইরে

কেন 'চোরা' সম্বোধন কৈলেন — অনুভব কর ভাইরে

নিতাইচাঁদের মনে এই অভিমান

'গৌর' আমার নিজস্ব ধন — নিতাইচাঁদের মনে এই অভিমান

সেই অভিমানে বল্‌ছেন্‌
নিতাইচাঁদ রঘুনাথে সেই অভিমানে বলছেন্‌

গিয়েছিলে ভোগ করিতে
আমার ধন আমায় না ব'লে গিয়েছিলে ভোগ করিতে

আজ 'দণ্ড' দিব তোরে
চোরা তোরে পেয়েছি কাছে আজ 'দণ্ড' দিব তোরে

রঘুনাথে কৈলেন কৃপাদণ্ড
'মহোৎসবের' আজ্ঞা দিয়ে রঘুনাথে কৈলেন কৃপাদণ্ড

আজও তার খ্যাতি আছে
'দণ্ড মহোৎসব' ব'লে আজও তার খ্যাতি আছে
চিড়া-দধি মহোৎসব আজও তার খ্যাতি আছে

রঘুনাথ কাঁদেরে
পড়ি নিতাই-পদ তলে রঘুনাথ কাঁদেরে

কাতরে রঘুনাথ বলে
বল বল প্রভু নিতাই
আমি কি তোমার গৌরাঙ্গ পাব বল বল প্রভু নিতাই

নিতাই তারে কৈলেন কৃপা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শোচক কীর্ত্তন

করিলেন শকতি সঞ্চার
তার মাথে চরণ দিয়ে করিলেন শকতি সঞ্চার

'পরে তারে তুলে নিয়ে
স্থির করিলেন বুকে ধ'রে

(বলিলেন) স্থির হও রঘুনাথ
অচিরে পুরিবে সাধ (বলিলেন) স্থির হও রঘুনাথ

নিতাইচাঁদের কৃপা পেয়ে রঘুনাথ ফিরে এলেন গৃহে

সদাই ব্যাকুলিত চিত
কবে গৌর-পদে ঠাঁই পাব সদাই ব্যাকুলিত চিত

"যবে রূপ সনাতন ব্রজে গেলা দুইজন
(তা) শুনইতে রঘুনাথ দাস

আর ত ঘরে রইতে নারে
শুনি রূপ সনাতন গেলা ব্রজপুরে আর ত ঘরে রইতে নারে

প্রাণ আজ উঠ্‌ল কেঁদে
শ্রীরূপসনাতনের আদর্শ পেয়ে প্রাণ আজ উঠ্‌ল কেঁদে

আর ঘরে নাহি থাক্‌ব
রঘুনাথ সঙ্কল্প কৈল আর ঘরে নাহি থাক্‌ব
গৌর-পদে বিকাইব আর ঘরে নাহি থাক্‌ব

আমি থাক্‌ব না আর এ সংসারে
শ্রীরূপ সনাতন গেল ব্রজপুরে—
আমি থাক্‌ব না আর এ সংসারে

কে যেন তারে বল্‌ল প্রাণে
তাদের ব্রজে গমন-বার্ত্তা সনে কে যেন তারে বল্‌ল প্রাণে
আইস রঘুনাথ আর কেনে কে যেন তারে বল্‌ল প্রাণে

কে যেন তারে ডাকল প্রাণে
আইস আমার রঘু বলে কে যেন তারে ডাকল প্রাণে
'ডাকার সনে' 'টান্‌ল প্রাণে' কে যেন তারে ডাকল প্রাণে

(তাই) "ইন্দ্র সম সুখ যার নিজ রাজ্য অধিকার
(সব) ছাড়িয়া চলিলা প্রভু-পাশ ॥"

বাম পদে ঠেলিরে
ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্যরাশি বাম পদে ঠেলিরে

থু থু ক'রে ত্যাগ ক'রে
নব লক্ষের ঐশ্বর্য্য থু থু ক'রে ত্যাগ ক'রে

মলবৎ ত্যাগ ক'রে
বিষয়ে গৌর মিলে না ব'লে মলবৎ ত্যাগ ক'রে

(সব) "ছাড়িয়া চলিলা প্রভু-পাশ ॥"

- কিছুতেই বাঁধিতে পার্‌ল নারে
অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি কিছুতেই বাঁধ্‌তে পার্‌ল না

বল কে বাঁধিতে পারে
আমার গৌর-প্রেমের বাউলেরে বল কে বাঁধিতে পারে

কিছুতেই বাঁধতে পারল নারে
অতুল ঐশ্বর্য্য রাশি কিছুতেই বাঁধতে পারল নারে

বল কে বাঁধিতে পারে ?
আমার গৌর-প্রেমের বাউলেরে বল কে বাঁধিতে পারে ?

দেহ-স্মৃতি কাঁহা তার
:গৌর-ভাবে-মাতা প্রাণ যার দেহ-স্মৃতি কাঁহা তার

সংসার কূপ কাঁহা তার
দেহ-স্মৃতি নাহি যার সংসার কূপ কাঁহা তার

তারে কি বাঁধিতে পারে
গৌর-কৃপা হয়েছে যারে তারে কি বাঁধিতে পারে
ছার 'বিষয়-বন্ধনে' তারে কি বাঁধিতে পারে

সে কি বাঁধা থাকে এই ছার বন্ধনে
গৌর চেয়েছে যারে কৃপা-নয়নে—
সে কি বাঁধা থাকে এই ছার বন্ধনে

কি কর্‌বে তারে বিষয়-বন্ধনে
মন মজেছে যার গৌর-গুণে   কি কর্‌বে তারে বিষয়-বন্ধনে

বেঁধেছিলেন বিবাহ-বন্ধনে
রঘুনাথের পিতা, তারে   বেঁধেছিলেন বিবাহ-বন্ধনে
গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে রাখ্‌বার তরে   বেঁধেছিলেন বিবাহ-বন্ধনে

কিন্তু কি কর্‌বে ছার সংসার বন্ধন
গৌর-পদে যার মজেছে মন—
কিন্তু কি কর্‌বে ছার সংসার-বন্ধন

কে রাখিতে পারে ধ'রে
যে বাঁধা পড়েছে গৌর-প্রেমডোরে   কে রাখিতে পারে ধ'রে

ফিরেও ত চাইল না রে
অতুল ঐশ্বর্য্য অপ্সরী নারী   ফিরেও ত চাইল না রে

চলিল গৌর-প্রেমের পাগল
সব ছেড়ে 'হা গৌর' ব'লে   চলিল গৌর প্রেমের পাগল

সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে   চলিল গৌর প্রেমের পাগল
দীন হীন কাঙ্গালের বেশে   চলিল গৌর প্রেমের পাগল

মুখের কথায় কি গৌর মিলে
সব ছেড়ে ঝাঁপ না দিলে   মুখের কথায় কি গৌর মিলে

সব ছেড়ে ঝাঁপ না দিলে
প্রাণ গৌর হে যা কর ব'লে   সব ছেড়ে ঝাঁপ না দিলে
মুখের কথায় কি গৌর মিলে

চলিল গৌর-প্রেমের পাগল
পেয়ে নিতাই-কৃপা-বল   চলিল গৌর-প্রেমের পাগল

সবই নিত্যানন্দ-কৃপাবল
দাস রঘুনাথের বৈরাগ্য কেবল   সবই নিত্যানন্দ-কৃপাবল

প্রভু দেখাইলেন জগতেরে
দাস রঘুনাথের দ্বারে   প্রভু দেখাইলেন জগতেরে
আপনার প্রাপ্তির উপায়   প্রভু দেখাইলেন জগতেরে

আমার দিবার অধিকার নাই
আমি বিকায়েছি নিতাই ঠাঁই   আমার দিবার অধিকার নাই

তবে ত আমারে মিলে
নিতাইচাঁদের কৃপা হ'লে   তবে ত আমারে মিলে

(সব) "ছাড়িয়া **চলিলা** প্রভু পাশ ॥
উঠি রাত্রি-শেষ ভাগে   জানি বা প্রহরী জাগে
পথ ছাড়ি বিপথে চলিলা।"

সেই ত পথে লয়ে যায় রে
গৌর-সেবাশকতি নিত্যানন্দ সেই ত পথে লয়ে যায় রে

"মনোদ্বেগে সদা ধায়"

কতক্ষণে দেখ্‌তে পাব ব'লে
সেই 'হরিবোলা' রসের বদন কতক্ষণে দেখ্‌তে পাব ব'লে

যায় রঘুনাথ ব্যাকুল প্রাণে
স্মঙরি নিতাই যুগল চরণে যায় রঘুনাথ ব্যাকুল প্রাণে

মনে মনে ভাবে রে
রঘুনাথ পথে যেতে মনে মনে ভাবে রে

কথা কি ফল্‌বে
আমার ভাগ্যে নিতাইচাঁদের কথা কি ফল্‌বে

প্রভু নিতাই বল্লেন সাধ পুর্‌বে
পানিহাটি গ্রামে দেখা দিয়ে প্রভু নিতাই বল্লেন সাধ পুর্‌বে

হায় আমি কি দেখা পাব
গৌরের রাতুল চরণ-যুগল হায় আমি কি দেখা পাব

একবার দেখা দিও হে
সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু একবার দেখা দিও হে
"মনোদ্বেগে সদা ধায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি পায় রে"

কি কর্‌বে তারে ক্ষুধা তৃষ্ণা
যার হৃদে গৌর-বাস সদা — কি কর্‌বে তারে ক্ষুধা তৃষ্ণা

"দিবানিশি কিছু না জানিলা ॥"

তার আবার কিসের দিবানিশি
যার হৃদে জাগে গোরা শশী — তার আবার কিসের দিবানিশি

দেহ স্মৃতি নাই রে
শ্রীগৌরাঙ্গ-অনুরাগে — দেহ স্মৃতি নাই রে

চলিল গৌর-প্রেমের পাগল
আহার নাই, নিদ্রা নাই — চলিল গৌর-প্রেমের পাগল
'হা গৌর !' ব'লে কাঁদে কেবল — চলিল গৌর-প্রেমের পাগল
দু'নয়নে ধারা অবিরল — চলিল গৌর-প্রেমের পাগল

করযোড়ে ভিক্ষা মাগে
স্থাবর-জঙ্গম যারে দেখে — করযোড়ে ভিক্ষা মাগে

এই ভিক্ষা দাও সবাই

যেন আমি দেখ্‌তে পাই
মধুর নীলাচলে গিয়ে — যেন আমি দেখ্‌তে পাই
শচীদুলাল প্রাণ গৌরাঙ্গে — যেন আমি দেখ্‌তে পাই

'দিবা নিশি কিছু না জানিলা'

একদিন ভিক্ষাচ্ছলে গো বাথানে সন্ধ্যাকালে
হা চৈতন্য বলিয়া বসিলা।

এক গোপ দুগ্ধ দিলা তাহা খাইয়া বিশ্রামিলা
সেই রাত্রি তাহাই বঞ্চিলা॥

কি বল্‌ব বৈরাগ্যের কথা
রঘুনাথ দাস গোসাঞির কি বল্‌ব বৈরাগ্যের কথা

'যে অঙ্গ পালঙ্ক বিনে ভূমি-শয্যা নাহি জানে
সে অঙ্গ বাথানে গড়ি যায়।'

'অপরূপ গৌরাঙ্গ লীলা'

কাঁধে করে বৈষ্ণবের ঝোলা
'রাজা' রাজত্ব ছাড়ি কাঁধে করে বৈষ্ণবের ঝোলা

সে আজ শুতিয়াছে গো-বাথানে
শ্রীগৌরাঙ্গ-অনুরাগে সে আজ শুতিয়াছে গো-বাথানে
যে শোয় না কভু পালঙ্ক বিনে
—সে আজ শুতিয়াছে গো-বাথানে

মুখের কথায় কি গৌর মিলে
এত অনুরাগ না হইলে মুখের কথায় কি গৌর মিলে

"সে অঙ্গ বাথানে গড়ি যায় ।

যেই ঘোড়া দোলা বিনে, পদব্রজ নাহি জানে,
সে পথ হাঁটয়ে রাঙ্গা পায় ॥

যে না হইতে দণ্ড চারি, তোলা জলে স্নান করি,
ষড়-রসে করিত ভোজন ।
এবে যদি কিছু পান, সন্ধ্যাকালে তাহা খান,
না পাইলে অমনি গমন ॥"

আহারের চেষ্টা নাই
কেউ দিলে তবে খায় আহারের চেষ্টা নাই

"বার দিনের পথ গিয়া, তিন সন্ধ্যা অন্ন খাইয়া,
উত্তরিলা নীলাচল পুরে ।
দেখিয়া শ্রীমন্দির, নয়নে গলয়ে নীর,
'হা চৈতন্য' ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥

(এর পর, 'নীলাচলে-গৌর-রঘুনাথ-মিলন' অংশটুকু এই গ্রন্থের ৫৩-৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে, এ কারণ তাহা এখানে বাদ দিয়া পরবর্ত্তী অংশ উদ্ধৃত হইতেছে ।)

কিছু পরে গৌরহরি
রঘুনাথে স্থির করি
সঁপে দিলেন স্বরূপের করে
(রীতিমত) ভজন-প্রণালী শিখাবার তরে—
সঁপে দিলেন স্বরূপের করে
সাধন-প্রণালী শিখায়ো ব'লে সঁপে দিলেন স্বরূপের করে

আদর করে ডাক্‌তেন প্রভু

সেই দিন হ'তে রঘুনাথে আদর করে ডাকতেন প্রভু

ও স্বরূপের 'রঘু' বলে আদর করে ডাকতেন প্রভু

কি বলব রঘুনাথের কথা

"শ্রীচৈতন্য কৃপা হৈতে, রঘুনাথ দাস চিতে,
পরম বৈরাগ্য উপজিলা।
দারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ,
মলপ্রায় সকলি ত্যজিলা॥

পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণনামে গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে॥"

'কৃষ্ণনামে' করেন পুরশ্চরণ

রঘুনাথ দাস গোসাঞি 'কৃষ্ণনামে' করেন পুরশ্চরণ

পাইতে গৌরাঙ্গ চরণ 'কৃষ্ণনামে' করেন পুরশ্চরণ

অনুভব কর ভাই রে

'গৌর-গণের' চরিতে অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে অনুভব কর ভাই রে

তাঁরা করেন কৃষ্ণ ভজন

পাবার লাগি গৌরচরণ তাঁরা করেন কৃষ্ণ ভজন

তাদের কৃষ্ণ ভজন মুখ্য নয়

শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা আশয় তাদের কৃষ্ণ ভজন মুখ্য নয়

"পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণনামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে,
শ্রীগৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।"

কি বল্‌ব ভজনের কথা
শ্রীদাস রঘুনাথের কি বল্‌ব ভজনের কথা

স্মঙরিলে প্রাণ কেঁদে উঠে
অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের কথা স্মঙরিলে প্রাণ কেঁদে উঠে

নীলাচলে গিয়ে রঘুনাথ
অযাচক বৃত্তি ক'রে
জগন্নাথের সিংহ দ্বারে অযাচক বৃত্তি ক'রে

"হা গৌর" বলে অঝোরে ঝুরে অযাচক বৃত্তি ক'রে

যেচে দিলে তবে খায়
কারে কিছু নাহি চায় যেচে দিলে তবে খায়
না দিলে উপবাস যেচে দিলে তবে খায়

সিংহ দ্বারে অযাচক বৃত্তি
'গৌর-কৃপা' পাবার লাগি সিংহ দ্বারে অযাচক বৃত্তি

এইরূপে কিছুদিন গেল
তারপর তাও ছাড়ি দিলেন

ছত্রে ছত্রে মেগে খায়
'গৌর' বলে কাঁদে সদাই-— ছত্রে ছত্রে মেগে খায়

তাও কিছু দিনে ছেড়ে দিলেন

তারপর অদ্ভুত বৈরাগ্য
বল্‌তে বুক ফেটে যায় তারপর অদ্ভুত বৈরাগ্য

গলা প্রসাদ বেছে খায়
তেলেঙ্গা গাইএর পরিত্যক্ত গলা প্রসাদ বেছে খায়
যা গাভীতেও খেতে নারে গলা প্রসাদ বেছে খায়
"হা' গৌর" ব'লে ভাসে নয়ন ধারায় গলা প্রসাদ বেছে খায়

পরস্পর শুন্‌তে পেলেন
প্রেমময় গৌরহরি পরস্পর শুনতে পেলেন
রঘুনাথের এই ব্যবহার পরস্পর শুনতে পেলেন

আর কি প্রভু রহিতে পারে

দেখাইলেন জগতেরে
প্রিয় রঘুনাথের দ্বারে দেখাইলেন জগতেরে
ত্যাগ বৈরাগ্য কা'রে বলে দেখাইলেন জগতেরে

একদিন রঘুনাথ

আপন মনে প্রসাদ বাছ্‌ছেন
(হা) গৌর গৌর ব'লে কাঁদছেন
—আপন মনে প্রসাদ বাছ ছেন

এক এক রঞ্চ মুখে দেয়
নয়ন জলে ভেসে যায় এক এক রঞ্চ মুখে দেয়

দূর হ'তে দেখ্‌লেন প্রভু
রঘুনাথের রীতি দূর হ'তে দেখ্‌লেন প্রভু

গোপনে এসে গৌরহরি
এক কণিকা প্রসাদ তুলে নিলেন
রঘুনাথের কর হতে এক কণিকা প্রসাদ তুলে নিলেন

শ্রীমুখে প্রসাদ দিয়ে বল্‌লেন
ছিঃ ছিঃ একি রঘুনাথ
'একি তোমার উচিত কার্য্য'

এমন সুধা একা আস্বাদ কর্‌ছ
আমাকে বঞ্চিত ক'রে এমন সুধা একা আস্বাদ করছ

রঘুনাথ বক্ষে কর হানিলেন
হায় প্রভু কি কর্‌লে ব'লে রঘুনাথ বক্ষে কর হানিলেন

বাহু পসারি গৌরহরি
রঘুনাথে কর্‌লেন কোলে
ভাসি দুটি নয়নজলে রঘুনাথে কর্‌লেন কোলে
এস 'প্রাণের রঘু' বলে রঘুনাথে কর্‌লেন কোলে

কি মধুর লীলা রে

সাধে কি গলে শিলা

না হ'লে এমন লীলা সাধে কি গলে শিলা

কার গুণ গাইব রে

দাসের গুণ কি প্রভুর গুণ কার গুণ গাইব রে

যেমন প্রভু তেম্নি দাস কার গুণ গাইব রে

সে দাস কৈ সে প্রভু কই

সে মধুর লীলা কৈ, সে দাস কৈ সে প্রভু কৈ,

"এই মনে অভিলাষ, পুনঃ রঘুনাথ দাস,

নয়ন গোচর কবে হবে ॥"

আদর্শ 'গৌরাঙ্গ' দাস

শ্রীরঘুনাথ দাস আদর্শ 'গৌরাঙ্গ' দাস

নামে কলঙ্ক রটালাম

'গৌরদাস' ব'লে পরিচয় দিয়ে নামে কলঙ্ক রটালাম

দাস-নাম কলঙ্কিত হল

আমাদের পরিচয়ে দাস-নাম কলঙ্কিত হল

কি বল্‌ব রঘুনাথের কথা

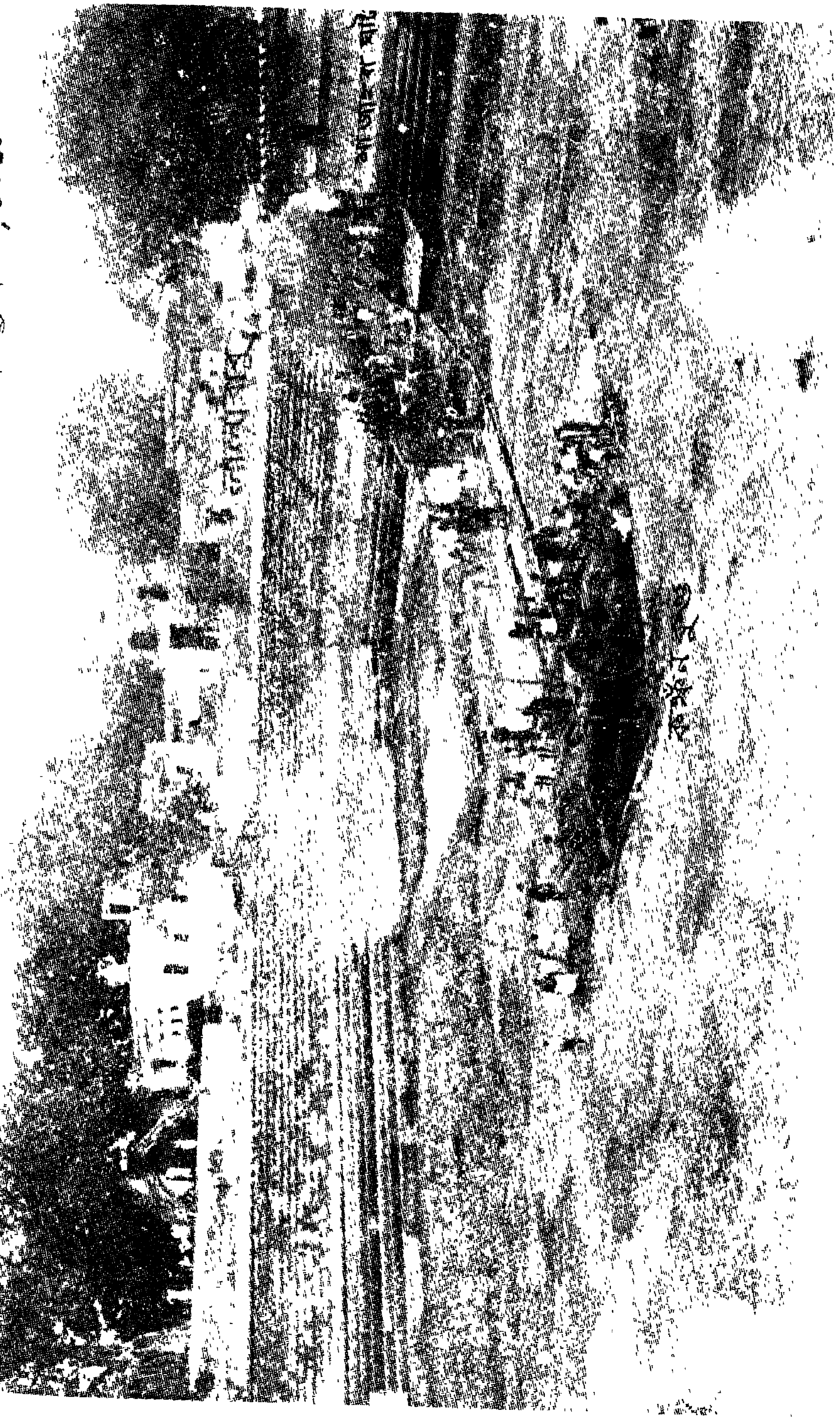

"গৌরাঙ্গ দয়াল হঞা, রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া,
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জা-হারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিল তাহারে ॥"

রঘুনাথে সমর্পিলেন
নিজ বক্ষঃস্থিত গুঞ্জা-হার রঘুনাথে সমর্পিলেন

নিজ বক্ষঃস্থিত গুঞ্জা-হার
'গোবর্দ্ধন শিলা' আর নিজ বক্ষঃস্থিত গুঞ্জা-হার

রঘুনাথে সমর্পিলেন

শ্রীমুখে বল্লেন প্রভু—

(রঘু) এই তোমার যুগল-সেবা
এই নাও রঘুনাথ এই তোমার যুগল-সেবা
গোবর্দ্ধন-শিলা গুঞ্জা-মালা এই তোমার যুগল-সেবা
গুঞ্জা 'রাধা' গিরিধারী 'কৃষ্ণ' এই তোমার যুগল-সেবা

বাসের আজ্ঞা কৈলেন
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে বাসের আজ্ঞা কৈলেন
শ্রীরাধাকুণ্ড তটে বাসের আজ্ঞা কৈলেন

শ্রীরাধাকুণ্ড তটে
শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে শ্রীরাধাকুণ্ড তটে

কি বল্‌ব অনুরাগের কথা
শ্রীরঘুনাথ দাস গোসাঞিঃর কি বল্‌ব অনুরাগের কথা
শুন্‌লে পাষাণ ফেটে যায় কি বল্‌ব অনুরাগের কথা

"চৈতন্যের অগোচরে, নিজ কেশ ছিঁড়ে করে,
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।"

প্রাণ গৌর-আজ্ঞা হৃদে ধ'রে
"বিরহে আকুল ব্রজে গেলা॥"

"দেহ ত্যাগ করি মনে গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে"

এ ছার দেহে কাজ কি আছে?
গৌরাঙ্গ-বৈমুখী দেহ এ ছার দেহে কাজ কি আছে?
প্রাণ গৌর যদি বিরূপ হয়েছে
এ ছার দেহে কাজ কি আছে?

আর বেঁচে কাজ কি বল
প্রাণ গৌর যদি ছেড়ে গেল আর বেঁচে কাজ কি বল

আর আমি রাখ্‌ব না
শ্রীগৌরাঙ্গ-বৈমুখী প্রাণ আর আমি রাখ্‌ব না

"দেহ ত্যাগ করি মনে গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে"

রঘুনাথের আশয় জেনে
প্রাণের প্রাণ গৌরহরি রঘুনাথের আশয় জেনে

জানাইলেন স্বপনে

প্রিয় শ্রীরূপ-সনাতনে জানাইলেন স্বপনে

"রঘুনাথের মনোবৃত্তি" জানাইলেন স্বপনে

সঙ্কল্প করেছে রঘুনাথ

আমার বিরহে করবে প্রাণপাত সঙ্কল্প করেছে রঘুনাথ

তোমরা গিয়ে রাখ প্রাণ

'রঘুনাথ' বিরহে ত্যজিবে পরাণ তোমরা গিয়ে রাখ প্রাণ

ত্বরায় যাও দুই জনে

গিরি গোবর্দ্ধন-তটে ত্বরায় যাও দুই জনে

আমার রঘুনাথে বাঁচাও প্রাণে ত্বরায় যাও দুই জনে

আমার রঘুনাথে বাঁচাও প্রাণে

তার দ্বারা আমার অনেক কাজ হবে—

আমার রঘুনাথে বাঁচাও প্রাণে

প্রাণগৌরের আজ্ঞা পেয়ে

ত্বরায় গেলেন দুই জনে

শ্রীরূপ-সনাতন উঠি প্রভাতে ত্বরায় গেলেন দুই জনে

গিরি গোবর্দ্ধন-পানে ত্বরায় গেলেন দুই জনে

রাখ্‌তে রঘুনাথের প্রাণে ত্বরায় গেলেন দুই জনে

দূর হ'তে দেখ্‌তে পেয়ে

গৌর-প্রিয় রঘুনাথে দূর হ'তে দেখ্‌তে পেয়ে

ছুটে গিয়ে ধর্‌লেন

"দুই গোসাঞি তাহারে দেখিলা ॥

ধরি রূপ সনাতন রাখিল তার জীবন

দেহত্যাগ করিতে না দিলা ॥"

এ কি সঙ্কল্প করেছ রঘুনাথ ?

কা'র দেহ ত্যাগ করিবে ?

এ কি তোমার দেহ রঘুনাথ ? কা'র দেহ ত্যাগ করিবে ?

এ দেহে তোমার কি অধিকার

এ দেহে গৌর করেছে অঙ্গিকার—

এ দেহে তোমার কি অধিকার

কা'র দেহ ত্যাগ করিবে

এ যে গৌরের কেনা দেহ কা'র দেহ ত্যাগ করিবে

এ যে গৌরের-উৎসর্গীকৃত দেহ কা'র দেহ ত্যাগ করিবে

"দুই গোসাঞির আজ্ঞা পাইয়া"

গৌর অভিমত জানিয়া

"দুই গোসাঞির আজ্ঞা পাইয়া রাধাকুণ্ড তটে গিয়া

বাস করি নিয়ম করিলা ॥"

নিশি দিশি ডাকে রে
রঘুনাথ দাস গোসাঞি নিশি দিশি ডাকে রে
রাধাকুণ্ড তীরে ব'সে নিশি দিশি ডাকে রে

হা রাধে শ্রীরাধে
গোসাঞি নিয়ম ক'রে সদা ডাকে হা রাধে শ্রীরাধে
হা হা গান্ধর্ব্বিকে হা রাধে শ্রীরাধে

ত্বৈবাস্মি ত্বৈবাস্মি
হা রাধে শ্রীরাধে ত্বৈবাস্মি ত্বৈবাস্মি

ত্বৈবাস্মি ত্বৈবাস্মি
ন জীবামি ত্বয়া বিনা ত্বৈবাস্মি ত্বৈবাস্মি

রাধে তোমার আমি তোমার আমি
তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি—
রাধে তোমার আমি তোমার আমি
তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি—
রাধে তোমার আমি তোমার আমি

তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি
দেখা দাও প্রাণ কিশোরী তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি

দেখা দাও প্রেমময়ী রাধে
গোসাঞী বলে অনুরাগ ভরে দেখা দাও প্রেমময়ী রাধে
এই কুণ্ডতীরে তোমার বঁধু-সাথে দেখা দাও প্রেমময়ী রাধে

দেখা দিয়ে রাখ মোর প্রাণে
এই কুণ্ডতীরে প্রাণ বঁধু সনে দেখা দিয়ে রাখ মোর প্রাণে

একবার দেখা দাও
কোথায় আছ প্রাণ-গৌর একবার দেখা দাও

নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে
রাধাকুণ্ড-তীরে দাস গোসাঞি নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে
কোথা গো প্রেমময়ী রাধে নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে

যেন পাষাণের রেখা
রঘুনাথের ভজন নিয়ম যেন পাষাণের রেখা

"বাস করি নিয়ম করিলা"

অপূর্ব্ব ভজন-রীতি
শ্রীরঘুনাথ দাস গোসাঞির অপূর্ব্ব ভজন-রীতি

"ছেঁড়া কম্বল পরিধান"

ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা
মুখে কৃষ্ণ-গুণ গাঁথা ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা

নিশি দিশি হা হুতাশ
(পরিধানে) ছেঁড়া কাঁথা বহির্বাস নিশি দিশি হা হুতাশ
পরিচয় দেয় শ্রীচৈতন্যদাস নিশি দিশি হা হুতাশ

"ছেঁড়া কম্বল পরিধান, বনফল গব্য খান,
অন্ন আদি না করে আহার।

তিন সন্ধ্যা স্নান করি স্মরণ কীর্ত্তন করি
রাধাপদ ভজন যাঁহার॥"

কেবল গৌর সুখের তরে
রাধাপদ ভজন করে কেবল গৌর সুখের তরে

"ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাকৃষ্ণ-গুণগানে,
স্মরণেতে সদাই গোঁয়ায়।

চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়॥"

শুধু মুখের কথায় কি গৌর মিলে
এমন করে তিলে তিলে না ভজিলে—
শুধু মুখের কথায় কি গৌর মিলে

"গৌরাঙ্গপদাম্বুজে রাখে মনোভৃঙ্গরাজে"

প্রকাশিলেন দাস গোসাঞি
আপন প্রাণের ভোগের কথা—প্রকাশিলেন দাস গোসাঞি
'শ্রীচৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' প্রকাশিলেন দাস গোসাঞি

কবিরাজের গলা ধ'রে কাঁদে

স্তবকল্পবৃক্ষ বর্ণন ক'রে — কবিরাজের গলা ধ'রে কাঁদে

গৌর হ'বে নাকি নয়ন-গোচর

রথের আগে নটন পর — গৌর হ'বে নাকি নয়ন-গোচর

কাঁদে আর্ত্তনাদ ক'রে

রঘুনাথ দাস গোসাঞি — কাঁদে আর্ত্তনাদ ক'রে

রাধাকুণ্ড-তীরে ব'সে — কাঁদে আর্ত্তনাদ ক'রে

(কৃষ্ণদাস) কবিরাজের গলা ধ'রে — কাঁদে আর্ত্তনাদ ক'রে

(প্রাণগৌরাঙ্গের) নীলাচল-বিহার বল্‌তে বল্‌তে

—কাঁদে আর্ত্তনাদ ক'রে

(বলে) বল বল কবিরাজ

আর কি আমি দেখ্‌তে পাব

সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু — আর কি আমি দেখ্‌তে পাব

গৌরের নীলাচল-বিহার — আর কি আমি দেখ্‌তে পাব

(বলে) এই দেখ কবিরাজ

গুঞ্জা-গিরিধারী দেখায়ে বলে — এই দেখ কবিরাজ

এই আমার প্রভুর গলার গুঞ্জামালা

এই শিলা প্রভুর বক্ষে ছিলা

—এই আমার প্রভুর গলার গুঞ্জামালা

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে
গুঞ্জা-গিরিধারী বুকে ধ'রে

বাহু পসারী জড়ায়ে ধরে
ভাবাবেশে বলে রে—

আর ছেড়ে দিব না
পেয়েছি তোমায় চিতচোরা আর ছেড়ে দিব না

গৌর-অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে
গুঞ্জা গিরিধারী বুকে ধ'রে গৌর-অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে

না হ'বে বা কেন রে
স যে প্রাণ-গৌরাঙ্গের বুকে ছিল না হ'বে বা কেন রে

গৌর অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে।

আবার ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
'হা গৌর' 'প্রাণ গৌর' বলে আবার ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

(বলে) পাব কি গৌরাঙ্গ-ধনে
আমার প্রভু স্বরূপের সনে পাব কি গৌরাঙ্গ-ধনে

"স্বরূপের সদাই ধেয়ায়।"

(বলে) আর কি দেখা দিবে মোরে
হা আমার প্রভু স্বরূপ আর কি দেখা দিবে মোরে
প্রাণ গৌর লয়ে গম্ভীরা-ঘরে আর কি দেখা দিবে মোরে

আর কি দেখ্‌তে পাব না
তোমার গলাধরা প্রাণ-গোরা আর কি দেখ্‌তে পাব না
তোমার কণ্ঠমালা শচীর-বালা আর কি দেখ্‌তে পাব না
রাধা ভাবে ভোরা গোরা আর কি দেখ্‌তে পাব না

আর কি শুন্‌তে পাব না
বিবর্ত্ত-বিলাস-প্রসঙ্গ আর কি শুন্‌তে পাব না

ডাক্‌বেন ও প্রাণ সহচরী
তোমার গলা-ধরি গৌর-কিশোরী ডাক্‌বেন ও প্রাণ সহচরী

ত্বরায় মিলাও বংশীধারী
ও প্রাণ সহচরী ত্বরায় মিলাও বংশীধারী
আর কি তা শুনাবে না

আর কি দেখাবে না
গম্ভীরার গুপ্তলীলা আর কি দেখাবে না

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
রঘুনাথ দাস গোসাঞি ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

হে বৃন্দাবনেশ্বর, হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি কর আত্মস্মাৎ ॥"

হা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু
হা স্বরূপ মোর প্রভু হা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

"স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়"

অভেদ শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে,
ভট্টযুগ-প্রিয় মহাশয় ॥

শ্রীরূপের গণ যত, তাঁর পদে আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যার জীবে ।

সেই আর্ত্তনাদ করি, কাঁদি বলে হরি হরি,
প্রভুর করুণা হবে কবে ॥"

যে ধনী হয় গৌর-প্রেমধনে

তার এইত স্বভাব বনে
আপনারে অযোগ্য মানে তার এইত স্বভাব বনে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
রঘুনাথ দাস গোসাঞি ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

হা রাধার বল্লভ, গান্ধর্বিকা-বান্ধব,
রাধিকা রমণ রাধানাথ।

হে বৃন্দাবনেশ্বর হা হা কৃষ্ণ দামোদর
কৃপা করি কর আত্মসাৎ।

ব্যাকুল হয়ে বলে রে

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, যবে হৈল অদর্শন,
অন্ধ হ'ল এ দুই নয়ন।"

চলে গেল দুই নয়ন
'শ্রীরূপ' 'শ্রীসনাতন' চলে গেল দুই নয়ন
যারা করাত গৌর দরশন চলে গেল দুই নয়ন

দুই নয়ন তারা হ'লাম হারা
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন চলি গেলা দুই নয়ন তারা হ'লাম হারা
গৌর-গোবিন্দ-লীলা-দরশনের দুই নয়ন তারা হ'লাম হারা

আর কি বা দেখ্‌ব আঁখি মেলে
শ্রীরূপ-সনাতন গেল চ'লে আর কি বা দেখ্‌ব আঁখি মেলে

বৃথা কেন রাখ্‌ব নয়ন
যদি ছাড়ি গেলা রূপ সনাতন বৃথা কেন রাখ্‌ব নয়ন

"বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি বৃথা প্রাণ কাঁহা রাখি

এ প্রাণে আর কাজ কি বল
প্রাণের প্রাণ গৌর ছেড়ে গেল এ প্রাণে আর কাজ কি বল

বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা প্রাণ কাঁহা রাখি'
এত বলি করয়ে ক্রন্দন ॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
হা রূপ-সনাতন ব'লে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

"শ্রীচৈতন্য নাম যত তার গণ হয় যত
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।"

গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব
সবারে করয়ে পরণাম ॥"

সবে মিলে কৃপা কর
লীলাস্থলী গৌরগণ সবে মিলে কৃপা কর

যেন জন্মে জন্মে পাই হে
শ্রীরূপ-সনাতন-সঙ্গ যেন জন্মে জন্মে পাই হে

শ্রীরূপ-সনাতন-সঙ্গ
প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরূপ-সনাতন-সঙ্গ

যেন জন্মে জন্মে পাই হে

যেন জন্মে জন্মে পাই গৌরাঙ্গ ধনে
আমার প্রভু স্বরূপ সনে যেন জন্মে জন্মে পাই গৌরাঙ্গ ধনে

যেন গৌর ব'লে মরতে পারি

এই কৃপা কর 'গৌরগণ' 'গৌর-লীলাস্থলী'—
যেন গৌর ব'লে মরতে পারি
"সবারে করয়ে পরণাম ॥

রাধাকৃষ্ণ-বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
শুখা রুখা অন্ন মাত্র সার।

গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিলা আগে,
ফল গব্য করিল আহার ॥

সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে
কেবল করয়ে জল পান।"

(বলে) এ জীবনে কাজ কি বল
সনাতন যদি ছেড়ে গেল এ জীবনে কাজ কি বল

কেন ম'রে নাহি যাই
অন্ন জল বিষ খাই কেন ম'রে নাহি যাই

রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ ॥

শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি তাঁহার গণে,
বিরহে আকুল হৈঞা কাঁদে।

কৃষ্ণ-কথা-আলাপনে, না শুনিয়া শ্রবণে,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে ॥

ব্যাকুল হয়ে দাস গোসাঞি ডাকে
শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে প'ড়ে ব্যাকুল হয়ে দাস গোসাঞি ডাকে

"হা হা রাধা কৃষ্ণ কোথা কোথা বিশাখা ললিতা
কৃপা করি দেহ দরশন।

'হা চৈতন্য মহাপ্রভু'
হা চৈতন্য বল্‌তে হারায় চৈতন্য

"হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা স্বরূপ মোর প্রভু
হা হা প্রভু রূপ সনাতন ॥"

কুণ্ডতীরে রঘুনাথ কাঁদে
নয়নে দরদর-ধারে কুণ্ডতীরে রঘুনাথ কাঁদে
আহার নাই নিদ্রা নাই কুণ্ডতীরে রঘুনাথ কাঁদে

কোথা বা লুকালে

হা প্রাণ শচীনন্দন
হা স্বরূপ রূপ সনাতন হা প্রাণ শচীনন্দন

রূপ সনাতন গেলে কোথা
আর কে শুনাবে গৌর কথা রূপ সনাতন গেলে কোথা

আর কি সঙ্গ দিবে না

গৌর-কথা কি শুনাবে না আর কি সঙ্গ দিবে না

"কাঁদে গোসাঞি রাত্রি দিনে পুড়ি যায় তনু মনে"

গৌরাঙ্গ বিরহানলে।

"পুড়ি যায় তনুমনে

ক্ষণে অঙ্গ ধুলায় ধুসর।

"চক্ষু অন্ধ অনাহার"

নিশি দিশি কেঁদে কেঁদে

চক্ষু অন্ধ অনাহার আপনাকে দেহ ভার

বিরহে হইল জর জর।"

উঠিবার শকতি নাই

বিরহেতে শীর্ণ তনু উঠিবার শকতি নাই

কঙ্কাল হয়েছে সার

ত্যাগ করেছেন আহার কঙ্কাল হয়েছে সার

বসিলে উঠিতে নারে

"রাধাকুণ্ড তটে পড়ি সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ি

মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ॥"

আর বলিবার শকতি নাই রে

"মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে"

ফুকারি বল্‌তে নারে

"মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥

সেই রঘুনাথ দাস পুরাহ মনের আশ
এই মোর বড় আছে সাধ ॥

এ রাধাবল্লভ দাস মনে বড় অভিলাষ
প্রভু মোরে করহ পরসাদ ॥"

এই কৃপা কর মোরে

রঘুনাথ দাস গোসাঞি এই কৃপা কর মোরে

স্বরূপের প্রিয় রঘুনাথ এই কৃপা কর মোরে

বিতর বিরহ-কণা

তোমা হ'তে অধিক দুঃখী মোরা বিতর বিরহ-কণা

যেন নিশিদিশি কাঁদতে পারি

"চৈতন্য-স্তব কল্পবৃক্ষ" গান করি,

—যেন নিশিদিশি কাঁদতে পারি

'হা গৌর' 'গৌরগণ' বলি, যেন নিশিদিশি কাঁদতে পারি

যেন গৌরগুণে সদা ঝুরি

তোমার চরণ হৃদে ধরি যেন গৌর-গুণে সদা ঝুরি

যেন কেঁদে লুটাই ব্যাকুল হ'য়ে
তোমার গৌর-বিরহ স্মরণ ক'রে
—যেন কেঁদে লুটাই ব্যাকুল হয়ে

'কুণ্ডতীরে' তোমার গুণ গেয়ে
—যেন কেঁদে লুটাই ব্যাকুল হ'য়ে
শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে গিয়ে যেন কেঁদে লুটাই ব্যাকুল হ'য়ে

যেন তোমার চরিত্র স্মরি মরি
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ হৃদে ধরি
—যেন তোমার চরিত্র স্মরি মরি

———

(এই তরঙ্গে সন্নিবেশিত উপরের শোচক কীর্ত্তন এবং পরপৃষ্ঠা হইতে সন্নিবেশিত 'শোচকে আক্ষেপ কীর্ত্তনটি' নিত্যধাম গত শ্রীল দ্বিজপদ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদনায় শ্রীশ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকাতে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে লওয়া হইয়াছে।)

ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল

(হায় হায়) যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর রে
হেন প্রভু কোথা গেলা, আচার্য্য ঠাকুর রে॥

(হায় হায়) কাঁহা গেলা স্বরূপ রূপ, কাঁহা সনাতন রে।
কাঁহা গেলা রঘুনাথ শ্রীজীব জীবন হে॥

(হায় হায়) কাঁহা গেলা ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ;
এক্ কালে কোথা লুকালে, গোরা নটরাজ॥

(হায়রে) কারও দেখা পেলাম না
কি বলব দুর্দ্দৈবের কথা (হায়রে) কারও দেখা পেলাম না

(আহা) "শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীবাসাদি গদাধর,
(হায়) নরহরি মুকুন্দ মুরারি॥

(হায় হায়) সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ, হরিদাস প্রেমকন্দ,
(হায়) দামোদর পরমানন্দপুরী॥"

(হায় হায়) যে সব করিলা লীলা,"
(হায়রে) মধুর নদীয়া আর নীলাচলে

(আমরি) শ্রীসুরধুনী আর সিন্ধু কূলে
—(হায়রে) মধুর নদীয়া আর নীলাচলে

(হায় হায়) যে সব করিলা লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুই না পাইনু দেখিতে।”

(হায়) কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে
‘প্রেমোন্মত্তকারী লীলা’ (হায়) কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

প্রেমোন্মত্তকারী লীলা
স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা প্রেমোন্মত্তকারী লীলা
ঝাড়িখণ্ড পথে ব্রজে আসিতে প্রেমোন্মত্তকারী লীলা

কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে
প্রাণ গৌরাঙ্গের) পাষাণ-গলান-লীলা
—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম্‌ না রে

পাষাণ-গলান লীলা
(আমার) চিতচোর প্রাণ গৌরাঙ্গের পাষাণ গলান লীলা

—অদ্যাপি তার নিদর্শন আছে
(শ্রীনীলাচলে) জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে
—অদ্যাপি তার নিদর্শন আছে

এখনও তার সাক্ষী দিছে

সেই লীলার সাক্ষী দিছে
'পাষাণে শ্রীপদচিহ্ন' সেই লীলার সাক্ষী দিছে

কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না
(প্রাণ গৌরাঙ্গের) পাষাণ গলান লীলা
—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না

দেখা শুনা হ'ল না
কারে বল্‌ব দুর্দ্দৈবের কথা দেখা শুনা হ'ল না
তখন জনম পেলাম না দেখা শুনা হ'ল না
(ও সে) গমনে নটন বচনে গান দেখা শুনা হ'ল না

"হায় তাহা মুই না পাইনু দেখিতে।"

"(হায় হায়) তখন না হৈল জন্ম, এবে ভেল ভববন্ধ.
সে না সেল রহি গেল চিতে॥"

আর জুড়াইবার উপায় নাই

নিশিদিশি জ্বল্‌ছে হিয়ায়
'সে লীলা অদর্শন শেল' নিশিদিশি জ্বল্‌ছে হিয়ায়

সেই লীলা অদর্শন শেলে
'পরাণ গৌরাঙ্গচাঁদের' সেই লীলা অদর্শন শেলে
নিশি দিশি জ্বল্‌ছে হিয়া

আর জুড়াইবার উপায় নাই ভাই
(একমাত্র) 'প্রাণ গৌর কথা' বিনে আর
—আর জুড়াইবার উপায় নাই ভাই

এনেছেন কৃপা করে

পরম করুণ শ্রীগুরুদেব এনেছেন কৃপা করে
কেশে বাঁধি কৃপা ডোরে এনেছেন কৃপা করে

এনেছেন কাছে ব্রজ ভূমিতে
(শ্রীগুরুদেব) অহৈতুকী কৃপার বশেতে
—এনেছেন কাছে ব্রজ ভূমিতে

এমন দিন আর পাবে না ভাই
এমন সুযোগ আর হয় নি ভাই

বল বল ভাই গৌর বল
শ্রীমহান্তগণের শরণাগতিতে বল বল ভাই 'গৌর' বল

শ্রীমহান্তগণের শরণাগতিতে
'শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী' শ্রীমহান্তগণের শরণাগতিতে
বল বল ভাই গৌর বল

'তাঁদের পদরজ' শিরে ধ'রে বল বল ভাই গৌর বল
তাঁদের পদরজময় ভূমিতে লুটায়ে বল বল ভাই গৌর বল
"(ও) বদনে বল জয় জয়, শচীর কুমার রে"

বল বল ভাই 'গৌর' বল

কবিরাজ গোস্বামীর চরণ তলে বসে বল বল ভাই 'গৌর' বল

কবিরাজ গোস্বামীর চরণ তলে

যিনি এনেছেন কৃপাবশে কবিরাজ গোস্বামীর চরণ তলে

বল বল ভাই গৌর বল

আর কিছু লাগে না ভাল বল বল ভাই গৌর বল

"বদনে বল জয় জয়, শচীর কুমার রে।"

জয় জয় দাও ভাই প্রাণ ভরি

আমার প্রেমাবতার গৌরহরির জয় জয় দাও ভাই প্রাণ ভরি

জয় জয় জয় গৌরহরি

বল জয় জয় জয় গৌরহরি

প্রেমাবতার গৌরহরি

জয় জয় জয় জয় প্রেমাবতার গৌরহরি

জয় জয় গৌরহরি

স্থাবর জঙ্গম প্রেমোন্মত্তকারী জয় জয় গৌরহরি

"গৌর আমার নিগম নিগূঢ় অবতার রে॥"

কি বা জানি কি বা বলব

যা বলান্ তাই বলি বাণী

শ্রীগুরুদেব কৃপার খনি যা বলান তাই বলি বাণী
"(প্রাণ) গৌর আমার নিগম নিগূঢ় অবতার রে ॥"

আমার চিতচোর গৌরাঙ্গ মূরতি

'মহারাসবিলাসের পরিণতি' আমার চিতচোর গৌরাঙ্গ মূরতি

চিতচোর গৌরাঙ্গ আমার

চিতচোর গোরা গুণমণি
মহাভাব প্রেমরস খনি চিতচোর গোরা গুণমণি

মহাভাব প্রেমরস খনি

বল বল ভাই গৌর বল

রামরায়ের চিতচোর বল বল ভাই গৌর বল
'মূরতিমন্ত প্রেম বৈচিত্ত্য' বল বল ভাই গৌর বল
'নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ' বল বল ভাই গৌর বল

চিতচোর গৌরাঙ্গ আমার

বল বল ভাই গৌর বল

"গৌর আমার নিগম নিগূঢ় অবতার রে ॥"
"শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য গৌর গুণ ভাল জানে"

যে কেঁদে কেঁদে এনেছে

অনশনে গঙ্গাতীরে বসে — যে কেঁদে কেঁদে এনেছে
গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে — যে কেঁদে কেঁদে এনেছে

(আমার) প্রাণ কৃষ্ণ এস বলে — যে কেঁদে কেঁদে এনেছে
(আমার) প্রাণ গৌর এস ব'লে — যে কেঁদে কেঁদে এনেছে

প্রাণ গৌর এস ব'লে

ভাসি দুটি নয়নজলে — প্রাণ গৌর এস ব'লে
যে কেঁদে কেঁদে এনেছে

"শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য গৌর গুণ ভাল জানে রে।
প্রভু নিতাই অবধূত, যার গুণ গানে রে ॥"

(আমার) প্রভু নিতাই পাগল করা গোরা

আমার আমার আমার আমার
—আমার প্রভু নিতাই পাগল করা গোরা
প্রাণ ভরে বল ভাই তোরা
—আমার প্রভু নিতাই পাগল করা গোরা

"প্রভু নিতাই অবধূত, যাঁর গুণ গানে রে ॥

(ভাইরে) যাঁর গুণে ঝুরি ঝুরি"
যাঁর গুণে ঝুরি ঝুরি
যাঁর গুণে ঝুরি ঝুরি
যাঁর গুণে ঝুরি ঝুরি
যাঁর গুণে ঝুরি ঝুরি

"রূপ সনাতন রে"

"(ভাইরে) যাঁর গুণে ঝুরি ঝুরি, রূপ সনাতন রে।
সকল ঐশ্বর্য্য ছাড়ি আইলা বৃন্দাবন রে॥"

লুপ্ত ব্রজ প্রকাশ কৈলা

'গৌর ব'লে কেঁদে' 'অনুভবে' লুপ্ত ব্রজ প্রকাশ কৈলা

গৌর বলে কেঁদে অনুভবি

'লীলাভূমি' জানি গৌর বলে কেঁদে অনুভবি

লুপ্ত ব্রজ প্রকাশ কৈলা

"সকল ঐশ্বর্য্য ছাড়ি আইলা বৃন্দাবন রে।"

(ভাইরে) যাঁর গুণে ঝুরি ঝুরি, শ্রীরঘুনাথ দাস রে।
যাঁর গুণে ঝুরি ঝুরি, শ্রীরঘুনাথ দাস রে
যাঁর গুণে ঝুরি ঝুরি, শ্রীরঘুনাথ দাস রে
"ইন্দ্রসম রাজ্য ছাড়ি, এই রাধাকুণ্ডে বাস রে॥"

নিশিদিশি কাঁদে রে

(আমার) রঘুনাথ দাস গোঁসাই নিশিদিশি কাঁদে রে
এই রাধাকুণ্ডতীরে বসে নিশিদিশি কাঁদে রে
(শ্রীকৃষ্ণদাস) কবিরাজের গলা ধরি নিশিদিশি কাঁদে রে

(কৃষ্ণদাস) কবিরাজের গলা ধরি

এই কুণ্ডতীরে বসি কৃষ্ণদাস কবিরাজের গলা ধরি

ব্যাকুল হয়ে কাঁদে গোঁসাই
দাস গোসাঞি ব্যাকুল হয়ে কাঁদ্‌ছেন্‌

বল বল কবিরাজ
আর কি আমি দেখ্‌তে পাব

বল বল কবিরাজ — আর কি আমি দেখ্‌তে পাব
'সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু' — আর কি আমি দেখ্‌তে পাব

এই এই দেখ কবিরাজ

দাস গোসাঞি ব্যাকুল হ'য়ে বলে — এই এই দেখ কবিরাজ
এই কুণ্ড তীরে বসে বলে — এই এই দেখ কবিরাজ

এইখানে বসে বলে, — দেখ দেখ কবিরাজ
কবিরাজের গলা ধরে বলে. — দেখ দেখ কবিরাজ

আমার প্রভুর গলায় ছিলা

এই 'গিরিধারী' 'গুঞ্জামালা' — আমার প্রভুর গলায় ছিলা

ভাবাবেশে বলে রে

ব্যাকুল হয়ে বল্‌তে বল্‌তে আবার — ভাবাবেশে বলে রে
'গুঞ্জামালা' 'গিরিধারী' বু'কে ধ'রে — ভাবাবেশে বলে রে

'বিন্দুতে' 'সিন্ধু' ভোগ করে

অঙ্গ সঙ্গ পেয়েছে

চিত্তচোরা প্রাণ গৌরাঙ্গের — অঙ্গ সঙ্গ পেয়েছে

সেই অনুভবে বলে

'গুঞ্জামালা' 'গিরিধারী' বুকে ধ'রে — সেই অনুভবে বলে
'বিন্দুতে' 'সিন্ধু' ভোগ করে — সেই অনুভবে বলে
গুঞ্জামালা গিরিধারী বুকে ধরে — সেই অনুভবে বলে

আর ছেড়ে দিব না

পেয়েছি তোমায় চিতচোর — আর ছেড়ে দিব না

কোথা বা আছ হে

দাস গোসাঞি কোথা তুমি
এইত তোমার বসতি ভূমি — দাস গোসাঞি কোথা তুমি

এই ত তোমার বসতি ভূমি

শ্রীগুরুমুখে শুনে বলি — এইত তোমার বসতি ভূমি
এখানে বসে, ব্যাকুল হয়ে কাঁদ্‌ছ তুমি

একবার কি দেখা দিবে

কোন অধিকার নাই, তবু বলি — একবার কি দেখা দিবে

কোন্ অধিকারে দেখা দিতে বল্‌ব

'দুর্বাসনার কিঙ্কর' আমি কোন্ অধিকারে দেখা দিতে বল্‌ব

অযাচিত কৃপাকারী

আমার পরাণ গৌরাঙ্গগণ — অযাচিত কৃপাকারা

শ্রীগুরুমুখে শুনেছি — অযাচিত কৃপাকারী

একবার কি দেখা দিবে

না না দেখা দিও না

'দুর্দ্দৈবের কিঙ্কর' আমি — না না দেখা দিও না

তোমার ভজনে বিঘ্ন হবে — না না দেখা দিও না

এই কৃপা কর হে

রঘুনাথ দাস গোসাঞি — এই কৃপা কর হে

যদি কৃপা করে এনেছ টেনে — এই কৃপা কর হে

বহু দিন পরে যদি, — **কৃপা করে এনেছ টেনে**

কৃপারজ্জু কেশে বেঁধে — যদি কৃপা করে এনেছ টেনে

গৌর গুণে ঝুর্‌তে পারি

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরি — গৌর গুণে ঝুর্‌তে পারি

যেন পাগল হ'য়ে বেড়াই সদা

যত দিন এই দেহ থাকে — যেন পাগল হ'য়ে বেড়াই সদা

শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় — যত দিন এই দেহ থাকে

পাগল হয়ে বেড়াই সদা

ভাই ভাই ভাই মিলে — পাগল হয়ে বেড়াই সদা

'গৌরাঙ্গ বিহার ভূমিতে' — পাগল হয়ে বেড়াই সদা

গৌরলীলা স্মঙরি ঝুরি ঝুরি — পাগল হয়ে বেড়াই সদা

এই কৃপা কর হে

রঘুনাথ দাস গোসাঞি — এই কৃপা কর হে

যেন কণ্ঠ হার হ'য়ে থাকে

শ্রীগুরুকৃপাদত্ত নামাবলী যেন কণ্ঠহার হ'য়ে থাকে

'সাধ্য' 'সাধন' নির্ণয় করা, শ্রীগুরু কৃপাদত্ত নামাবলী

যেন কণ্ঠহার হয়ে থাকে

ভাই ভাই বেড়াই সদা

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধ'রে ভাই ভাই বেড়াই সদা

নাম-মালা কণ্ঠহার ক'রে ভাই ভাই বেড়াই সদা

প্রাণ ভ'রে গাইতে পারি

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরি প্রাণ ভ'রে গাইতে পারি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

(নিতাই) গৌর হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল

শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল ॥

(শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংক্রান্তি বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৪।।০ ঘটিকায়, শ্রীকুণ্ডতটে অবস্থিত দাস গোস্বামীর সমাধিতে এই কীর্ত্তনটী করিয়াছিলেন।)

সপ্তদশ তরঙ্গ

"প্রীতি উপহার"

বিবরণ

১। (চিত্রে) সঙ্কলয়িতার শ্রীগুরুদেব—

২। শ্রীগুরুদেব শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয় ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ঠাকুর দেবশর্ম্মা, পঞ্চতীর্থ. মধ্যে প্রশ্নোত্তরে "শ্রীশ্রীরাম দাস কথামৃত এবং কোথাও বা শ্রীগুরুদেবের বাণীটিই কেবল উদ্ধৃত হইয়াছে। --(পর পৃষ্ঠায় পৃথক সূচী)

৩। শ্রীগুরু অষ্টকালীয়-লীলা-স্মরণ-মালা— পৃষ্ঠা—৫৬২

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ন গুরোরধিকম্	:	৫২১
এ বারের বিপরীত খেলা	:	৫২১
আমার ঠাঁই নাই	:	৫২২
আকর্ষণের ভিত্তি	:	৫২২
'ধর্ম্ম' ও 'অধর্ম্ম'	:	৫২২
'অপরাধ'	:	৫২২
শাস্তি	:	৫২২
আমি করি এ বড় জ্বালা	:	৫২৩
করেছি ও করেছেন	:	৫২৩
জীবের স্বাধীনতা কোথায় ?		৫২৪
স্বাধীনতা	:	৫২৫
ভক্তি পথের প্রাথমিক পাঠ্য নির্ব্বাচন	:	৫২৫
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে	:	৫২৫
দৃষ্টি	:	৫২৬
সাবধান বাণী	:	৫২৬
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়	:	৫২৬
বৈষ্ণবের দৃষ্টি	:	৫২৭
আসক্তি	:	৫২৮
সাধু-সঙ্গ ও বিশ্বাস	:	৫২৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীরামদাস কথামৃত ঃ		
সিদ্ধ প্রসঙ্গ	:	৫৩১
সাধন প্রসঙ্গ	:	৫৩৩
আনুগত্য	:	৫৩৬
সাধন সম্পদ	:	৫৪০
স্বতন্ত্রার আরও রূপ	:	৫৪৭
বৈষ্ণব সমাজে দাস ভাব	:	৫৫০
বৈষ্ণবের আদর্শ	:	৫৫২
উপায় কি ?	:	৫৫৩
একটি ভক্তের প্রশ্ন	:	৫৫৪
সাধন ও স্বতন্ত্রতা	:	৫৫৬
সংসারের স্রোতে সাঁতার	:	৫৫৯

গ্রন্থ সঙ্কলয়িতার শ্রীগুরুদেব

নামময়-জীবন শ্রীল রামদাস বাবাজী

ন গুরোরধিকম্

ওগো! গুরু স্বরূপে যখন হাত ধরেছে, তখন চাওয়া পাওয়া সব হয়ে গেছে, তবে যদি বল তা'হলে এই সব নাম প্রসঙ্গ বিগ্রহ সেবা প্রভৃতির প্রয়োজন কি? সে কোন হেতুতে নয়, কোন জন্যে নয়, সে কেবল তাঁর (শ্রীগুরু স্বরূপের) মুখ পানে চেয়ে, সে ভালবাসে তাই, নইলে আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে?

"এ বারের বিপরীত খেলা"

'দাতার স্বভাব দান করা—

হেতু নাই যুক্তি নাই পাত্রাপাত্র বিচার নাই, প্রচ্ছন্ন স্বভাবে আসা প্রচ্ছন্নভাবেই সব কাজ সারা। 'স্বরূপে' 'আবরণে' 'কাজে' সবই প্রচ্ছন্ন, রূপে মিল কর্‌তে গেলে ঠকে যাবে। কাজে মিল করে নাও, ঘরে বসে 'সব পাবে'।

যে গুলো ঘটে যাচ্ছে সে গুলো কি সোজা?
কলির জীবের সর্ব্বদাই ভুলে থাকা স্বভাব। খাওয়া পরা নিয়ে ব্যস্ত, তাদের কি এ রাজ্যে আসা সোজা!

তাই প্রচ্ছন্ন ভাবে আসা, ওই ওরই ভেতর দিয়ে ঢুকে সম্বন্ধ করিয়ে নিতে হবে—যেচে দিতে হবে, তবে কাজ হবে। এ বারের খেলা সব বিপরীত।

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডের বিধি নিষেধ, অধিকারী অনধিকারী কিছু দেখ্‌লে চলবে না, দেখ্‌তে গেলে পাবে না, দাতার করুণার ঠাঁই হবে না…

—৩৪

আমির ঠাঁই নাই

'তারই জিনিষ, সেই আসে, দেয়ও মারফতে, 'আমির' ঠাঁই নাই

"আকর্ষনের ভিত্তি"

ওগো ! সে বাজিয়ে দেখে নেয়, টান্‌টা কোথায় ? নিজের 'লাভ' 'পূজা' 'প্রতিষ্ঠায়' না তাঁর ওপর ; ওমনি করেই তো নিজের জনকে খাঁটি সোনা করে রাখে, আর তাই দেখেই তো পরশমণির সন্ধানে সব যায়, আসল কথা কা'র মুখ চেয়ে আছ, টাকা পয়সার না তার মালিকের ? না তার ছাড়া কেউ দাতা আছে ?

সে সব নাটের গুরু। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য........ ...

'ধর্ম্ম' ও 'অধর্ম্ম'

'ওগো, আত্মানুশীলনই ধর্ম্ম আর, পরানুশীলনই অধর্ম্ম'

'অপরাধ'

ও গো ! **'অস্থানে'** বস্তুর আরোপিই **'অপরাধ,'**
যে যা নয় তাকে তাই করাই অপরাধ।

'শান্তি'

'আত্মদোষ' 'আত্ম,—অপরাধ' চিন্তা ক'র্‌লেই শান্তি আসে

আমি করি এ বড় জ্বালা

বাবাজী ম'শায় :

'একটি গল্প আছে—

এক সময় এক দরিদ্র ভক্ত ব্রাহ্মণ, শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্যে আর একটি মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভিক্ষায় বে'র হ'লেন। কিছু দিন পর বেশ ধন-রত্ন সংগ্রহ হ'লো। তা'র এই সব সংগ্রহ দেখে এক ডাকাত তার পিছু নিলে, সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে সেই ভক্তটি সন্ধ্যা কর্‌তে বসেছেন, ডাকাতও লুকিয়ে থাকলো, সুযোগ হলেই সর্ব্বস্ব নেবে। এদিকে ওখানে লক্ষ্মীনারায়ণ পাশা খেল্‌ছিলেন, হঠাৎ নারায়ণ হাত থামিয়ে উঠে পড়্‌লেন, ঠাকুরাণী বল্লেন, ও কি! উঠলে কেন?

নারায়ন বল্লেন, এক ভক্তের সর্ব্বস্ব ডাকাতে কেড়ে নিচ্ছে, সে আমায় স্মরণ করেছে কাতর ভাবে। এই কথা বলেই একটু থেমেই আবার খেল্‌তে বস্‌লেন, দেবী জিগ্যেস্ কর্‌লেন, কি হ'ল? থেমে রইলে যে?

নারায়ণ হেসে বল্লেন, ও হ'য়ে গেছে। ব্রাহ্মণ ভাব্‌লে আমিই বা কেন শুধু শুধু ছাড়্‌বো, একটু দেখেই নিইনা!

ব্যাস, আর আমার কাজ নেই, যত্‌ক্ষণ আমার ওপর ভরসা করেছিল, তখন ছুটছিলাম, কিন্তু, যখুনি তার 'অহংজ্ঞান' এসে পড়্‌লো আমার কাজও ফুরোলো।

'ক'রেছি' ও 'ক'রেছেন'

বাবাজী মহাশয়ঃ

দেখ! আজ দুটি বেশ কথা পেয়েছি—

‘করেছি’ ও ‘করেছেন’

জগত-শুদ্ধ লোক এত ‘করেছির’ দলে মিশে পুরুষকার অহংকারে নষ্ট হয়ে যায়ই !

(এটা করেছি, ওটা করেছি বলে ঐ রসেই মেতে আছে)

আচ্ছা ! আমি করেছি বল্‌লে—

‘কর্ত্তা’ ও ‘ভোক্তার’ অভিমান এল না ?

আর তাঁরই কৃপা অবলম্বনে সমস্ত কাজ সমাধান করে অকপট সত্যানুভূতিতে যদি কেউ বলেন—

সমস্তই তিনি ক’রেছেন—

তা’হলে তিনি যে ‘সমর্পিত’ ও ‘আশ্রিত’ এবং প্রভুর বিশুদ্ধ সেবক এটা বুঝতে কি বাকী থাকে ?

এই ‘করেছি’ কথাটা জগতে কি দুর্দ্দশাই কর’ছে !

জীবের স্বাধীনতা কোথায় ?

বাবাজী মহাশয়ঃ

হাঁ জীবের অবার কর্ত্তৃত্ব আর স্বাধীনতা—

ঐ যে গো বলা হয়—

অন্ন গ্রাস গ্রহণেও ক্ষমতা নেই, রান্না, বান্না হয়েছে, আসন, জল, থালা, অন্ন ব্যঞ্জন, সব সাম্‌নে ধ’রে দিল। গ্রাস তুল্‌বে এবার। এমন সময় হয়তো বাড়ীতে বিপদ বাধলো কিম্বা যে পরিবেশন কর্‌ছে তারই সঙ্গে সামান্য কারণে কিছু বেধে গেল, হাতের গ্রাস হাতে রইলো, মার্‌লে লাথি ‘গেল সব উল্টে’। রাগে লাল হয়ে উঠে পড়্‌লো ;

কি ?—পার্‌ল না কেন ?

এইতো 'কর্ত্তৃত্ব'
তা হ'লে বোঝো, যে সব সময়েই তাঁর বশ্যতা চাই।

স্বাধীনতা—

বাবাজী ম'শায়
'আমার' স্বাধীনতা রেখো না 'আমার' ঠাঁই রেখো না বিপদে প'ড়বে।

স্বাধীনতা কোথায় ? যখন তাঁতে মতি থাক্‌বে স্বা (স্বা মানে মুখ্য তিনি, গৌণ এই দেহ) ধীন হ'য়েও তাঁরই অধীন তবে 'স্বাধীন'।

ভক্তি পথে প্রাথমিক পাঠ্য নির্ব্বাচন—

ছ্যাখ, সবাই ভগবানের কথা শুন্‌ছে, শ্রীমদ্‌ভাগবত, শ্রীচৈতন্ম চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত।—আরে, এতে তো তাঁর কথা আছে, আগে এ সব শুনে কি করবে ? তাতে তো তাঁর কথা আছে, তোমার কথা কৈ ? তুমি কোথার যাবে ? কেমন করে যাবে ?

সেটা কোথায় আছে জান ? 'ভক্ত' কথায়। ভক্তের কথা শোনো, প্রাপ্তির পথ বলা আছে, তোমার অবস্থা বলা আছে, তাতেই সব জান্‌তে পারবে। ভক্ত ছাড়া তোমার অবস্থার কথা আর কে বল্‌বে ? আগে থেকে তাঁর অবস্থা জেনে কি করবে ?

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে

ওগো ! বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেও সব হয়। আশ্রম ধর্ম্মে আতিথেয়তার

মহৎ কৃপা লাভ হয়; কোন মহাপুরুষ দোরে এসে হয়তো ফিরে গেলেন, তাতেও করুণা লাভ হয়। তাঁরা বলেন—

'আ হা! এরা ভূলে আছে'

ব্যস্ 'কার্য্য সিদ্ধি'।

দৃষ্টি

'দৃষ্টি এলে বিচারের ঠাঁই থাকে না। যত প্যাঁচ ঐ 'দৃষ্টি' নিয়ে। বস্তু ঠিকই থাকে,—**যেমনি দৃষ্টি তেমান প্রাপ্তি**। দৃষ্টি হয় ভাবে। কৃপা ক'রে কেউ সে ভাব দিলে তবে দৃষ্টি ফেরে। তখন দেখে বিচার কোথায়? সবই 'নিত্যানন্দময়'।

সাবধান বাণী

সব তো 'স্বার্থ মিশ্রিত' পরমার্থ, 'বিশুদ্ধ পরমার্থ' কৈ? সে হোলে অল্পেই কাজ হয়।

সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়

দেখ! ছেটেবেলার একটি কবিতা মনে পড়ে—

সাধনের থাকিলেও বিভিন্ন পদ্ধতি।
সকল সাধকের এক ঈশ্বরের মতি॥

শ্রীকবিরাজও বলছেন্ না?

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥

আর তাইতো তার নাম 'বিশ্বম্ভর' 'বিশ্বরূপ'। তোমার ভাল না লাগে তো কি করবে? কিন্তু, **বাদ দেবে কেন?**

'বিরাটের' 'বিশ্বরূপের' কোনোটি বাদ দিয়ে কি 'বিরাট' হয়? না 'বিশ্বরূপ হয়? সব নিয়েই তবে তো! না কি বল? সবেতেই সর্ব্ব শক্তি আছে না? ঐ যে বলেছেন—

'সর্ব্ব শক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ'

তবে?—

বিচার ক'রে 'গ্রহণ' 'বর্জ্জন' দৃষ্টি' তো দুর্দ্দৈবেই হয়।

বৈষ্ণবের দৃষ্টি

দেখ! কেদার দত্ত ম'শায় (ভক্তি বিনোদ) 'কল্যাণ কল্পতরু' লিখেছেন, তাতে বেশ বলেছেন্—

ঐ যে ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা আছে না ·

"কবে এ সংসার বামে ঠেলে যাব"

তাতে তিনি কি বলেছেন, জান?

তুমি সংসার ঠেল্‌বে কি রকম? ও কথায় ভক্তি পথে আঘাত লাগে।

"আমায় অযোগ্য জেনে সংসারই ঠেলে ফেল্‌বে"

বেশ কথাটি নয়! মীরার ভজনেও তো ওই কথা·········

আসক্তি

বাবাজী ম'শায়! যা'র যা'তে আসক্তি হয়, তাতে তা'র একটা চেহারার ছাপ্ পড়ে, চেহারা দেখ্‌লেই সেটা নজরে পড়ে। বস্তুর বিকার বস্তুতেই থাকে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : আচ্ছা, বাবা! বস্তু যদি পরিস্কার থাকে তবেই না, তার ওপর ছাপ পাড় ; সেটা সরিয়ে নিলেই ছায়াও যায়। মলিন হ'লে ছায়া পড়ে না, পড়লেও স্থায়ী হয় না। আমরা যখন পরিস্কার নই তখন আর আমদের দুর্ভাবনা কি ?

বাবাজী ম'শায় শুনে হাস্‌লেন। বেশ সহজ সুরেই বললেন-না গো না, স্বচ্ছ বস্তুতেই নয়, যা' দেখ্‌বে, যা শুন্‌বে, যা কর্‌বে—সবেতেই ছায়া পড়ে ; স্বচ্ছ হ'লে লোকের নজরে পড়ে, আর মলিন হলে (আর) নজরে পড়েনা ; কিন্তু ছাপ্‌তো পড়েই !

তোমরা বল 'আদর্শ চরিত্র'। আদর্শ মানে আয়না। আয়নার সাম্‌নে দাঁড়ালে খুটিনাটি সব দাগ ধরা পড়ে। আয়নার কাছ থেকে সরে গেলে আর মনেই থাকে না।

আর, ফটো তোলার আয়নায় সব ধরা থাকে, তাতেই সব আটকে যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা : বিষয়ের ছাপ্‌ থাকে কিসে ?

বাবা! কেন ? দেহে, মনে। ভাব্‌নার ছাপ্‌ মনে আর আহার ব্যাবহার দেখা শোনার ছাপ্‌ দেহে। **কিছুই যাবার নয়।**

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : এ ছাপ্‌ ধরে রাখে কে ?

বাবা : **'সংস্কার' ও 'আসক্তি'**

অনাদি কালের বাসনা ; লোভ এলেই সংযোগ।

এ রাজ্যে ও রাজ্যে দুই সমান :—

এ রাজ্যে **'মালিন্য'** আর **'বন্ধন'**

ও রাজ্যে **'মার্জ্জন'** আর **'মজ্জন'**

কবিরাজের কথা তো তাই—

'চিত্ত দর্পণ মার্জ্জন করে'

ওদের সব আচরণ দেখ্‌ছ না কেমন? যেখানে 'উদ্দীপনা' সেখানেই আলিঙ্গন; যে খানে 'মালিন্য' সেইখানেই এড়িয়ে যাচ্ছেন। এ হোলো আচরণের কথা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! আপনি যে বল্লেন দেহেও ছাপ্‌ থাকে, সেটা কি রকম?

বাবা : **দেহের ছাপ্‌ আহারে**। অশুদ্ধ আহার দেহে গিয়ে গোটা-টাই বদ্‌লে গেয়। সে রক্ত যত কাল দেহে থাকে, তত দিন দেহের বিকার। সে বিকার কি এক দিনে যায়?

সে রক্তের দোষ পাল্টাতে দেরী হয়। এক এক রসে এক এক বিকার—

'মলিন শরীরে না হয় কৃষ্ণের ভজন'

'প্রসাদ' 'চরণামৃত' খেতে খেতে ও ধাত্‌ যায়। তা' ছাড়াও, থেকে যায় মাতৃ পিতৃ সম্বন্ধ।

•

সাধু-সঙ্গ ও বিশ্বাস

পটভূমিকা :

[একটি বড় প্রোসেশন যাচ্ছে—বাবা নিবিষ্টের মত দেখছেন্ আর মৃদুমৃদু হাসছেন। তাদের কোলাহল আর পথচারীর ভীড়, সেখানটায়

বেশ জমে উঠেছে।

হঠাৎ বাবা বললেন—'এরা কিসের আকর্ষণে শোভাযাত্রা করছে? 'পরের উপকার' না 'প্রতিষ্ঠা'?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : 'দুইই'

বাবা : মূলে কি? (পরে) হেসে বললেন—

'দেহাত্মাভিমান'—সকল বন্ধনের একমাত্র কারণ।
যেখানে 'দেহাত্মাভিমান' নেই, সেইখানেই 'সাধু-সঙ্গ'।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বুঝবো কি করে?

বাবা : 'বিশ্বাস মহাশয়ের' সাক্ষাৎ হলেই বোঝা যাবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : কথায় বিশ্বাস না বিশ্বাস বলে কোন বস্তু আছে?

বাবা : **বিশ্বাস একটী অবস্থা!**

প্রসঙ্গান্তরে—

'বিশ্বাস মহাশয়ের দেখা মিল্‌লে কিছুই আটকায় না। আমাদের কেবল ওঁর সঙ্গে আলাপ হোলো না।'

ওগো সবই আছে সবই থাকবে—'হরিনাম' 'মূর্ত্তি' 'প্রসাদ'। কিন্তু **অবিশ্বাসেই সব** ফাঁক।

শ্রীশ্রীরামদাস কথামৃত

১৩৫৫ সাল জ্যৈষ্ঠ মাস পোস্তার রাজবাড়ী
কলিকাতা। সকাল ৭টা

সিদ্ধ প্রসঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : সিদ্ধপুরুষরাও সাধারণ লোকের মত লোভ কামনা ও ক্রোধের বশ হ'য়েছেন শুনেছি, এটা কি রকম ?

বাবাজী ম'শায় : তোমাদের কবিরাজিতে সিদ্ধ মকরধ্বজের কথা আছে। কিন্তু তাই ব'লে কি তা দিয়ে প্রলেপ দাও না পাচন কর ? যিনি যে কর্ম্মে সিদ্ধ তাতেই তাঁর কাজ, আর যিনি যে 'ভাবে' সিদ্ধ সেই 'ভাবেই' তাঁর প্রাপ্তি। অনন্ত ভাব অনন্ত কর্ম্ম।

তোমরা মনে কর সিদ্ধ-পুরুষ মানে 'সব ভাবে 'সব কাজেই' তিনি সিদ্ধ, তা হয় না। জীব যে তিনি। কেউ পথ চলায় সিদ্ধ কেউ লেখা পড়ায় সিদ্ধ, কেউ বা মোট বওয়ায় সিদ্ধ। তাঁর কাছে অন্যটি খুঁজ্‌তে গেলেই বিড়ম্বনায় প'ড়বে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! অনেক সিদ্ধ-পুরষ অধর্ম্মের কাজ করেন এও তো শুনেছি !

বাবাজী ম'শায় : ভগবৎ সম্পর্ক শূন্য কাজে আর ভাবে সিদ্ধ হ'লে ধার্ম্মিক হবেনই তিনি, এমন মনে কর কেন ? শ্মশানে ব'সে অনেকে ভূতপ্রেত সিদ্ধ হন, তাঁদের কাছে ধর্ম্মের কি পাবে ?

সকল ধর্ম্মের মূল শ্রীভগবান। তাঁর ভাবে তাঁর কাজে যিনি সিদ্ধ হবেন, তাঁর কাছে যেও তা'হলে আর ওসব বলা আস্‌বে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' বাবা! লোকে বলে এটি হোল সিদ্ধ-পুরুষের কথা, তা কথা তো কথাই, তাতে আবার সিদ্ধ-পুরুষের কি আছে?

বাবজী ম'শায়ঃ তোমরা যখন পড়াশুনা কর, তখন একটা আলোর দরকার হয়, তা সে সূর্য্যের আলোই হোক আর না হয় তেলের আলো, কিন্তু আলো চাই। অন্ধকারে কি দেখতে পাও? সাধুদের পড়াশুনাতেও আলো লাগে, সে আলো তাঁর আলো। যাতে তাঁর আলো পড়েনা তাকে তাঁরা বলে অন্ধকার, তখন কোনও কথা তাঁরা প'ড়তেও পারেন না আর কাউকে সে কথা ব'ল্‌তেও পারেন না। সেই জন্যেই সাধারণের কথা আর সিদ্ধপুরুষের কথায় তফাৎ থাকে। তাঁদের আচরণও আলাদা, অন্তরে যখন তাঁদের প্রেরণা আসে, তখন তাঁরা শ্রীভগবানের পেছনে থেকে কাজ করে যান। তাঁদের চলা-ফেরা কথা কওয়া দেখা শোনা সবেতেই তাঁর আলো না এলে তাঁরা অন্ধের মত বোবা-কালার মত থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' বাবা! সিদ্ধ-পুরুষেরা অনেক সময় নিজেকে গোপন করে রাখেন, চিন্‌বো কেমন ক'রে?

বাবাজী ম'শায়ঃ দ্যাখো কৃপণ ধনী দেখেছ? এই এত টুকু ছোট্ট কাপড় পরেন, জলছড়া দিয়ে রান্না করিয়ে খান, লোকের কাছে দীন দরিদ্রের মত থাকেন, কথায় কথায় নিজেকে সামান্য মানুষ ব'লে পরিচয় দেন, কিন্তু লোকে তাঁকে ধ'রে ফেলে; লোকে জান্‌তে পারে ইনি মস্ত ধনী। তাঁর শরীরে মনে এমন একটা লাবণ্য বের হয় যাতে লোকে সহজেই জান্‌তে পারে ইনি ধনী। তা হোলে বোঝে, প্রাকৃত সম্পদ্ পেয়েও যদি তাকে

গোপন ক'রতে না পারে তাহ'লে অপ্রাকৃত পরমার্থ সম্পদ পেলে কেউ গোপন ক'রতে পারে কি? তাঁর সব সময় 'ধৈর্য্য' 'বিনয়' 'মিত্রতা, 'করুণা' এগুলি আপনি আপনি প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। ও গুলি যে তাঁর জিনিষ, কৃপা ক'রে তিনি তাঁকে দিয়েছেন। গোপন করা যাবে না তো।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা! এমন সব কথা শুনেছি যে মনে হয়, যেন সাধু মহাপুরুষরা কথার ঠিক রাখতে পারেন না। কাউকে বল্লেন অমুক সময় তোমার ওখানে যাব, কিন্তু ঠিক্ সময়ে যেতে পারলেন না, কিম্বা গেলেনই না, তাতে কি মনে করা চলে সাধুরা বেভুল হন?

বাবাজী ম'শাই ঃ (হাসিতে হাসিতে) ও কথা ব'ল্‌লে তাঁর ওপর দোষ দৃষ্টি করা হয়, অমন ভাবতে নাই। সাধুদের জীবন শ্রীভগবানে অর্পিত। কাউকে কথা দেবার আগে ওঁরা ওপর থেকে প্রেরণা পেয়েই তবে কথা দেন, তা হ'লে বেভুল হবেন কেন? তিনিই তো তাঁকে নিয়ে যাবেন, তাঁর ছটি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে একটি ঐশ্বর্য্য হোলো "সমগ্র বীর্যশক্তি"। তা হোলেই বোঝো বীর্যবান না হ'লে মেধাবী হয় না। এরাজ্যের (সাধন রাজ্যের) গোড়ার ভিৎ হোলো ব্রহ্মচর্য। ওটি তাঁর ঐশ্বর্য্য; যিনি সে ঐশ্বর্যে ধনী তিনি বেভুল হবেন কেন?

সাধন প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা! সাধন ভজন করবার সময় রিপুগুলির তাড়না কি বাড়ে? শুনেছি সে তাড়নায় অনেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে যান।

বাবাজী ম'শায় ঃ ছটি রিপুর কোনটি কম কোনটি বেশী নয় সব কটিই সমান। ওদের উৎপাতে ভিৎ আর ইমারত (দেহ মন কর্ম্ম ইত্যাদি) সবই ঝাঁঝরা হয়। তবে গোড়ারটিতে ভিৎ যায়, তাই অত সাবধান হওয়ার কথা। বাকীগুলিতে দেওয়াল কাঠাম সব নষ্ট হয়।

মনে কর তুমি যে বাড়ীতে আছ সে বাড়ীতে যদি তোমার আপন জন কি গুরুজন বন্ধু বান্ধব কি চাকর বাকর কেউ আসেন তুমি কি ক'রবে ? সে যেমন লোক তার জন্যে তোমার ঘরটিতে তেমনি থাকার ব্যবস্থা করবে তো ? কারও জন্যে সাদা সিদে, কারও জন্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তারপর তিনি এসে কি তোমার ঘরে উপদ্রব ক'রবেন ? যদি করেন, তা হ'লে কি ভাববে ? নিশ্চয় ইনি তিনি নন অন্য কেউ এসেছেন ! তেমনি তোমার এই দেহ মনের ভেতরে যিনি আসবেন তাঁর থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থা আগে কর।

তিনি কল্যাণময়, সব সময় কল্যাণ ক'রছেন, 'নাম' করলে কি তিনি এসে উপদ্রব ক'রবেন ? কখনই নয়। 'নাম' 'নামী' যে অভিন্ন, তাঁকে এ ঘরে রাখতে হ'লে, তেমনি পরিষ্কার, পবিত্র রাখ, তবেতো।

'প্রসাদ' 'চরণামৃত খাও, 'সাধুসঙ্গে সৎ প্রসঙ্গে থাক' নাম কর। কিসের তোমার রিপুর তাড়না ? তবুও যদি তাড়না দেখ তবে জানবে তাঁকে আননি, তাঁর বদলে অভিমান গৌরব, প্রতিষ্ঠা, লাভ, পূজা এঁরা এসেছেন, ওঁদের স্বভাব ওঁরা ক'রছেন। শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হও, অকপটে তাঁকে জানাও সব ঠিক হ'য়ে যাবে। যদি বল রিপুগুলির স্বভাবই হোলো তারা সইতে পারে না উপদ্রব করে, কিন্তু তার

আগমনে "শুনিয়া গোবিন্দ রব আপনি পলাবে সব". শরণাগতবৎসল প্রভু 'নাম' রূপে আসার সঙ্গে সঙ্গে করুণা মেঘের বর্ষণে সব শান্ত হ'য়ে যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! সাধনার জন্যে কি একটা নির্দ্দিষ্ট ঘর, বিশেষ আসন, বিশেষ নিয়ম করা একটা সময়ের দরকার হয় ?

বাবাজী ম'শায় : তোমাদের ব্যবহার রাজ্যে ওই কথাই বটে। চিকিৎসক বৈজ্ঞানিক এঁদেরও তাই, তবে কথা কি জান ; এবার প্রভুর বড় করুণা। "খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়। দেশ দেশ কাল নিয়ম নাই সর্ব সিদ্ধি হয়" মহৎ কৃপা হ'লে সর্বত্রই তাঁদের ঠাঁই, সব কালই তাঁদের কাল। তবে যে দেখ ওটি আহ্নিকের ঘর, ওটি পূজা অর্চার ঘর, এ হোলো ব্যবহার রাজ্যের অভ্যাস। আর দেহ মনেও অনেকের লুকায় না, একটু নির্জন নিঃসঙ্গ না হ'লে সাম্‌লান যায় না। কলির অন্নগত মন-প্রাণ অল্পেতেই চঞ্চল হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! আপনি বলেন সৎসঙ্গে থাক্‌লে, আর প্রসাদ চরণামৃত খেলে রিপুর বল কমে যায়, কিন্তু এমন অনেক সময় হয় যে সে অবস্থাতেও শরীর বিকৃত হয়ে পড়ে তখন উপায় কি ?

বাবাজী ম'শায় : 'বন্ধু' (শ্রীজগদ্বন্ধু) ব'লতো ! জপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে স্নায়ুগুলি নিস্তেজ হয়ে থাকে একটু ফাঁক পেলেই তাদের প্রকোপ বাড়ে তখন সেখানে থেকে সরে গিয়ে বেশ ক'রে স্নান ক'র্‌বি, যদি না পারিস দৌড়বি, ক্লান্ত হলেই তারাও ক্লান্ত হবে। যার শরীরে দৌড়ান সয়না সে বেড়াবে। ব্রজে থাক্‌তে মাঝে মাঝে ওমনি ক'রতে হোতো। যমুনায় ডুবে আস্‌তুম।

---

* শ্রীজগদ্বন্ধু প্রভু

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! ওতে হোলো গোড়ার রিপুর কথা. বাকী-গুলির কি ব্যবস্থা ?

বাবাজী ম'শায় : 'বন্ধু' ব'ল্‌তো আয়নায় মুখ দেখ্‌বি, তা হোলেই ক্রোধ সরে যাবে। লোভ এলে খুব তেতো রস খাবি। তখন ছত্রিশগড়ের বাড়ীতে থাকি, ছু'বেলা ছু'গ্লাস শিউলি পাতার রস খেয়েছি। মোহ এলে ঠাঁই নাড়া হবি। অহঙ্কার হ'লে উপোস করবি, পরের উপর কটাক্ষ বুদ্ধি (মাৎসর্য) এলে নিজের দোষ ভাববি। এ সব ছিল তার উপদেশ (শ্রীজগদ্বন্ধুর উপদেশ)। 'ন' মাস ব্রজে থাকার সময় সে কাছে ছিল তিন মাস। হাতে কলমে বুঝিয়ে দিয়েছে। তবে নাম ক'রলে এসবের অনুষ্ঠানের বিশেষ দরকার হয় না। শ্রীগুরুর আনুগত্যে নাম ক'রতে হয়। অনেক ঝড়ঝাপ্‌টা তিনিই সহ্য করেন **কৃপায় আসা কিনা তাঁর**।

আনুগত্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! শ্রীগুরুর আনুগত্য আমরা মুখেই বলি' আর কিছু লিখে শেষের পংক্তিতে লিখি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত অমুক। সত্যি সত্যি কি সম্ভব ?

বাবাজী ম'শায় : ভাল মাটীতে বীজ পড়লে গাছ হয়, তারপর জল বাতাসে ধীরে ধীরে সে গাছ বড় হয় ফুল ফল ধরে। এও তেমনি, তাঁর দেওয়া বীজ শুদ্ধ ক্ষেত্রে প'ড়লে পরেই সব আপনা আপনি হবেই, 'নাম' 'মন্ত্রের' কাজও তো সোজা নয়। তিনিও চুপ্‌ ক'রে থাক্‌বেন না। বটের বীজ কাকেই খাক আর কেউ গিলেই ফেলুক্‌ হজম করবার নয়। একটু ফাটল

পেলেই হোলো, বীজের শক্তি দেখাবেই সে। তবে অল্প দিনেই গাছ আর ছায়া চাও তো তেমনি করে লাগাও, নইলে হবে বটে, কিন্তু দেরী হবে। আনুগত্য তো তাই।

সব ছেড়ে ঝাঁপ দেওয়া।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা! আনুগত্য লাভ তো অল্প ভাগ্যে হয় না, যদি হয় তবে আবার সেও চাপা পড়ে যায় অনেকের, কেন এমন হয় বাবা?

বাবাজী ম'শায় ঃ হ্যাঁ তাও হয়। স্বজাতি সঙ্গের অভাবে সেটী চাপা প'ড়ে যায়, (এখানে স্বজাতির অর্থ অনুকূল সঙ্গ) ওতে বড় অনিষ্ট ঘটে; প্রতিকূল সঙ্গের তুফান খুব জোরে যখন আসে তখন তার ভেতর কি আছে নজরে ঠেকে না, কিন্তু দুদিন পরে জোয়ার চ'লে গেলেই দেখে মাঠে প'ড়ে আছে। এও তেমনি, হঠাৎ একটি সঙ্গ লাভ হোলো আর তার আকর্ষণ এসে নিজের সামান্য কিছুও যা ছিল সব চাপা প'ড়ে গেল, শেষটায় 'হা হুতাশ'।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ! বাবা! এমন তো হয় যে জ্ঞানত প্রতিকূল সঙ্গ করিনা কিন্তু ধীরে ধীরে প্রথমকার মনের অবস্থা আর থাকে না, এ কেন হয়?

বাবাজী ম'শায় ঃ তোমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে আছে বোধ হয় যে, আহার গা ছোঁয়া, নিঃশ্বাস, অপরের কাপড় চোপড় পরা, অন্যের সঙ্গে বসে গল্প, এসবের ভেতর দিয়ে তার মনোভাব গুলি ধীরে ধীরে তোমার মনে প্রভাব আনে। তারপর তার মনোভাব যত বেশী হবে তুমিও তার ভাবে ডুবে যাবে, শেষটায় লাভে মূলে সব যায়। এমন কথাও আছে, যে কাছে বসা দূরে থাক্

চোখে চোখেও মনোভাব ছড়িয়ে পড়ে। খুব সাবধান।
কিন্তু কবিরাজ ব'লেছেন (শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ)—
'নিঃসঙ্গ হইয়া সঙ্গ বিনা না জুয়ায়।'

সঙ্গ চাই বই কি, নইলে ইষ্টবস্তুর মার্জ্জন মনন হবে কি ক'রে কিন্তু আপন মরমী জনের সঙ্গ চাই। গোস্বামীরা শ্রীকুণ্ডের তীরে ব'সে ইষ্ট গোষ্ঠী ক'রতেন। ওঁদের মনে যখন যা ভাব আস্‌তো এক জায়গায় ব'সে সেগুলি প্রকাশ ক'রতেন, আবার সেইগুলিকে মার্জ্জনা ক'রতেন, এক অনুভূতির সঙ্গে মিল হ'য়ে গেলেই সেইটি তাঁদেয় সিদ্ধান্ত হোতো। তারপর স্মরণ মনন ক'রতেন। সঙ্গ চাই, কিন্তু ওই তার ধারা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা! অনুকূল সঙ্গে থাক্‌লে কি আনুগত্যের পথে আর বাধা আসেই না ?

বাবাজী ম'শায় ঃ হ্যাঁ তাতেও আসে। সঙ্গে যিনি আছেন 'অভিমান' তাঁর উপদ্রব বড্ডো। তিনি এসে ঘাড়ে চাপ্‌লে আর কথাই নাই, একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যায়। 'সাধুসঙ্গ' 'প্রভুর আনুগত্য' সব ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় হাজির করে। সাধে কি তাঁদের দৃষ্টি 'তৃণাদপি'। এ 'অভিমান' এমন বিষম ভূত যে, গুরু শিষ্য ব'লে কোন কথা নেই। পথ ঘোরাল করে দেয়। গুরুর আসনে ব'সে শিষ্যকে শাসন ক'র্‌তে গেলেও তৃণাদপি যাজন থাকে না। এ রাজ্যের বড় সূক্ষ্ম দৃষ্টি। এ অভিমান এলেই দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ আস্‌বে। তখন আসবে পরিণাম-দর্শিতা তারপর 'সুখ' 'দুখ'। শেষটায় সব চ্যুত। বোঝো তা হ'লে। ইষ্ট সেবাই কর আর শ্রীগুরুচরণেই থাক 'অভিমান' এলেই সর্ব্বনাশ। অভিমান এসেই আগে তোমায় "আমি" বুদ্ধি আনিয়ে দেবে, তারপর প্রভুর বাইরের দ্বারে ঐ যে

দাঁড়িয়ে আছেন মায়াদেবী, তাঁর কবলে প'ড়তে হবে। সে কবলে গেলেই তাঁর বৈভব দেখে সব ভুল হ'য়ে যাবে; শেষটায় ভ্রমণ। আবার কোন কালে যদি মহতের কৃপা হয়; তবে, তাও প্রভুর ইচ্ছায়। অনুকূল সঙ্গে থেকেও রেহাই নাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা! এঁর অনুকূল সঙ্গ লাভ হ'য়েছে এমনটি কি ক'রে বুঝ্‌বো?

বাবাজী ম'শায় ঃ তাঁর স্বভাব হবে সবাই যোগ্য আমিই কেবল অযোগ্য সবারই জন্য প্রভু মুক্তদ্বার করে দিয়েছেন আমারই জন্যে সংসারের যত বিধি নিষেধ। **এইটি যাঁতে দেখবে তিনিই তোমার অনুকূল সঙ্গ।**

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা ঃ এমন অনুকূল সঙ্গ পাব কি ক'রে?

বাবাজী ম'শায় ঃ সেখানে হুমড়ি খেয়ে প'ড়লেই তিনিই অনুকূল সঙ্গ জুটিয়ে দেবেন। যাঁরা তাঁর লীলা, তার গুণ গেয়ে কাটান, গ্রাম্য প্রশ্ন স্বপ্নেও করেন না তাঁদের সঙ্গ লাভ কি অল্প ভাগ্যে হয়, তাঁর কাছে জানাও তিনিই এনে দেবেন সঙ্গ। (হাসিতে হাসিতে) এখনকার ভাষা সত্যাগ্রহ। তেমনি করে-খাঁটি-আগ্রহ জানাও, 'প্রভু আমার বিরুদ্ধ ভাবটি বদ্‌লে দাও। আমার আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা আর কোরোনা'। নিশ্চয় তিনি অনুকূল সঙ্গ এনে দেবেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা! আমার অনুকূল সঙ্গ লাভ হ'চ্ছে এমনটি বুঝ্‌ব কি ক'রে?

বাবাজী ম'শায় ঃ জীবনের ধারাটিই তোমার বদ্‌লে যাবে। কি ছিলে

কি কর্‌ছিলে আর এখন কি ঘট্‌চে এটি মনে পড়্‌বে। সঙ্গ লাভ বড় কঠিন। এক সময় চারু গিছলো সচ্চিদানন্দস্বামীর কাছে তিনি ব'লেছিলেন 'কার সঙ্গ কর'। সে ব'ল্লে আজ্ঞে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গলাভ করি। তিনি তো তখুনি গড়গড় ক'রে জিগ্যেস ক'র্‌লেন, কি বল্লে? বাবাজী মহাশয়ের? ঠিক তো? চারু তো ভয়ে জড়সড় হ'য়ে বল্লে, 'আজ্ঞে না, সঙ্গ করি না, তবে তাঁর কাছে যাতায়াত করি।' স্বামীজী ব'ল্লেন হ্যাঁ তাই বল যে, যাতায়াত করি। সঙ্গ হয় না। সাধু সঙ্গ তো (লাভ) এত সোজা নয়। জীবনের চল্‌তি ধারাটি একেবারে বদ্‌লে যাবে!

সাধন ও সম্পদ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা! শাস্ত্র বলেন শ্রীহরি ভজনে দু'টি পথ একটি বিধির একটি অনুরাগের। এর উদ্দেশ্য কি?

বাবাজী ম'শায়: 'বিধি' হোলো নিজের জন্যে আর অনুরাগ হোলো তাঁর সুখের জন্যে। দেহে যাঁরা আছেন (ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) তাঁদের কাছে তো নিজেকে সমর্পণ করেছো অনেকদিন, তাদিকে বশে না আনতে পার্‌লে তাঁর সুখ বুঝ্‌বে কি ক'রে? তাই ওঁদিকে (ইন্দ্রিয় গুলিকে) তাঁর সেবার পথে আন্‌বার জন্যে (ইন্দ্রিয় দমনের জন্যে) ওই পথ (বিধির পথ) ওটি হোয়ে গেলে আর দেহের দিকে খেয়ালই থাকবে না। তবে কোন ভাগ্য ফলে যদি ওটি এসে প'ড়ে (ভগবদ্‌ অনুরাগ)

তা হ'লে তাঁকে আর কিছু ভাবতেই হবে না। কোটিতে গুটিক হয়। তাই তাঁরা ব'লেছেন আগে বিধির পথই দরকার। নইলে এত দিন যে ওঁরা দেহে বাস ক'র্‌ছেন, তাঁরা নানা রকমে বাধা সৃষ্টি করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা! বৈষ্ণবের সাধন রাজ্যে চৌষট্টি প্রকার অপরাধের কথা আছে! এসব বাঁচিয়ে চলা কি সোজা? এযেন ব্যাকরণ শাস্ত্র, একটু এদিক ওদিক হোলেই ব্যাকরণ ভুল, আর তার পরই তাকে বলে অপণ্ডিত। তাই বল্‌ছিলাম

—সাধন সম্পত্তি রক্ষার উপায় কি?

বাবাজী ম'শায় ঃ ওতো হোলো পরের কথা। আগে দু'টি শত্রুর কাছ থেকে রক্ষা কর্‌তে হবে, একটি ঘরে, একটি বাইরে। ঘরেরটি হ'লেন 'অভিমান'। ইনি বিষম চিজ, আমি 'নাম' করি। আমি 'পণ্ডিত'। আমার শাস্ত্রব্যাখ্যাশুনেঅনেকে সুখী হন। এ হোলো ঘরের শত্রুর ভাষা, 'প্রভুর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দেয়'। তারপর হোলো বাইরের শত্রু। অসাধু হয়ে সাধুর বেশ ধরে আসেন। ঠাকুর মশাই ব'লেছেন—"এ ভাই বড়ই বিষম কলিকাল! গরলে কলস ভরি মুখে তার দুগ্ধ পূরি তৈছে দেখ সকলি বিটাল। "ভকতের ভেক ধরে, সাধু পথ নিন্দা করে, গুরু-দ্রোহী সে বড় পাপিষ্ঠ"।

—এর কাছে রেহাই পাওয়া বড় শক্ত। বড় বড় মহাপুরুষও এঁদের পাল্লায়প'ড়েনাজেহাল হন। **সাধুবেশী অসাধুর সঙ্গে পড়লে ভয়ানক ক্ষতি।** মহাবীর (হনুমান) দেখলেন প্রভুযুগলকে রক্ষা করার ভার তাঁর ওপর দিয়েছেন। তিনি ল্যাজের কুণ্ডলী পাকিয়ে গড় তৈরী ক'রে তার মধ্যে তাঁদিকে (রাম লক্ষ্মণকে) রাখ্‌লেন, আর নিজে পাহারা দিতে

লাগিলেন। সর্ব্বদাই সাবধান হ'য়ে আছেন, কখন কোন্ ছলে মহীরাবণ এসে পড়ে। এদিকে মহীরাবণ তো নানা পথ খুঁজ্‌ছেন কখনও আস্‌ছেন কৌশল্যার বেশ ধ'রে ; কখনও আস্‌ছেন দশরথের বেশ ধরে, কখনও বা ভরতের, কখনও বা জনক রাজার, কিন্তু মহাবীর কেবলই জোড়হাত ক'রে তাঁদের কাছে জানাচ্ছেন,—আপনি অপেক্ষা করুন এক্ষুণি মহারাজ বিভীষণ আস্‌বেন, এলেই দরজা ছেড়ে দোবো।

মহীরাবণ দেখ্‌লেন হনূমানকে তো কিছুতেই ভোলান যাচ্ছেনা। তখন ভাব্‌লেন কি করা যায়। তাঁর মনে প'ড়ে গেল, হনূমান কেবলই বল্‌ছেন "বিভীষণ" এলেই দরজা ছেড়ে দোবো, আচ্ছা বিভীষণের রূপ ধ'রে যাই একবার। তাই ক'র্‌লেন, একটু পরেই বিভীষণের রূপ ধ'রে এলেন। হনূমান তো তাঁকে দেখে একটু বিস্মিত হলেন। ইনি খাঁটি খাঁটি বিভীষণ বটেন তো ? কিন্তু তাঁর আর পরীক্ষা করার অবসরই হোলো না, সেই বিভীষণরূপী মহীরাবণ এসেই বল্লেন, মহাবীর! দরজা দাও ; একবার রাম লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে একটা কথা ব'লে আসি, তাঁরা যেন সাবধানে থাকেন ; আমার বেশ ধ'রে মহীরাবণও আস্‌তে পারে। তাঁদের শিরে আমি রক্ষা কবচ বেঁধে দিয়ে আসি।

হনূমান আর ঠিক ক'র্‌তে পার্‌লেন না, 'মায়াবীর' কথায় ভুলে গেলেন, দিলেন দরজা ছেড়ে। মহীরাবণ তখন টুক ক'রে ভেতরে ঢুকেই রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে পাতালে প্রবেশ ক'র্‌লেন। তাঁরা তখন ঘুমিয়ে ছিলেন।

দেখ্‌লে তো ? মায়াবীর ছল, শেষে যখন কিছুতেই পারে না, তখন ভক্তের বেশ ধ'রে আসে, ভক্তের মত কথা কয়, ভক্তের মত ব্যবহার করে। এরাজ্যে ওই

হোলো বাইরের শত্রু, ওদের সঙ্গ থেকে রেহাই পেতে হোলে সর্বদা 'নামের বেড়া' দিয়ে গড় প্রস্তুত ক'রে রাখ্‌তে হয়। আর তাঁকে জাগিয়ে রাখ্‌তে হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' বাবা! হনূমান তো ভুলে গেলেন, তিনি জীব, তাঁর পক্ষে হয়তো কপট মায়া বোঝা সম্ভব হয়নি, কিন্তু রাম লক্ষ্মণ তো ভগবান্ তাঁরা জানতে পারলেন না কেন?

বাবাজী ম'শায় ঃ ঐ যে কথা তাছে তাঁরা তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। 'নরলীলা' কিনা? সবই মানুষের মত, জেগে থাক্‌লে তো হোতো না।—

দেখ্‌ছো না কৃষ্ণ বলরাম তো বৃন্দাবনে খেলা কর্‌ছিলেন, আর সেই সময় এক অসুর এলো সেখানে, ব্রজের বালকের রূপ ধ'রে। ঠিক্ ব্রজবাসী বালক। দু'পক্ষে খেলা হ'চ্ছিলো তখন (ভাণ্ডীর বটের কাছে)। বালকবেশী অসুরটি গিয়ে ব'ল্লে—যে হেরে যাবে সে কাঁধে নিয়ে ঐ বটতলা পর্য্যন্ত যাবে। তাতে কৃষ্ণ বলরাম রাজী হোলেন। অসুরটি তো ইচ্ছে করেই হেরে গেল। ওমনি কৃষ্ণকে কাঁধে নিয়ে দে ছুট্, যখন বটতলা পেরিয়ে যাচ্ছে, তখনই তিনি বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে তাকে শেষ কর্‌লেন। ঠিক নরলীলা। ওই জন্যে তো কথা, **নামের বেড়া দাও আর নামীকে জাগিয়ে রাখ। নইলে তোমার চিত্ত থেকে নামীকে নিয়ে মায়াবী পালিয়ে যাবে।** ভক্তের বেশ ধ'রে এসে মায়াবীরা কত কথাই বলে, এ কর্‌তে হবে, তা ক'র্‌তে হবে, কিন্তু কোন দিকে নজর দিলে হবে না, নামের গড়ে নামীকে জাগিয়ে রাখ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! আপনি ব'ল্লেন ঘরের শত্রু অভিমান,—তার জন্ম কি ক'রে হয় বাবা ?

বাবাজী ম'শায় : (হাসিতে হাসিতে) উনি হ'লেন রক্তবীজের বংশ। ওঁর মা বাবার দরকার হয় না। নানা রকমে ওঁর উৎপত্তি। অনেক টাকা থাক্‌লে ওঁর জন্ম হয়, আবার অনেক বেশী বিদ্যা থাক্‌লেও অভিমানের আগমন হয়। এসব অভিমান তো কালে কালে সরে পড়েন কিন্তু আরও যাঁরা আছেন তাঁরা বড় সাংঘাতিক। ধন দৌলত বিদ্যাবুদ্ধির রূপের সঙ্গে তাঁদের রূপ ঠিক উল্টো। এঁদের হাত থেকে এড়ান বিষম ঠেলা ; যাঁদের ধনদৌলত নেই, তাদের মনের অভিমান বড় লোকেরা নিশ্চয় আমাদিগকে ঘৃণা করেন। আবার যাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি কম, তাঁরা ভাবেন বিদ্বানরা আমাদিগকে মুক্‌খু ব'লে অগ্রাহ্য করে। যারা ঘোর সংসারী তারা ভাবে বৈরাগী সাধুরা আমাদিগকে ঘৃণা করেন। এসব হোলো গূঢ় অভিমান. তারপর আছে অন্তগূঢ় অভিমান. তাঁকে এঁরা (বৈষ্ণবগণ) বলেন 'বৈষ্ণবী মায়া'। তিনি এলে বেঁধে মার। আমি গুরুর আসনে ব'সে আছি, আমাকে গুরুদেব মহন্ত ক'রে রেখে গেছেন, আমাকেই তিনি এসব দিয়ে গেছেন। এসব রক্ষা না ক'রলে কে ক'রবে, ওরা সব তাঁর ইচ্ছা ঠিক ঠিক পালন ক'রছে না. আমার আচরণই তাঁর অভিমত, এসব হোলো বৈষ্ণবী মায়া। ঘরের শত্রু অভিমান, এর সঙ্গে মিশলে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বে তার কি ঠিক আছে ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : 'বাবা ! শ্রীগুরুর কৃপায় কি এ অভিমান যায় না ?

বাবাজী ম'শায় : তাতে আর সন্দেহ কি ? ওগুলি আমার ঘুচুক ব'লে

তাঁর শরণাপন্ন না হ'লে তিনি কৃপা ক'রলেও হৃদয়ে ব'স্‌বে না। পতিত পাবনের ওপরও তো ভরসা নাই, বাইরে কেবল মুখের কথায় পতিত ব'লে জানালে কি হবে? পতিতের স্বভাব না এলে পতিত পাবন কি ক'রবেন। একটি গান মনে পড়লো—

'পতিত পাবন নাম শুনেছ মন ; তাতে তোমার ভর্‌সা কিসে
তুমি যে মন অভিমানের মঞ্চোপরি আছ ব'সে ॥
মুখে পতিত সবাই বলে, কু-রঙ্গে মাতিয়া চলে,
মুখের কথায় কি জগৎ ভোলে,
(তিনি করুণা করেন না কপট বেশে।
মুখে গৌর তোমার হলাম,
স্বমুখে বিষয়ের গোলাম,
সাধু সেজে লোক ঠকালাম,
সবার মজুরী তার নয়নে ভাসে ॥
কিশোর কয় ছাড় কপটতা,
পতিত বলা তোমার মিছে কথা,
সাধু গুরুর পদে বিকিয়ে মাথা,
পড়ে থাক্‌, যদি তর্‌বি শেষে ॥

তিনি তো জান্‌তে পারছেন এ পতিত কি না। ওই যে ব্রজ-বালক বেশী অসুরের কথা। আরে তুই তো এলি ব্রজের বালকের বেশে, কিন্তু তোর অন্তরে যে অসুর বসে আছে। তার কাছে লুকুবি কি ক'রে? অভিমানী কি দয়ার পাত্র হয়? সে তখন নিগ্রহের পাত্র। তোমরা অমনি চেঁচাবে এত ভজন সাধন করলুম কিন্তু তাঁর দয়া আর হোলো না। সে কি গো? তাঁর

দয়া হোলো না কি কথা? কাকে তবে দয়া করবেন তিনি অসুরকে দয়া ক'রলে যে অসুরটিই বাড়বে! তাই অসুরের পতন হয়। সাপকে দুধ খাওয়ালে যে তার বিষকেই বাড়ান হয়। **তোমার ভেতর যিনি আছেন তিনি কে, তাই দেখ আগে।**

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা! মহাপুরুষরা দয়া করলে কি সেই সাপেরমত অসুরের মত দুর্বৃত্ত অভিমান কি মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর হয় না?

বাবাজী ম'শায়: হয় না আবার! হয় বৈ কি! কিন্তু তিনি নিজের আট ঘাট বেঁধে করেন।—

অসুরকে দয়া ক'রতে গিয়ে নিজের বিপদ্‌তো কম আসেনা, সে বিপদে যখন তিনি ভোগেন তখন প্রভুর কাছেও জানাবার আর পথ থাকেনা। প্রভু বলেন—কেন তুমি যে "আমি" অভিমানে ওকে দয়া ক'র্‌তে গেলে এখন আবার আমায় ডাক কেন? দয়ায় গোড়ার কথা কি 'আমি' অভিমান? **দয়ার গোড়ার কথা ভগবৎ স্মরণ; প্রভুর কাছে প্রার্থনা, আমি অভিমান ক'র্‌লেই দুজনের বিপদ্‌।** কাজ কি বাবা! তাই সাধু মহাপুরুষরা কাউকে "আমি" অভিমানে দয়া করেন না: সবই তাঁর কাছে জানান দেওয়া মাত্র। দয়া করার ফলে কারুর বিপদ্ হয়, কারুর বা ব্যাধি হয়, কেউবা অসামাজিক কিছু ক'রে বসেন, পতনতো হাতের কাছেই আছে। এ হোলো সরকারী রাজ্য, থানার দারোগা থেকে পুলিসের কড় কর্ত্তা পর্য্যন্ত সকলেই অপরাধীকে ইচ্ছা কর্‌লে মুক্তি দিতে পারেন কিন্তু তাতে রাজ্যও থাকে না অপরাধীও শোধরায় না, তাই তাঁরা ওপর ওয়ালাকে জানান মাত্র। নিজে কর্ত্তা সেজে কিছু ক'র্‌তে গেলেই ওপর ওয়ালার চাপ।

সকলের ওপর যিনি তিনি সব পারেন. তবুও তাঁকে ভাবতে হয়, আর পাঁচজনের মুখ চেয়ে, তাঁকে নিরপেক্ষ হ'তে হবে। ব্যবহার রাজ্যের নমুনা দেখেই সাধন রাজ্যের হিসেব ঠিক ক'রতে হয়।

———

স্বতন্ত্রতার আরও রূপ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা! বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ওপর লোকে একটি কটাক্ষ ক'রে বলে যে বৈষ্ণবগণ কর্ম্মী জ্ঞানীদিগকে বড় পৃথক পৃথক ভাবে দেখেন।

বাবাজী ম'শায় ঃ হ্যাঁ, ভেতরেব কথাটি তাঁদের কাছে পরিষ্কার হয় না বলেই একটু গোলমালে পড়ে যান। পাখীর ছানা দেখেছ? তারা যখন খুব কচি, ডানা পালক ওঠেই নি হয়তো, তাদিকে বাসায় রেখে তাদের মা ভোরে উঠে আহার খুজ্‌তে খুব দূরে চলে যায়; বাচ্চাটি অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে আবার জেগে উঠে মাকে দেখতে না পেয়ে খোজে কিচি মিচি করে চেঁচায়, শেষটায় খিদে পায়, তখন মা মা ক'রে খুব ডাকে, ডেকে ডেকে ক্লান্ত হ'য়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জাগে, তারপর প্রাণপণে আবার ডাকে। দিনের শেষে মা আসে অমনি আকুলি বিকুলি ক'রে মায়ের মুখের কাছে ঠোঁট নেড়ে কত অভিমান জানায়। এই যে এমনি করে মাকে ডাকা সে কি সত্যি সত্যি মাকে ডাকা? না তা নয়, আমি অসহায়, মা তুমি এস, আমার খিদে পেয়েছে, ফড়িং টড়িং কি আছে দাও।

ব্যস্ ! যেই পোকা মাকড় পাওয়া অমনি চুপ্ । বুঝলে তো ! **এই হোলো কর্ম্মীর ভগবান ডাকা।** যেই ফল প্রাপ্তি অমনি চুপ্ । আর ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই ।

আর জ্ঞানীর হোলো 'বাছুরের ডাক' । ঘরে বাছুর রেখে মা চলে গেছে । বাছুরতো সারাদিন হাম্বা হাম্বা করে ডাক্‌ছে মুখে খড় কুটোও দেয় না । মা হয়তো ছেলের ডাক শুনে একবার চলে এসেছে, ওমনি মাথা ল্যাজ নেড়ে ফোঁফাতে ফোঁফাতে মায়ের কাছে ছুট্‌লো । মা শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লো । বাছুরটি ওমনি চুক্ চুক্ করে দুধটুকু খেলে, বাস্ আর ডাকে না । জ্ঞানী 'ভক্তরা' 'ভগবান' ভগবান করেন ঠিকই তবে পাখীর ছানার মত নন । পাখীর ছানা মায়ের কাছে অন্য কিছু চায়, পেলেই চুপ । জ্ঞানীরা ভগবানের কাছে অন্য কিছু চায় না, তাঁরই 'সত্ত্বা' চান । বাছুর গাইয়ের কাছে দুধই চায় । সেটুকু পেলেই চুপ্ । মায়ের দুধের মত হোলো 'সার্ষ্টি' সারূপ্য ঐশ্বর্য্য । **ও ভিন্ন অন্য কিছু কাম্য নাই তাঁদের ।**

ভক্তের ধারা তা নয় । তাঁরা হলেন কুলবতী সতীর মত । কত দিন হয়তো স্বামীর দেখা পায়নি, আহার নিদ্রা নাই, দিনরাত তাঁর জন্যে ভাবনা । ভেবে ভেবে শরীর শুকিয়ে গেছে । হঠাৎ স্বামী এসে পড়েছেন । অভিমানও আছে আবার সেবার জন্য ছট্‌ফটানিও আছে ; কোথা রাখি, কোথায় বসাই, কেমন ক'রে খাওয়াই । আর কিছু চাই না, শুধু তোমার সেবা চাই । আহা কত কষ্টে তোমার দিন যাচ্ছে । তোমায় ফেলে রেখে আমার কোন সুখ নাই । স্বামীও দেখেন আমার বিরহে সতীর এই দশা হয়েছে । তিনি নীরবে তাঁর সেবায় বশীভূত হন ।

ভক্তরা ওই সতীর মত। যাঁরা তাঁর স্বামীকে চেয়ে 'আত্মসুখ' চায় তার কাছে থেকে, তাদের সঙ্গ ভক্তরা কর্‌তে চান না। প্রাণে ব্যথা লাগে। ঠাকুর মশাইয়ের তাই ওই পদ—

কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহাকে করিয়া ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা ! সাধকের মধ্যে এমন কথাও শুনেছি যারা কৃষ্ণ নাম করেন না তাঁদিকে ভেক জিহ্বা ব'লে তাঁরা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন, একি রকম ?

বাবাজী ম'শায় ঃ ঠিক্ উপেক্ষা নয় 'আক্ষেপ' করেন বল। ভেক্ জিহ্বা বলাতো আজকের কথা নয়, স্বয়ং ব্যাসের কথা। ব্যাঙের জিভ্ থেকেও নাই কিন্তু ডাকে খুব। তাঁদের মুখে শুনেছি এক সময় নাকি দেবী পার্ব্বতী দেবতাদিকে অভিশাপ দিয়েছেন, তোমাদের পুত্র কন্যা কিছুই হবে না। তাঁরা তো ব্রহ্মার শরণাপন্ন হ'লেন ; ব্রহ্মা বল্লেন দেবীর অভিশাপ তো রদ হবার নয়, কি করি বলুন। তাঁরা তখন বল্লেন এখন উপায় কি ? ব্রহ্মা ব'ল্লেন আপনারা অনুসন্ধান করে দেখুন দেবীর অভিশাপের সময় কোন্ দেবতা সেখানে ছিলেন না। দেবতারা তখন অনুসন্ধান করে জানলেন্। সেখানে অগ্নি দেবতা ছিলেন না। ব্রহ্মা বল্লেন আচ্ছা তবে তাকেই আরাধনা করুন, তাঁর পুত্র হ'লেই আপনাদের দুঃখ দূর হবে। তখন দেবতারা তো ত্রিভুবন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কোথাও অগ্নি দেবতাকে খুজে পেলেন না। ক্লান্ত হয়ে এক সরোবরের তীরে বসে ভাবছেন, এমন সময়, রসাতল থেকে এক ভেক্ উঠে এসে সেই জলের ধারে দাঁড়িয়েছে।

দেবতারা 'তাকে জিগ্‌গেস করলেন—অগ্নি দেবতার সন্ধান জান ? ভেক্ বল্লে, হ্যাঁ জানি। আমার নিবাস রসাতলে কিন্তু অগ্নি দেবতা রসাতলে লুকিয়েছেন। তাঁর তেজে আমি থাকতে পারলাম না ; ওপরে উঠে এসেছি, দেহটাকে জলে ভিজিয়ে নিচ্ছি। ভেকের মুখে সংবাদ শুনে দেবতারা রসাতলে গিয়ে অগ্নির সাক্ষাৎ পেলেন। কাজ উদ্ধারও কর্‌লেন, কিন্তু অগ্নিদেব যখন জানতে পারলেন্ ওই ভেকই আমার সন্ধান দিয়েছে ওমনি অভিশাপ দিলেন 'তোমার রসজ্ঞান আর থাক্‌বেনা,' ভেক্‌তো ভয়ে অস্থির। কিন্তু দেবতারা তাকে অভয় দিয়ে বল্লেন, হে ভেক্ ! অগ্নির শাপে তোমার রসজ্ঞান থাকবে না বটে কিন্তু তোমার মুখে জিহ্বার মত আওয়াজ করার ক্ষমতা থাকবে।

সেই থেকে লোকে বলে 'ভেক্ জিহ্বা'। যে শ্রীভগবানের 'নাম' 'গুণ' মহা মহা মুনি ঋষিরা গান করেন, আর আনন্দে নৃত্য করেন, সেই করুণাময়ের নাম যারা করেন না অথচ সংসারের সব কথাই ওই জিব্ দিয়ে বলেন তাঁদের রসজ্ঞান কোথায় ? তিনিই তো শ্রেষ্ঠ রসময়, তাঁর নাম ও গুণ গাইতেই যত ভিরকুটি ! তাই বৈষ্ণবগণ আক্ষেপ ক'রে বলেন-হায় হায়, তোমার জিহ্বা কেবল ভেকের জিহ্বা। সংসারের আশ পাশ কথা কয়ে কেবল আয়ু নষ্ট কর আর কালসাপকে ডেকে আন !

বৈষ্ণব সমাজে দাস ভাব—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা ! শিক্ষিত সমাজের একাংশে এমনও কথা হয় যে তাঁরা বলেন বৈষ্ণবগণ 'দাস' 'দাস' ক'রে মানুষের মনকে নীচু করে দেন। দাসত্ব মনোবৃত্তিতে উন্নত কাজ হয় না ;

বাবাজী ম'শায় : (অল্প হাসিয়া) 'দাস' কথাটি খুব বড় আদর্শের কথা। **দাসের আদর্শ থাক্‌লে জীবের এত অশান্তি থাক্‌তো না।** সবই দেখতো তাঁর সংসার, আমরা মাত্র সেবক ; 'যারা দান করেন' তাঁরাই দাস। এ রাজ্যের বাঁধন পরা দাসের (চাকর বাকর) স্বভাব দেখে তোমরা বল মন নীচু হ'য়ে যায়। তাকি হয় ? ঠাকুর বৃন্দাবন বলেছেন—

"অল্প করি না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান॥

আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব্ব বন্ধ নাশ।
তবে সেই হইতে পারে **শ্রীকৃষ্ণের দাস**॥

এই বাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজ।
মুক্ত সব লীলাতনু করি কৃষ্ণ ভজে॥

দাস কথার স্মৃতি শ্রীভগবানে। সেই স্মৃতি ভুল হ'য়েই এই বিপত্তি ঘটেছে। **কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হ'লেই ভগবানের দাসত্ব কামনা আসে।** তাঁর দাসত্ব 'মুক্তির' আনন্দের চেয়েও কোটি কোটি গুণে সুখ, সে সুখে যাঁরা সুখী তাঁরাই তো জগৎকে সুখী কর্‌তে পারেন। **হৃদয়ের নিধিকে জগৎবাসীর হৃদয়ে দান কর্‌তে পারলেই তাঁদের দাসত্বের সুখ।** শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য পরম্পরায় এই 'দাস কথার' উৎপত্তি। আজকালতো সেটি আর থাকছেনা। মনে প্রাণে সব মায়ার দাস, সংসারের দাস কিন্তু তাদিকে দাস বল্লেই জ্বালা। আবার ভগবানের দাস বল্লেও বুঝতে পারে না ! খালি তর্ক যুক্তির কচাকচি। ঈশ্বর গুপ্তের একটি কবিতা পড়েছো ?

কাঁচা খাও পাকা খাও তাতে নাহি জ্বালা।
তুমি খাও বলিলেই হয় বড় জ্বালা॥

কলা কাঁচাও খাচ্ছ পাকাও খাচ্ছ, কিন্তু যেই তোমাকে কেউ বল্লে 'কলা খাও' ওমনি তুমি তাকে মারতে গেলে। (বলিয়াই হাসি)

কবিরাজ ব'লেছেন—

'কৃষ্ণ দাস' অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু।
'ব্রহ্মানন্দ' তার আগে নহে এক বিন্দু॥

এ দাসত্ব যারা পছন্দ করেন না তাঁদের মনে 'দাস' কথার বিরুদ্ধ অর্থতো জাগবেই।

বৈষ্ণবের আদর্শ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা! অনেক সময় ভগবান শঙ্করকে বৈষ্ণব প্রধান বলা হয়। এদিকে তাঁকে ভগবানও বলা হয়, আবার বৈষ্ণবও বলা হয়।

বাবাজী ম'শায় ঃ ভগবান নিজেই সেবকের আদর্শ দেখিয়েছেন, তাঁর রূপটি ভাব দেখি। কপালে আছেন সুধাকর আর কণ্ঠে আছেন কালকূট, 'নীলকণ্ঠ' হয়ে বসে আছেন। কারও মধ্যে একটু কিছু গুণ দেখ্‌লেই বৈষ্ণবগণ সেই প্রভুর কৃপা ভেবে

ওমনি মাথায় ধারণ করেন। আর রাশি রাশি দোষ পেলেও কণ্ঠে ঢেকে রাখেন, একটুও বাইরে আস্‌তে দেন না। জগৎ তাহ'লে বিষময় হ'য়ে যাবে। **এইটিই বৈষ্ণবের আদর্শ।**

তাঁর কৃপা না হ'লে সব উল্টে যায়। দেখছো না ওখানে বাল্যলীলায় বসন চুরি খেলা ক'রেছেন আর যায় কোথা? অমনি ঢাক পিটিয়ে তাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে গেয়ে বেড়ায়। তিনি যে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ ক'রেছেন লুকিয়ে থেকে, তা আর বলা হ'চ্ছে না।

তিনি যে এত কথা ক'য়ে জানালেন অর্জ্জুনকে, আমি 'আত্মারাম' 'পূর্ণকাম,' তা আর মুখে আস্‌ছে না, যা আস্‌ছে তা ঠিক উল্টো গোপিকা-লম্পট নন্দনন্দন। কি বলি বল বৈষ্ণবের আদর্শ তো সহজ নয়, তাঁর কৃপায় তিনি নেমে এসে না দেখালে কোন্ আদর্শ ধরে চল্‌বে? প্রভুর তাই ওই রূপ।

উপায় কি?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা! করুণা বশে তো অনেক কথাই শুনিয়েছেন, কিন্তু আমাদের যেন খোলের বোল মুখস্থ করার মত হ'চ্ছে, প্রচুর বোল মুখস্থ করে দেখা গেল হাত সাধা না হওয়ার জন্যে সব বোল বোলই থাক্‌ছে। শ্রীগুরুর উপদেশ জীবনে সাধা হ'চ্ছে না তো? কেবল বোল শেখা হ'চ্ছে।

বাবাজী ম'শায় ঃ (অল্প হাসিয়া) সাধুরা বলেন "হরিষে লাগি রহ রে ভাই" "তেরী বিগড়ী বাতভি বনত্ বনত্ বনি যাই"।

—এতে লেগে থাক্‌তে থাক্‌তে সব বেগড়ানই শুধ্‌রে যাবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা! বেগড়ান কেমন!

বাবাজী ম'শায় ঃ (আবার হাসিয়া) বড় বড় লোকেরা ভাল জাতের ঘোড়া কিনে আনেন, এনে দেখেন এদেশের ঘোড়াদের সঙ্গে

থাক্‌তে থাক্‌তে সাবেক চাল ভুলে গিয়ে নতুন চাল ধরে। তখন বলে এইরে ঘোড়াটা বিগড়ে গেছে। এও তেমনি মানুষ এল সে রাজ্য থেকে, এখানে এসে রিপুর খপ্পরে প'ড়ে সাবেক চাল ভুল গিয়ে রিপুর দাস হওয়ার চাল ধরে, তেম্‌নি তেম্‌নি কথা বলে। সাধুরা তখন বলেন, জীবের বাত বিগড়ে গেছে। ও বেগড়ানতো সহজে যায় না, ঘোড়া যেমন ভাল সহিস কোচায়ানের কাছে থাক্‌তে থাক্‌তে তবে সে বেগড়ান শোধ-রায় মানুষও তেমনি।

"শ্রীভগবানের করুণা-বাহনের সহিত কোচোয়ানের মত" যাঁরা এ জগতে আসেন তঁদের কাছে প'ড়ে থাক্‌তে থাক্‌তে তোমার স্বভাব বদ্‌লে যাবে। 'বিগড়ী বাতভী বনি যাই'। আনন্দে লেগে থাকতে হবে, নিশ্চয় হবে। সাধুদের উপর যে তাঁর হুকুম আছে, **শোধরানর জন্যই তো তাঁদের আশা**।

একটি ভক্তের প্রশ্ন—(তিনি দাদার মারফতে প্রশ্ন করেছিলেন)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা ! এত দেখে শুনে জ্ঞান হচ্ছে না কেন ?

বাবাজী ম'শায় ঃ এখনও যে ফানুষ তত্ত্ব বোঝা হয় নি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা ! ফানুষ তত্ত্ব কি ?

বাবাজী ম'শায় ঃ (প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর নাম স্মরণ করে) প্রভু 'বলতেন' একটি সাধু বাজারে গিয়েছিলেন গিয়ে দেখেন—একটি লোক মাথায় হাত দিয়ে বসে কাঁদছে। সামনে তার কতকগুলি ফানুষ, তিনি জিগ্যেস কর্‌লেন—বাবা কাঁদছ কেন ? বাজারের সেই লোকটি ব'ল্লে আমি কিছু ধান কিনে এনেছিলাম, ভাবলুম এগুলি বাজারে বেচে যা পাব মূল টাকাটী রেখে লাভের টাকা দিয়ে সংসারের জন্য কিছু নিয়ে যাব। তা বাবা একটি লোক আমার পাশে এগুলি নিয়ে (ফানুষগুলি) খুব হাঁক ডাক্ করে বেচ্‌ছিল। সে আমাকে

কি ভাব্‌লে জানি না, আমাকে বোঝালে যে আমি চট্‌পট্‌ চলে যাব, তোমার ও ধান বিক্রি হ'তে ঢের দেরী। আজ হয়তো বিক্রি নাও হতে পারে। তার চেয়ে এগুলি নিয়ে আমাকে ধানগুলি দাও। এ মাল খুব দামী, খুব বিক্রী হবে। ব্যাস্ আমিতো সোনার মত রঙ এই ফানুষগুলি নিয়ে তাকে যেই (আমার ধানগুলি) দেওয়া সে ওমনি চট্‌পট্‌ চলে গেল। প্রথমটা আমার বেশ আনন্দ হোলো। তারপর দেখছি লোকজনতো আমার এ সব কেউ কিনতেই চায় না, দুই একটি ছেলে কিন্‌তে চায়। এ সবের দামতো কিছুই নয়।

সাধু বল্লেন—তা ওগুলো বেচ্‌লেও তো তোমার দু' পয়সা হবে। লোকটি বল্লে, না, বাবা, এ কিছুই হবে না। মূলও গেল লাভ তো গেলই। বলেই আবার কাঁদতে লাগ্‌লো।

সাধু বল্লেন—আরে কেঁদে কি হবে, যা গেছে তা গেছে, এখন তো বুঝেছ? যা আছে ঐ দিয়ে আবার ব্যবসা কর; ধীরে ধীরে আবার সব হবে। **সাবধান আর যেন কেউ না ঠকায়।**

বুঝলে তো? সংসারে এসে রিপুর খপ্পরে প'ড়ে ফানুষ পাওয়া গেছে, ওগুলির মূল্য তো কত! দেখতেই খালি মন ভোলান। ওর তত্ত্ব বুঝলে দেখবে মূলও গেল লাভও কিছু হবে না। তবুও যা আছে তাই নিয়েই চল। সাধুর কথা শোন। যতটুকু সময় আছে তাঁকে স্মরণ ক'র্‌লেই হবে। **সাধুর শরণ নাও তিনি ব'লে দেবেন কেমন করে তাঁকে পাওয়া যাবে।**

সাধন ও স্বতন্ত্রতা :

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! এমনও দেখা গেছে যে কোন শিষ্যটী হয় তো খুব নিষ্ঠাবান, শ্রীগুরুদত্ত উপদেশে তার প্রগাঢ় নিষ্ঠা কিন্তু

কিছু দিনের মধ্যে দেখা গেল সেই শিষ্যটী একটু পৃথক ধরণের আচরণ করছেন, শেষটায় শ্রীগুরুদেবের সঙ্গেই যেন পাল্লা দিয়ে চলতে লাগলেন, এর রহস্য কি ?

বাবাজী ম'শায়ঃ হুঁ, কথাটা রহস্যেরই বটে। তবে কথা কি জান ও ভাবটি ধরা বড় মুস্কিল, যিনি ওই নিয়ে কটাক্ষ করবেন. তিনি অপরাধের ধাক্কাতে পড়বেন। "তাঁরই দেওয়া উপদেশ (শ্রীগুরুদত্ত উপদেশ) আবার তাঁর সঙ্গেই বিরোধ!" এর সূত্র ধরতে গেলে বড় বিড়ম্বনায় প'ড়তে হয়, **প্রভুর চোখে কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি। অনুগত ব্যক্তিটি খাঁটি কি না. তাই সকলকে দেখিয়ে দেন তিনি।** ছোটবেলায় যাত্রা শুনতে যেতাম্, ডোমসায় যাত্রা হ'চ্ছিলো 'পাণ্ডব বিজয়'। (ডোম্সা-স্থানটি ফরিদপুর সহরের দশ বার ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে পালং থানার অন্তর্গত এবং মাদারিপুর সাবডিভিসনে, শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব স্থান ফরিদপুর সহরে এবং পিতৃভূমি 'কুমারপুর' গ্রামে, সেটী ডোম্সার নিকট) ধর্ম্মদাস রায়ের যাত্রা, লোকে লোকারণ্য হ'য়েছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দণ্ডীরাজা যুদ্ধ করে-ছিলেন, হেরে গেছেন। প্রাণ ভয়ে পালিয়ে এলেন। কি করেন! কৃষ্ণের শত্রু হ'য়ে থাকাও চলে না, তাই তিনি পাণ্ডবদের শরণাগত হ'য়ে বল্লেন—আপনারা আমায় আশ্রয় দিন। শ্রীকৃষ্ণের অনুগত পাণ্ডবগণ দেখলেন বিষম সমস্যা। এঁকে আশ্রয় দিলে কৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতা করতে হয়; আবার এঁকে ত্যাগ ক'রলে সখার 'অভয় গুণের' মহিমা থাকে না। ওঁরা তখন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে তাঁরই মহিমাকে জয় দিয়ে দণ্ডীরাজাকে অভয় দিলেন। দণ্ডীরাজারও মনে সেই কৃষ্ণ-ভক্তদের গুণটীর দাগ পড়'লো। এদিকে সে কথা শ্রীকৃষ্ণের কাণে গেল, তিনি এসে বল্লেন "তোমাদের সঙ্গে আমার বিরোধ ঘটলো দেখছি," ওমনি ভীম বল্লেন, হে কৃষ্ণ!

আমাদের বল তো একমাত্র তুমি। তোমার গরবেই আমরা ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণকেও সামান্য জ্ঞান করি। কিন্তু কৃষ্ণ! তুমি যে,সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র শরণাগত বৎসল ; আজ যদি দণ্ডী-রাজাকে পরিত্যাগ করি তবে লোকে যে তোমারই কুযশ গাইবে। -- তা সইতে পা'রবো না, ওতে যদি জীবন যায় যাবে। হে কৃষ্ণ! শরণাগতকে রক্ষা করতে তুমিইতো শিখিয়েছো, আজ যদি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় আমরা তাতেও প্রস্তুত, তুমিই আমাদের সহায়। শ্রীকৃষ্ণ মুচ্‌কী হেসে বল্লেন—বেশ তা হ'লে প্রস্তুত হও। পাণ্ডবগণও মাথা নত ক'রে বল্লেন, আমরা প্রস্তুতই আছি। তারপর উভয় পক্ষে খুব যুদ্ধ হোলো, একপক্ষে পঞ্চপাণ্ডব, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর আর এক পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ, যাদব সৈন্য, অন্যান্য দেবতা। শেষটায় পাণ্ডবদেরই জয় হোলো। শ্রীকৃষ্ণের আর আনন্দের সীমা নাই। ভক্তের জয়ে প্রভুর আনন্দ। জগতকে দেখালেন যাঁরা প্রভুর গুণে বলীয়ান হন তাঁরা সহজেই উত্তীর্ণ হন। একে স্বতন্ত্রতা বল্লে দোষের হয়। ভক্তের-মন, বুঝতে পারে কোন্‌টি প্রভুর ইচ্ছা কোন্‌টি প্রভুর অনিচ্ছা। এ অনুভূতি না থাক্‌লে সেটি হয় দেহের অভিমানে স্বতন্ত্রতা। —প্রভু তখন 'আসল' 'মেকি' ধরিয়ে দেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা! 'প্রভুর ইচ্ছা কি' এটি যে ভক্ত জান্‌তে পারেন তাঁর আচরণে তো সকলে' সন্তুষ্ট হবে কিন্তু তেমনি ভক্তের আচরনেও সকলে খুসী হন না। ভগবদ্ ইচ্ছায় সকলের তো খুসী হওয়া উচিত্। এ সব ক্ষেত্রে ভগবদ্ ইচ্ছা আর ভক্তের ইচ্ছায় তো স্বতন্ত্রতা থাকতে পারে না!

বাবাজী ম'শায় ঃ ওই যে কবিরাজ বলেছেন "সবার চিত্ত নারি আরাধিতে" যাঁদের বিরুদ্ধ স্বভাব হয় তাঁরা ভগবানের ওপরই

বল, আর ভক্তের আচরণের ওপরই বল. কখনও খুসী হতে পারেনা। ভক্ততো সকলের মন-ভোলান আচরণ করেন না, তাঁরা করেন ভগবানের সেবা। সে সেবার যেটি নিয়ম সেটা ষোল-আনা রক্ষা করেন তাঁরা। একটি বাদ পড়লে আর পাঁচটি বাদ প'ড়ে যাবে। তাই তাঁরা সহস্র বাধা এলেও সেই নিয়ম নিষ্ঠার আচরণে দৃঢ়তা রাখেন। সেইটিই হয় বজ্রের মত কঠিন। আবার প্রভুর করুণার কোথাও বিকাশ দেখলে আনন্দে নেচে উঠেন। তখন হয় ফুলের মতন, যেমনি সৌরভ তেমনি কোমলতা। লোকে বলে 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি' ? **এ সব কিন্তু লোকের মুখপানে চেয়ে নয়, কোন দেহ অভিমানে বা প্রতিষ্ঠা গৌরবে নয়, এ হোল প্রভুর মুখপানে চেয়ে।**—নিয়ম নিষ্ঠায় আর প্রভুর করুণা বিতরণে। তাই অনেক সময় ধরা যায় না ভক্তের স্বতন্ত্রতা কেন ? বিপরীত স্বভাব যাঁদের (যাঁরা ভগবদ্‌বিরোধী) তাঁরা মনে করেন ভক্তটীর আচরণ স্বতন্ত্র।

সংসারের স্রোতে সাঁতার

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ঃ বাবা ! সংসারে 'কর্ম্মবেগ' জীবের থাম্‌বে কবে ? —অসহ্যও তো লাগছে কারো কারো।

বাবাজী ম'শায় ঃ (হাসিয়া) অসহ্য হ'লেই পাক্‌ড়াও ঠিকই হবে। কৌতূহল তো মেটেনি। নদীর বেগ কত, কোথায় নিয়ে যায় তা তো জানা হয় নি। কৌতূহল হতেই তীরের কথা নিজের বলের কথা ভুলে স্রোতে গা ভাসাতে ইচ্ছে হোলো, ব্যাস, তারপর ভেসে ভেসে চলে আর হাত পা ছোঁড়ে। তারপর নিজের দমও ফুরিয়ে আসছে তীরের দিকেও চেয়ে দেখছে সব ফাঁকা। যখন একেবারে অসহায় তখন কেউ গিয়ে হয়তো

দড়ি ফেলে দিলেন। প্রথম প্রথম দড়িটি ধরে একটু তীরে ফিরে আসার চেষ্টা হোলো। তারপর যেই একটু বল হোলো ওমনি মনে মনে জাগলো দড়িতো রয়েছে আর একটু এগিয়ে দেখে আসি। তারপর আবার সেই দড়ি ধ'রে স্রোতের টানে চলে। **এমনি হোলো সংসার সাঁতার**। জীব অনাদি কাল থেকে তাঁকে ভুলে নিজেকে ভুলে সংসারের স্রোতে কৌতুহল করে গা ভাসিয়েছে, করুণাময় নিশ্চয় তায় অসহায় দশা দেখে 'নামের রজ্জু' ছুঁড়ে দিয়েছেন। জীব প্রথমটা ধরে তারপর সেই নাম বলে আবার গা ভাসাতে চায়। কত দিনে যে দৃষ্টি ফিরবে! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তিনি তো চুপ্ করে নাই, কেবলই ছুট্‌ছেন, তবুও কি হুঁস্ আসে? **বৈরাগীর পথে এসেও রেহাই নাই**। বৈষ্ণবী মায়ার সংসারে আবার গা ঢালা।)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা': বাবা! বৈষ্ণবী মায়া কি রকম?

বাবাজী ম'শায়: (হাসিয়া) গোড়ায় গোড়ায় হয়তো ইচ্ছা হোলো, একটি আশ্রম করতে হবে, সেইখানেই বিগ্রহসেবা আর নাম হবে। তাতে জীবের পরম কল্যাণ হবে। পথে যেতে আসতে নাম শোনাও হবে আর ভগবত দর্শনও হবে, ধীরে ধীরে হৃদয়ে লোভ জাগবে, প্রসাদ চরণামৃত খেতে খেতে চিত্ত-শুদ্ধি হবে। একটু একটু করে সাধুসঙ্গ করারও প্রবৃত্তি জাগবে।

এদিকে সাধুর মনটি কিন্তু গোড়ার কথা ভুলে গেল। তিনি শুনেছিলেন "জীবে দয়া নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন"। সেই প্রেরণাতেই তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা। তিনি খুব উদ্যোগ করে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। ত্রিসন্ধ্যা নাম, শ্রীমূর্ত্তির সেবা, প্রসাদ চরণামৃত দিয়ে জীবে দয়া, তাদিকে শ্রীনাম শোনান। তারপর এল আশ্রম রক্ষা। আজ এটি নাই, কাল ওটি নাই,

তখন আশ্রম রক্ষার জন্যে জমি জায়গা চাই, বাড়ি চাই, টাকা চাই, ব্যস্, তারপরেই এলো বৈষয়িক ব্যাপার। তখন পরমার্থ স্বার্থ হয়ে উঠল, একে উচ্ছেদ কর, তার কাছে তাগিদ কর, শেষটায় যা হবার তাই হলো। **এই হোলো বৈষ্ণবী মায়া**। এর হাতে পড়লে "বেঁধে মার।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! আপনি তো সবেতেই ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন? তা হোলে বৈষ্ণবের ধর্ম্ম কি ভয় থেকেই উৎপন্ন হয়?

বাবাজী ম'শায় : না ভয় কিসের? তাঁর স্বরূপটি ভাব তা হলেই বুঝবে "**সর্ব্বত্র নির্ভয়**"। তাঁর ছটি ঐশ্বর্য্য আছে। তার মধ্যে বৈরাগ্যও একটি ঐশ্বর্য্য। **তাঁর বৈরাগী স্বরূপের কথা ভাবলে আর বৈষ্ণবী মায়ার দিকেও যেতে হবে না**। এক পাতা তুলসী আর একটু জল দিলেই তিনি **বিকিয়ে** যাবেন। তা হোলে তাঁকে আবার দৌলত দিয়ে আশ্রম রাখার উদ্দেশ্য কি?

একবার কোর্টে একটি মামলা হয়েছিল এক আশ্রম নিয়ে। দিদির মুখে শুনেছি [শ্রীললিতা সখীজীর মুখে] কোর্টে রায় দিলেন ভগবানের জন্যে ঋণ হয় না, ঋণ হয়েছে আশ্রমের আচার ব্যভার নিয়ে, ওতো সেবকদের ব্যাপার। তবে মামলা ক'রছে তারা তা দোষটা কিসের? [অল্প হাসিয়া] ওগো এসব কথা বললে তোমাদের গায়ে লাগবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : **তা হলে বৈরাগীরা থাক্‌বে কেমন করে?**

বাবাজী ম'শায় : কেন ওই যে বলছেন, 'মাগিয়া যাচিয়া কর উদর পূরণ।' তোমাকে আশ্রম ক'রে বাঁধা আয় দিয়ে বস্‌তে বলেছেন কি? যে যা দেয় দিক্‌না তোমার সে দিকে লক্ষ কেন, যারা দেবে তারা ধন্য হবে। আর তুমি তোমার ভিক্ষা ছাড় কেন?

অষ্টাদশ তরঙ্গ

"পাথেয়"

সূচীপত্র

পাথেয় সঙ্কেত ঃ পৃষ্ঠা

১। মহামন্ত্রের পরিচর্যা— ৫৬৩

২। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের ইতিহাস— ৫৮০

(২।১) শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের স্বত্ব সামীত্ব লইয়া মথুরায় মুনসেফ্ কোর্টে দরখাস্তের নকল ও মুনসেফের অর্ডার— ৫৯৩

৩। কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত দাস গোস্বামীর সংস্কৃত ভাষায় শ্লোচক ও পয়ারে অনুবাদ— ৬০০

৪। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধি সম্বন্ধে— ৬০৮

৫। বৈষ্ণব মতে 'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' রহস্য— ৬০৯

৬। 'আরোপে' আরতি হেরে দাস গোস্বামী ছুঁহুঁ করে— ৬১০

৭। শ্রীশ্রীপাটবাড়ী তত্ত্ব— ৬১২

(১)

"মহামন্ত্রের পরিচর্য্যা"

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

"মহামন্ত্র মহাশূর"
তাইতে বলি মহাশূর
পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে

যে ধনের পায় নাই সন্ধান
কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-সাধন-ফলে— যে ধনের পায় নাই সন্ধান
অনায়াসে করেন দান

মহামন্ত্র মহাশূর—তাই, অনায়াসে করেন দান
"পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধন"— অনায়াসে করেন দান

সবাই,—শক্তিহীন নামের কাছে
জগতে. কত কত সাধন আছে—
সবাই,—শক্তিহীন নামের কাছে

শ্রীগুরু-প্রেরণায় এই ত' জাগে

শ্রীকৃষ্ণলীলা-রস-ধাম
এই, বত্রিশ-অক্ষর ষোল-নাম শ্রীকৃষ্ণলীলা-রস-ধাম

তাই, মহামন্ত্র এত শক্তিমান্
এ যে, ব্রজলীলা-রস-ধাম তাই, মহামন্ত্র এত শক্তিমান্

অপরূপ এ নাম-রহস্য
শ্রীগুরু-মুখে শুনেছি অপরূপ এ নাম-রহস্য

যখন দেখ্‌লেন লীলা থাকে না
কিশোরীর দশমী-দশাতে যখন দেখ্‌লেন লীলা থাকে না
তখন এ নাম হ'লেন প্রকাশ

ব্রজলীলা রাখবার লাগি তখন এ নাম হ'লেন প্রকাশ
কৃষ্ণ-বিরহিনী, কিশোরীর শ্রীমুখ হ'তে
—তখন এ নাম হ'লেন প্রকাশ
'কৃষ্ণ-বিরহিনী, কিশোরীর শ্রীমুখ হতে'
—তখন এ নাম হ'লেন প্রকাশ
'দশমী-দশায় আরূঢ়' তখন এ নাম হ'লেন প্রকাশ
কৃষ্ণ-বিরহিনী,-কিশোরীর শ্রীমুখ হ'তে
—এ, নাম হ'লেন প্রথম প্রকাশ

যখনি এ নাম হ'লেন প্রকাশ
সঙ্গে সঙ্গে বিরহের শান্তি

বিরহিনী-কিশোরী শুনে
প্রথম 'হরে' নাম স্ফুরণে বিরহিনী-কিশোরী শুনে
ঐ,—বাঁশী বাজে কদম্ব-বনে বিরহিনী-কিশোরী শুনে

অমনি প্রাণে জেগে উঠিল

তবে ত, কৃষ্ণ আছে ব্রজে
ঐ যে, কদম্ব-বনে বাঁশী বাজে তবে ত, কৃষ্ণ আছে ব্রজে

ব্রজে আছে শ্যাম-রায়

ব্রজ ছেড়ে যায় নাই কোথায়— ব্রজে আছে শ্যাম-রায়

অম্‌নি হ'ল বিরহের শান্তি

কদম্ব-বনে বাঁশী-শুনে অম্‌নি হ'ল বিরহের শান্তি

ব্রজ ছেড়ে যায় নাই ব'লে অম্‌নি হ'ল বিরহের শান্তি

প্রথম হরে 'পূর্ব্বরাগ' জাগায়

বিরহ-তাপ মিটাইয়ে প্রথম 'হরে' পূর্ব্বরাগ জাগায়

কদম্ব-বনে বাঁশী শুনায়ে প্রথম 'হরে' পূর্ব্বরাগ জাগায়

পর পর লীলা ভোগ

পর পর নাম স্ফুরণে পর পর লীলা ভোগ

ব্রজবিহারীর লীলা ভোগ

প্রথম 'হরে' পূর্ব্বরাগ জাগায়

শেষ 'হরে' 'মহারাস' দেখায়

—**প্রথম হরে 'পূর্ব্বরাগ জাগায়'**

ব্রজলীলা রস ধাম

মহামন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ' নাম ব্রজলীলা রস-ধাম

মহামন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ' নাম

বিরহিনী, গৌরকিশোরীর শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ

মহামন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ' নাম

তোমরা ব'ল্লে, বল্‌তে পার

যদি কিশোরীর, শ্রীমুখ হতে এ নামের প্রকাশ

—তবে, কেন বলিলেন কবিরাজ

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তবে, কেন বলিলেন কবিরাজ

শ্রীচৈতন্য মুখোদ্‌গীর্ণ ব'লে তবে, কেন বলিলেন কবিরাজ

অপরূপ রহস্য ভাই

অনুভব কর ভাই রে

এ কথার মর্ম্ম অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে অনুভব কর ভাই রে

নাম ধ'রেছেন গৌরহরি

ব্রজ-বিহারী নন্দনন্দন নাম ধ'রেছেন গৌরহরি

আস্বাদিতে স্বমাধুরী নাম ধ'রেছেন গৌরহরি

রাধা-ভাব কান্তি অঙ্গী করি নাম ধ'রেছেন গৌরহরি

পরিপূর্ণ ভোগ বটে

'বিরহে'-'পরিপূর্ণ ভোগ' বটে পরিপূর্ণ ভোগ বটে

তাই লিখেছেন কবিরাজ

'শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বিরহেতে ভোর॥'

দশমী-দশায় সদাই বিভোর

মহাভাব নিধি গৌরাঙ্গ-সুন্দর দশমী-দশায় সদাই বিভোর

গম্ভীরা ভিতরে গোরারায়

কাঁদেন সদাই দশমী-দশায়
গম্ভীরা ভিতরে গোরারায়

নিরন্তর গৌরহরি জপেন

এই 'হরে কৃষ্ণ' নাম
নিরন্তর গৌরহরি জপেন

রাধা ভাবে দশমী-দশায়
নিরন্তর গৌরহরি জপেন

তাই ব'লেছেন কবিরাজ

প্রাণ-গৌর-রহস্য অনুভবী
তাই ব'লেছেন কবিরাজ

শ্রীচৈতন্য-শ্রীমুখোদ্গীর্ণ

দশমী-দশাপন্ন
শ্রীচৈতন্য-শ্রীমুখোদ্গীর্ণ

দশমী-দশাপন্ন

রাধিকা-ভাবিত-মতি
দশমী-দশাপন্ন

শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণ

এ নাম,—যুগল বিলাস-ধাম

কারুণ্য-তারুণ্য-লাবণ্যামৃত-ধাম
এ নাম, যুগল বিলাস-ধাম

এই,—নামেই করেন অবস্থান

ব্রজলীলারসের উপাদান
এই,—নামেই করেন অবস্থান

ব্রজলীলা-রস পূর্ণ আছে

'মহামন্ত্র'-নামের মাঝে
ব্রজলীলা-রস পূর্ণ আছে

প্রথম 'হ'কার হ'তে শেষ 'রে'কারের মাঝে

—ব্রজলীলা-রস পূর্ণ আছে

সকলি আছেন মূর্ত্তিমান

'পূর্ব্বরাগ' হ'তে 'সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান' সকলি আছেন মূর্ত্তিমান

তাই বলি, মহামন্ত্র মহাশূর

এ যে, ব্রজলীলা-রস-পুর তাই বলি, মহামন্ত্র মহাশূর

যদি কা'রও, ভোগ ক'রতে সাধ থাকে

রাধাকৃষ্ণ, যুগল-উজ্জ্বল বিহার

—যদি কা'রও, ভোগ ক'রতে সাধ থাকে

তবে, যাও ভাই এই নামের কাছে

শ্রীগুরুদেবের পাছে পাছে

—তবে, যাও ভাই এই নামের কাছে

এই, নাম সব ভোগ করা'বে

যুগল-উজ্জ্বল বিহার এই, নাম সব ভোগ করা'বে

শ্রীরাধা, রাধারমণের রহোলীলা

—এই, নাম সব ভোগ করা'বে

পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম রূপে এই, নাম সব ভোগ করা'বে

যুগল, সেবামৃত সমুদ্রে ডুবা'য়ে

মধুর, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন যুগল, সেবামৃত সমুদ্রে ডুবা'য়ে

পরাণ গৌরাঙ্গ দেখায়

'হরে কৃষ্ণ' নাম নিজ স্বরূপ পরাণ গৌরাঙ্গ দেখায়

দেখায় প্রাণের গৌর-মুরতি
মহা, রাস-বিলাসের পরিণতি দেখায় প্রাণের গৌর-মূরতি
'রাই কানু একাকৃতি' দেখায় প্রাণের গৌর-মূরতি

দেখায় প্রাণের শচীসুত
মুরতি অদভুত দেখায় প্রাণের শচীসুত
ভানুসুতা-মণ্ডিত-নন্দসুত দেখায় প্রাণের শচীসুত
মূরতিমন্ত-প্রেমবৈচিত্ত্য দেখায় প্রাণের শচীসুত

দেখায় মধুর গৌর দেহ
নিত্য-মিলনে নিত্য-বিরহ দেখায় মধুর গৌর দেহ

দেখায় চিতচোরা গোরা
'হরে কৃষ্ণ' নাম নিজ-স্বরূপ দেখায় চিতচোরা গোরা
পরস্পর, বুকে ধ'রে আত্মহারা দেখায় চিতচোরা গোরা
বিলাস-বিবর্ত্ত-রসে ভোজ দেখায় চিতচোরা গোরা
গৌর-অনুরাগীর বুক-ভরা দেখায় চিতচোরা গোরা
(শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী

(অ) শ্রীগৌরসুন্দর যে সংখ্যাপূর্ব্বক 'মহামন্ত্র' জপ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁহার লীলা পরিকরদের উক্তি—

(১) **শ্রীল সনাতন গোস্বামী ঃ**

শ্রীচৈতন্য মুখোদ্‌গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎপ্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥

(লঘুভাগবতামৃতম্)

(২) **শ্রীল রূপ গোস্বামী ঃ**

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা—
কৃতগ্রন্থিশ্রেণীসুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগল-খেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্য কিং মে পুনরপি দৃশো র্যাস্যতি পদম্।

(স্তবমালা)

(৩) **শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঃ**

বধ্নন্ প্রেমভরপ্রকম্পিতকরো গ্রন্থীন্ কটিডোরকৈঃ
সংখ্যাতুং নিজলোকমঙ্গল হরেকৃষ্ণেতিনাম্নাং জপন্।
অশ্রুস্নাতমুখঃ স্বমেবহি জগন্নাথং দিদিক্ষুর্গতা—
যাতৈ র্গৌরতনু বিলোচনমুদং তন্বন্ হরিঃ পাতু বঃ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত)

(আ) মহামন্ত্র সংখ্যাপূর্ব্বক জপের জন্য গৌরহরির উপদেশ—

(১) নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।

ইতি-প্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসুনুঃ কিং মে নয়ন-সরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥

(স্তবাবলী)

(২) আপনে সভাবে প্রভু করেন উপদেশ।
কৃষ্ণনাম "মহামন্ত্র" শুনহ বিশেষ ॥

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"

প্রভু বলে,—কহিলাম এই 'মহামন্ত্র'
ইহা গিয়া 'জপ' সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ।

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

(৩) **পুরীধামবাসী ব্রাহ্মণদের প্রসঙ্গে ঃ**

ভিক্ষা নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাসিয়া।
চল তুমি আগে 'লক্ষেশ্বর' হও গিয়া ॥

* * * *

প্রভু বলে জান লক্ষেশ্বর বলি কারে।
প্রতিদিন যে লক্ষনাম গ্রহণ করে ॥

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

(৪) **নবদ্বীপবাসী আবাল-বৃদ্ধ বনিতার প্রতি ঃ**

হাসিয়া কহিল প্রভু ভক্ত সবাকারে।
এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে ঘরে ॥
নবদ্বীপে বাল-বৃদ্ধ বৈসে যত জন।
চণ্ডাল দুর্গত আর সজ্জন দুর্জ্জন ॥

সবারে শিখাও হরিনাম 'গ্রন্থি' করি।
অনায়াসে সর্ব্বলোক যাক্ ভব তরি॥

(চৈতন্যমঙ্গল)

(ই) **শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাপরিকরবৃন্দ সংখ্যাপূর্ব্বক মহামন্ত্র জপ করিয়াছিলেন।** যথা—

ষড় গোস্বামী ঃ

সংখ্যাপূর্ব্বক-নামগান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ—
নিদ্রাহারবিহারাকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ
রাধাকৃষ্ণগুণস্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ॥

(শ্রীনিবাস আচার্য্য বিরচিত অষ্টকে)

ঠাকুর হরিদাস ঃ

হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত প্রধান
প্রতিদিন লয় তিঁহ তিন লক্ষ নাম॥

—চরিতামৃত

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ঃ

হরিনাম সংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সেই তণ্ডুল পাক করি প্রভুরে অর্পয়॥

—ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ঃ

সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়েন লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম॥

(চরিতামৃত)

বন্ধন দশায় বাণীনাথ পট্টনায়েক ঃ

বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় হরিনাম।
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' কহে অবিরাম॥
সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলীতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা॥

—চরিতামৃত

জগাই মাধাই :

জগাই মাধাই দুই চৈতন্য কৃপায়।
পরম ধার্ম্মিক রূপে বৈসে নদীয়ায়॥
ঊষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণ নাম লয় প্রতিদিনে॥

—শ্রীচৈতন্য ভাগবত

নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দ ঃ

প্রভু মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সবে চলে নিজ বাস॥
নিরবধি সদাই জপেন কৃষ্ণনাম।
প্রভুর চরণ কায় মনে করি ধ্যান॥

—শ্রীচৈতন্য ভাগবত

(ঈ) সংখ্যা পূর্ব্বক 'নাম' জপের উপদেশ দানে 'গৌর পরিকরবৃন্দ' ঃ--

ঠাকুর হরিদাসের উপদেশে :

(হীরা) মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥

—চরিতামৃত

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম প্রতি লোকনাথ গোস্বামী ঃ

যে বৈষ্ণব হইবে লইবে হরিনাম।
সংখ্যা করি লৈলে কৃপা করেন গৌরধাম

—প্রেমবিলাস

(উ) শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ সংখ্যা পূর্ব্বক মহামন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। যথা—

শ্রীনিবাস আচার্য্য ঃ

সংখ্যা করি নাম লয় প্রহর দ্বয়েক।
গ্রন্থ দরশনে আর যায় প্রহরেক॥

—কর্ণানন্দ

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম ঃ

হরিনামে নরোত্তমের এক বৎসর গেল॥
* * * * *
দুই লক্ষ নাম সাধন নিভৃতে বসিয়া।
সংখ্যা নাম লয় বসি রাত্রিতে জাগিয়া॥

-প্রেমবিলাস

শ্রীল শ্যামানন্দ ঃ

লক্ষ নাম রাত্রি দিনে করয়ে সাধন।
গোবিন্দ দর্শন আর সাধু দরশন॥

—শ্যামানন্দ প্রকাশ

(ঊ) শিষ্যগণ প্রতি শ্রীল নরোত্তম ঃ

শুন শিষ্যগণ কহিয়ে তোমাকে—
প্রথমেই কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি লক্ষ যার—
সে লইবে লক্ষনাম সংখ্যা আপনার

— কর্ণানন্দ

(খ) স্বশিষ্য কলানিধি প্রতি আচার্য্য শ্রীনিবাস :

(১) প্রভু কহে তুমি চৈতন্যের প্রিয়তম।
লক্ষ নাম জপ তুমি করিবা নিয়ম ॥

—কর্ণানন্দ

(২) রাজা বীরহাম্বির প্রতি শ্রীনিবাস :

শ্রীকামগায়ত্রীর অর্থ যত্নে শুনাইল।
হরিনাম জপের নির্ব্বন্ধ করাইল ॥

—ভক্তিরত্নাকর

(৯) **শ্রীনিবাস** আচার্য্য প্রভুর শিষ্যবৃন্দ সংখ্যা **পূর্ব্বক মহামন্ত্র জপ ও কীর্ত্তন** করিয়াছেন। যথা কর্ণানন্দে—

রামকৃষ্ণ চট্টরাজ প্রভুর এক শাখা।
তাহার মহিমা গুণ কি করিব লেখা ॥
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম।
সংখ্যা করি জপে সদা অবিশ্রাম ॥

প্রভুর কৃপা পাত্র এক **চট্টকৃষ্ণ দাস**
লক্ষ হরিনাম জপে নামেই বিশ্বাস ॥

তবে সেই **কলানিধি** চট্টরাজ নাম।
সদা হরিনাম জপে এই তার কাম ॥

কাঞ্চন গড়িয়া গ্রামে প্রভুর ভক্তগণ
এক এক **লক্ষ** হরিনাম করেন গ্রহণ ॥

গোবিন্দের ঘরনী **সুচরিতা বুদ্ধিমন্তা**।
শ্রীঈশ্বরীর কৃপা পাত্রী অতি সুচরিতা ॥
লক্ষ হরিনাম সেই করেন গ্রহণ।
এই মতে রহে তেঁহ সুখাবিষ্ট মন ॥

কর্ণপুর কবিরাজ করয়ে ভজন।
লক্ষ হরিনাম যেই করেন গ্রহণ ॥

প্রভুর পরম প্রিয় **শ্রীমথুরা দাস**।
হরিনাম জপে সদা পরম উল্লাস ॥

শ্রীআত্মারাম প্রভুর প্রিয় দাস।
সদা হরিনাম জপে সংসারে উদাস ॥

রামচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভুর সেবক।
তার যত শিষ্যগণ কহিব কতক ॥
লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা করিয়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা কথা শুনে আস্বাদিয়া ॥

তবে প্রভু কৃপা কৈল **নিমাই কবিরাজে**।
রূপ কবিরাজের ভ্রাতা খ্যাত জগ মাঝে ॥
লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা যে করিয়া।
সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥

শ্যামসুন্দর দাস সরল ব্রাহ্মণ।
লক্ষ হরিনাম যেই করেন গ্রহণ ॥

শ্রীদুর্গাদাস নাম প্রভুর নিজ দাস।
সদা হরিনাম জপে অন্তরে উল্লাস ॥

আর এক সেবক **শ্রীগোকুলানন্দ দাস**।
সদা হরিনাম জপে নামেতে বিশ্বাস ॥

শ্রীবংশীবদন ঠাকুর যেই মহাশয়।
প্রভুর প্রিয় শাখা হয় মধুর আশয় ॥
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম।
সংখ্যা করি জপে নাম সদা অবিশ্রাম ॥

তারপরে কৃপা কৈল **শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী**।
পদাশ্রয় পাঞা যেঁহ হৈলা কৃত-কীর্ত্তি ॥*
লক্ষ হরিনাম লয় নামেতে বিশ্বাস।
বড়ই রসিক তেঁহ সংসারে উদাস ॥

তবে ত করিল দয়া **বল্লভী কবিপতি**।
পদাশ্রয় পাইয়া যেঁহ হইলা সুকৃতি ॥
হরিনাম জপে সদা করিয়া নিয়ম।
লক্ষ হরিনাম করি করেন ভোজন ॥

প্রেমীকৃষ্ণদাস আর **মুক্তারামদাস**।
প্রভুপদে নিষ্ঠা সদা অন্তরে উল্লাস ॥
সবে মিলি একত্রেতে করেন ভোজন।
লক্ষ হরিনাম সবে করেন গ্রহণ ॥

(গ)

"গৌরহরি" হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীল নরোত্তম, আচার্য্য শ্রীনিবাস, শ্রীল শ্যামানন্দ এবং তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যাদির সময় পর্য্যন্ত যে সব বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশিত বা হস্তলিখিত দেখিতে পাওয়া যায় সে সব গ্রন্থে

* শ্রুত কীর্ত্তি।

কোথাও দেখা যায় না যে সংখ্যা না রাখিয়া "মহামন্ত্র" কীর্তিত হইয়াছেন কিম্বা কীর্ত্তনের কোন বিধান আছে।

বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণ মন্দিরের গোস্বামী শ্রীবনমালীলাল কর্ত্তৃক ফাল্গুন কৃষ্ণা ৩০ বুধবার ১৯৯০ তারিখে লিখিত ব্যবস্থা পত্র হইতে জানা যায় যে ঐ সময়ের ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবনে 'মহামন্ত্র' 'অসংখ্যাত' কীর্ত্তনের কোন প্রচার ছিল না।—

আবার, ঐ সময়ে স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ অদ্বৈত বংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীমুরলীমোহন গোস্বামীর ব্যবস্থাপিত পত্রাংশ—

'আমি শ্রীবৃন্দাবনে নামসংকীর্ত্তনে মহামন্ত্রের গান হওয়া শুনি নাই। আমি বৃদ্ধ, বর্ত্তমানে ৮২ বৎসর বয়স। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে ব্যবহার প্রচলন আছে, কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে 'মহামন্ত্রে' দীক্ষা দেওয়া। সুতরাং তাহার গান রীতি বিরুদ্ধ।'

আজও পূর্ব্ববঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিভিন্ন স্থানে দেখা যায় যে 'মহামন্ত্র' নাম যজ্ঞের 'অষ্টপ্রহর', 'চব্বিশ প্রহর' অনুষ্ঠানে সংখ্যা রাখিবার জন্য জাপক নিযুক্ত থাকে।

ব্রজে শ্রীঅদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহাশয় বড় দশকুশী প্রভৃতি তাল সহকারে 'মহামন্ত্র' কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু, সে কীর্ত্তনে সকলে লক্ষ্য করিয়াছেন—

"গোরা জপে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি ভাবে তিনি গান করিতেন। ঐরূপ নাম কীর্ত্তন গৌরগুণগানেই পর্য্যবসিত হয়। স্বতন্ত্র তারক ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন নহে।

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে কুম্ভ মেলা হয়। সেই সময়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে নদীয়া ও ব্রজের গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দের মধ্যে দুইটি গোষ্ঠী হয়। প্রথম গোষ্ঠীর মত,—

'মহামন্ত্র' সংখ্যা পূর্ব্বক জপ্য,—কীর্ত্তনীয় নয়, হইতে পারে না। এই গোষ্ঠীর কয়েকজন প্রখ্যাত বৈষ্ণব ঃ—

শ্রীল বনমালীলাল গোস্বামী ও প্রভুপাদ শ্রীমুরলী মোহন গোস্বামী এবং শ্রীগৌরচন্দ্র গোস্বামী, (সোনার গৌরাঙ্গ অঙ্গন, নবদ্বীপ), শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী, (শান্তিপুর); শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী, (শ্রীখণ্ড); শ্রীমণীন্দ্র মোহন গোস্বামী, (ঝাওটীয়া, ঢাকা); শ্রীকুঞ্জলাল গোস্বামী ভাগবতরত্ন, (শ্রীধাম নবদ্বীপ); ব্রজমণ্ডলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক শ্রীভক্তিচরণ দাস; শ্রীকামিনীবল্লভ গোস্বামী, (রাধাবাগ; বৃন্দাবন); শ্রীগোপালদাস বাবাজী প্রভৃতি।

অপর গোষ্ঠীর অভিমত,—

'মহামন্ত্র' জপ্য এবং অসংখ্যাত কীর্ত্তনীয়ও। ইঁহাদের প্রধান—তাৎকালীন চার সম্প্রদায়ের মোহান্ত, শ্রীনিত্যানন্দদাস; শ্রীবিনোদ-বিহারী গোস্বামী, (কালিদহ, বৃন্দাবন); প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী প্রভৃতি।

ঐ মতদ্বৈধতা এ যাবতকাল শিষ্য পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে।

—('বড় অবতার' ও 'অশেষ বিশেষ রস আস্বাদনকারী' রঙ্গিয়া গৌরহরির এ ও এক লীলা রঙ্গ!)

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের ইতিহাস ঃ

১৫৩৩।৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত বিরক্ত বৈষ্ণব সমাজের (মাধ্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায) প্রধান বা মহান্তবৃন্দের 'নাম মালা' ও বিশেষ বিশেষ ঘটনাব উল্লেখ—

মহান্তর নাম ঃ বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিবরণ

১। **শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী**—১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে দুইটি কবলায় ৬০৲ মুল্যে শ্রীশ্রীবাধাকুণ্ডেব জমি খরিদ হয। জমি বিক্রেতাদের নাম—

কামনা, শালোযা, অধব, মাজ্জু, কুজ্জা ও গোবিন্দ। ঐ সময পর্য্যন্ত জমিটি ধান্যক্ষেত্র ছিল।

১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডেব জমি খবিদ হয।

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে ঐ কুণ্ডদ্বযেব পার্শ্বস্থ জমিগুলি খবিদ হয তাহাব চারটি 'কবলা' আছে।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দেব বিজয়া দশমীর দিন (৭ রিক্ মাহারজব সন ৯৯৬ হিজরী) শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী **শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের সত্ব স্বামীত্ব** শ্রীজীব গোস্বামীকে দানপত্র যোগে অর্পণ করেন। ঐ দান পত্রটির অবিকল নকল মুদ্রিত আছে শ্রীহরিদাস দাস কৃত গৌডীয বৈষ্ণব জীবন, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৫১। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের একটি নক্সা (on Scale) সন্নিবেশিত হইল।

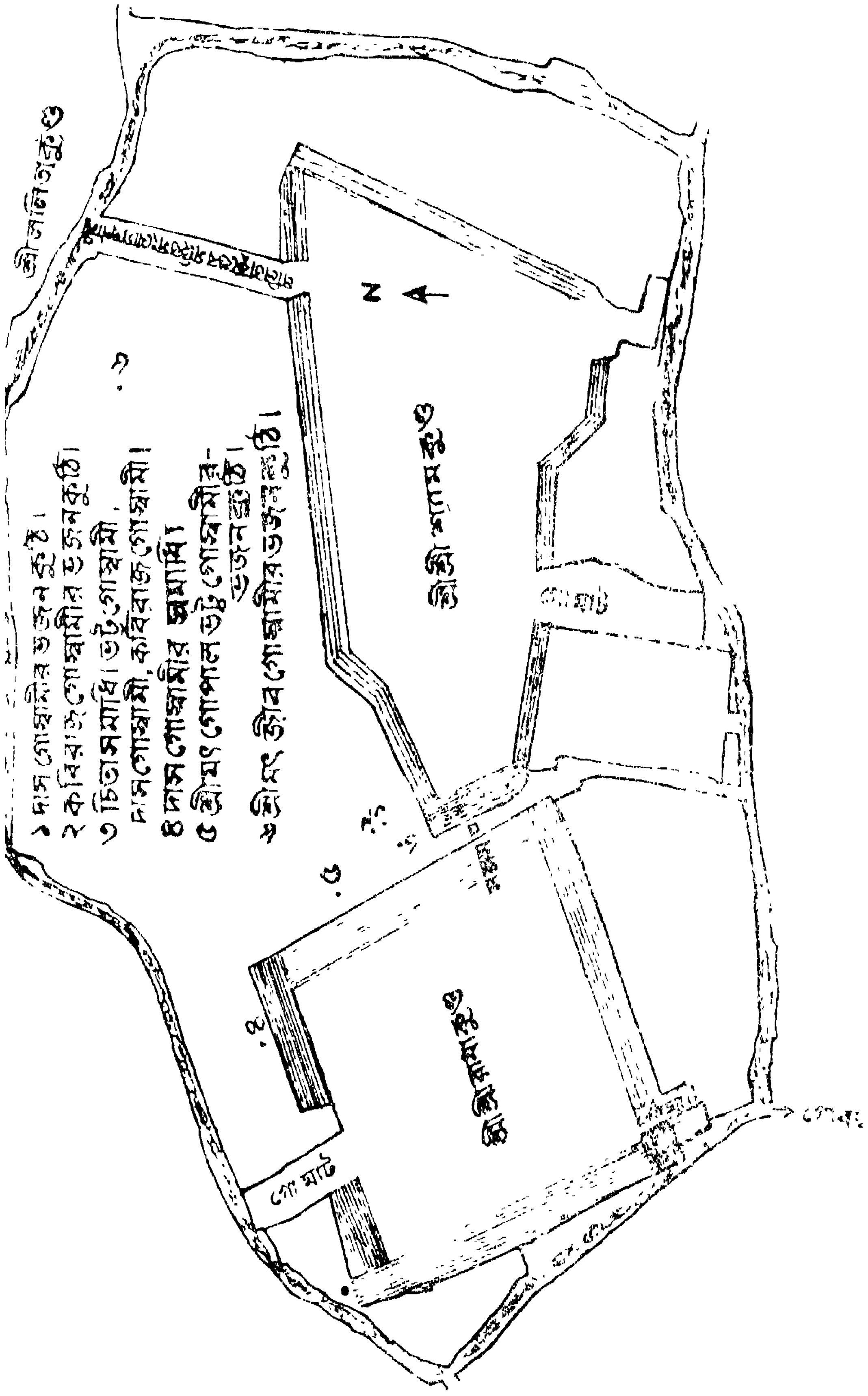
১ দাস গোস্বামীর ভজন কুটি।
২ কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটি।
৩ চিতাসমাধি। ভট্টগোস্বামী,
দাস গোস্বামী, কবিরাজ গোস্বামী।
৪ দাস গোস্বামীর সমাধি।
৫ শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর-
ভজন কুটি।
৬ শ্রী শ্রী জীব গোস্বামীর ভজন কুটি।
শ্রী ললিতাকুণ্ড
N
শ্রী শ্রী শ্যামকুণ্ড
শ্রী শ্রী রাধাকুণ্ড
গো ঘাট

২। **শ্রীজীব গোস্বামী—**

৩। **শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—**১৬৪২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে 'বারিখা' 'হায়দর,' 'গদ্দর' ও 'মকর্দ্দম' "একরারনামা" দেয় যে রাধাকুণ্ডে জল যাইবার প্রণালীতে কেহ কর্ষণ করিবে না। এবং কুণ্ডের ইষ্টক অপসারিত করিবে না এবং তীরস্থ বৃক্ষ ছেদন করিবে না। এই দলিলের নকলও মুদ্রিত আছে উপরোক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন পৃঃ—২৫২

৪। **নন্দকিশোর দাস—**

৫। **শ্রীব্রজকুমার দাস—**(পারস্য ভাষায় লিখিত বাদশাহী পরওয়ানা) ইংরাজী তারিখ ২৫ শে এপ্রিল ১৬৭২ খৃষ্টাব্দ। বঙ্গানুবাদ ঃ—গোঁসাই ব্রজকুমার আসিয়া নালিশ করিতেছে যে পরগণা সাহারের অন্তর্গত আরাট গ্রামে রাধাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী তাহার গৃহ আছে এবং সেই স্থানে বৃক্ষাদি রোপণ করিয়াছে। গ্রামের অধিবাসিগণ বলপূর্ব্বক ঐ জমিতে তাহাকে বাধা দিতেছে বৃক্ষাদি ছেদন করিতেছে এবং চতুর্দ্দিকে স্থাপিত প্রস্তর সমূহ লইয়া যাইতেছে। সুতরাং ইহা লিখিত হইতেছে যে নালিশকারী যাহাতে সন্তুষ্ট চিত্তে ধ্যান ও ভগবানের নাম করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে পারে এতদর্থে তদন্ত করিয়া এবং অত্যাচারকারীগণ যাহাতে অভিযোগকারীর জমির চতুর্দ্দিগস্থ বৃক্ষাদি ছেদন না করে এবং প্রস্তর লইয়া না যায় তজ্জন্য তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবা। এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবা। ৭ই মহরম্ ১০৮৩

নোট ঃ—

(১) এই সময় গ্রামের মালিক 'গোড রাজপুতগণ' ছিল। বিদেশীয় ব্যক্তিগণ স্বাধীন ভাবে তাহাদের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া ও খাজনা

না দিয়া এই সমুদয় ভূমি দখল করিবে ইহা তাহারা সহ্য করিতে পারিত না।

(২) আওরংজেব মথুরার নাম রাখিয়াছিলেন 'ইসলামাবাদ' ও বৃন্দাবনের নাম 'মুদিনাবাদ'।

(৩) আকবর বাদশাহ যখন আসিয়াছিলেন তিনি বৃন্দাবনকে 'ফকিরাবাদ' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

৬। **শ্রীগোপীরমণ দাস** ওরফে **শ্রীগোপীমোহন দাস**—মহম্মদশা বাদশাহের আমলের তিনখানি পারস্য ভাষায় লিখিত পরওয়ানা আছে। বঙ্গানুবাদ নীচে—

(১) ইং ৩০শে জুলাই ১৭২১ খৃষ্টাব্দ ঃ—

সৈয়দইজ্জৎখাঁ বাহাদুর অধীন মহম্মদসাহ গাজী। অনুগ্রহ প্রার্থী সাহস সম্পন্ন মহম্মদ হায়াৎ বৃন্দাবন গ্রামের অধিবাসী গোপীরমণ দাস অভিযোগ করিতেছে যে তাহার পূর্ব্বাধিকারীগণ সাহার পরগণার অন্তর্গত রাধাকুণ্ড গ্রামে জমি খরিদ করিয়া তাহাতে পুষ্করিণী ও ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছে। মথুরা সহরের মালঝোলা নিবাসী 'নাথুরাম' নামক এক ব্যক্তি ঐ জমি লইয়া গোলমাল করিতেছে। সুতরাং তোমাকে লিখা যাইতেছে যে তুমি মনযোগ সহকারে ও বিশদ ভাবে তদন্ত করিবা এবং যদি অভিযোগ সত্য হয় তবে ঐ প্রকার বাধা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিবা, আর যদি সত্য না হয়, তবে যথার্থ সংবাদ প্রেরণ করিবা। লিখিত হইল ১৬ই শওয়াল ২ জুলুস্ ১১৩৩ হিজরী।

(১) ইং তারিখ ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৭২১ খৃষ্টাব্দ ঃ—

মথুরা অন্তর্গত পরগণা ইসলামাবাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ফৌজদারগণের গোমস্তা সমূহকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে ১৭ই

শওয়াল বৎসর ২ তারিখের সরকারী সম্পত্তি তত্ত্বাবধারকের ছাপ যুক্ত (UNDER the Seal of the Controller of Estate) প্রধান মন্ত্রী কুতুবুল মুলক্ ইয়ামিন্ উদ্দৌলীয় পরওয়ানা, দ্বারা সরকারের প্রধানগণকে জ্ঞাপন করা যায় যে বৃন্দাবনবাসী গোপীরমণ দাসের পূর্ব্বাধিকার জীব গোস্বামী গ্রাম আরাথ ওরফে রাধাকুণ্ডে জমি ক্রয় করতঃ তাহাতে পুষ্করিণী ও উদ্যান প্রস্তুত করে। এক্ষণে মথুরা ন বার্সি নাথুরাম নামক এক ব্যক্তি অন্যান্য লোকদের সহায়তায় ঐ জমির কিয়দংশ বেদখল করিয়া তাহাতে সীমানার দেওয়াল নির্ম্মাণ করিতে চাহিতেছে। আমার উপর তদন্তের ভার দেওয়া হয় এবং হুকুম হয় যে এ বিষয়ে সত্য অবধারণ পূর্ব্বক অত্যাচার নিবারণ করিবা। তদনুসারে আমি দলিল পত্রাদি দেখিয়া ও মান্যগণ্য ব্যক্তিদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তদন্ত করিয়াছি। ইহাতে পরিষ্কার রূপে দেখা যাইতেছে যে কথিত জমি জীব গোস্বামীর হয় এবং ঐ সম্পত্তিতে আর কেহ সরিক নাই। অন্য কাহারও ঐ জমি লইয়া বিবাদ বা গোলমাল করা উচিত নহে। তারিখ ২৭ জিল্ হুজ সন ২ জুলুস ১৭ই শওয়াল ১-১১৩৩ হিজরী।

(৩) ইং তারিখ ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৭২২ খৃষ্টাব্দ ঃ—

সাদতখাঁ বাহাদুর ও বাহাদুর জাং-এর ছাপ যুক্ত ঐক্যমতে পরওনা তারিখ ১৬ জলহুজ ৩।

এতদ্বারা সুবা আগ্রার অন্তর্গত পরগণা সাহারের অধীন বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কর্ম্মচারীগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বৃন্দাবনবাসী গোপীরমণ দাস এই অভিযোগ দ্বারা জানাইতেছে যে উপরোক্ত পরগণার অন্তর্গত আরাথ ওরফে রাধাকুণ্ড গ্রামে জীবগোস্বামী জমি খরিদ করিয়া পুষ্করিণী ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছে। কতিপয় লোক শত্রুতা করিয়া ঐ জমিতে বাধা দিতেছে এবং বলপূর্ব্বক বৃক্ষ ছেদন করিয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং তোমাকে এতদ্বারা জানান

যাইতেছে যে তুমি তদন্ত করিয়া ঐ বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবা। এবং এরূপ বন্দোবস্ত করিবা যে, মূল্য দ্বারা ক্রীত জমিতে কেহ বাধা না জন্মায় এবং বৃক্ষাদি কাটিয়া না লয় এবং পুনরায় যেন এই প্রকার নালিশ উপস্থিত না হয়।

৭। **অনন্ত দাস**—
৮। **রাধামোহন দাস** (ওরফে রাধারমণ দাস)—
৯। **নিত্যানন্দ দাস**—

১০। **পরমানন্দ দাস**
১১। **চরণ দাস**
১২। **গোবিন্দ দাস**
১৩। **পুরুষোত্তম দাস**
}—

(১) বাংলার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের নাতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন ওরফে প্রখ্যাত "লালাবাবু" ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে, প্রস্তর সোপান দ্বারা লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তীর বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। এ ঘটনার সময় 'মহান্ত' কে ছিলেন তাহা আজ জানিবার উপায় নাই। কারণ 'রেকর্ড়ে' দেখা যাইতেছে কেবল মহান্তদের ক্রমিক নাম। কিন্তু, কে কখন্ মহান্ত হন বা কবে মহান্তপদ ত্যাগ করেন বা অপ্রকট হন এ সব জানার আজ কোন উপায় নাই।

(২) ঐ 'লালাবাবু' দাস গোস্বামীর আদর্শে প্রাকৃত বিষয় বৈভব পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন বেশ ও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা তাঁহার শেষ জীবন শ্রীকুণ্ডতটে অতিবাহিত করেন। তিনি যে স্থানে ভজন করিতেন আজও সে স্থানটির নাম "লালাবাবু"র ভজনকুঠি। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহ রক্ষা করেন।

(৩) শ্রীনবদ্বীপ দাস প্রণীত শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস পৃষ্ঠা ৫১ হইতে প্রাপ্ত সংবাদ দৃষ্টে বলা যায় যে—

(ক) ব্রজের মুকুটমণি শ্রীকুণ্ডতটে নিষ্কিঞ্চন ভাবে ভজন যে 'সর্ব্বোত্তম ভজন' ইহা 'লালাবাবুর' দৃষ্টান্তে বৈষ্ণববৃন্দের মনে স্থান পায়। এবং লালাবাবুর অপ্রকটের পর হইতে ধীরে ধীরে বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীকুণ্ডতটে বাস ও ভজন জন্য আসিতে আরম্ভ করেন।

(খ) ১৩ই অক্টোবর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের একটি চুক্তিপত্র আছে। বিরক্ত বৈষ্ণবগণ ঐ চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া স্বীকার করেন যে ভজন কুঠি বাসী বৈষ্ণবগণ সম্প্রদায় মতে ধর্ম্ম আচরণ করতঃ একত্রে বাস করিবেন এবং যদি কেহ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করেন তবে মহান্ত তাহাকে কুঠি হইতে বাহির করিয়া দিবেন এবং সে সমাজে পতিত হইবে। এই কারণে (আজও) শ্রীরাধাকুণ্ডের মহান্তকে চলতি কথায় দেড়শত কুটির মালিক বলে।

১৪। **বৈষ্ণবচরণ দাস**—রাধাকুণ্ডের উপরিতন জমিদার 'গৌড় রাজপুতগণের' হাত হইতে কাল প্রভাবে সত্ব স্বামীত্ব রাজা পৃথ্বীসিংএ আসে। এই পৃথ্বীসিং ১৮৭৪ সালে বিরক্ত বৈষ্ণবদের খসড়া নক্সার ৯৪২ নং জমি ও ৪টি ভজন কুঠি বেদখল করেন। সে সময় মহান্ত 'বৈষ্ণবচরণ দাস'। সুতরাং বাধ্য হইয়া ইঁহারা বৈষ্ণবচরণ দাসজী প্রমুখ আগরার সদর দেওয়ানী আদালতে মৌলবী মহম্মদ আব্দুল কোয়াইয়া খাঁ সবজজ আদালতে ১৮৭৫ সালে ৭ই জুন তারিখে স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্ব্বক ঐজমি ও কুঠি পুর্ণ দখলের মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। মোকর্দ্দমা বিচারাধান থাকাকালীন মহান্ত পরলোক গমন করেন।

১৫। **গৌরাঙ্গ দাস**—পূর্ব্বতন মহান্ত বৈষ্ণবচরণ দাসজীর সময়ের বিচারাধীন মোকর্দ্দমা ইঁহার সময় নিষ্পত্তি হয়।

ইনি, বেদখলি জমিতে দখল প্রাপ্ত হয়েন। বিরক্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ ঐ সব কুঠিতে জমিদারের বিরুদ্ধে স্বত্ত্ববান হইয়া বহুকাল যাবৎ পরম্পরা ক্রমে দখলকার আছে ইহা ধার্য্য হয়। বৈষ্ণবচরণ দাসজী ও তাঁহার পূর্ব্বতন মহন্তগণ যে এই দেড়শত কুঠির মালিক তাহা প্রমাণিত হয়।

নোট ঃ "ভারত" অখণ্ড,—এ বোধ সে সময়ে সর্ব্বসাধারণের মনে রেখাপাত করে নাই। সুতরাং 'ভারত গৌরব' নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণববৃন্দকে 'বিদেশী' আখ্যা দিয়া জমিদাররা (প্রথম জমিদার গৌড় রাজপুতগণ ও পরবর্ত্তী জমিদার রাজা পৃথ্বী সিং) অশেষ বিশেষ উৎপীড়ন করিতে চেষ্টা করেন। নিজেরা ব্যর্থকাম হইলে সরল গ্রামবাসীদের প্ররোচিত করেন। ফলে, গ্রামবাসীদের সহিত বৈষ্ণবদিগের বিবাদ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে চলিয়া আসিতেছিল। এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তহশীলদার যে তদন্ত করিয়াছিল তাহাতেও কুণ্ডদ্বয় এবং কুণ্ডতীরস্থ জমি সমুদয় বৈষ্ণবদিগের স্বত্ত্ব সাব্যস্ত হইয়াছিল।

১৬। **যমুনা দাস**—

১৭। **গোপী দাস**—

১৮। **নরসিং দাস**—এই সময়ে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—

(১) ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহান্ত নরসিং দাসজী মথুরা জেলার মুন্‌সেফ্ লালা আলোপী প্রসাদের আদালতে শ্রীআনন্দ দাসজীর নামে নালিশ করেন। ঐ নালিশ আপীল পর্য্যন্ত হইয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় যে শ্রীরাধাকুণ্ডের 'মহান্ত' কেবল বাঙ্গালীই হইতে পারে। মণিপুরী জাতির কোন ব্যক্তি হইতে পারে না।

(২) শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস প্রণেতা মহান্ত শ্রীনবদ্বীপ দাসজী ঐ গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায় তৃতীয় প্যারায় লিখিয়াছেন—

"আমরা শুনিয়াছি যে, নরসিংহ দাসজীর সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে পৃথক 'গৌরমন্ত্র' দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপাসনা

হইবে কি 'কৃষ্ণমন্ত্রে' অর্চ্চনা হইবে ইহা লইয়া মতভেদ উপস্থিত হয়। শ্রীরাধাকুণ্ডেও এ বিবাদ ছড়াইয়া পড়ে। এবং তাহার ফলে যে সমুদয় বৈষ্ণব 'গৌরমন্ত্রের' পক্ষ অবলম্বন করিলেন তাঁহারা 'নূতন ঘেরা' নামক স্থানে পৃথকভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহারা রাধাকুণ্ডের মহান্তের অধীন রহিলেন না।"

১৯। **গুরুচরণদাস ঃ** ঘটনা—

শ্রীস্বরূপদাসজী নামক জনৈক নিষ্কিঞ্চন বাবাজী সাধারণের নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করিয়া প্রায় ১২।১৩ হাজার টাকা ব্যয়ে শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের চতুর্দ্দিক প্রস্তরের দ্বারা বাঁধাইয়া দেন। এই কার্য্যের সম্পূর্ণ পরিচালনা, রাজর্ষি বনমালী বাহাদুরের সেরেস্তা হইতে হইয়াছিল।

অপর ঘটনা ঃ—

কলিকাতার গিরিশবাবু শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে মার্ব্বেল পাথর দ্বারা রত্নবেদী নামক ছত্র নির্ম্মাণ করেন এবং শ্রীকুণ্ডের দক্ষিণদিকে একটি ধর্ম্মশালা করেন।

তৃতীয় ঘটনা—

গ্রামের জমিদার আবাগড়ের বলবন্ত সিং বৈষ্ণবদিগের 'বুরূজা' নামক দুইটি ভজন কুঠি বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং ঐ জমি হইতে তাহাদিগকে বে-দখল করেন। সেই জন্য মহান্ত শ্রীগুরুচরণ দাসজী ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মহাবনের মুন্সেফ্ আদালতে ৭৮৯নং মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। মোকর্দ্দমা বিচারাধীন থাকা সময়ে উক্ত মহান্ত পরলোকগমন করেন।

২০। **ব্রজানন্দ দাস**—পূর্ব্বোক্ত মোকর্দ্দমা পরিচালনা করেন। ঐ মোকর্দ্দমায় ধার্য্য হয় যে পূর্ব্ববর্ত্তী মহান্ত উইল দ্বারা পরবর্ত্তী মহান্ত নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং মহান্ত দেড়শত কুঠির মালিক। এই

'বুরজা' দেড়শত কুঠির অন্তর্গত ও পরিক্রমার রাস্তার নিকট অবস্থিত। সুতরাং বিবাদী উপরিতন জমিদার হইলেও বৈষ্ণবগণ স্মরণাতীত কাল হইতে কুঠি সমূহের দখলদার থাকায় তাহারা বিরুদ্ধ স্বত্বে স্বত্ববান হইয়াছে অতএব মহান্ত নালিশী জমিতে দখল পাইবে।

নোট: ঐ 'বুরজার' কতক অংশে বর্ত্তমান 'নিতাই' 'গৌর' মন্দির ও শ্রীবিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন।

২১। **গোবিন্দ দাসজী**—১২ই ডিসেম্বর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইনি মহান্ত হন। তাঁর সময়ে পাইকপাড়ার রাণী যোগমায়া 'তমালতলার' যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু বসিয়াছিলেন ঐ 'ঘাট' মহান্তর অনুমতি লইয়া বাঁধাইয়া দেন। (১৯০৫ খৃষ্টাব্দ)।

২২। **জগদানন্দ দাসজী** (১৯১২—১৯২০)—১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আবাগড়ের রাজা সূর্য্যপাল সিং (নাবালক) তাহার পক্ষে Court of wards জগদানন্দ দাসজীর নামে ১৫০ কুঠি বাবদ্ কুঠির প্রতি দুই পয়সা হিসাবে খাজনা ধরিয়া ১৬৮৲ টাকা দাবী করিয়া মুনসেফ্ আদালতে ২২৩নং মোকর্দ্দমা দায়ের করেন। এই মোকর্দ্দমাটী আপীল পর্য্যন্ত যায়। খাজনার দাবী খারিজ হয়।

ঐ Court of wards বিভিন্ন বৈষ্ণবের নামে বাকী খাজনার দাবী করিয়া Case Nos. ২১০, ২১৫ ও ১৯৬ দায়ের করেন। এই সব মোকর্দ্দমাগুলিও খারিজ হয়।

২৩। **রাধারমণ দাসজী**—

২৪। **গৌর দাসজী**—

২৫। **অদ্বৈত দাসজী**—

২৬। **সনাতন দাসজী**—ইনি ১৯২৫ খৃঃ হইতে মহান্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে 'জ্ঞানবাবু' তমালতলায় যে স্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উপবেশন

করিয়াছিলেন ঐ স্থানে একটি ক্ষুদ্র মন্দির করিয়া দেন। শ্রীকুণ্ড-দ্বয়ের 'তীর' ও 'নীর' সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা স্থানীয় বৈষ্ণববৃন্দের ধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপ।

নোট : বিভিন্ন দলিল দৃষ্টে পাওয়া যায় যে,—দাস গোস্বামীর পরবর্ত্তী কাল হইতে সদা সর্ব্বদা উপরিতন ভূম্যধিকারীগণ প্রায় অখণ্ডভাবে নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত বৈষ্ণববৃন্দকে নিজেদের অধীনে রাখিবার অপচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কখন কখন নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও বা গ্রামবাসীদের দ্বারাও নানান অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। 'নিতাই' 'গৌরের' করুণায় তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা সর্ব্বদাই ব্যর্থ হইয়াছে।

১৭। **কৃষ্ণচৈতন্য দাসজী** :—একটি নূতন ঘটনা—

১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ভূম্যধিকারীর ভৃত্যগণ জলের পানা পরিষ্কার কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল। এবারের বিরোধের তীব্রতা অনুভব করিয়া শ্রীকুণ্ডবাসী বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাসজীকে মহান্ত করেন। Date of appointment 23. 4. 29 (ইনি পূর্ব্বাশ্রমে ইংরাজী ও দর্শনের M. A. এবং বাঙ্গলার একজন প্রখ্যাত Deputy Magistrate ছিলেন।) ১৯২১ খৃষ্টাব্দে একদা মাধবদাস বাবাজী শ্রীকুণ্ডের জলের পানা পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তখন আবাগড়ের জমিদারের ভৃত্যগণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বিতাড়িত করিল। এই ঘটনায় বৈষ্ণববৃন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। সমগ্র ব্রজ মণ্ডলে এবং বাংলাদেশ বা 'গৌড় মণ্ডলে' এই সংবাদটি প্রচারিত হইল। সকলে স্থির করিলেন যে উপযুক্ত ভাবে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিরুদ্ধাচারী গ্রামবাসীবৃন্দের প্রশমিত করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী, নামময়-জীবন শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় এবং তাঁহাদেরই কৃপাসিঞ্চিত কতিপয় ব্যক্তির

সাহায্যে মহান্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাসজী ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে আবাগড়ের রাজা ও শ্রীরঙ্গজী স্বামীর নামে কুণ্ডদ্বয়ের 'জলে' ও 'স্থলে' নিজ স্বত্ব ও স্বার্থ রক্ষার্থ ও জল পরিষ্কার করিতে যাহাতে ভূম্যধিকারী বাধা দিতে না পারে তজ্জন্য মথুরার মুন্সেফ্ আদালতে ৪৮২নং স্বত্বের মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন।* বিবাদের ঘোরত্ব ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে নানা বিতর্ক লইয়া এই মোকর্দ্দমা তিনবার মহামান্য হাইকোর্ট সমক্ষে বিচারার্থ উপস্থিত হয় এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া বাদীপক্ষ সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন।

এই মোকর্দ্দমায় কাগজ, পত্র, নথি, দলিলাদি ও শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ ও সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের বিষয় বস্তু প্রস্তুত করেন নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব পরম ভাগবত শ্রীনবদ্বীপ দাসজী। পররর্ত্তীকালে ইনি যখন শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মহান্ত হন সেই সময় ইনি "শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস" নামক পুস্তিকা রচনা করেন। সেই গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তাঁহার অনুভব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (ইনি পূর্ব্বাশ্রমে B. A. BL. রংপুরের খ্যাতনামা উকিল। এবং বিরক্ত জীবনে ভাগবতভূষণ ও সাহিত্যরত্ন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।)

যথা—

"সর্ব্বত্যাগী অসহায় ভিক্ষোপজীবী গৌড়ীয় বিরক্ত বৈষ্ণবগণ যাঁহারা কেবল সাধন ভজনের জন্য ব্রজে আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই চারিশত বৎসর ব্যাপিয়া যে বৈষয়িক উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছে —ইহার পশ্চাতে কি এক রহস্য আছে তাহা কে উদ্ঘাটন করিবে? শ্রীভগবানের এই পরম বিরোধময় বিচিত্র লীলার উদ্দেশ্য কি তাহা ক্ষুদ্র জীবের বোধগম্য হওয়া কঠিন।"

১৮। **নরহরি দাসজী**—১৯৪০।৪১ খৃষ্টাব্দে—

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এই মহান্তজীর অনুমতি লইয়া ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ

* আর্জ্জি ও অডারের নকল। শেষ অংশে ২।১ সংযোজিত হইল।

ধনী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ পাল মহাশয় প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্যামকুণ্ডের জল তুলিয়া ফেলিয়া উত্তমরূপে পঙ্কোদ্ধার করিয়াছেন। এবং শ্যামকুণ্ডের প্রয়োজনীয় মেরামত কার্য্য সম্পন্ন করেন। পঙ্কোদ্ধারে দেখা গেল যে তাহার তলদেশের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণা প্রবাহিত। লোকে বলিতে লাগিল, এইসব ঝরণাও এক একটি পৃথক তীর্থ। শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যস্থলে একটি ছোট কুণ্ড দেখা গেল। ইহার মধ্যেও ঝরণা আছে, জল বরফের ন্যায় শীতল। ইহাকে 'কঙ্কনকুণ্ড' বলে। ঐ সময়ে Photo তোলা হয়, তাহার চিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।

শ্যামকুণ্ডের মধ্যস্থলেও একটি বৃহত্তর কুণ্ড আছে। ইহাকে 'বজ্র কুণ্ড' বলে। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র ইহা খনন করেন। শ্যামকুণ্ডের মধ্যেও বহু ঝরণা রহিয়াছে। (উপরের সিঁড়ির ৩টি ধাপের পর) এত উপরে এই সব ঝরণা কেমন করিয়া আসিল তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। এই সব ঝরণার জল দ্বারাই শ্রীকুণ্ডদ্বয় আবার পূর্ণ হইয়াছিল।

২৯। **নবদ্বীপ দাসজী**--পূর্ব্বাশ্রমে নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী B. A. BL. রংপুরে ২৬ বৎসর ওকালতি করার পর ব্রজে আসেন। নবদ্বীপের প্রাপ্ত উপাধি সাহিত্যরত্ন ; "ভাগবত ভূষণ"।

৩০। **কৃষ্ণচৈতন্য দাসজী**—২-৭-৫৪ হইতে তিন মাস।

৩১। **গৌরাঙ্গ দাসজী**—২-৯-৫৫—১১-৪-৫৭ পর্য্যন্ত মহান্ত ছিলেন।

৩২। **মনোহর দাসজী**—(১২-৪-৫৭—১৭-১২-৫৯) মথুরা মুন্‌সেফ্ আদালতে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৫২৮নং মামলা দায়ের হয়।

মোকর্দ্দমাটি,—সঙ্গম হইতে দক্ষিণে পরিক্রমা রাস্তা যাইবার বাঁধান স্থানে ১টি কুঠিকে লইয়া।

৩৩। **রাধাকৃষ্ণ দাসজী**—(১৮-১২-৫৯ হইতে, বর্ত্তমানেও আছেন।) ২৭।৩।৬৩ তারিখে উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় মহান্ত জয়লাভ করেন। আর একটি মোকর্দ্দমা ঃ এবার ১৩ জন রাধাকুণ্ডের পাণ্ডা ও রামদাস সাধু (নিম্বার্কি) দাবী করেন সঙ্গমে ৮´×৮´ এবং নিমতলার নিম্নের চবুতরা। মোকর্দ্দমার মধ্য পথে তাহারা পলায়ন করেন। মহান্ত একতরফা ডিগ্রী পান। Case No 373/59

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের স্বত্ব স্বামীত্বে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও আজ কয়েক বৎসর হইতে চেষ্টা চলিতেছে যে, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবদের নিকট Municipal Tax আদায় করা।

নোট ঃ **অপর দুইটি ঘটনা**—

(১) গোবালিয়রের মহারাজের ভ্রাতা শ্রীবলবন্ত ভাই সাহেব। তিনি কুসুম সরোবরের শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাসজীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং তাহার উপদেশ ক্রমে কুসুম সরোবরের নিকটে ১৯১৩ সালে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করতঃ শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করেন। ঐ মন্দির হইতে ব্রজচৌরাশীক্রোশের চারি সম্প্রদারের বৈষ্ণবগণকে মাসিক অর্থ সাহায্য করা হইয়া থাকে। মন্দির পরিচালনাদির জন্য ট্রাষ্টীগণ আছেন।

(১) ১৯১৮ সালে মহান্ত **শ্রীজগদানন্দ দাসজীর** সময়ে মণিপুরের মহারাজা ৬৫০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমায় পথ পাথরের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেন এবং ঐ রাস্তায় রাত্রিকালে আলোক দিবার বন্দোবস্ত করেন এবং এই সময়ে শ্রীব্রজমোহন দাসজির উদ্যোগে শ্রীরাধাকুণ্ডে টাউন এরিয়া অর্থাৎ **'মিউনিসিপালীটি'** প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের স্বত্ব স্বামিত্ব লইয়া মথুরায় মুনসেফ্ কোর্টে দরখাস্তের ও মুনসেফের অর্ডারের নকল ঃ

True copy of plaint in the Civil Suit No. 482 of 1931
IN

The Court of the Munsif, Muttra.

Civil Suit No. 482 of 1932

Mohant Krishna Chaitany Das Chela of Krishna Das Birakta Bairagi Sadhoo in his capacity of Mohant of Bairagi Sadhoos of Madhwa Gouriya Sampradaya of Radhakund, Krishnakund in the Pargana and Disrict Muttra............

.........**Plaintiff**

Verses

(1) Srijut Raja Suryapal Singh Sahab Rais of Awagarh.

(2) Thakur Ranggi Maharaj installed in the big Temple of his name Situated in the town of Brindaban through Sri Swami Rangacharyaji Maharaj Mohanta resident of the said Temple of Brindaban.

.........**Defendants**

The above named plaintiff begs respectfully to state as follows :—

(1) That the Sites of two adjacent Sacred tanks Radhakund & Krishnakund (Situate in village Arath alias Radhakund in the Pargana and District Muttra) which are mentioned in the

life history of Hindu God Srikrishna had through lapse of ages been forgotten even by the people of the locality and all that was left of those tanks on the spot in the 16th. century A. D. was a shallow depression in the grounds with remnants of kacha Banks here & there in which water used to collect in rainy season, paddy cropes were grown by the villagers, and the spot was then called (black & white fields) by the residents of the village.

(2) That in the 16th. century A. D. Sri Chaitanya Mahaprabhoo the most prominent saint of Madhwa Gouriya Sampradaya of Hindu religion (believed to be an incarnation of Srikrishna in his wanderings through Upper India happened to visit the village mentioned in para 1. of this plaint, which was then called (Arath) after the name of the demon Arishta that had been slaim, there by God Srikrishna.

(3) That the said saint determined the said site of Radha and Krishnakund of revered memery, which the villagers thourgh ignorance had begun to call (black & white fields) as stated above.

(4) That on his subsequent return to Puri in Orissa, the said saint deputed his disciples to go to Brajamandal (now called Muttra District) to revive Vaishnavisim, to brighten the faith of people in Srikrishna and to re-awaken their interest in the holy scenes and places connected with his early life in the locality whieh were through lapse of time well nigh forgotten as such :

(5) That thus in the 16th. century A. D. Rupa Sanatan Ballava & the latter's son Jiva Goswami, being members of a very dstinguished family who renounced, the world and

became the said Chaitanya Mahaprabhoo's disciples—came to Muttra District along with other desciples including one Raghunath Das.

(6) That the said Raghunath Das & other disciples in the 16th. century A. D. acquired by way of purchase in the name of Jiva Goswami, plots of land, the sites of present Radha & Krishnakund aforesaid as also lands surrounding and abutting on the said kunds, from the then village people owners of the land, and there-after on the said plots the said disciples, chiefly Jiva Goswami and his successors, the Mahants for the time being (with the help of well-to-do Vaisnava followers of their faith who were eager to serve them) excavated the said tanks known as Radha & Krishnakund, built PUCCA GHATS with stone steps and Banks of the said tanks, and round those tanks built temples and mainy small cottages for the residance of Birakta Sadhoos of their faith—there after called 150. 'Kutis'.

(7) That from time to time on the lands so acquired the predecessors in office of the 'plaintiff' of this Suit—the Mahant for the time being, planted trees, built a PUCCA stone-paved way for (Parikrama) perambulation round the said sacred tanks, and most of the said kutis and temples, permitted other people of their faith as also other Vaisnavas to raise temples thereon on plotes given to them and allowed Birakta Sadhoos to occupy the said cattages, ejected them in ease of their mis-behaviour and continued to exercise all the rights of ownership from the time of the said purchase hundreds of years ago upto now.

(8) That the predecessors of the plaintiff and the plaintiffs have, all along in their own right been in peaceful

possession of their said properties and have been keeping the said PUCCA GHATS in a state of good repairs, have been skimming the green moss from the surface water of the tanks and draining and cleaning the silt from the beds there of, and have also repaired and maintained the big sluice drain for rain water leading to the tank from Lalitakund.

(9) That the plaintiff to this suit, being the persent Mohant is as such vested with all the rights aforsaid.

(10) That on a few occasions during time past, the ancestors of defendant No 1. as also other persons took unwarranted steps detrimental to some of the said rights of the Mahant for the time being, and matters reaching the law courts or the Government Officer incharge of the Admistration of Justice, the rights of the Mahant for the time being, were vindicated.

(11) That inspite of several adjudicatians declaring the said right of ownership of the predccessors of the plaintiff, the servants of defendants No. 1 & 2 have of late, since a notice was given to them in Nov, 1930, begun to offer casual and half-hearted obstructions in skimming the moss from surface water of the tanks and removing silt from the bed of the same and works incidental to the same and there-by are clouding the title of the plaintiff only in portions marked in blue in the map appended to this plaint, being the land which underlies the tank. The defendants or their predecessors have nor have had any semblance of title to the same. The plaintiff and his predecessors have been owners and possessors of the same long before the advent of the British rule and the purchase by defendants' predecc-

ssors. Under the above circumstances the plaintiff is entitled to a declaration of his right to it and perpetual injunction against defendants No. 1 & 2, or any such other consequential relief as the circumstances of the case permit.

(12) That because in July last the said perfunctory opposition and obstruction has been started, cause of action for the siut arose to the plaintiff in July 1931 against defendant No. 1 and 2 at village Radhaknnd, Pargana Muttra, within the jurisdiction of this court.

(13) That in order to avoid the worry of a Law siut the plaintiff by means of his hunble petition dated the September 29th. 1931 prayed the defendants 1 & 2, to direct their servants not to molest the sadhoos occupying the said 'Kuties' by leave & licence and on behalf of the plaintiff, in the exercise of plainliffs right referred to above, in Para II, but as yet they have vouch-safed no reply, hence the present suit.

(14) That as the Collector Sahib of Muttra has in reply to a formal notice of suit under section 80 of C. P. C. assured the plaintiff that the Government did not claim the property in dispute as its own, the Secretary of State for India in Council is not made a pary.

(15) That the object of this suit is not at all to infringe in any way the right of public to visit and use the sacred Tanks Radha and Krishnakund for religious purposes or to object to the pandas or any other persons leeding the pilgrims to the said Tanks and taking voluntary gifts from them.

(16) That for perpose of Jurisdiction & payment of Court fees this suit is valued at Rs. 1000/- (One thonsaned) as stated below :—

Prayer :

(A) That it may be dclared that the plaintiff in his capacity of Mohant of Birakta Shadhoos of Radhakund of the Madhwa Gouriya Sampradaya is the owner of the land lying under the tanks Krishnakund and Radhakund situate in the town of Radhakund, pargana and district Mattura of which land 'a plan coloured blue' is herewith submitted and on which the plaintiff relies. Valued at Rs. 800/- the value of the land.

(B) The defendants be restrained by a perpetual injunction from interfering with the exercise of his rights by the plaintiff to skim the moss from the surpace water and to remove silt from the beds of the said tanks, and other acts incidental thereto. Valued at Rs. 200/-

(C) The Cost of this Suit may be awarded against the contesting defendants.

(D) That any other relief to which the Court may appear just may be granted to the plaintiff.

The contents of paragraph 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and part of Para 8. paras 10, 12, and 16 of this plaint are stated on information received and believed to be true and the contents of part of para 8, 9, 11, 13, 14 and 15 are stated out of my own knowledge.

Verified at......
By.... .
general attorney of the plaintiff aforesaid.
Autograph signature of ....
Dated the 5th. Nov. 1931.

Signature of
(in Urdu)

Order :—

Subject to the right of the hindus to visit & use the sacred tanks Radhakund & Krishnakund for religious purpose and the right of the pandas to lead the pilgrims there and take voluntary gift from them, the plft in his capacity as the Mahanta Gouriya Samprodarya is declared to be the owner and the claim for perpetual injunction is decreed to be their owner and the claim for perpetual injunction is decreed as prayed. The plft will have his Costs from the Difts & the latter will bear their own.

Sd. Bindbashini Prasad

Munsif. 1. 6. 33

---

(৩)

কবিরাজ গোস্বামি বিরচিত দাস গোস্বামীর সংস্কৃত শোচক ও পয়ারে অনুবাদ ঃ

বন্দে রঘুনাথদাসং রাধাকুণ্ড নিবাসিনং।
চৈতন্য-সৰ্ব্বতত্ত্বজ্ঞং ত্যক্তান্যাভাবমুত্তমম্॥
(শ্রীজীব গোস্বামীকৃত বৈষ্ণববন্দনা)

আমাদের গ্রন্থ মন্দিরে (শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির, শ্রীশ্রীভাগবত আচার্য্যের পাটবাড়ী, বরাহনগর)—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শোচক (সংস্কৃতে) আছে।
(পুঁথি নং ১৩৫৫।৬০)

পরবর্ত্তী মহাজন শ্রীল রাধাবল্লভ দাস কর্তৃক বাংলা পয়ারে (বৃহৎ ভক্তিতত্ত্বসারে ধৃত) দাস গোস্বামীর শোচকটি যে কবিরাজ গোস্বামীর সংস্কৃতেরই বঙ্গানুবাদ তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়। এখানে আমরা প্রথমে কবিরাজ গোস্বামীর সংস্কৃতে বিরচিত দাস গোস্বামীর শোচক ও তাহার বাংলা পয়ার নীচে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

শ্রীচৈতন্যহরেঃ কৃপাসমুদয়াদ্দারান্ গৃহান্ সম্পদঃ
সদ্দেশাধিপত্যঞ্চ যঃ স্বমলবৎ ত্যক্ত্বা পুরশ্চর্য্যয়া।*
প্রাপ্তঃ শ্রীপুরুযোত্তমং পদযুগং তস্যাসিষেবে চিরং
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্‌গোচরঃ॥ ১

---

* শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণের প্রথম পাদে "ছন্দোভঙ্গ" থাকা সত্ত্বেও আদর্শ পাঠটিই রক্ষা করা হইল।

শ্রীচৈতন্য কৃপা হইতে রঘুনাথ দাস চিতে
পরম বৈরাগ্য উপজিলা।
দারাগৃহ সম্পদ নিজ রাজ্য-অধিপদ
মল প্রায় সকল ত্যজিলা॥
পুরশ্চর্য্যা কৃষ্ণ নামে গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
নয়নগোচর কবে হবে॥

রাধাকৃষ্ণ ইতি স্বনাম দদতা গোবর্দ্ধনাদ্রেঃ শিলাং
গুঞ্জাহারমপি ক্রমাৎ ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে যঃ স্বয়ং।
রাধায়াঞ্চ সমর্পিতঃ করুণয়া চৈতন্যগোস্বামিনা
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্‌গোচরঃ॥ ২

গৌরাঙ্গ দয়াল হঞা রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে
সমর্পণ করিলা তাহারে॥
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
নয়ন গোচর কবে হবে॥

চৈতন্যে নিভৃতং ব্রজং গতবতি ছিত্ত্বা কচান্ যো ব্রজং
প্রাপ্তস্তদ্ বিরহাতুরঃ স্বকবপুর্হাতুঞ্চ গোবর্দ্ধনে।
দ্রষ্টুং রূপসনাতনৌ কৃততনুত্রাণশ্চ তাভ্যাং বলাৎ
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্‌গোচরঃ॥ ৩

চৈতন্যের অগোচরে নিজ কেশ ছিঁড়ে করে
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি মনে গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে
দুই গোসাঞি তাহারে দেখিলা ॥
ধরি রূপ সনাতন রাখিল তার জীবন
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঞির আজ্ঞা পাঞা রাধাকুণ্ড তটে গিয়া
বাস করি নিয়ম করিলা ॥
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
নয়ন গোচর কবে হবে ॥

রাধাকুণ্ডতটে বসন্ নিয়মিতঃ স্বভ্রাতৃরূপাজ্ঞয়া
বাসঃ কম্বলকৈঃ ফলৈর্ব্রজভুবৈর্গব্যৈশ্চ বৃত্তিং দধৎ
রাধাং সংস্মৃতিকীর্ত্তনৈর্ভজতি যঃ স্নানং ত্রিসন্ধ্যং চরন্
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্‌গোচর ॥ ৪

ছেঁড়া কম্বল পরিধান বনফল গব্য খান
অন্ন আদি না করি আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি স্মরণ কীর্ত্তন করি
রাধাপদ ভজন যাঁহার ॥
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
নয়ন গোচর কবে হবে ॥

পঞ্চাশদ্ ঘটিকাঃ সদানয়দহোরাত্রস্য ষট্ সংযুতা
রাধাকৃষ্ণবিলাসসংস্মৃতিযুতৈঃ সঙ্কীর্ত্তনৈর্বন্দনৈঃ।
যঃ শেতে ঘটিকাচতুষ্টয়মিহাপ্যালোকতেস্বেশ্বরৌ
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্‌গোচরঃ ॥ ৫

ছাপান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণ গুণগানে
স্মরণেতে সদাই গোঙায়।
চারি দণ্ড শুতি থাকে স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়॥
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
নয়ন গোচর কবে হবে॥

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপো যঃ শ্রীস্বরূপাশ্রিতো
রূপাদ্বৈততনুঃ সনাতনগতির্গোপালভট্টপ্রিয়ঃ।
শ্রীরূপাশ্রিতঃ সদ্গুণাশ্রিতপদো জীবেঽতিবাৎসল্যবান্
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ॥ ৬

গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে রাখে মনোভৃঙ্গরাজে
স্বরূপের সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপের সনে গতি যার সনাতনে
ভট্টযুগ প্রিয় মহাশয়॥
শ্রীরূপের গণ যত তাঁর পদে আশ্রিত
অত্যন্ত বাৎসল্য যাঁর জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি কাঁদি বলে হরি হরি
প্রভুর করুণা হবে কবে॥
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
নয়ন গোচর কবে হবে॥

শ্রীকৃষ্ণং স্বগণং শচীসুতমথো নানাবতারাংশ্চ যঃ
শ্রীমূর্ত্তীশ্চ নিশামিতা নিশমিতা যাযাশ্চ লীলাস্থলীঃ।
প্রত্যেকং নমতীহ বৈষ্ণবগণান্ দৃষ্টান্ শ্রুতান্ প্রত্যহং
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ॥ ৭

শ্রীচৈতন্য শচীসুত তাঁর গণ হয় যত
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব
সবারে করয়ে পরণাম ॥
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
নয়ন গোচর করে হবে ॥

রাধামাধবয়োর্বিয়োগবিধুরো ভোগানশেষান্ ক্রমাৎ
চৈতন্যস্য সনাতনস্য চ রসান্ ষট্ চান্নমপ্যত্যজৎ।
শ্রীরূপস্য জলং বিনা হরিকথাং বাচং স্বরূপস্য যো
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ ॥ ৮

রাধাকৃষ্ণ বিয়োগে ছাড়িল সকল ভোগে
শুখারুখা অন্ন মাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে অন্ন ছাড়ি দিল আগে
ফল গব্য করিল আহার ॥
সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে
কেবল করয়ে জল পান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে জল ছাড়ি দিল তবে
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ ॥
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
নয়ন গোচর কবে হবে ॥

হা রাধে ক নু কৃষ্ণ হা চ ললিতে ক ত্বং বিশাখেঽসি বা
হা চৈতন্যমহাপ্রভো ক নু ভবান্ হা হা স্বরূপ ক বা
হা শ্রীরূপসনাতনেত্যনুদিনং রোদিত্যলং যঃ সদা
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ ॥ ৯

শ্রীরূপের অদর্শনে না দেখি তাঁহার গণে
বিরহে ব্যাকুল হঞা কাঁদে।
কৃষ্ণকথা আলাপনে না শুনিয়া শ্রবণে
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে ॥
হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা কোথা বিশাখা ললিতা
কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা 'স্বরূপ' মোর প্রভু
হা হা প্রভু রূপ সনাতন ॥
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
নয়ন গোচর কবে হবে ॥

যঃ প্রাপ্তান্ ব্রজবাসিনোহতিশিশূন্ মান্যান্ দ্বিজান্ বৈষ্ণবান্
প্রীত্যোত্থায় মুদোপগুহ্য তিলকেনাভ্যার্চ্চয়ন্ ভাষণৈঃ
মৈত্র্যা কৃষ্ণপদাশ্রিতান্ সুখয়তি স্বাজ্ঞ্যাশ্রিতান্ লালনৈঃ
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্‌গোচরঃ ॥ ১০

যিনি ব্রজবাসীগণকে এবং ব্রজবাসী শিশুবৃন্দকে মান্য করিতেন এবং তত্রস্থ বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণকেও মান্য করিতেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়াই প্রীতির সহিত উত্থিত হইয়া তাহাদিগকে সন্তোষ বিধান আলাপ ও উৎকৃষ্ট প্রীতির উপহার দ্বারা অভ্যর্থনা করিতেন এবং কৃষ্ণ-ভক্ত মাত্রকে ও নিজের আশ্রিত জনকে সমভাবে লালন করিতেন সেই শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আবার আমার নয়ন গোচর হোন।

চৈতন্যস্য সনাতনস্য চ বিনা রূপস্য সংদর্শম্
চক্ষুষ্মত্বমিদং বৃথেতি বিমৃশন্নন্ধ্যং দধে স্বেচ্ছয়া।
স্বাচারং দ্বিগুণীচকার ভজনং চান্ধ্যেহপি যঃ সাগ্রহম্।
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্‌গোচরঃ ॥ ১১

যিনি শ্রীচৈতন্য দেব, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপের অদর্শনে নিজের দৃষ্টিকে বৃথা মনে করিয়া স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব সাধন করিয়া ছিলেন এবং অন্ধাবস্থায় নিজের আচরণ এবং ভজনে দ্বিগুণ আগ্রহ সাধন করিয়া ছিলেন সেই শ্রীরঘুনাথ আমার নয়ন গোচর হোন।

রাধাবল্লভ রাধিকাদয়িত হে গান্ধর্ব্বিকাবান্ধব
শ্রীরাধা প্রিয় রাধিকারমণ হে বৃন্দাবনেশেশ্বর
গোবিন্দাচ্যুত কৃষ্ণ ভো কুরুকৃপা'মিথ্যং সদা রৌতি যঃ
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্‌গোচরঃ॥ ১-

হে রাধাবল্লভ গান্ধর্ব্বিকা-বান্ধব
রাধিকারমণ রাধানাথ।

* * * *

রাধে মাধবি মাধবপ্রিয়তমে গান্ধর্ব্বিকে রাধিকে
কৃষ্ণ প্রেয়সি দেবি কৃষ্ণ দয়িতে কুণ্ডপ্রিয়াধিশ্বরি
দানং মাং স্বপদান্তিকং নয় দয়াং কুর্ব্বত্যলং রৌতি যঃ
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্‌গোচর॥ ১৩

হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা কোথা বিশাখা-ললিতা
কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা স্বরূপ মোর প্রভু
হা হা প্রভু রূপ সনাতন॥

* * * *

ইদমমলং তৎপ্রকৃতি সূচকং শ্রীহরিপ্রণয় বিলসৎ সরস ভক্তি-

—সিন্ধোস্তবম্

পঠতি কৃতীহ রঘুনাথদাসস্য যঃ, স ভবতি রাধিকা হরেঃ

—কৃপাভাজনম্

ইতি—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিনঃ গুণলেশ সূচকং সমাপ্তম্।

নোট: ১০ ও ১১ নম্বর শ্লোকের অনুবাদ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর দেবশর্ম্মা কৃত।

(৪)

"শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধি সম্বন্ধে" :

'শ্রীকুণ্ড-তটে' দাস গোস্বামীর সমাধি মন্দির আজও বর্ত্তমান। ঐ সমাধিকে প্রত্যহ স্নান, আহ্নিক, তিলক, 'মাঠা-ভোগ' সমর্পণ আদি সবই করা হয়। এই সমাধির সেবক শ্রীভাগবত দাস বাবাজী মহাশয়ের চেষ্টা ও নেতৃত্বে ১৩৭১ বঙ্গাব্দের শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমা (৩ রা চৈত্র বুধবার) হইতে 'অখণ্ড নাম সংকীর্ত্তন' চলিতেছেন।

কিন্তু এই সমাধিটি তাঁর (দাস গোস্বামীর) 'পুষ্প সমাধি' কি 'পূর্ণ সমাধি' তাহা বলা যায় না। প্রথমতঃ কোনও গ্রন্থে উল্লেখ নাই। তারপর, যাঁহাদের প্রায় একশত বর্ষ বয়স (এখনো প্রকট) এইরূপ বিভিন্ন ব্রজবাসী ও বৈষ্ণববৃন্দের সহিত আমরা আলাপ করিয়াছি। কোন হদিস পাওয়া যাইতেছে না।

'গম্ভীরা-বিহারী গৌরহরির নীলাচল লীলার ধারক'

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধি

'বৈষ্ণব মতে 'আবির্ভাব, 'তিরোভাব' রহস্য' ঃ

বৈষ্ণব ধর্ম্মমতে 'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' যেন অভিনয় মঞ্চে যবনিকাপাত।

'যবনিকাটি' ওঠান থাকিলে দর্শকবৃন্দ অভিনয় ও অভিনেতাদের দেখিতে পায়। আর যবনিকাটি ফেলা থাকিলে দর্শকমণ্ডলী কিছুই দেখিতে পায় না। কিন্তু যাঁরা যাঁরা রঙ্গমঞ্চের অধিকারীর নিজজন, তাঁরা যবনিকাপাত থাকিলেও অভিনেতাদের সহজেই দেখিতে পান্। এমন কি অভিনয়কালে, তাঁহাদিগকে (অভিনয়ের মর্য্যাদায়) সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া পার্টির লোকদের ও অভিনেতাদের দেখিতে হয়; আর, যবনিকা পড়িলে তাহাদের (অধিকারীর লোকদের) সে সম্ভ্রম ঘুচিয়া যায়।—আসে নিবিড় 'আত্মীয়তা' 'অন্তরঙ্গতা'।

এই কারণে, কোনও 'বৈষ্ণবগ্রন্থে তিরোভাব' তিথিটি ছাড়া 'অপ্রকট' বৎসরের উল্লেখ দেখা যায় না।

যুগের পরিবর্ত্তনে ও ভক্তির দুর্ল্লভতায় কিম্বা ন্যূনতায় আজ সমাজের এক অংশ, আচার্য্যবৃন্দের তিরোভাব বৎসর নির্দ্ধারণে মহা ব্যস্ত। ফলে দেখা যায় "কেবল বাক্যের বাণিজ্য"। **যাহা সংরক্ষিত হয় নাই,—তাহা আজ কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে?**

"আরোপে আরতি হেরে দাস গোস্বামী হুঁ হুঁ করে" ঃ

আরোপ (আ—রুপ+ণিচ্ ভাবে অচ্) অভেদ ভাবনা ।

মহাজনী পদ—

"সুর-নর মুনিগণ, হেরতহিঁ আরতি
ভকত বৎসল প্রতিপালকী ।
বাজে ঘণ্টা তাল, মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী,
অঞ্জলি কুসুম গুলাবকী ॥
হুঁ হুঁ বলি বলি রঘুনাথ দাস গোস্বামী"

বাবাজী ম'শায়ের আখর ঃ

"গোসাঞি, আর ত' কিছু বল্‌তে নারে
'আরোপে আরতি হেরে'
—"গোসাঞি, আর ত' কিছু বলিতে নারে
গোসাঞির, প্রেমে কণ্ঠ রোধ হল রে
কেবল, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করে
গোসাঞি-এর বয়ান ভাসে নয়ন নীরে
—কেবল, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করে
নন্দগ্রামের পানে চেয়ে, কেবল, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করে

শ্রীকুণ্ড তীরে গড়ি যায় যায় রে

বলে, তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি
'রাধে', ত্বয়া বিনা ন জীবামি বলে, তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি

রাধে, আমি তোমার আমি তোমার

আমি তোমা বিনা বাঁচি না গো

—রাধে, আমি তোমার আমি তোমার

এত বলি, শ্রীকুণ্ড তীরে গড়ি যায় রে"

দাস গোস্বামী শ্রীকুণ্ড-তটে। গোধূলী '[illegible]', [illegible] দর্শন করিতেছেন—

(বিভু) নন্দগ্রাম সহ নন্দনন্দনের আরতিকারিণী সগোষ্ঠী মা যশোদা।—সঙ্গে সঙ্গে ভাবান্তর বা দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইল।—এখন দেখিতেছেন—

(বিভু) নীলাচলধাম সহ শ্রীল 'জগন্নাথদেবের আরতি' দর্শনকারী 'গৌরসুন্দর'।—এ গৌরসুন্দর হচ্ছেন—'বিরহিনী শুদ্ধ রাধা'।

'দাস গোস্বামীর' কৃপা কটাক্ষে, কবিরাজ গোস্বামীতেও এই 'আরোপে' দর্শনের শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। দিক দর্শন হিসাবে দেখানো হচ্ছে—

যতো যতঃ পততি বিলোচনং হরে
স্ততস্ততঃ স্ফুরতি তদঙ্গ সংহতিঃ।
ন চাদ্ভুতং তদিহ তু যৎ ব্রজাটবী
মুদে হরেরলভত রাধিকাত্মতাম্॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৬ষ্ঠ সর্গ ২৫ শ্লোক)

* পয়ারে বঙ্গানুবাদ—

'যে যে দিকে নটরাজ করে নিরীক্ষণ।
সেই দিকে হয় প্রিয়া অঙ্গের স্ফুরণ॥
হইল শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরাধিকাময়।
প্রাণ প্রিয়তম কৃষ্ণে দিতে সুখচয়॥'

---

* শ্রীশশধর সরকারের পয়ারে অনুবাদ—

"শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী তত্ত্ব"

শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম (বরাহনগর, কলিকাতা-৩৫

"নদে" "নীলাচল" ও "ব্রজ"—এই তিন ভূমির 'প্রকটিত ও অপ্রকটিত' পরিকর সহ সমন্বয় ভূমি যে "খেতুরী" তাহার অনুভবী দ্রষ্টা শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়ের 'নিত্য' বসতিস্থলী হচ্ছেন, এই শ্রীপাঠবাড়ী।

—ইনি ঐতিহাসিক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য—

--বাবাজী ম'শায়ের পরিজনদের পরিচয় তিনি নিজেই 'কীর্ত্তনে' ব'লে গিয়েছেন।

প্রখ্যাত শ্রীল ভাগবতাচার্য্য এবং প্রখ্যাত শ্রীল রামদাস এই শ্রীপাঠবাড়ীতে 'নিত্য' অবস্থান ক'রছেন।

এই স্থানটির প্রকৃত পরিচয় মহাপাঠবাড়ী—লোকে এ নামের পরিচিতি নাই।

ভারতে বিভিন্ন স্থানে অপূর্ব্ব বৈভব সম্পন্ন বৈষ্ণব মহাপুরুষবৃন্দের 'শ্রীপাট' আছেন। কিন্তু এই 'মহাপাঠবাড়ীটি' 'স্বীয় বৈশিষ্ট্যে' 'স্বমহিমায়' 'অনন্য সাধারণ' এবং 'তুলনাহীন'।

(শ্রীগুরুদেব শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়কে 'বুকে-ধরা' এই 'মহাপাঠবাড়ীর' করুণাতেই এখানে অবস্থান পূর্ব্বক "ঠাকুর হরিদাস" ও "দাস গোস্বামী" এই শ্রীগ্রন্থদ্বয়ের মুদ্রণ কার্য্য সু-সম্পন্ন হ'য়েছে।)

"শ্রীগুরু কৃপায় কি না হয় ?"

"দাস গোস্বামী" গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্কলন "ঠাকুর হরিদাস" সম্বন্ধে প্রখ্যাত মণীষিবৃন্দের অভিমত—

যাঁহারা যাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে সঙ্কলয়িতার সহিত পরিচিত, আশা-করি তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে এইরূপ কার্য্য "শ্রীগুরু কৃপা ছাড়া" এই মূর্খ নির্ব্বোধ সঙ্কলয়িতার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

—এ সঙ্কলনে সঙ্কলয়িতার স্থান যেন "পায়েসের ডাবু" ঃ

—অর্থাৎ পরম সমর্থ দানবীর ধনী ব্যক্তি 'পরমান্ন' প্রস্তুত ও পরিবেশন,—এই উভয় কার্য্য জন্য রস-গ্রহণে অক্ষম, অতি তুচ্ছ একটি 'ডাবু' ব্যবহার করেন, (সেইরূপ) নির্হেতুক কৃপাকারী "শ্রীগুরু করুণা" 'অপদার্থ' তুচ্ছ সঙ্কলয়িতাকে "ঠাকুর হরিদাস" ও "দাস গোস্বামী" সঙ্কলনে ও প্রকাশে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা সু-সত্য সু-সত্য।

—সঙ্কলক

অভিমত সংকেত ঃ

১। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—
২। ” ” শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—
৩। ” ” রমেশচন্দ্র মজুমদার—
৪। ” ” কালিদাস ভট্টাচার্য্য—
৫। ” ” মহানাম ব্রহ্মচারী—
৬। — ” চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—
৭। ” ” বিমানবিহারী মজুমদার—
৮। — ” দেবপ্রসাদ ঘোষ—
৯। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালিপদ তর্কাচার্য্য—
১০। শ্রীযুক্ত মধুসূদন ন্যায়াচার্য্য—
১১। প্রিন্‌সিপ্যাল নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় M A
১২। শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী—
১৩। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত—
১৪। অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর—
১৫। ডক্টর শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—
১৬। ” ” শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়—

পত্র পত্রিকা ঃ

অমৃত—
উদ্বোধন—
উজ্জীবন—
দেশ—
প্রবর্ত্তক—(১)
প্রবর্ত্তক—(২)
ভাবমুখে—
বসুমতী (দৈনিক)—
বিশ্ববাণী—
যুগান্তর—
শ্রীসুদর্শন—
সংহতি—
সংসদ—
হিমাদ্রী—

বৈষ্ণবাচার্য্য ঃ

শ্রীপাদ কানুপ্রিয় গোস্বামী—(নবদ্বীপ)
শ্রীল গৌরগুণানন্দ ঠাকুর—(শ্রীখণ্ড)— এবং অন্যান্য অভিমত।

"ঠাকুর হরিদাস" সম্বন্ধে—
ভারতের তথা বাংলার প্রখ্যাত মনীষিবৃন্দের অভিমত :

!! ওঁ !! !! শ্রী !!

Dr. Suniti Kumar Chatterji, Sahityartana.
(National Professor of India in Humanities)
16, Hindusthan Park,
Calcutta-29

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর দাস সঙ্কলিত "ঠাকুর হরিদাস" পুস্তকখানি অতি মূল্যবান সংযোজন। শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকদের মধ্যে ঠাকুর হরিদাস মুসলমানের ঘরে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া যিনি 'যবন হরিদাস" নামে সুপরিচিত—একজন ক্ষণজন্মা ভক্ত পুরুষ এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ প্রীতিভাজন অনুগামী ছিলেন। ধর্ম্মের জন্য এবং নাম প্রচারের জন্য ইহাকে প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, প্রাণপণ করিয়া ইনি আপনার ধর্ম নীতিতে অটল ছিলেন, এবং অহিংসক নীতিতে ইঁহার প্রতিরোধ হইয়াছিল বলিয়া শেষে ইনি জয়ী হইয়াছিলেন। ইহার বৈষ্ণবোচিত দীনতা ও বিনয়, আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণের কথা প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তিকে অনুরূপ ভাবের দ্বারা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা দ্বারা আপ্লুত করে।

বৈষ্ণব সাহিত্য সাগর মন্থন করিয়া এই অতি উপাদেয় গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। মনে হয়, এখানি হরিদাস সম্পৃক্ত আখ্যান ও অন্য কথার একটি পরিপূর্ণ সম্পুট। মূল বা আকর গ্রন্থ সমূহ হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি পুস্তকের প্রামাণিকতা বৃদ্ধি করিয়াছে। পরিশেষে

শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী প্রমুখ সাধকের হরিদাস সম্বন্ধীয় কীর্ত্তন পদ দেওয়া হইয়াছে—তাহা হইতে বাঙ্গলাদেশে বৈষ্ণব জনগণের মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত ঠাকুর হরিদাসের প্রতি যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বিদ্যমান তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় মিলিবে।

এই সুলিখিত ও সুমুদ্রিত পুস্তকে গ্রন্থকার কতকগুলি রঙীন ও একরঙ্গা চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সেগুলির মধ্যে দুই চারখানির বিশেষ মূল্য আছে—যেমন কুঞ্জঘাটা রাজবাড়ীতে রক্ষিত শ্রীচৈতন্য দেবের পরিকর সহ চিত্র—ইহা হইতে ঠাকুর হরিদাসের ছবিখানি তিন রঙের ব্লকে বড় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আশা করি ভক্ত, ঐতিহাসিক সাহিত্যিক ও সাধারণ পাঠক সমাজে এই বইয়ের উপযুক্ত সমাদর হইবে। ইতি ২১শে বৈশাখ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, ৫ই মে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

Dr. SRIKUMAR BANARJEE
M. A. B. L. Ph. D.

31, Southern Avenue,
Calcutta-29

Dated Cal. the 24th May 1967

শ্রীশ্রী৺দুর্গা

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু—

আপনার সঙ্কলিত ঠাকুর হরিদাস গ্রন্থখানি আস্বাদন ক'রে সমস্ত অন্তর এক অনির্ব্বচনীয় মধুর রসে আপ্লুত হয়ে গিয়াছে। আপনি যেরূপ একান্ত আত্মনিবেদন ও ভক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে হরিদাসের পুণ্য জীবন কাহিনীর বিবৃত করেছেন ও ঘটনা বিবৃতির সঙ্গে যে রসাস্বাদন যুক্ত করেছেন তাতে গ্রন্থখানি আমাদের মত বিষয়াসক্ত ও চৈতন্য কৃপাহীন জীবকেও এক দিব্য ভাব জগতে উত্তীর্ণ করে দেয়

আর হরিদাস সাধনায় অন্তর্নিহিত রসটি পরিস্ফুট করার জন্য নাদ-সিদ্ধ সিদ্ধভক্তপ্রবর শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের সে অমৃতস্যন্দী কীর্ত্তন-বিলাস ও তার মধ্যে অপূর্ব্ব আঁখর সংযোজন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে. তাতে অনাবিল, অজস্র উচ্ছ্বসিত ভক্তিস্রোতোধারায় সমস্ত চিত্ত প্লাবিত হয়ে মহাতীর্থ সঙ্গমে অবগাহনের আনন্দ উপভোগ করে।

এই গ্রন্থের অমৃতরস অভিষেকের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মের কতকগুলি নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে নূতন আলোক চিত্তে স্ফুরিত হয়। সর্ব্বপ্রথম, শ্রীচৈতন্য পরিকর গোষ্ঠীর মধ্যে—হরিদাস ঠাকুরের অনন্য বৈশিষ্ট ও কেন্দ্রিক আসনটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। শ্রীচৈতন্য অবির্ভাবের পূর্বেই সে দুই জন সাধকের অন্তরে তাঁর আগমনের পূর্বাভাস উন্মেষিত হয়েছিল—তাঁরা হচ্ছেন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর। এঁরা চৈতন্যের প্রেমধর্ম নিজেদের অন্তরে অনুভব করেছিলেন ও নাম কীর্ত্তন রসে মগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য জীবনী গ্রন্থ ও বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী যেন শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী প্রভুকেই কিছুটা প্রাধান্য দিয়েছে। অদ্বৈত চৈতন্য পরিকর গোষ্ঠীর ঠিক কেন্দ্রস্থলে স্থান পেয়েছেন। হরিদাস তাঁহার বিনয় দৈন্যের আতিশয্য ও নির্জন সাধনারতির জন্য যেন একটি পার্শ্বচরিতে পরিণত হয়েছেন। তিনি চৈতন্য ভাবমণ্ডলের প্রান্তলগ্ন একটি স্তিমিত জ্যোতিষ্করূপেই সাধারণ ভক্ত পাঠকের নিকট প্রতিভাত হয়ে থাকেন। আপনার গ্রন্থ পাঠে এই ঐতিহাসিক মূল্য বোধের একটা আমূল পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। হরিদাসই এই জ্যোতিরুৎসবের প্রধান গ্রহ রূপে কেন্দ্রিয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী হয়েছেন। তিনি চৈতন্য ধর্ম্মের দুইটি প্রধান তত্ত্বের একনিষ্ঠ সাধক ও মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। নাম মহাত্ম্যের তিনি বিশুদ্ধতম প্রতীক ও স্বয়ং চৈতন্যদেব তাঁর সংস্পর্শ থেকে তাঁর নিজের মহামন্ত্রের পূর্ণ মাধুর্য্য ও শক্তি উপলব্ধি করেছেন।

আর তাঁর অহিংসা ও অক্রোধ সমদর্শী সর্ব্বজীবে প্রেম হরিদাসের পুণ্য জীবনে যতটা দিব্যরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে এমন আর কোন ভক্তের মধ্যে হয়নি তাছাড়া হরিদাসের তিরোধানে স্বয়ং চৈতন্যদেবকে যত গভীরভাবে অভিভূত করেছে ও তাঁকে প্রেমানন্দ নৃত্যে মাতোয়ারা করেছেন, তিনি হরিদাসের মহাপ্রয়াণকে যতটা দিব্যভাবরসে অভিষিক্ত করেছেন, আর কোন চৈতন্য—অন্তরঙ্গের সে সৌভাগ্য হয় নি। চৈতন্যদেব তাঁর গভীর ভাবমুগ্ধতার ও প্রেমাশ্রুবর্ষণের অর্ঘ্য নিবেদনে হরিদাস যে তাঁর দ্বিতীয় সত্তা তার অখণ্ডনীয় স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন।

তাছাড়া, বৈষ্ণব সাধনার কেন্দ্রস্থ নিগূঢ় তত্ত্ব প্রত্যয়ও হরিদাসের নামযজ্ঞ সমাহিত, আপাত-জটিলতাহীন, একনিষ্ঠ ভজন প্রণালীর মধ্যে নিহিত। তিনি শুধু নাম জপ করেই সাধারণ ভক্তের মধ্যে নাম মহিমা প্রচার করেই, নামের মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে পরিচিত হয়েই গৌরাঙ্গ দেবের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-মিলন-তত্ত্ব, দ্বৈত সত্তার অভেদাত্মক রূপ ও গৌর-নিতাইএর নিগূঢ় অন্তরঙ্গতা-রহস্যের মর্মভেদ করেছিলেন। নীলাচল প্রবাস কালে ও সন্ন্যাস গ্রহণের পুর্বে নবদ্বীপ লীলার প্রারম্ভস্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে অন্তরঙ্গ ও বাহিরঙ্গ সাধনার একটি সুস্পষ্ট সীমা নির্দ্দেশ করেছিলেন, ও অধিকারীভেদে তাঁর ভক্তগোষ্ঠীকে দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীতে স্থান দিয়াছিলেন, হরিদাস তাঁর নির্জন সাধনা ও চৈতন্য-সঙ্গ পরিহার সত্ত্বেও এই দুই রূপ সাধনার মধ্যে সংযোগ সেতু রচনার হেতু হয়েছিলেন। নীলাচল বাসী মহাপ্রভু গম্ভীরার সাধনা-প্রকোষ্ঠে অলৌকিক কৃষ্ণ-বিরহরস আস্বাদন করে সিদ্ধ বকুল তলায় গুহাহিত হরিদাসের কাছে এসে তাঁর আনন্দের পূর্ণতা লাভ করতেন। শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজীর ধ্যানতন্ময়, সাধনানির্মল অনুভূতি হরিদাসের প্রতি শ্রীচৈতন্যের রহস্যময় আকর্ষণের মুল কারণটি আবিষ্কার করেছে। হরিদাসের আননের স্বচ্ছ মুকুরে তিনি তাঁর সত্তো অনুভূত

অপ্রাকৃত ভাবরোমাঞ্চমুকুলিত স্বত্বার প্রতিফলন দেখতেন। ভক্তের বদন-দর্পণে ভগবানের লীলা-বিলাস রহস্য প্রতিবিম্বিত হয়ে তার বহিঃরূপ ইন্দ্রিয়গম্য প্রত্যক্ষতায় প্রতিভাত হত। অন্তরে বন্দী রতন-ঝলক বাহিরে ছটা বিস্তার করত; হরিদাসের নাম-সাধনা তাই চৈতন্যাবতারে অনুষ্ঠিত বৃন্দাবন লীলার গোপন বার্ত্তাটির বহিঃনিষ্ক্রমণ পথ রচনা করে. চৈতন্য প্রত্যয়কে ঘনীভূত করে প্রেম-ধর্ম-রস-চর্চ্চাকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর করে দিয়েছে। চৈতন্য ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে আর কার এরূপ অন্তরতম দৌত্যে অধিকার জন্মেছিল?

নিত্যানন্দ পর্য্যন্ত এই গূহ্য সাধনার প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলেন এমন কথা বৈষ্ণব মহাজন গ্রন্থে অনুল্লিখিত। তিনি অমৃত কলসের ভাণ্ডারী ছিলেন, কিন্তু এই অমৃত ঘট কিরূপ অলৌকিক কামধেনু দোহনে পূর্ণ হত, তার উৎস-সন্ধানী ছিলেন কি?

আরও একটি বৈষ্ণব ধর্মের মুল তত্ত্ব হরিদাস ঠাকুরের জীবনের পটভূমিকায় নব তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে নাম কীর্ত্তন শুধু বহিরঙ্গ সাধনার জপ-মন্ত্র, নামপ্রেম থেকে শুদ্ধাভক্তির স্ফুরণ হয় ও এই নামই সংসার-সাগর-ততীর্ষু জনগণের 'মহাতরণী' এই ধারণার কারণ এই সে আমরা নাম সাধনার প্রথম প্রারম্ভের কথাই জানি, তার চরম সিদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। এই রাধা-নাম-বর্জিত, দিব্যপ্রেমব্যঞ্জনা-হীন, কেবল ভক্তি প্রেরণা প্রণোদিত নাম জপের মধ্যে যে মহাপ্রভুর জীবন সাধনার সূক্ষ্মতম নির্য্যাস ও প্রেমানুভূতির মধুরতম রস তাদের সমস্ত দৈবশক্তি নিয়ে অতল গভীরে আত্মগোপন করে আছে ও রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমেই যে এর মন্ত্রচৈতন্যের মধ্যে অলক্ষ্যভাবে ক্রীয়াশীল এ রহস্য অদীক্ষিত অসাধকের কাছে অজ্ঞাতই থাকে। হরিদাসের জীবনে সে সত্য একবার প্রকাশিত হয়েই আবার রহস্য সাগরে ডুব মেরেছে। যিনি হরিদাসের মত নিষ্ঠা নিয়ে নাম-সমুদ্রে নিমজ্জিত হবেন, যিনি প্রেমরত্নাকরের অগাধ জলে আত্মসংবিৎ হারিয়ে ডুবে

যাবেন, তিনিই এই ভক্তি সাধনা মন্ত্রের অক্ষরে অক্ষরে অনাস্বাদিত মধুর রসের সন্ধান পেয়ে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করবেন। নাম জপের মৃণালে শেষ পর্য্যন্ত দিব্যরসগন্ধভরা শতদল পদ্ম বিকশিত হয়ে উঠবে, আবৃত্তির স্থির সরোবরে রসের হিল্লোল উঠে সাধককে এক অপরূপ আনন্দ তীরে পৌঁছে দেবে।

মন্থিত দুগ্ধের তলে নবনীতের ন্যায় কঠোর অনুশাসনের লৌহ-শৃঙ্খলবদ্ধ পৌনঃপুনিক মন্ত্র-উচ্চারণ গভীরশায়ী রসের উদ্বোধন ঘটিয়ে ভক্তিপথের পথিককে প্রেম স্বর্গের অভিযাত্রী, চির কিশোর —কিশোরীর লীলাবিলাসস্থল ভাববৃন্দাবনের অধিবাসী করে তুলবে।

এই সত্যই হরিদাসের সর্ব্বভোগশূন্য কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যাসাধনের মধ্যে দিয়ে ব্যঞ্জিত হয়েছে। তিনি তাঁর সমস্ত ত্যাগ-বৈরাগ্যের মরুভূমির মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরের স্বর্ণচূড়া ও শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জশ্যামলিমা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

সাধারণতঃ আধুনিক সমালোচক চৈতন্য-চরিত গ্রন্থগুলিকে পৌরাণিক অতিরঞ্জন দুষ্ট বলে অভিযোগ করে থাকেন—চৈতন্যের জীবনকাহিনী যেন পৌরাণিক অলৌকিকতার প্রক্ষেপে অনৈতিহাসিক হয়ে উঠেছে। এই অভিযোগ আক্ষরিক ভাবে সত্য অন্তরধর্মে অসত্য। সত্য সত্যই নবদ্বীপে ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের অবতারকে কেন্দ্র করে পঞ্চদশ—ষোড়শ শতকে বাংলায় পৌরাণিক যুগের পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল। চৈতন্য পরিকর গোষ্ঠী যে কোন পৌরাণিক অবতারের কায়ব্যূহের সমধর্মী, সংখ্যায় প্রচুর, উদ্দেশ্যে এক-সূত্রগ্রথিত ও একই লক্ষ্যবদ্ধ। আর পৌরাণিক যুগের অতিমানবিকতা অন্ততঃ দুইটি ঐতিহাসিক চরিত্র উদাহৃত—এক, দিব্যোন্মাদগ্রস্থ শ্রীচৈতন্য, ও অপর, বাইশ বাজারে বেত খাওয়া অমানুষিক অত্যাচারে অটল যবন দীন হরিদাস—

ইতি—

বৈষ্ণবকৃপাকণাপ্রার্থী

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

Dr. R. C. Mazumdar
4, Bepin Pal Road,
Calcutta-26

সবিনয় নিবেদন

আপনার "ঠাকুর হরিদাস" গ্রন্থখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিলাম। এই পরম বৈষ্ণবের জীবন কাহিনীর যত প্রচার হয় ততই ভাল। আপনার গ্রন্থখানি এ বিষয়ে সাহায্য করিবে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

নিং শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

VISVA-BHARATI
KALIDAS BHATTACHARYA
Santiniketan
West Bengal (India)

পরম শ্রদ্ধাষ্পদেষু ১৮ই অক্টোবর

আমি অনেক দিন আগেই আপনার "ঠাকুর হরিদাস" শ্রীগ্রন্থ-খানি পরম তৃপ্তির সহিত আদ্যন্ত অতি যত্ন করে পড়েছি। এমন অপূর্ব্ব ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ বর্ত্তমান সমাজে অতি বিরল। আমার ইচ্ছা হয় বারে বারে ঐ গ্রন্থখানি পাঠ করি। পাঠ করতে বসলে ছাড়া যায় না।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করবেন। ইতি—

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

মহানাম সম্প্রদায়

শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন পোঃ শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর
শ্রীশ্রীমহানাম যজ্ঞক্ষেত্র

জয় গুরু শ্রীগুরু

অমিত প্রীতিভাজনেষু

আপনার "ঠাকুর হরিদাস" শিরে ধারণ করিয়া ধন্য হইলাম। শ্রীগ্রন্থ পাকীস্থানে পৌঁছিয়া আমার হাত পর্য্যন্ত আসিতে বেশ বিলম্ব হইয়াছে।

আপনার গ্রন্থ, গ্রন্থ নয় 'অমৃতের খণ্ড'। তাহাতে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আঁখরে কর্পূর বাসিত হইয়াছে। গুরুকৃপাস্নাত আপনার লেখনীস্পর্শে মধুর লীলা মহা-মাধুর্য্য-মহোদধিতে পরিণত হইয়াছে "স্বাদু স্বাদু পদে পদে"।

মৃত্যুঞ্জয়ী "ঠাকুর হরিদাস" শ্রীগ্রন্থ আপনাকেও বৈষ্ণব জগতে অমর করিয়া রাখিবে। ঠাকুর হরিদাস সম্বন্ধে আরও দুই তিনটি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। তাহাদের তুলনায় আপনার গ্রন্থ পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। একটি অখণ্ড চিত্র।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসঙ্গী শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীনরহরি, শ্রীরামানন্দ, শ্রীঠাকুর নরোত্তম প্রমুখ পার্ষদগণের প্রত্যেকের সম্বন্ধে এক একটি গ্রন্থ লিখিয়া আপনি বৈষ্ণব জগতকে আরও সমৃদ্ধিশালী করুন।

আপনি শ্রীরাম-কিঙ্কর। নিত্যানন্দরামের কৃপায় আপনার লেখনী মহাযোগ্যতা লাভ করিয়াছে। ভাবাপ্লুত হৃদয় "ঠাকুর হরিদাস" পাঠ করিতেছি আর ভাবিতেছি কবে জগতের প্রতি ঘরে এই মহারত্ন পূজিত হইবেন। জয় নিতাই। জয় জগদ্বন্ধু।

কৃপার্থী

দাস - মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

C. K. Bhattacharyya
M. A. LL B.
Member. Senate & Syndicate
CALCUTTA University
MEMBER OF PARLIAMENT
LOK SABHA

CALCUTTA
Phone : 55-3498
24A, Hemendra Sen Street,
Calcutta-6

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু—

এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া আপনি ধর্মের, সমাজের ও সাহিত্যের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। ঠাকুর হরিদাসের চরিত্র ও সাধনা জগতে দুর্লভ। এইজন্য মহাপ্রভুর পরিকরগণের মধ্যে এবং ধর্ম-জগতে তাঁহার বিশেষ স্থান। এই দেবদুর্লভ জীবনের কথা কিন্তু বিশেষ কোথাও লিপিবদ্ধ নাই। বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। আপনি যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া বিচ্ছিন্ন জীবন কথাগুলিকে একত্রে গ্রথিত করিয়া একটি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ জীবনীর আকার দান করিয়াছেন। ইহার জন্য সামাজিকগণ আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

মহাপ্রভুর সাধনা ও শিক্ষা ঠাকুর হরিদাসের মধ্যে রূপ লইয়াছিল শ্রীহরিদাসকে তাহার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। আপনার রচনায় ও সংগ্রহে ঠাকুর হরিদাসের সে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্য পরিকরের মধ্যে ঠাকুর হরিদাসের স্থান কোথায় এবং কতখানি তাহাও আপনি ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ঠাকুর হরিদাসের জীবনী সংগ্রহে আপনি যে সকল সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার মধ্যে নিত্যধামগত শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের সংকীর্ত্তন পদগুলির বিশেষ স্থান আছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঠাকুর হরিদাস সম্বন্ধে যে অনুভব লিপিবদ্ধ আছে শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয়ের অনুভব পূর্ব্বাচার্য্যগণের সে অনুভবকে কেবল 'সম্পূর্ণ' ও 'সমৃদ্ধ' করে নাই তাহাকে 'অধিকতর পরিস্ফুট

করিয়াছে' এবং তাহার 'অন্তরঙ্গ ভাবটিকে' উদ্ঘাটিত করিয়াছে। ইহাতেই আপনার যাহা আকাঙ্খা তাহারও পূরণ হইয়াছে। আপনার রচনায় ও সংগ্রহে ঠাকুর হরিদাস যে ভাবের ভাবুক ছিলেন তাহা প্রকাশ পাইয়াছে এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বহুভাবসমন্বিত সাধনার যে ভাবটি লোক সমাজে প্রকাশার্থে ঠাকুর হরিদাসের আবির্ভাব সে ভাবও সর্বসাধারণের অনুভবসাধ্য হইয়াছে।

"ঠাকুর হরিদাসের" বহুল প্রচার হউক ইহাই আমার প্রার্থনা। শ্রীহরিদাসচরিত্রের অনুধ্যান সমাজের কল্যাণ করিবে এবং বর্ত্তমান সমস্যাপীড়িত জীবনে শান্তি ও স্থিতি আনিবে।

ইতি—

বিনীত শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

পুঃ একটি সংশোধনের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি—

আপনার গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"প্রসিদ্ধ কুলটা হইল পরম মহান্তী" মূল গ্রন্থে এখানে "কুলটা" শব্দের স্থলে বৈষ্ণবী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—

Dr. Bimanbehari Mazumdar
M. A. Ph. D. P. R. S.
Bhagbatratna

GOLA DARIAPUR
PATNA-4
Phone: 23156

সবিনয় নিবেদন—

ঐ গ্রন্থের ভাষা যেমন সরল সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী, ভাবও তেমনি মনোহর। সর্ব্বত্র আপনি ঐতিহাসিক মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন ইহা আরও সুখের বিষয়।···প্রণাম।

ভবদীয়—

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্, এ, বি. এল্,
৫৭বি, আপার সর্কুলার রোড,
এম্, পি, (ভারতীয় রাজ্যসভা)　　কলিকাতা-৯
ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি　　টেলিফোন : ৩৫-১৬৬২
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের সদস্য

শ্রীরামকিঙ্কর দাস সঙ্কলিত
"ঠাকুর হরিদাস"

অভিমত

৺পুরীধাম স্বর্গদ্বরাস্থ শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর ট্রাষ্ট কর্তৃক প্রকাশিত ও বিশিষ্ট বৈষ্ণব-সেবক শ্রীরামকিঙ্কর দাস মহাশয় সংকলিত "ঠাকুর হরিদাস" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। একে ত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ যবন হরিদাস ঠাকুরের পুণ্য কাহিনী বিবৃত হইয়াছে এই গ্রন্থখানিতে, তদুপরি সঙ্কলিয়তা দাস মহাশয় যেরূপ ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া বৈষ্ণব মহাজনদিগের গ্রন্থাদি হইতে ঠাকুর হরিদাসের লীলা কাহিনী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্বতঃই চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠে। অথচ শুধু যে উচ্ছ্বাসেই পরিপূর্ণ এই গ্রন্থখানি তাহা নহে, ঠাকুর হরিদাসের জীবনের বিচিত্র কাহিনীর তথ্য ও ঘটনাবলীও অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা হয়ত ঠিক বৈষ্ণবভাবাপন্ন নহেন অথচ সাধু-মহাত্মাদিগের পুণ্য চরিত কথা জানিতে উৎসুক তাঁহাদিগের নিকটও এই গ্রন্থখানি খুবই উপাদেয় ও উপভোগ্য হইবে মনে করি। বলা বাহুল্য মাত্র আধ্যাত্ম জীবন গঠনে অতি মূল্যবান এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার আমি কামনা করি।

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

কলিকাতা

ওঁ হরিরোম্

মহামহোপাধ্যায়—শ্রীকালিপদ তর্কাচার্য্য শান্তিনগর,
পোঃ ভদ্রপল্লী, হুগলী

গ্রন্থ রত্ন সমীক্ষা

শ্রীশ্রীভগবতভক্তি যেমন ভগবদ্‌ভক্তের প্রাক্তন অসাধারণ মহাপুণ্যের ফল, তেমনই ভগবদ্‌ভক্তি-বাসিত চিত্ত ভগবদ্‌ভক্তের পুণ্য চরিত কথা আলোচনা করিবার সুযোগ লাভ করাও মহাপুণ্য প্রসূত ইহা অসন্দিগ্ধ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। তাই আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব চূড়ামণি বিদ্যাচারসম্পন্ন শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর দাস মহাশয়ের নিপুণ লেখনী-প্রসূত "ঠাকুর হরিদাস" নামক গ্রন্থরত্ন আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সাগ্রহে ভক্তিসহকারে পাঠ করিয়া স্বকীয় প্রাক্তন মহাপুণ্য সম্ভাবনা সম্বলিত পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি।

এই গ্রন্থরত্নের ভক্ত-কবি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাভারত ও হরিদাস ঠাকুরের জীবন কথা প্রভৃতি মহামূল্য বহুগ্রন্থ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বৈষ্ণব কুলের চরম আদর্শভূত যবন হরিদাসের অপূর্ব্ব পবিত্র চরিত্র-গত অসাধারণ বৈশিষ্ট্য অতি মধুর সামঞ্জস্য পূর্ণ সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের তথা বৈষ্ণব তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক সমাজের সুগভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন।

আমরা যখন এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের বর্ণিত হরিদাস ঠাকুরের প্রথম ও দ্বিতীয় অগ্নিপরীক্ষা, কারাবরণ, কারাবাস, দণ্ড বিধান প্রভৃতি বিচিত্র বিস্ময়কর প্রকরণ সমূহ অধ্যয়ন করি, তখন ঠাকুর যবন হরিদাসের কামক্রোধাদিরিপুবিজয়িনী বিস্ময়জননী মহাশক্তি, বৈষ্ণবধর্মে সুমহতী নিষ্ঠা, নামজপের সঙ্কল্প পালনে দৃঢ়তা, নাম সংকীর্ত্তনে উন্মত্ততা, কষ্টসহিষ্ণুতা, বিষ্ণুভক্তি প্রসূত অলৌকিক শক্তি প্রভৃতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লোকাতীত মহাবিস্ময়ে অভিভূত হই এবং মনে মনে তাহার চরণ প্রান্তে ভক্তিভরে নিজ মস্তক অবনত করি।

এই মহা গ্রন্থ যাহারা একান্তচিত্তে পাঠ করিবেন তাহাদের কাছে ঠাকুর যবন হরিদাসের পবিত্র জীবন কথার অণুমাত্র অংশ অবিদিত থাকিবে না।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার যেমন পরম বৈষ্ণব তেমনই তত্ত্বগবেষণাদক্ষ, তাই তিনি এই গ্রন্থে নানা প্রাচীন গ্রন্থের নানা উপাদেয় তত্ত্ব আহরণ পূর্ব্বক প্রমাণ সহযোগে উপান্যাস করিয়া নিঃশেষ রূপে হরিদাস ঠাকুরের চরিত্র বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভের সুযোগ সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন। যাহার ফলে তিনি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেরই অসীম কৃতজ্ঞতা ও অজস্র সাধুবাদের পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থাকারেব বর্ণিত যবন হরিদাসের অনন্য সাধারণ ঐকান্তিক ভগবদ্‌ভক্তি ও বৈষ্ণবোচিত আচার নিষ্ঠা প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া অতি নাস্তিক দুশ্চরিত্র ব্যক্তিও নাস্তিকতার ঘোর অন্ধকার হইতে আস্তিকতার উজ্জ্বল অলোকময় লোকে উন্নীত হইবেন ইহাই আমি সম্ভাবনা করি। অনুভবশীল নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থের নানা বিষয়ে মহোপকারিতা অনুভব করিরেন। অতএব এই কল্যাণময় মহাগ্রন্থের ভূরি প্রচার কামনা করি এবং শ্রীশ্রীভগবানের চরণপ্রান্তে গ্রন্থকারের নিরাময় কল্যাণময় সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

—তদীয় গুণমুগ্ধ
শ্রীকালিপদ তর্কাচার্য্য

শ্রীমধুসুদন ন্যায়াচার্য্য
প্রধান অধ্যাপক প্রাচ্যবিভাগ
গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ। কলিকাতা

শ্রীমৎ রামকিঙ্কর দাস সঙ্কলিত "ঠাকুর হরিদাস (১ম খণ্ড) গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ছায়া অবলম্বন করিয়া 'তৃণাদপি সুনীচেন' ইত্যাদি শ্লোকের মূর্ত্তপ্রতীক বৈষ্ণবচূড়ামণি ঠাকুর হরিদাসের কৈশোর হইতে আরম্ভ করিয়া নীলাচলে মহাপ্রয়াণ পর্য্যন্ত অমৃত-মধুরিমাময়ী জীবন কথা আলোচ্য গ্রন্থে অতি নিপুণ ভাবে প্রাঞ্জল-ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। আমার মনে হয়, সাধন পরায়ণ ব্যক্তি ভিন্ন কাহারও পক্ষে এইরূপ ভাবগম্ভীর মাধুর্য্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং গ্রন্থকার সে একজন ভাগবতোত্তম এবং উন্নত সাধন-মার্গে অধিষ্ঠিত এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই গ্রন্থরত্ন-খানি পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মানসমন্দিরে হরিদাসের জীবন-বীণা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ উক্ত গ্রন্থে বিদেহী ভক্ত সাধক শ্রীমদ্-রামদাস বাবাজী মহোদয়ের রোমাঞ্চ সঞ্চারী অনবদ্য সংকীর্ত্তন পদাবলী সংযোজিত হওয়ায় মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়াছে। ত্রিতাপ-তাপিত সংসারী জীবগণ এই পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে অভূতপূর্ব শান্তি-লাভের অধিকারী হইবে। আমি বৈষ্ণব ও সুধীসমাজে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

শ্রীমধুসূধন ন্যায়াচার্য্য

দীননাথ ত্রিপাঠি
কাব্য-ব্যকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তর্ক-তর্ক
ন্যায়-মীমাংসাতীর্থ, ন্যায়াচার্য্য

ঠাকুর হরিদাসের জীবন অতুলনীয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এবং শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তাঁহার লীলাকথা যে ভাবে নিবিষ্ট আছে. তাহা পড়িলে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তির উদয় হয়। গ্রন্থকার 'ঠাকুর হরিদাস' গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়া একত্র হরিদাসের সমগ্র লীলা যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে এই গ্রন্থটি পড়িতে আরম্ভ করিলে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। একে শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভগবন্মূর্তির সহিত হরিদাস ঠাকুরের লীলা বিলাস তারপর শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের অনুভূতির সম্বন্ধ মিলিত হইয়া উক্ত গ্রন্থখানি নিত্য স্বাধ্যায়ের বিষয়ীভূত হইয়াছে মনে হয়; আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে হরিদাস ঠাকুরের লীলা বুঝিতে পারা একেবারেই অসম্ভব। তথাপি এই গ্রন্থ পড়িলে মনে হয় পাঠক তাঁহার কিঞ্চিৎ লীলাস্বাদে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা আমাদের বিশ্বাস।

নিবেদন ইতি—
বিনীত—শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠি

Dr. B. B. Dutt,　　　　30, Motijheel Avenue,
Dumdum, Cal-28

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু—

ভক্তপ্রবর. আপনার অপ্রত্যাশিত কৃপাপ্রদত্ত, কলিযুগের প্রহ্লাদ, ভক্তশ্রেষ্ঠ ঠাকুর হরিদাসের অমর জীবন কাহিনী পাইয়া চমৎকৃত হইলাম এবং নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। ঠাকুর হরিদাস

ছিলেন ভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ। লিখিয়াছেন, আপনার মতন ভক্ত সাধক। এই পবিত্র জীবনীতে তাই বহিয়া গিয়াছে আদ্যন্ত ভক্তি-রসের অমৃত-বাহিনী সুরধুনী। ভাগ্যবান্ ভক্তই এই পুণ্যপ্রবাহে অবগাহন করিবার অধিকারী। আমার সেই ভাগ্য হয় নাই। তবুও মনে হইল, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া মন পবিত্র হইল, দেহ শুদ্ধ হইল। যেই রসের আস্বাদ পাইলে সংসার-রসগোল্লার রসও বিরস হইয়া যায়, 'মাত্রাস্পর্শ' লোপ পায়, ঠাকুর হরিদাস সেই দিব্যামৃতরস নিত্য আস্বাদন করিতেন।

বাইশ বাজারের বেত্রাঘাতেও তাঁহার মন বহির্মুখ করিতে পারে নাই।—আপনার লেখার গুণে সেই চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রামদাস বাবাজীর কীর্তনামৃতে ভক্তপ্রবরের মহিমা বড়ই সুমধুর হইয়াছে। এই ভোগবানের যুগে এই রকম ভক্তিগ্রন্থ যতই প্রচার হয়, ততই মঙ্গল।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনীত—শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত

অধ্যাপক—**ধীরানন্দ ঠাকুর**

ঠাকুর হরিদাস

(অভিমত)

জীবনের সৎ, মহৎ ও সুন্দর বৃত্তিগুলির অনুশীলনই ধর্মসাধনা। এই অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা নিত্যকালীন। সুতরাং যথার্থ ধর্মসাধনার আবশ্যকতাও সার্বকালিক, সার্বদেশিক।

তথাকথিত ধর্মমতসমূহের মূল্যবত্তা নিরূপণ করতে হবে এই শাশ্বতকালিকতার মানদণ্ডে।

হিন্দুধর্মের সার স্বরূপের মর্ম অবগত হোলে তার এই নিত্যকালীনতার কথা উপলব্ধি করা যাবে। হিন্দুধর্মের একটি অভিব্যক্ত সুপরিণত রূপ বৈষ্ণব-ধর্ম। বৈষ্ণব-ধর্মের পরাকাষ্ঠা চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম।

বৈষ্ণব ধর্মের অনুভব-নির্ভরতা ও যুক্তি প্রতিষ্ঠাতার এবং বাস্তবিকতা ও ভাবিকতার পূর্ণ-স্বরূপের পরিচয় যাঁরা একদা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হোলেন যবন হরিদাস। এই পরিচয়ে মুগ্ধ হোয়েই বোধ হয় তিনি মনে প্রাণে-বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

অদ্বৈত-দেব ও চৈতন্য-দেবের সংস্পর্শে এসে হরিদাসের জীবন সাধনা হোতে পেরেছিলো ঐকান্তিকতর, গভীরতর। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মে হরিদাসকে বিশিষ্ট ভাবে গ্রহণ করে ও স্বীকৃতি দিয়ে অদ্বৈত ও চৈতন্যদেব এক অসামান্য মানবতা, দূরদর্শী সমাজ চেতনা এবং যথার্থ, যুক্তিনিষ্ঠ ধর্ম বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাঙলা দেশের সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসে এই ঘটনার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বিশেষ প্রণিধেয়। বৈষ্ণব-ধর্মের অসাম্প্রদায়িকতা ও সর্বজনীনতার কথাই প্রমাণিত হোয়েছিলো তাঁদের প্রচেষ্টায়।

পক্ষান্তরে হরিদাসেরও অসাধারণ শক্তির কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। সেকালের সেই সংকীর্ণ, কুসংস্কার-বিমূঢ়, আতঙ্কময় প্রতিকূল পরিবেশে বৈষ্ণব ধর্মের সর্বজনীনতা ও সত্য সৌন্দর্যময়তার বিষয় উপলব্ধি গ্রহণ ও স্বীকৃতি করার এবং অসহনীয় নির্য্যাতন সহেও সেই ধর্মকে অবিচলিত নিষ্ঠা ও অনুরাগ দিয়ে ধরে থাকার অনন্য ক্ষমতা হরিদাসেরই ছিলো।

এই বিচারে একান্ত একক ছিলো পরম ভক্ত হরিদাসের জীবন। তাঁর উপলব্ধ ধর্মের অনুভূত অনুরাগের এবং সাধিত আচরণের নৈষ্ঠিকতা সর্ব মানুষের আদর্শ-স্বরূপ।

কিন্তু মহাশক্তিমান এই ভক্তের জীবন-কথা তেমন সুবিদিত নয়।

তাঁর এই স্বরূপের পরিচয় সে-ভাবে দেখাবার চেষ্টাও তেমন দেখা যায়নি এত দিন।

এখন তার নিদর্শন পেলুম একটি সুলিখিত গ্রন্থে। গ্রন্থটির নাম "ঠাকুর হরিদাস"। লেখক রামকিঙ্কর দাস। এই লেখকও এক পরম বৈষ্ণব ভক্ত, নিষ্ঠাবান সাধক। তাঁর বৈষ্ণব শাস্ত্রের জ্ঞান ও উপলব্ধির নিদর্শন আছে এই সদ্‌গ্রন্থে।

ইনি মুখ্যত 'চৈতন্য ভাগবত' এবং 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থদ্বয়কেই আকর রূপে আশ্রয় করেছেন। কিন্তু সেই গ্রন্থ দুটিতে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা হরিদাস জীবনীর নানা উপাদানকে পরম অনুরাগের সঙ্গে সংকলন, হৃদ্যতা দিয়ে অনুভব এবং সবার উপর সহজ সরস করে রূপ দেওয়ার চিত্তশক্তির স্বচ্ছ উজ্জ্বল প্রমাণ মিলে এই আলোচ্য গ্রন্থে।

অনাচ্ছন্ন মনে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে বোঝা যাবে, বিষয়কে পরিষ্কার করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রচনার ক্ষমতা এই লেখকের আছে। এই ক্ষমতার গুণে এখন জানা কত সহজ হোলো, হরিদাসের জীবন সত্যই কি বিস্ময়কর, বিচিত্র ছিলো। কত চক্রান্তের প্রতিকূলতায়, কত নির্য্যাতনের নির্মমতার আঘাতে হরিদাসের ভক্তিশক্তির অলৌকিকতা পরিক্ষীত; কত বিনয়ে-দৈন্যে কত অনীহতায় এবং অনুরাগে যে হরিদাসের মহৎ জীবন ছিলো সুন্দর, আনন্দভাজন তা স্পষ্টই প্রতীত হোয়েছে এই গ্রন্থে। এক একটি পরিচ্ছেদে হরিদাস জীবনের এক-এক প্রকাশকে এমন করে রূপ দিয়েছেন এই লেখক যে তাতে হরিদাসের মহাজীবনকে যেন একবারে প্রত্যক্ষ করা যায়। গ্রন্থের ভাষাতেও কী চমৎকার কমনীয় প্রসাদ-গুণ।

অকুণ্ঠিত চিত্তে বলতে ইচ্ছা করে বাঙলা জীবনী-সাহিত্যের ভাণ্ডারে গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখ্য এক সংভরণ।

—ধীরানন্দ ঠাকুর

Anil Chandra Banerjee P228. C. I. T. ROAD
M. A. Ph D. CALCUTTA-10

শ্রীচৈতন্য চরণে সমর্পিত চিত্ত শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ঠাকুর হরিদাসের পরম পবিত্র জীবন কাহিনী পাঠ করিয়া ধন্য হইলাম। বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য রূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন এবং ভক্তিরস পানে উন্মুখ বৈষ্ণব সমাজকে সাদরে উপহার দিয়াছেন। আশা করি তিনি ভবিষ্যতে অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনগণের পুণ্য জীবনী পাঠক সমাজে উপস্থিত করিবেন। ভক্তগণের নিকট এইরূপ গ্রন্থের বিশেষ সমাদর হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১শে বৈশাখ

ওঁ

চৈত্র সংক্রান্তি ৬১।১, মুর এভিনিউ.
কলিকাতা-৪০

পরম পূজনীয় বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীরামকিঙ্কর দাস

শ্রীচরণকমলেষু—

অপ্রত্যাশিত ভাবে গত বুধবার ২৯শে চৈত্র আপনার প্রেরিত "ঠাকুর হরিদাস" নামক শ্রীগ্রন্থখানি পেয়ে বিস্ময়ে পুলকিত হলাম। এমন একটি মহাগ্রন্থ আমার মত অধম নরকুকুরকে আপনি প্রেরণ করা কেন সঙ্গত মনে করলেন, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বইটি পাঠিয়ে আপনি মাদৃশ অভাজনকে যে করুণা প্রদর্শন করেছেন তার জন্যে আপনার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করছি।

পরম ভক্ত বৈষ্ণব ব্যতীত এরূপ সদগ্রন্থ সমালোচনার অধিকার জন্মে না। কিন্তু আমি তো বৈষ্ণব নই। ভক্তও নই। আমার মতো অকৃতী অধম এক পাষণ্ডকে অভিমত প্রকাশের আহ্বান জানিয়ে অবশ্যই আপনি অমানীকে মান দান করেছেন। আমি সম্মানিত হয়েছি নিঃসন্দেহ কিন্তু আপনার সঙ্কলিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানির সম্মান বৃদ্ধি করতে পারব কি না জানি না।

ঠাকুর হরিদাস গ্রন্থখানির মুদ্রণ পরিপাট্য প্রশংসনীয়, চিত্রগুলি সুনির্বাচিত, সু-অঙ্কিত উপযুক্ত উপলক্ষে প্রদত্ত। কিন্তু এ তো কেবল বহিরঙ্গ সৌষ্ঠবের উৎকর্ষের কথা।

অন্তরঙ্গ বিচারে দেখা যায় যে একুশটি সুবিভক্ত পরিচ্ছেদে গঠিত এই গ্রন্থের বিষয় বস্তু ভক্তিরসপরিপ্লুত অথচ জীবনীগ্রন্থসঙ্গত ঐতিহাসিকতায় সমৃদ্ধ। ঠাকুর শ্রীহরিদাসের জীবন কাহিনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও ভক্তিরোমাঞ্চময়। তাঁর জীবনে যা কিছু শিক্ষণীয় উপাদান ছিল, গ্রন্থকার সমস্তই সযত্নে সংগ্রহ করেছেন। যা কিছু পবিত্র, যা কিছু মধুর, সে-সবের একশেষ করে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়েছে। লেখক নিত্য নব অভ্যুদয় লাভ করুন ; এই পত্র লেখকের বিনীত প্রার্থনা। কৃষ্ণভক্তি-রস-ভাবিতা মতি নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে এই সঙ্কলন কার্য্য তিনি সমাপ্ত করেছেন। তাঁকে আমি সর্বান্তঃকরণে সাধুবাদ জ্ঞাপন করছি।

যবন হরিদাস যে প্রকৃতই মুসলমান ছিলেন, এ কথা অবিশ্বাস করার কারণ দেখি না। তিনি খাঁটি মুসলমান না হলে তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণে কাজিরা অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বাইশ বাজারে কোড়া মারার আদেশ দিতেন না। প্রকৃত গবেষকের সত্যনিষ্ঠা নিয়ে শ্রীরামকিঙ্কর অন্য সম্ভাবনাগুলির উপর আলোক পাত করেছেন। তবে দুটি প্রামাণিক গ্রন্থ—শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত যে সাক্ষ্য বহন করছে তার ঐতিহাসিকতা স্বয়ং সার যদুনাথ সরকারের মতো

পণ্ডিতও মেনে নিয়েছেন। সুতরাং হরিদাসের যবন হওয়া সত্ত্বেও ভক্তি মূলক বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের বিষয়ে কোন অপ্রত্যয় বা সংশয়ের অবকাশ দেখি না। এমন সদ্দৃষ্টান্ত আরও আছে।

পরিশেষে আপনাকে প্রণিপাত জানিয়ে এ পত্রের উপসংহার-করি। কোটি জন্মের সুকৃতি ব্যতীত এমন গ্রন্থ রচনা সাফল্য দেখা যায় না।

ইতি

আপনার দাস নরাধম অধ্যাপক—

শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

কানুপ্রিয় গোস্বামী নবদ্বীপ,

শ্রীশ্রীগৌরহরি জয়তি॥

শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দ পদারবিন্দমধুপেষু—

সবহুমান নিবেদন,—

ভবদীয় কৃপা প্রদত্ত 'ঠাকুর হরিদাস' গ্রন্থখানি পাইয়া ও মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হইলাম, পরে আপনার কৃপালিপিও পাইয়াছি জানিবেন। জগদ্বরেণ্য শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসের পুণ্য চরিত এবং যাহা আপনার ন্যায় মহতের সঙ্কলিত, এতাদৃশ গ্রন্থের সমালোচনা করিবার যোগত্যা ও সাহস যে, মাদৃশ হীনজনের থাকিতে পারে না, এ কথার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন তথাপি আপনার ন্যায় পরম বৈষ্ণবের কৃপা নির্দ্দেশ পালন করা অত্যাবশ্যক বিবেচনায়, নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞই বর্ত্তমান যুগে 'সর্ব্বযজ্ঞ সার' অর্থাৎ মুখ্য ধর্মরূপে বিঘোশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নামের মহামহিমা শাস্ত্রে নিগূঢ় ভাবে নিহিত থাকিলেও কলিপাবনা-

বতারী শ্রীনাম প্রেম ধর্মের জগতে মহাপ্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু— শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ আবির্ভাবের পূর্ব্বে উহা প্রকৃষ্টরূপে জন সমাজে প্রচারিত হয় নাই। তদীয় শ্রীচরণানুচর নিত্য পরিকরগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ নাম পরায়ণ ছিলেন। তন্মধ্যে আবার শ্রীঠাকুর হরিদাস ছিলেন সেই ভুবন মঙ্গল শ্রীহরিনাম প্রচারের শ্রীগৌরলীলার অগ্রদূত। অমৃতময় শ্রীনাম মাহাত্মের মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে ঠাকুর শ্রীহরিদাস এই মর জগতে নামামৃত বিতরণের জন্য প্রকট হইয়াছিলেন যথা সময়ে শ্রীগৌরচন্দ্রেরই প্রেরণায়।

শুদ্ধা ভক্তিই সর্ব্বজীবের আত্মধর্ম্ম। জীবের দেহে দেহে ভেদ থাকায় দৈহিক গুণ-কর্ম্মাদির ভেদ অনুরূপ দৈহিক ধর্ম্মের ভিন্নতা অনিবার্য্য। কিন্তু জীবত্মার মধ্যে সেরূপ কোন ভেদ না থাকায় এবং সকল জীবের একই 'কৃষ্ণদাস' সম্বন্ধ হওয়ায়, বর্ণাশ্রমাদি দৈহিক ধর্ম্মের মত এই সর্ব্বাত্ম ধর্ম্ম ভক্তির আচরণে তাই জাতি-কুলাদি কিম্বা স্থাবর জঙ্গমাদি অথবা দেশ-কাল পাত্রাদিরূপ কোন অধিকার ভেদ নাই।

"কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার"।

ভক্তিই পরম স্বতন্ত্রা ও সর্ব্বনিরপেক্ষা। এই হেতু সর্ব্ব জীবের পরম আত্মধর্ম ভক্তিই।

শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন হইতেছেন জীব হৃদয়ে সেই সুদুর্ল্ভা ভক্তি সঞ্চারের 'পরম উপায়'।

"নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়"।

নববিধা ভক্তি উদয়ে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনই পরম কারণ।

"নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হইতে হয়।" সুতরাং বর্ত্তমান যুগে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বজীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা পরম আত্মধর্ম।

"তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন"।

এতাদৃশ অব্যর্থ-প্রভাব শ্রীনাম গ্রহণে যদি শ্রদ্ধাদিক্রমে ভক্তির উদয় না দেখা যায়, তবে অপর কোন কারণের অন্বেষণ না করিয়া,

বুঝিতে হইবে কোন নামাপরাধ সংঘটিত হওয়ায়, যাহার ফলে শ্রীনাম অপ্রসন্নতাবশতঃ স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছেন না।

"তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।

কৃষ্ণনাম বীচ তাহে না হয় অঙ্কুর।" এই হেতু সর্ব্বভাবে দশবিধ নামাপরাধ বিষয়ে সতর্ক থাকিয়া শ্রীনাম গ্রহণের উপদেশ।

"নিরপরাধে নাম লৈলে হয় প্রেমধন"।

একমাত্র নামাপরাধ ব্যতীত নামের ভজনে অপর কোন বিধি নিষেধ নাই।

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।

দেশ কাল নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়।"

শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের এই সর্ব্বনিরপেক্ষতা ও সার্ব্বত্রিকতারূপ মহা মহিমার জন্য শ্রীনামই এই যুগে, জীবের সর্ব্বোত্তম আত্মধর্ম্ম-রূপে স্বপ্রকাশ হইয়াছেন। তাই কেবল মানুষের জন্যই নহে স্থাবর জঙ্গমাবধি সর্ব্বজীবেই শ্রীনাম কীর্ত্তন প্রভাবের ক্রিয়াশীলতা শাস্ত্রসিদ্ধ।

"স্থাবর জঙ্গমাদি বলিতে না পারে।

শুনিলে সে হরিনাম, তারা সব তরে।"

অপর কোন ধর্ম্মের, মনুষ্যত্বের সর্ব্বজীবে এতাদৃশ ব্যাপকতা বা সার্ব্বত্রিকতা দেখা যায় না।

শাস্ত্রোক্ত সেই শ্রীনাম মহিমা, শ্রীঠাকুর হরিদাস চরিত্রে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহার প্রতিটি আচার ও প্রচারে—

"আচার প্রচারে নামের কর তুই কার্য্য।

তুমি জগতের গুরু জগতের বর্য॥" শ্রীসনাতন দাসের এই উক্তিতেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। স্থিরচিত্তে তদীয় জীবনী আলোচনায় ইহার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

বেনাপোলের গহন বনমধ্যে যে নাম যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতে পুষ্ট হইয়াও তৎকালে জনাকীর্ণ সপ্তগ্রামের

ধনপতিগণের সভাগৃহে যাহার পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল শ্রীনাম-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যানে বিরুদ্ধবাদী অপরাধগ্রস্তগণের চেতনা সম্পাদনে এবং যে হরে কৃষ্ণ নাম মন্ত্রের পরম সাধ্যবস্তু হইতেছেন শ্রীগৌরসুন্দর ইহা 'জয় জয় হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ' এই শ্রীমদদ্বৈত বাক্যে প্রকাশ রহিয়াছে। ঠাকুর হরিদাসের সেই শ্রীহরিনাম সাধনার পরিপূর্ত্তির পরিসীমা বা চরম বিশ্রাম স্থল হইয়াছিল নীলাচলে সিদ্ধ বকুলতলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণের সহিত শ্রীগৌর চরণে মহাপ্রয়াণে ও স্বয়ং শ্রীভগবান কর্ত্তৃক তদীয় শ্রীনামসিদ্ধ তনু অঙ্কে ধারণ করিয়া প্রেমনর্ত্তনে এবং পরিশেষে সিন্ধুকূলে স্বয়ং শ্রীহস্তে বালুকা অর্পণ পূর্ব্বক সমাধি দানে, জগতে শ্রীনাম মহিমার সমুজ্জ্বল সাক্ষ্য দিতেছেন—এখনও সেই শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি মঠ।

সেই হরিনামময় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সুমঙ্গল চরিত কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবতাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুসরণ পূর্ব্বক সহজ সুন্দর সুললিত ভাষায় সুনিপুণতার সহিত সঙ্কলিত হইয়া এই 'ঠাকুর হরিদাস' গ্রন্থে যে ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহার দ্বারা বর্ত্তমান কলি সন্তপ্ত জগতের জনগণের মনে পরম মঙ্গল শ্রীহরি নাম গ্রহণের প্রেরণা জাগাইবে, ইহা যথেষ্টরূপে আশা করা যায়।

বিশেষতঃ পরবর্ত্তীকালের নামসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে যিনি অক্লান্ত ভাবে দেশের সর্ব্বত্র শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন প্রবাহ বহাইয়াছেন—সেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের অনুপম আখর যুক্ত কীর্ত্তনাবলী এই গ্রন্থে সংযুক্ত হওয়ায় এবং সাক্ষাৎ সেই শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাসের মর্ত্ত্যলীলায় সিদ্ধিলাভ স্থান 'শ্রীহরিদাস মঠ' হইতে এই গ্রন্থের প্রকাশ ব্যবস্থা হওয়ায় এই সকল পরিবেশ প্রভাবে এই গ্রন্থে যে শক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা অতুলনীয় বলা যাইতে পারে।

আশা করি এই উপাদেয় গ্রন্থখানি নিত্য পাঠ্যরূপে গৃহে গৃহে বিরাজমান হইয়া জাতির কল্যাণ বিধানের সহায়ক হইবেন।

বিনীত নিবেদন ইতি—বৈষ্ণব কৃপালব প্রার্থী দীন কানুপ্রিয় গোস্বামী

শ্রীধাম নবদ্বীপ

'অমৃত' (চিঠিপত্র)

Friday 5th. January,

গৌরাঙ্গ-পরিজন প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য

'কি করে যে মুসলমানের ছেলে হরিদাস হল, সংসার বন্ধন ছিন্ন করে বিরাগী হল কেউ বলতে পারে না—'আমার এ উক্তির ভিত্তি দীন রামকিঙ্কর দাস সঙ্কলিত শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ, স্বর্গদ্বার পুরী থেকে প্রকাশিত' ঠাকুর হরিদাস 'গ্রন্থ'—রামকিঙ্কর দাস লিখছেন :

"হরিদাস ঠাকুর বুঢ়ন গ্রামে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্যকালের কোন ঘটনাই বৈষ্ণব মহাজনগণ উল্লেখ করেন নাই। তিনি কতকাল পিতৃগৃহে ছিলেন। কিরূপে কোন স্পর্শমণির স্পর্শে তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন সে কথা এখন কাহারও জানবার সাধ্য নাই।······ঠাকুর হরিদাসের পিতা মাতার সঙ্গে কিরূপ সম্পর্ক ছিল। কিরূপে তিনি গৃহত্যাগ করেন, এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব মহাজনগণ নির্ব্বাক।"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
কলিকাতা-২৬

'উদ্বোধন'

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম লীলা পার্ষদ ও পরিকর ঠাকুর হরিদাসের স্থান ভক্তি জগতে অতি উচ্চে। তিনি ছিলেন ভক্ত শিরোমণি। কত লৌহময় জীবন যে তাঁহার স্পর্শ মণির স্পর্শে কাঞ্চন-জীবনে পরিণত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আলোচ্য গ্রন্থখানি মহাভক্ত শ্রীহরিদাসের একখানি প্রামাণিক জীবন চরিত। সংকলন কর্ত্তা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত—এই গ্রন্থদ্বয় হইতে প্রধানতঃ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস ভক্ত পাঠকগণের নিকট গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিবে।

'দেশ'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং পরিকর যবন হরিদাস বা ব্রহ্ম হরিদাসের পুণ্য জীবন লীলা গ্রন্থ খানিতে সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু শুধু সঙ্কলন নহে, সাধনানুভূতি সমৃদ্ধ ভাবের সংবেদনে সঙ্কলন রীতি ভাবের একটি অবিমিশ্র রীতি গ্রন্থখানিতে পরিস্ফুট রহিয়াছে দেখা যায়। সঙ্কলন কর্ত্তা চৈতন্য চরিতামৃত এবং চৈতন্য ভাগবত এই দুই খানি গ্রন্থ হইতেই প্রধানত উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। হরিদাস ঠাকুরের জীবনী গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বেও কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানির একটি বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। বিশটি পরিচ্ছেদে আলোচনা বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি

অধ্যায় সঙ্কলন-কর্তার ভগবৎ প্রীতিমূলক অনুভূতির উজ্জ্বল্যে পারম্পর্যসূত্রে ভাবের ঘনিষ্ঠতায় আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আলোচনার মাধুর্য্য পাঠকের মনকে যেন এক নিঃশ্বাসে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। হরিদাস ঠাকুরের নির্বান উপলক্ষে শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তন সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি বিশিষ্টতায় রসভূয়িষ্ঠ লাভ করিয়াছে। বাবাজী মহারাজের ভাবসমাহিত কীর্ত্তন রঙ্গে ভগবৎ প্রেমের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ ভক্তহৃদয়কে নাচাইয়া তোলে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলার মাধুর্যে আমাদের অন্তর আপ্লুত হয় এবং আমাদের মন ভাগবৎ-প্রীতিতে ভরিয়া উঠে। এমন পুস্তকের সর্ব্বত্র সমাদর বাঞ্ছনীয়।

'প্রবর্ত্তক'

……দীন—রামকিঙ্কর দাস বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং সাধক। তিনি বহু গবেষণা, আয়াস এবং শ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসের বিচিত্র জীবন কথা সহজ এবং সরল ভাষায় আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্য সুখ পাঠ্য সংক্ষিপ্ত এবং সংহত। রচনার সরসতা পাঠক সাধারণকে নির্বিশেষে পরমান্দ লোকে নিয়ে যায়। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত নিজস্বতা এবং বিশটি পরিচ্ছদে একটি মহামানবের সুখ-দুঃখ হাসি অশ্রুর আলেখ্য উপস্থাপনের অনায়াস ভঙ্গি সুন্দর।

আমরা ঠাকুর হরিদাসকে জীবন-সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন বলেই মনে করি। এবং লেখককে সাধুবাদ জানাই।

রবিবারের 'বসুমতী'

মহাপ্রভু অভিন্ন হৃদয় পার্ষদ বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের জীবণ কথা যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি ধর্মাত্মা ও ভক্তজনের ধর্ম ও ভক্তিভাব উন্মেষের পরম সহায়ক। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের লেখনীতে, বিপিন বিহারী দাস গুপ্ত মহাশয়ের 'হরিদাস ঠাকুরের জীবন কথা' গ্রন্থে এবং অনুরূপ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বহু রচনার মধ্যে এই মহাপুরুষের হৃদয় গ্রাহী কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। তথাপি ঈদৃশ গ্রন্থের আরও প্রকাশ ও আরও প্রচার বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর দাস মহাশয় উপর্যুক্ত গ্রন্থকর্ত্তাদের ন্যায়ই আর একটি মহৎ কাজ করেছেন ঠাকুর হরিদাসের এই অপূর্ব্ব জীবনী গ্রন্থখানি প্রকাশ করে। এই গ্রন্থের রচনা কৌশল, তথ্য সম্পদ, পরিচ্ছেদ বিভাগ ব্যতীত, অজস্র একাধিক রঙের যে চিত্র সম্পদ সংযোজিত হয়েছে তা অভাবনীয়। অকুণ্ঠ চিত্তে অর্থব্যয় না করলে এক প্রকারে গ্রন্থখানি মুল্যবান ও সুসোভিত করে তোলা কখনই সম্ভব ছিল না। ভক্তজনের মধ্যে এই গ্রন্থের অবশ্যই সমাদর হবে।

'শ্রীসুদর্শন'

সিদ্ধ মহাপুরুষদের জীবন সীমার মাঝে অসীমের খেলা। তাই লেখনীমুখে তার সম্যক পরিচয় প্রদান—তার যথাযথ আলেখ্য চিত্রণ বড়ই দুরূহ ব্যাপার, কারণ সে জীবনের অন্তর্গূঢ় রহস্য তো স্থূল তে, কামকামনার অঞ্জনলিপ্ত চোখে দেখা যায় না। এমনি অনন্য

সাধারণ নিগূঢ় তত্ত্বের খনি, নাম-প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ ছিলেন ঠাকুর হরিদাস। অনন্ত বারাধি সদৃশ পারাপার হীন সন্তজীবনের পরিমাপ করিবে কে? তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতন ভক্ত এবং অনন্য-সাধারণ পণ্ডিতকেও বলিতে শুনি—'বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়''। মানব-সাধ্যের পরাকাষ্ঠা অধ্যাত্ম সাধনায়. এই সাধনায় যিনি যতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই অধ্যাত্ম জীবন রহস্যের উদ্‌ঘাটনে ততটুকু সমর্থ হইবেন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারি গ্রন্থাকার গুরু-কৃপালব্ধ অধ্যাত্ম শক্তি এবং বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির অধিকারী বলিয়াই ঠাকুর হরিদাসের এমন অপূর্ব্ব চরিত-কথা রচনা করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার রচনা-শৈলী, প্রকাশভঙ্গীমার অপূর্ব্বতা এবং ভাবের মাধুর্য্যে ও ভাষার সৌন্দর্যে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জীবনী রচনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার তুলনা বিরল। অধ্যাত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু রসিক ভাবুক পাঠকমাত্রেই গ্রন্থপাঠে মুগ্ধ হইবেন—তৃপ্ত হইবেন।

—— —— —— ——

'হিমাদ্রি'

ঠাকুর হরিদাস ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শুধু অন্তরঙ্গ নয় বিশিষ্টতম পার্ষদও তিনি বটেন।

জনজীবনে শ্রীচৈতন্যের প্রকাশের বহু আগে, চৈতন্য পন্থী বৈষ্ণবীয় ধর্ম্মান্দোলন শুরু হওয়ার বহু আগে যে দুইজন বৈষ্ণব গৌড়দেশে ভক্তি ধর্ম্মের ব্যাখানে ব্রতী হন তাঁহাদের একজন অদ্বৈত আচার্য্য

অপর হরিদাস ঠাকুর। হরিদাসের বিশেষত্ব অদ্বৈতের মত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তিনি প্রচার করেন নাই—করিয়াছেন প্রপত্তি ও নাম সাধন-মূলক ভক্তি ধর্ম্মের প্রচার। কৃষ্ণ নামের মহাচারণ ও ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে তাই হরিদাস গৌড়দেশের সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া উঠেন। যবন কুলে জন্মান সত্ত্বেও যে অত্যাশ্চর্য্য বৈষ্ণবীয় সংস্কার তাঁহার জীবনে উদ্‌গত হইতে দেখা গিয়াছে তাহার তুলনা বিরল।

মহাপ্রভুর প্রেমলীলা ভক্ত প্রবর হরিদাসের জীবনে অপরূপ মহিমায় প্রতিফলিত হয়। দৈন্য ত্যাগ তিতিক্ষা ও ভক্তি প্রেমের বিকাশ দেখা যায় তাঁহার সাধন সত্ত্বায়। হরিদাসের নির্য্যান লীলার যে করুণ মধুর বর্ণনা চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত আছে ভক্তি সাহিত্যে তাহার তুলনা খুজিয়া পাই না। মহাপ্রভুও তাঁহার প্রাণসর্ব্বস্ব হরিদাসের অন্তিম সংলাপ ও প্রেমার্ত্তি আজও সহস্র সহস্র ভক্তের হৃদয়কে উদ্বেল কয়িয়া তোলে। মহাভক্ত ঠাকুর হরিদসের জীবন-লীলার এক অপূর্ব্ব আলেখ্য, লেখক এই গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন। হরিদাসের জীবন তথ্য বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনা হইতেই প্রধানতঃ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই সংগৃহীত তথ্য ও হরিদাস-তত্ত্ব যে ভাবে তিনি পরিবেশন করিয়াছেন তাহা উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। মহা বৈষ্ণব হরিদাস, নামমূর্ত্তি হরিদাস এখানে যেন জীবন্ত হইয়া ধরা দিয়াছেন।

রামদাস বাবাজী মহারাজের অনুভূতি লব্ধ সুললিত পদাবলী ও আখর সমূহ সংযোজিত হওয়ার গ্রন্থের আকর্ষণ আরো বাড়িয়াছে পুরাতন ও আধুনিক চিত্রগুলি অবশ্যই ঠাকুর হরিদাসের স্মৃতি অনু-ধ্যানের সহায়তা করিবে। এই গ্রন্থটি শুধু বৈষ্ণব সমাজেরই উপকার করিবে না, অধ্যাত্মরসিক পাঠক মাত্রেরই কল্যাণ সাধন করিবে।

— – ——